তিন গোয়েন্দা
ভলিউম ১
প্রথম খণ্ড
রকিব হাসান
কিশোর থ্রিলার
সেবা
প্রকাশনী

তিন গোয়েন্দা

প্রথম প্রকাশঃ আগস্ট ১৯৮৫

রকি বীচ, লস অ্যাঞ্জেলেস, ক্যালিফোর্নিয়া।

সাইকেলটা স্ট্যাণ্ডে তুলে রেখে ঘরে এসে ঢুকল রবিন মিলফোর্ড। গোলগাল চেহারা। বাদামী চুল। বেঁটেখাট এক আমেরিকান কিশোর।

'রবিন, এলি?' শব্দ শুনে রান্নাঘর থেকে ডাকলেন মিসেস মিলফোর্ড।

'হ্যাঁ, মা,' সাড়া দিল রবিন। উঁকি দিল রান্নাঘরের দরজায়। 'কিছু বলবে?'

চেহারায় অনেক মিল মা আর ছেলের। চুলের রঙও এক। কেক বানাচ্ছেন মিসেস মিলফোর্ড। 'চাকরি কেমন লাগছে?'

'ভালই,' বলল রবিন। 'কাজকর্ম তেমন নেই। বই ফেরত দিয়ে যায় পাঠকরা। নাম্বার দেখে জায়গামত ওগুলো তুলে রাখা, ব্যস। পড়াশোনার প্রচুর সুযোগ আছে।'

'কিশোর ফোন করেছিল,' একটা কাঠের বোর্ডে কেক সাজিয়ে রাখতে রাখতে বললেন মা।

'কি, কি বলেছে?'

'একটা মেসেজ দিতে বলেছে তোকে।'

'মেসেজ! কি মেসেজ?'

'বুঝলাম না। আমার অ্যাপ্রনের পকেটে আছে।'

'দাও,' হাত বাড়াল রবিন।

'একটু দাঁড়া। হাতের কাজটা সেরেই দিচ্ছি,' বড় দেখে একটা কেক তুলে নিলেন মা। ছেলের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'নে, খেয়ে নে এটা। নিশ্চয় খিদে পেয়েছে।'

কেকটা নিয়েই কামড় বসাল রবিন।

'হ্যাঁরে, রবিন, রোলস রয়েস তো পেলি···

'শুনেছ তাহলে। আমি না, কিশোর পেয়েছে,' কেক চিবুতে চিবুতে বলল রবিন। 'চেষ্টা করেছিলাম, হয়নি। একশো আশিটা বেশি বলে ফেলেছিলাম, মুসা দু'শো দশটা কম।'

'ওই হল! কিশোরের পাওয়া মানেই তোদেরও পাওয়া।···রবিন, প্রতি-

যোগিতাটা কি ছিল রে?'

'জান না?' চিবানো কেকটুকু কোঁৎ করে গিলে নিয়ে বলল রবিন, 'সে এক কাণ্ড! বড় এক জারে [illegible] বীচি ভরে শোরুমের জানালায় রেখে দিয়েছিল কোম্পানি...'

'রেন্ট-আ-রাইড অটো রেন্টাল কোম্পানি?'

'হ্যাঁ। ঘোষণা করল, জারে ক'টা বীচি আছে যে বলতে পারবে, শোফারসহ একটা রোলসরয়েস দিয়ে দেয়া হবে তাকে তিরিশ দিনের জন্যে। সব খরচ-খরচা কোম্পানির। ঘোষণা দেখে ঝটপট আনসার সাবমিট করে দিয়ে এলাম আমি আর মুসা। কিশোর তা করল না। জারটা ভাল করে দেখল, এদিক থেকে ওদিক থেকে। বাড়ি ফিরে এসে শুরু করল হিসেব। কত বড় জার, বীচির সাইজ, প্রতিটা বীচি কতখানি জায়গা দখল করে, ইত্যাদি ইত্যাদি। তিনটে দিন শুধু ওই নিয়েই রইল। তার উত্তরও পুরোপুরি সঠিক হয়নি, তিনটে বেশি। তবে এরচেয়ে কাছাকাছি আর কারও হয়নি। কিশোরের জবাবকেই সঠিক ধরে নিয়েছে কোম্পানি।' আবার কেকে কামড় বসাল রবিন।

'ছুটি তাহলে খুব আনন্দেই কাটছে তোদের,' একটা কাপড়ে হাত মুছছেন মা। 'কোথায় কোথায় যাচ্ছিস?'

'সেটা নিয়েই ভাবছি,' বাকি কেকটুকু মুখে পুরে দিল রবিন।

'আরেকটা নিবি?'

মাথা নাড়ল রবিন। হাত বাড়াল, 'মেসেজটা, মা?'

পকেট থেকে কাগজের টুকরোটা বের করলেন মিসেস মিলফোর্ড। ইংরেজিতে বানান করে করে বলেছে কিশোর, লিখে নিয়েছেন তিনি। পড়লেন, 'স্যাবুজ ফ্যাটাক য়েক! ছ্যাপা খ্যানা চ্যালু! মানে কি রে এর?'

'সবুজ ফটক এক দিয়ে ঢুকতে হবে। ছাপাখানা চালু হয়ে গেছে,' বলতে বলতেই ঘুরে দাঁড়াল রবিন। রওনা হয়ে গেল দরজার দিকে।

'ও-মা, এই এলি! আর এখুনি...,' থেমে গেলেন মা। বেরিয়ে গেছে রবিন। কাঁধ ঝাঁকালেন তিনি।

এক ছুটে হলরুম পেরোল রবিন। দরজা খুলে প্রায় ছিটকে বেরিয়ে এল বাইরে। ধাক্কা দিয়ে স্ট্যাণ্ড সরিয়েই এক লাফে সাইকেলে চড়ে বসল। পা ভাঙা, ভুলেই গেছে যেন।

ব্যথা আর তেমন পায় না এখন। সাইকেল চালাতেও বিশেষ অসুবিধে হয় না। পাহাড়ে চড়তে গিয়ে ঘটিয়েছে ঘটনাটা। ভাঙা জায়গায় ব্রেস লাগিয়ে দিয়েছেন ডাক্তার আলমানজু। অভয় দিয়েছেন, শিগগিরই ঠিক হয়ে যাবে পা।

ছোট্ট ছিমছাম শহর রকি বীচ। একপাশে প্রশান্ত মহাসাগর, অন্যপাশে সান্তা মনিকা পর্বতমালা।

পর্বত বললে বাড়িয়ে বলা হয় সান্তা মনিকাকে, পাহাড় বললে কম হয়ে যায়। ওরই একটাতে চড়তে গিয়ে বিপত্তি ঘটিয়েছে রবিন। বেশ খাড়া। সাধারণত কেউ চড়তে যায় না। বাজি ধরে ওটাতেই চড়তে গেল সে। পাঁচশো ফুট উঠেছিল কোনমতে, তারপরই পা পিছলাল।

শহরতলীর প্রান্ত ছাড়িয়ে এল রবিন। ওই যে, দেখা যাচ্ছে জাংক-ইয়ার্ডটা। পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ড।

দুই ভাই জাহেদ পাশা আর রাশেদ পাশা। বাঙালী। গড়ে তুলেছেন ওই জাংক-ইয়ার্ড। আগে নাম ছিলঃ পাশা বাতিল মালের আড়ত। ইংরেজি অক্ষরে সাইনবোর্ড লাগানো হয়েছিল বাংলা নামের। সঠিক উচ্চারণ কেউই করতে পারত না, খালি বিকৃত উচ্চারণ। রেগেমেগে শেষে নামটা বদলাতে বাধ্য হয়েছেন রাশেদ পাশা, কিশোরের চাচা।

এখন রাশেদপাশা একাই চালান স্যালভিজ ইয়ার্ড। ভাই নেই। ভাবীও নেই, দু'জনেই মারা গেছেন এক মোটর-দুর্ঘটনায়। হলিউড থেকে ফিরছিলেন রাতের বেলা। পাহাড়ী পথ। কেন যে ব্যালান্স হারিয়েছিল গাড়িটা, জানা যায়নি। নিচের গভীর খাদে পড়ে চুরমার হয়ে গিয়েছিল। কিশোরের বয়েস তখন এই বছর সাতেক।

অনেক কিছুই পাওয়া যায় পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ডে, তবে সবই পুরানো। আলপিন থেকে শুরু করে রেলগাড়ির ভাঙা বগি, চাই কি, জাহাজের খোলের টুকরোও আছে। নিলামে কিনে আনেন রাশেদ পাশা। বেশির ভাগই বাতিল জিনিস, তবে মাঝে মাঝে ভাল জিনিসও বেরিয়ে পড়ে। ওগুলো বেশ ভাল দামেই বিক্রি হয়। আর বাতিল জিনিসপত্রের অনেকগুলোই সারিয়ে নেয়া যায়। ওগুলো থেকেও মোটামুটি টাকা আসে। সব মিলিয়ে ভাল লাভ। তবে খাটুনি অনেক।

কিশোরদের জন্যে পরম লোভনীয় জায়গাটা। খুঁজলেই বেরিয়ে পড়ে প্রচুর খেলার জিনিস।

ইয়ার্ডের আরও কাছে চলে এসেছে রবিন। চোখে পড়ছে রঙচঙে টিনের বেড়ার গায়ে আঁকা বিচিত্র সব ছবি। স্থানীয় শিল্পীদের আঁকা।

বেড়ার গায়ে সামনের দিকে আঁকা রয়েছে গাছপালা, ফুল, হ্রদ। হ্রদের পানিতে সাঁতার কাটছে রাজহাঁস। পাশে পাহাড়ের ওপারে সাগর। সাগরে পালতোলা জাহাজ, নৌকা। কেমন একটা হাসি হাসি ভাব ছবিগুলোতে, ভারিক্কি কিছু নয়।

লোহার বিরাট সদর দরজা। পুড়ে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল কোন প্যালেস। ওখান থেকেই কিনে আনা হয়েছে পাল্লাজোড়া। রঙ করতেই আবার প্রায় নতুন হয়ে গেছে। ইয়ার্ডের শোভা বাড়াচ্ছে এখন।

দরজার কাছে গেল না রবিন। পাশ কাটিয়ে চলে এল। বেড়ার ধার ধরে ধরে

এগিয়ে গেল শ'খানেক গজ। এখানে বেড়ার গায়ে আঁকা নীল সাগর। দুই মাস্তুলের পালতোলা একটা জাহাজ ঝড়ের কবলে পড়েছে। মাথা উঁচু করে দেখছে একটা বড় মাছ।

সাইকেল থেকে নামল রবিন। হ্যাণ্ডেল ধরে ঠেলে নিয়ে এল বেড়ার কাছে। হাত বাড়িয়ে মাছের চোখ টিপে ধরল।

নিঃশব্দে ডালার মত উঠে গেল বেড়ার গায়ে লেগে থাকা দুটো সবুজ বোর্ড। কয়েকটা গোপন প্রবেশ পথের একটাঃ সবুজ ফটক এক।

সাইকেল নিয়ে ইয়ার্ডে ঢুকে পড়ল রবিন। আবার নামিয়ে দিল বোর্ডদুটো। কানে আসছে ঘটাং-ঘট ঘটাং-ঘট আওয়াজ। কোণের আউটডোর ওয়ার্কশপের দিকে চেয়ে মুচকে হাসল রবিন। ভাঙা মেশিনটা তো মেরামত হয়েছেই, কাজও শুরু হয়ে গেছে!

মাথার ওপরে টিনের চাল। ছয় ফুট চওড়া। টিনের এক প্রান্ত আটকে দেয়া হয়েছে বেড়ার মাথায়, আরেক প্রান্ত খুঁটির ওপর। ভেতরের দিকে বেড়ার ঘরের প্রায় পুরোটার মাথায়ই টানা রয়েছে এই চাল। ভাল আর দামি জিনিসগুলো এই চালার নিচে রাখেন রাশেদ পাশা। একপাশে খানিকটা জায়গার মালপত্র সরিয়ে তার ওয়ার্কশপ বসিয়েছে কিশোর।

সাইকেল স্ট্যাণ্ডে তুলে রাখতে রাখতে একবার পেছনে ফিরে চাইল রবিন। দৃষ্টি বাধা পেল পুরানো জিনিসপত্রের স্তূপে। ইয়ার্ডের মূল অফিস আর কিশোরের ওয়ার্কশপের মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে ওই স্তূপ। অফিসের রঙিন টালির চূড়াটা শুধু চোখে পড়ে এখান থেকে। মেরিচাচীর কাচে ঘেরা চেম্বারটা দেখা যায় না।

পুরানো জিনিস কেনার কাজে প্রায় সারাক্ষণই বাইরে বাইরে থাকেন রাশেদচাচা, ইয়ার্ড আর অফিসের ভার থাকে তখন মেরিচাচীর ওপর।

ওয়ার্কশপে ঢুকে পড়ল রবিন। ছোট প্রিন্টিং মেশিনটার কাছে দাঁড়িয়ে আছে লম্বা, বলিষ্ঠ এক কিশোর। কুচকুচে কালো গায়ের রঙ। মাথায় কোঁকড়া কালো চুল। আমেরিকান মুসলমান, মুসা আমান।

মহা ব্যস্ত মুসা। ঘামছে দরদর করে। সাদা একগাদা কার্ড পড়ে আছে পাশের একটা ছোট টুলে। একটা করে কার্ড তুলে নিয়ে মেশিনে চাপাচ্ছে, ছাপা হয়ে গেলেই আবার বের করে নিচ্ছে দ্রুত হাতে।

পাশে তাকাল রবিন। পুরানো একটা সুইভেল চেয়ারে বসে আছে কিশোর পাশা। হালকা-পাতলা শরীরের তুলনায় মাথাটা বড়। ঝাঁকড়া চুল। চওড়া কপালের তলায় অপূর্ব সুন্দর দুটো চোখে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ঝিলিক। বুড়ো আঙুল আর তর্জনীর সাহায্যে চিমটি কাটছে নিচের ঠোঁটে। ভাবনার ঝড় বইছে মাথায়, বুঝতে পারল রবিন।

'কি ছাপাচ্ছ?' মেশিনের কাছে এগিয়ে গেল রবিন।

'এই যে, এসে গেছে,' ফিরে চেয়েই বলে উঠল মুসা।

ভাবনার জগৎ থেকে ফিরে এল কিশোর। রবিনের দিকে চেয়ে বলল, 'মেসেজ পেয়েছ?'

'পেয়েই তো এলাম,' জবাব দিল রবিন।

'গুড,' ভারিক্কি চালে বলল কিশোর। 'মুসা, একটা কার্ড দেখাও ওকে।'

মেশিন বন্ধ করে দিল মুসা। একটা কার্ড তুলে নিয়ে বাড়িয়ে ধরল রবিনের দিকে। 'নাও।'

বড় আকারের একটা ভিজিটিং কার্ড। ইংরেজিতে লেখাঃ

'তিন গোয়েন্দা'

? ? ?

প্রধান ঃ কিশোর পাশা

সহকারী ঃ মুসা আমান

নথি গবেষক ঃ রবিন মিলফোর্ড

'বাহ্, সুন্দর হয়েছে তো।' প্রশংসা করল রবিন। 'এগিয়ে যাওয়াই ঠিক করলে তাহলে?'

'হ্যাঁ, ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি খোলার এই-ই সুযোগ,' বলল কিশোর। 'স্কুল ছুটি। তিরিশ দিনের জন্যে একটা গাড়ি হয়ে গেল। খুব কাজে লাগবে,' থামল একটু সে। সরাসরি রবিনের দিকে তাকাল। 'আমরা এখন তিন গোয়েন্দা। এজেন্সির চার্জে থাকছি আমি। তোমার কোন আপত্তি আছে?'

'না,' মাথা নাড়ল রবিন। 'ডিটেকশনের কাজ আমার চেয়ে ভাল বোঝ তুমি।'

'গুড। সহকারী হতে মুসারও আপত্তি নেই,' বলল কিশোর। 'তোমার এখন সময় খারাপ। পা ভাঙা। দৌড়ঝাঁপের কাজগুলো খুব একটা করতে পারবে না। বসে বসেই কিছু কর। আপাতত লেখাপড়া আর রেকর্ড রাখার দায়িত্ব রইল তোমার ওপর।'

'আমি রাজি,' বলল রবিন। 'এবং খুশি হয়েই। লাইব্রেরিতে কাজের ফাঁকে ফাঁকেই পড়াশোনাটা সেরে ফেলতে পারব। রেকর্ড রাখাটাও এমন কিছু কঠিন না।'

'গুড,' মাথা ঝোঁকাল কিশোর। 'ভেবে বস না, খুব হালকা কাজ পেয়ে গেছ। তদন্তের নিয়মকানুন অনেক বদলে গেছে আজকাল। এ-কাজে এখন প্রচুর পড়াশোনা আর গবেষণা দরকার।...কি হল, কার্ডের দিকে ওভাবে চেয়ে আছ কেন?'

'তিনটে প্রশ্নবোধক চিহ্ন! কেন?'

সূক্ষ্ম একটা হাসির আভাস খেলে গেল কিশোরের মুখে। চট করে একবার চাইল মুসার দিকে।

'ঠিকই বলেছ, কিশোর,' মুসার চোখে বন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা। 'ঠিক অনুমান করেছ তুমি!'

'কি?' জানতে চাইল রবিন।

'তুমিই বল,' কিশোরকে বলল মুসা। 'গুছিয়ে বলতে পারব না আমি।'

'চিহ্নগুলো কার্ডে বসানর অনেক কারণ আছে,' ব্যাখ্যা করতে লাগল কিশোর। 'একঃ রহস্যের ধ্রুবচিহ্ন ওই প্রশ্নবোধক। আমরা কার্ডে দিয়েছি, কারণ, যে-কোন রহস্য সমাধানে আগ্রহী আমরা। ছিঁচকে চুরি থেকে শুরু করে ডাকাতি, রাহাজানি, খুন, এমনকি ভৌতিক রহস্যের তদন্তেও পিছপা নই। দুইঃ চিহ্নগুলো আমাদের ট্রেডমার্ক। দলে তিনজন, তাই তিনটে চিহ্ন,' থামল সে।

অপেক্ষা করে রইল রবিন।

'তিন,' আবার শুরু করল কিশোর। 'লোকের মনে কৌতূহল জাগাবে ওই চিহ্ন। কেন বসানো হয়েছে, জিজ্ঞেস করবেই। কথা বলার সুযোগ পাব তখন। এতে আমাদের কথা মনে থাকবে তাদের। নাম ছড়াবে অনেক বেশি,' রবিনের দিকে চাইল সে। 'আরও কারণ আছে, পরে ধীরে ধীরে জানতে পারবে সেগুলো।'

আর কি কারণ জানার কৌতূহল হল খুব, কিন্তু বলার জন্যে চাপাচাপি করল না রবিন। বন্ধুর স্বভাব জানে। নিজে থেকে না বললে হাজার চাপাচাপি করেও মুখ খোলানো যাবে না কিশোরের।

'মেশিন ঠিক, কার্ড ছাপানো শেষ, গাড়িও পেয়ে গেছি,' বলল রবিন। 'এবার কোন একটা কাজ পেয়ে গেলেই নেমে পড়তে পারতাম।'

'কাজ একটা পেয়ে গেছি আমরা,' মুসা জানাল।

'পাইনি এখনও,' শুধরে দিল কিশোর। 'পাবার আশা আছে।' সোজা হয়ে বসল সে। 'তবে সামান্য একটা অসুবিধে আছে।'

'কেসটা কি? অসুবিধেটাই বা কি?' কৌতূহল ঝরল রবিনের গলায়।

'একটা ভূতুড়ে বাড়ি খুঁজছেন মিস্টার ডেভিস ক্রিস্টোফার, সত্যি সত্যি ভূত থাকতে হবে। তাঁর একটা ছবির শূটিং করবেন সেখানে,' জানাল মুসা। 'স্টুডিও থেকে শুনে এসেছে বাবা।'

হলিউডের বেশ বড়োসড়ো একটা স্টুডিওতে বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ পদে বহাল আছেন মুসার বাবা মিস্টার রাফাত আমান।

'ভূতুড়ে বাড়ি!' ভুরু কুঁচকে গেছে রবিনের। 'তা-ও আবার সত্যি সত্যি ভূত থাকতে হবে! তা কি করে সম্ভব?'

'ভূত আছে কি নেই, সেটা পরের কথা। তেমন একটা বাড়ির খোঁজ পেলেই তদন্ত শুরু করে দেব আমরা,' জবাব দিল কিশোর। 'ভূত থাকলে তো কথাই নেই, না থাকলেও ক্ষতি নেই। আমরা খোঁজখবর করতে শুরু করলেই জানাজানি হবে। নাম ছড়াবে তিন গোয়েন্দার।'

'অসুবিধে কি ভূত নিয়েই?'

'না?'

'তবে? মিস্টার ক্রিস্টোফার আমাদেরকে কাজ দিতে রাজি হচ্ছেন না।'

'হতেই হবে তাঁকে। আমাদের সার্ভিস নিতে বাধ্য করব,' কেমন রহস্যময় শোনাল কিশোরের গলা। 'তিন গোয়েন্দার যাত্রা শুরু হবে মিস্টার ডেভিস ক্রিস্টোফারের কাজ নিয়েই।'

'শিওর, শিওর!' ব্যঙ্গ প্রকাশ পেল রবিনের গলায়। 'মার্চ করে সোজা গিয়ে ঢুকে পড়ব পৃথিবী বিখ্যাত এক চিত্র পরিচালকের অফিসে! এবং আমরা গিয়ে হাজির হলেই কাজ দিয়ে দেবেন! এতই সহজ!'

'খুব কঠিনও মনে হচ্ছে না আমার কাছে,' বলল কিশোর। 'ইতিমধ্যেই মিস্টার ক্রিস্টোফারকে ফোন করেছি আমি। অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্যে।'

'ইয়াল্লা!' রবিনের মতই ভুরু কুঁচকে গেছে মুসার। 'তিনি দেখা করবেন আমাদের সঙ্গে?'

'না,' সহজ গলায় বলল কিশোর। 'লাইনই দেয়নি তাঁর সেক্রেটারি।'

'তা তো দেবেই না,' বলল মুসা।

'শুধু তাই না, শাসিয়েছে, তাঁর অফিসের কাছাকাছি গেলেই আমাদেরকে হাজতে পাঠানর ব্যবস্থা করবে,' যোগ করল কিশোর। 'মেয়েটা কে জান? কেরি ওয়াইল্ডার।'

'মুরুব্বী কেরি!' একসঙ্গে বলে উঠল মুসা আর রবিন।

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। ওদের চেয়ে কয়েক গ্রেড ওপরের ছাত্রী কেরি ওয়াইল্ডার। পড়ালেখায় ভাল। সুনাম আছে ভাল মেয়ে বলে। স্কুলে নিচের গ্রেডের ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাস নেয় মাঝে মাঝে। মুরুব্বীয়ানা ফলানর লোভটা সামলাতে পারে না। ফলে নাম হয়ে গেছে মুরুব্বী কেরি।

'এবারের ছুটিতে তাহলে সেক্রেটারির কাজ নিয়েছে মুরুব্বী!' চিন্তিত দেখাচ্ছে রবিনকে। 'মিস্টার ক্রিস্টোফারের সঙ্গে দেখা করার আশা ছেড়ে দাও। মুরুব্বীর অফিস পেরোনর চেয়ে প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দেয়া অনেক সহজ।'

'মূল অসুবিধে এটাই,' বলল কিশোর। 'তবে যে কাজে নামতে যাচ্ছি, বাধা আর বিপদ আসবেই পদে পদে। ওসবের মোকাবিলা করতে না পারলে নামাই উচিত না। আগামীকাল সকালে রোলস রয়েসে চেপে হলিউডে চলে যাব। দেখা করতেই হবে মিস্টার ক্রিস্টোফারের সঙ্গে।'

'যদি পুলিশে খবর দেয় মুরুব্বী?' বলল রবিন। 'আমার ব্যাপারে অবশ্য ভাবছি না। কাল তোমাদের সঙ্গে যেতে পারব না আমি। লাইব্রেরিতে কাজ আছে।'

'তাহলে আমি আর মুসা যাব। কাল সকাল দশটায়। তার আগেই গাড়ি

পাঠাতে ফোন করব কোম্পানিকে। হ্যাঁ, তুমি একটা কাজ কর, রবিন,' বলে একটা কার্ড তুলে নিল কিশোর। উল্টোপিঠে একটা নাম লিখে বাড়িয়ে ধরল। 'এটা রাখ। এই নামের একটা দুর্গ আছে। পুরানো ম্যাগাজিন কিংবা পত্র-পত্রিকায় নিশ্চয় উল্লেখ থাকবে। এটার ব্যাপারে যত বেশি পার তথ্য জোগাড় করবে।'

'টেরর ক্যাসল!' পড়ে ফিসফিসিয়ে বলল রবিন। বড় বড় হয়ে গেছে চোখ।

'নাম শুনেই ঘাবড়ে গেলে! এত ভয় পেলে গোয়েন্দাগিরি করবে কি করে?'

'না না, ঘাবড়াইনি...'

'ঠিক আছে,' বাধা দিয়ে বলল কিশোর। 'কিছু কার্ড সঙ্গে রাখ। তিনজনকেই রাখতে হবে এখন থেকে। এগুলোই আমাদের পরিচয়পত্র। আগামীকাল থেকে পুরোপুরি কাজে নামব আমরা। পালন করব যার যার দায়িত্ব।'

দুই

পরদিন সকালে, গাড়ি পৌঁছার অনেক আগেই তৈরি হয়ে গেল মুসা আর কিশোর। লোহার গেটের বাইরে এসে রোলস রয়েসের অপেক্ষায় রইল ওরা। দু'জনেরই পরনে সানডে সুট, শার্ট আর নেকটাই। পরিপাটি করে আঁচড়ানো চুল। পরিচ্ছন্ন চেহারা। হাতের নখ অবধি পরিষ্কার করেছে ব্রাশ ঘষে।

অবশেষে হাজির হল বিশাল রোলস রয়েস। গাড়িটার উজ্জ্বলতার কাছে নিজেদেরকে একেবারে ম্লান মনে হল দু'জনের। পুরানো ধাঁচের ক্লাসিক্যাল চেহারা। প্রকাণ্ড দুটো হেডলাইট। চৌকো, বাক্সের মত দেখতে মূল শরীরটা কুচকুচে কালো। চকচকে পালিশ, মুখ দেখা যায়।

'খাইছে!' কিশোরের মুখে শোনা বাঙালী বুলি ঝাড়ল মুসা। এগিয়ে আসা গাড়িটার দিকে অবাক চোখে চেয়ে আছে। 'একশো দশ বছর বয়েসী কোটিপতির উপযুক্ত!'

'পৃথিবীর সবচেয়ে দামি গাড়ির একটা,' বলল কিশোর। 'কোটিপতি এক আরব শেখের অর্ডারে তৈরি হয়েছিল। এই গাড়িও নাকি পছন্দ হয়নি শেখের। ফলে ডেলিভারি নেয়নি। কম দামে পেয়ে কিনে নিয়েছে রেন্ট-আ-রাইড কোম্পানি। নিজেদের বিজ্ঞাপনের কাজে ব্যবহার করছে।'

কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল রোলস রয়েস। ঝটকা দিয়ে খুলে গেল দরজা। ড্রাইভিং সিট থেকে দ্রুত নেমে এল শোফার। ছয় ফুট লম্বা, আঁট-সাট দেহের গড়ন। লম্বাটে হাসিখুশি চেহারা। একটানে মাথার টুপি খুলে হাতে নিয়ে নিল।

'মাস্টার পাশা?' সপ্রশ্ন চোখে কিশোরের দিকে চেয়ে বলল লোকটা। 'আমি হ্যানসন, শোফার।'

'পরিচিত হয়ে খুশি হলাম, মিস্টার হ্যানসন,' বলল কিশোর। 'আমাকে কিশোর

বলে ডাকবেন, আর সবাই যেমন ডাকে।'

'প্লীজ,স্যার,' দুঃখ পেয়েছে যেন শোফার, 'আমাকে শুধু হ্যানসন বলবেন। আপনাকে নাম ধরে ডাকা উচিত হবে না। কারণ এখন আপনার অধীনে কাজ করছি আমি। বেয়াদবী করতে চাই না।'

'ঠিক আছে, শুধু হ্যানসন,' বলল কিশোর।

'থ্যাঙ্ক ইউ, স্যার। আগামী তিরিশ দিনের জন্যে এই গাড়ি আপনার।'

'চব্বিশ ঘন্টার জন্যে নিশ্চয়? শর্ত তাই ছিল।'

'নিশ্চয়, স্যার।' পেছনের দরজা খুলে ধরল হ্যানসন। 'প্লীজ।'

'থ্যাঙ্ক ইউ,' বলে গাড়িতে উঠল কিশোর। মুসাও ঢুকল। হ্যানসনের দিকে চেয়ে বলল কিশোর, 'বেশি ফর্মালিটির দরকার নেই। দরজা আমরাই খুলতে পারব।'

'কিছু মনে করবেন না, স্যার,' বলল ইংরেজ শোফার, 'চাকরির পুরো দায়িত্ব পালন করতে দিন আমাকে। ঢিল দিয়ে নিজের স্বভাব নষ্ট করতে চাই না।'

পেছনের দরজা বন্ধ করে দিল হ্যানসন। সামনের দরজা খুলে ড্রাইভিং সিটে উঠে বসল।

'কিন্তু মাঝেমধ্যে তাড়াহুড়ো করে বেরোতে কিংবা ঢুকতে হতে পারে আমাদের,' বলল কিশোর। 'তখন আপনার জন্যে অপেক্ষা করতে পারব না। তবে এক কাজ করা যায়। শুরুতে একবার দায়িত্ব পালন করবেন আপনি, আরেকবার একেবারে বাড়ি ফিরে। মাঝে যতবার খোলা বা বন্ধ করার দরকার পড়বে, আমরা করব। ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে, স্যার। সুন্দর সমাধান।'

রিয়ার ভিউ মিররে চোখ পড়ল কিশোরের। তার দিকে চেয়ে হাসছে হ্যানসন। তাড়াতাড়ি বলল কিশোর, 'অনেক সম্ভ্রান্ত লোকের কাজ করেছেন নিশ্চয়? বুঝতেই পারছি, ওরা কেউই আমাদের মত ছিল না। অনেক আজব, উদ্ভট জায়গায় যেতে হতে পারে আমাদের, কাজ করতে...,' একটা কার্ড নিয়ে হ্যানসনের দিকে বাড়িয়ে ধরল সে। 'এটা দেখলেই আন্দাজ করতে পারবেন।'

গম্ভীর মুখে কার্ডটা ফিরিয়ে দিতে দিতে বলল হ্যানসন, 'বুঝতে পেরেছি, স্যার। আপনাদের কাজ করতে আমার খুবই ভাল লাগবে। কিশোর অ্যাডভেঞ্চারের কাজ করে একঘেয়েমিও কাটাতে পারব। এতদিন শুধু বুড়োদের চাকরি করেছি, সবাই বাড়ি থেকে অফিস কিংবা অফিস থেকে বাড়ি। মাঝেমধ্যে পার্টিতে যেত, ব্যস। তো এখন কোথায় যাব, স্যার?'

হ্যানসনকে খুব পছন্দ হয়ে গেছে দুই গোয়েন্দার। লোকটা সত্যিই ভাল। তাদেরকে মোটেই অবহেলা করছে না।

'হলিউডে, প্যাসিফিক স্টুডিওতে,' বলল কিশোর। 'মিস্টার ডেভিস

ক্রিস্টোফারের সঙ্গে দেখা করব। গতকাল ফোনে…মানে, টেলিফোন করেছিলাম তাঁকে।'

'যাচ্ছি, স্যার।'

মৃদু গুঞ্জন করে উঠল রোলস রয়েসের দামি ইঞ্জিন। এতই মৃদু যে শোনাই যায় না প্রায়। পাহাড়ী পথ ধরে মসৃণ গতিতে হলিউডের দিকে ছুটল রাজকীয় গাড়ি।

সামনে পথের ওপর দৃষ্টি রেখে বলল হ্যানসন, 'গাড়িতে টেলিফোন আছে। একটা রিফ্রেশমেন্ট কম্পার্টমেন্টও আছে। চাইলে ব্যবহার করতে পারেন।'

'থ্যাঙ্ক ইউ,' গম্ভীর গলায় বলল কিশোর। এত দামি একটা গাড়িতে চড়ে নিজেকে হোমরা-চোমরা গোছের কেউ একজন ভাবতে শুরু করেছে ইতিমধ্যেই। সামনের সিটের পেছনে বসানো একটা খোপের ছোট্ট দরজা খুলে ফেলল বোতাম টিপে। বের করে আনল টেলিফোন রিসিভারটা। এত সুন্দর রিসিভার জীবনে দেখেনি সে। সোনালি রঙ। চকচকে পালিশ। কোন ডায়াল নেই। একটা বোতাম আছে শুধু

'মোবাইল টেলিফোন,' জানাল হ্যানসন। 'বোতামে শুধু একবার চাপ দিলেই যোগাযোগ হয়ে যাবে অপারেটরের সঙ্গে। তাকে নাম্বার জানালে লাইন দিয়ে দেবে। খুব সহজ।'

রিসিভারটা আবার আগের জায়গায় রেখে দিল কিশোর। আরাম করে হেলান দিয়ে বসল নরম চামড়া মোড়ানো পুরু গদিতে।

দেখতে দেখতে হলিউডে এসে ঢুকল গাড়ি। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোর ধার দিয়ে চলেছে এখন। গন্তব্যস্থান যতই কাছিয়ে আসছে, অস্থির হয়ে উঠছে মুসা। খালি উসখুস করছে, 'কিশোর,' শেষে বলেই ফেলল সে। 'বুঝতে পারছি না স্টুডিওর গেট পেরোবে কি করে! আমাদেরকে কিছুতেই ঢুকতে দেবে না দারোয়ান। ওই গেটই পেরোতে পারব না আমরা।'

'উপায় একটা ভেবে রেখেছি,' বলল কিশোর। 'কাজে লাগলেই হয়। এই যে, এসে গেছি।'

উঁচু বিশাল এক দেয়ালের ধার দিয়ে এগিয়ে চলেছে গাড়ি। বড় বড় দুটো ব্লক পেরিয়ে এল। সামনের দেয়ালের গায়ে বিরাট লোহার দরজা। গেটের কপালে বড় বড় করে লেখাঃ প্যাসিফিক স্টুডিও।

দরজার সামনে এসে থামল গাড়ি। বন্ধ পাল্লা। হর্নের আওয়াজ শুনে পাল্লার একদিকের ছোট একটা গর্তের সামনে থেকে ঢাকনা সরে গেল। উঁকি দিল একটা গোমড়া মুখ। 'কোথায় যাবেন?'

জানালা দিয়ে মুখ বের করে দিল হ্যানসন। 'মিস্টার ডেভিস ক্রিস্টোফার।'

'পাস আছে?'

'পাসের দরকার নেই। টেলিফোন করেই এসেছি।'

মিছে কথা বলেনি হ্যানসন। ঠিকই টেলিফোন করেছিল কিশোর। মিস্টার ক্রিস্টোফারকে লাইন দেয়া হয়নি, সেটা তার দোষ না।

'ও-ও!' অনিশ্চিতভাবে মাথা চুলকাচ্ছে দারোয়ান।

ঠিক এই সময় পেছনের একপাশে সাইড উইণ্ডো খুলে গেল। বেরিয়ে এল কিশোরের মুখ। 'এই যে ভাই, কি হয়েছে? দেরি কেন?'

দারোয়ানের দিকে চোখ মুসার। কিশোরের কথা কানে যেতেই চমকে উঠল। কেমন ঘড়ঘড়ে গলা, কথায় খাঁটি ব্রিটিশ টান। ফিরে চাইল। 'ইয়াল্লা?' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল সে।

এ কোন কিশোরকে দেখছে! ঝুলে পড়েছে নিচের ঠোঁট। মাড়ি বেরিয়ে পড়েছে। মাথা সামান্য পেছনে হেলানো। নাকের ওপর দিয়ে চেয়ে আছে। বিচ্ছিরি! মিস্টার ডেভিস ক্রিস্টোফারের কিশোর সংস্করণ, কোন খুঁত নেই। এক সময় টিভিতে অভিনয় করে প্রচুর নাম কামিয়েছে কিশোর। এ-অঞ্চলে তখন ছিল না মুসা, কিশোরের সেসব অভিনয় দেখেনি। তবে আজ বুঝতে পারল, লোকে কেন কিশোর পাশার নাম রেখেছে নকল পাশা।

হাঁ করে কিশোরের দিকে চেয়ে আছে দারোয়ান। রা নেই মুখে।

'ঠিক আছে,' নাকের ওপর দিয়ে দারোয়ানের মাথা থেকে পা পর্যন্ত নজর বোলাল একবার কিশোর, মিস্টার ক্রিস্টোফারের অনুকরণে।

'সন্দেহ থাকলে ফোন করছি আমি চাচাকে।'

সোনালি রিসিভারটা বের করে আনল কিশোর। কানে ঠেকাল। বোতাম টিপে দিয়ে নিচু গলায় নাম্বার চাইল আসলে পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ডের নাম্বার। সত্যিই তার চাচার লাইন চেয়েছে কিশোর।

দামি গাড়িটার দিকে আরেকবার চাইল দারোয়ান সোনালি রিসিভারটা দেখল। কিশোরের টেলিফোন কানে ঠেকিয়ে কথা বলার ভঙ্গিতে দেখল। তারপর সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল। 'ঠিক আছে, আপনার ফোন করার দরকার নেই। আমিই জানিয়ে দিচ্ছি, আপনারা তাঁর অফিসে যাচ্ছেন।'

'থ্যাঙ্ক ইউ,'

খুলে গেল দরজা। 'হ্যানসন, আগে বাড়ো' গম্ভীর গলায় দারোয়ানকে শুনিয়ে শুনিয়ে আদেশ দিল কিশোর

সূক্ষ্ম একটা হাসির রেখা দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল হ্যানসনের ঠোঁটে সাঁ করে গাড়ি ঢুকিয়ে নিল সে ভেতরে।

এগিয়ে চলল গাড়ি। অনেকখানি এগিয়ে মোড় নিল একদিকে। সরু পথ। দু'ধারে সবুজ লনের পথঘেঁষা প্রান্তে পাম গাছের সারি লনের ওপারে ছবির মত সুন্দর ছিমছাম ছোট আকারের ডজনখানেক বাংলো। নাক বরাবর সোজা পথের শেষ মাথায় বিশাল অনেকগুলো শেড। স্টুডিও। একটা শেডের সামনে দাঁড়িয়ে

আছে কয়েকজন অভিনেতা-অভিনেত্রী।

গেটের বাধা ডিঙিয়ে এসেছে, স্টুডিওতে ঢুকে পড়েছে ওরা। এখনও মাথায় ঢুকছে না মুসার, মিস্টার ক্রিস্টোফারের সঙ্গে কি করে দেখা করবে কিশোর! বেশিক্ষণ ভাবার সময় পেল না সে। একটা বড় বাংলোর সামনে এনে গাড়ি রেখেছে হ্যানসন। বোঝা গেল, আগেও এসেছে এখানে। পথঘাট সব চেনা। বাংলোর দেয়ালে এক জায়গায় বড় বড় করে লেখাঃ ডেভিস ক্রিস্টোফার। আলাদা আলাদা বাংলোতে বিভিন্ন পরিচালকের অফিস। কে কোথায় বসেন, বোঝার জন্যেই এই নাম লেখার ব্যবস্থা।

'আপনি বসুন গাড়িতে,' পেছনের দরজা ধরে দাঁড়ানো হ্যানসনকে বলল কিশোর। বেরিয়ে এল। 'কতক্ষণে ফিরব বলা যায় না।'

'ঠিক আছে, স্যার।'

সিঁড়ি ভেঙে বারান্দায় উঠল কিশোর, পেছনে মুসা। সামনের স্ক্রীনডোর ঠেলে ভেতরে পা রাখল। এয়ার কণ্ডিশনড রিসিপশান রুম। একটা ডেস্কের ওপাশে বসে আছে সোনালিচুলো একটা মেয়ে। সবে নামিয়ে রাখছে রিসিভার। অনেকদিন দেখা নেই। হঠাৎ বেড়ে ওঠা কেরিওয়াইল্ডারকে প্রথমে চিনতেই পারল না মুসা, গলার আওয়াজ শুনে নিশ্চিত হতে হল।

'তাহলে,' কোমরে দু'হাত রেখে উঠে দাঁড়িয়েছে মুরুব্বী, 'ঢুকেই পড়েছ? মিস্টার ক্রিস্টোফারের ভাতিজা! বেশ, কত তাড়াতাড়ি স্টুডিও পুলিশকে আনানো যায়, দেখছি।' টেলিফোনের দিকে হাত বাড়াল কেরি।

একেবারে চুপসে গেল মুসা। বিড়বিড় করে বলল, 'ইয়াল্লা!'

'থাম!' বলে উঠল কিশোর।

'কেন?' সামনের দিকে চিবুক বাড়িয়ে দিয়ে আলতো মাথা ঝাঁকাল কেরি। 'গার্ডকে ফাঁকি দাওনি তুমি? বলনি মিস্টার ক্রিস্টোফারের ভাতিজা...'

'না, বলেনি,' বন্ধুর পক্ষে সাফাই গাইল মুসা। 'গার্ডই ভুল করেছে।'

'তোমাকে কথা বলতে কে বলেছে?' ধমকে উঠল কেরি। 'প্রায়ই গোলমাল করে কিশোর পাশা। স্কুলে অন্যের ব্যাপারে নাক গলানর অনেক উদাহরণ আছে। এবার কিছুটা শিক্ষা দিয়ে ছাড়ব আমি।'

ঘুরে টেলিফোনের ওপর ঝুঁকল কেরি। হাত বাড়াল রিসিভারের দিকে।

'তাড়াহুড়ো করে কিছু করা উচিত নয়, মিস ওয়াইল্ডার,' বলল কিশোর।

আবার চমকে উঠল মুসা। আবার পুরোদস্তুর ইংরেজ, কথায় সেই অদ্ভুত টান—মিস্টার ডেভিস ক্রিস্টোফার যেভাবে কথা বলেন। চকিতে আবার 'কিশোর ক্রিস্টোফার' হয়ে গেছে কিশোর।

'আমি শিওর, এটা দেখতে চাইবেন মিস্টার ক্রিস্টোফার,' বলল কিশোর।

রিসিভার হাতে তুলে নিয়েছে কেরি। কিশোরের কথায় ফিরে চাইল। সঙ্গে

সঙ্গে খসে পড়ে গেল রিসিভার। চোখ বড় বড় হয়ে গেছে, ছিটকে বেরিয়ে আসবে যেন কোটর ছেড়ে। কেব্‌ল্ থেকে ঝুলছে রিসিভারটা। টেবিলের পায়ার সঙ্গে বাড়ি খাচ্ছে খটাখট, কানেই ঢুকছে না যেন তার। 'তুমি...তুমি...!' ফিসফিস করছে সে, '...তুমি...' হঠাৎই ভাষা খুঁজে পেল যেন কেরি। 'হ্যাঁ, কিশোর পাশা, সত্যিই বলেছ! এটা দেখতে চাইবেন মিস্টার কিস্টোফার!'

'কি, মিস ওয়াইল্ডার?'

দ্রুত তিন জোড়া চোখ ঘুরে গেল দরজার দিকে। দরজায় এসে দাঁড়িয়েছেন মিস্টার ডেভিস ক্রিস্টোফার স্বয়ং। শরীরের তুলনায় মাথা বড়। ঝাঁকড়া চুল। এত বেশি ঝুলে পড়েছে নিচের ঠোঁট, মাড়ি দেখা যায়। ভীষণ কুৎসিৎ চেহারা।

'কি হয়েছে? কোন গোলমাল?' আবার জানতে চাইলেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। 'সেই কখন থেকে রিঙ করছি আমি।'

'গোলমাল কিনা আপনিই ঠিক করুন, মিস্টার ক্রিস্টোফার,' ফস করে বলে বসল কেরি। 'এই ছেলেটা কিছু দেখাতে চায় আপনাকে। আপনি মুগ্ধ হবেন।'

'সরি,' বললেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। 'কারও সঙ্গেই দেখা করতে পারব না আজ। হাতে কাজ অনেক। ওকে যেতে বল।'

'আমি শিওর, মিস্টার ক্রিস্টোফার, আপনি দেখতে চাইবেন!' কেমন এক গলায় কথা বলে উঠল কেরি।

স্থির চোখে কেরির দিকে তাকালেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। তারপর ফিরলেন দুই কিশোরের দিকে। কাঁধ ঝাঁকালেন। 'ঠিক আছে। এস।'

বিশাল এক টেবিলের ওপাশে সুইভেল চেয়ারে গিয়ে বসলেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। ইচ্ছে করলে টেবিল-টেনিস খেলা যাবে টেবিলটাতে, এত বড়। তাঁর দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল দুই গোয়েন্দা। পেছনে দরজাটা ওপাশ থেকে বন্ধ করে দিল কেরি।

'তারপর, ছেলেরা,' বললেন মিস্টার ক্রিস্টোফার, পাঁচ মিনিট সময় দিচ্ছি তোমাদের, 'কি দেখাতে চাও?'

'এটা স্যার,' অদ্ভুত ভঙ্গিতে পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে টেবিলের ওপর দিয়ে ঠেলে দিল কিশোর। ভঙ্গিটা লক্ষ্য করলেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। একেবারে তাঁর নিজের ভঙ্গি। হাত বাড়িয়ে তুলে নিলেন কার্ডটা।

'হুমম! তোমরা তাহলে গোয়েন্দা। প্রশ্নবোধক চিহ্নগুলো কেন? নিজেদের ক্ষমতার ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ?'

'না, স্যার,' জবাব দিল কিশোর। 'ওগুলো আমাদের ট্রেডমার্ক। যে-কোন ধরনের রহস্য ভেদ করতে রাজি আমরা। তাছাড়া ওই চিহ্ন কার্ডে বসানর কারণ জিজ্ঞেস করবেই লোকে, আমাদেরকে মনে রাখবে।'

'আচ্ছা!' ছোট্ট একটা কাশি দিলেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। 'নাম প্রচারের

ব্যাপারে খুব আগ্রহী মনে হচ্ছে?'

'নিশ্চয়, স্যার। লোকে আমাদের নামই যদি না জানল, ব্যবসা টেকাব কি করে?'

'ভাল যুক্তি,' স্বীকার করলেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। 'কিন্তু ব্যবসা তো শুরুই করনি এখনও।'

'সেজন্যেই তো এসেছি, স্যার। আপনাকে একটা ভূতুড়ে বাড়ি খুঁজে দিতে চাই আমরা।'

'ভূতুড়ে বাড়ি?' ভুরুজোড়া সামান্য উঠে গেল মিস্টার ক্রিস্টোফারের। 'আমি ভূতুড়ে বাড়ি খুঁজছি, ভাবনাটা কেন এল মাথায়?'

'শুনেছি, আপনার পরের ছবির জন্যে একটা ভূতুড়ে বাড়ি খুঁজছেন,' বলল কিশোর। 'আপনার খোঁজায় সাহায্য করতে আগ্রহী তিন গোয়েন্দা।'

তাচ্ছিল্যের হাসি ফুটল মিস্টার ক্রিস্টোফারের মুখে। 'দুটো বাড়ির খোঁজ ইতিমধ্যেই পেয়ে গেছি আমি,' বললেন তিনি। 'একটা ম্যাসাচুসেটসের সালেমে, আরেকটা দক্ষিণ ক্যারোলিনার চার্লসটনে। দুটো জায়গাতেই নাকি ভূতের উপদ্রব আছে। আগামীকাল আমার দুজন লোক যাবে জায়গাগুলো দেখতে। আমি শিওর, দুটোর একটা জায়গা আমার পছন্দ হবেই।'

'কিন্তু আমরা যদি এখানে, এই ক্যালিফোর্নিয়াতেই একটা বাড়ি খুঁজে দিতে পারি, অনেক সহজ হয়ে যাবে আপনার কাজ।'

'আমি দুঃখিত, খোকা। তা হয় না আর এখন।'

'টাকা পয়সা কিচ্ছু চাই না আমরা, স্যার,' বলল কিশোর। 'শুধু প্রচার চাই। এজন্যে কাউকে লিখতে হবে আমাদের কথা। যেমন লেখা হয়েছে শার্লক হোমস, এরকুল পোয়ারোর কাহিনী। আমার ধারণা, ওদের কথা লেখা হয়েছে বলেই আজ ওরা এত নামী গোয়েন্দা। না না, স্যার, আপনাকে লিখতেও হবে না। লিখে দেবেন আমাদের এক সহকারীর বাবা, মিস্টার রোজার মিলফোর্ড। খবরের কাগজে চাকরি করেন তিনি।'

'আচ্ছা, এবার তাহলে,' ঘড়ি দেখলেন মিস্টার ক্রিস্টোফার।

'মিস্টার ক্রিস্টোফার, ভেবেছিলাম আমাদের প্রথম কেসটায় একটু সাহায্য করবেন...'

'সম্ভব না, যাবার পথে দয়া করে কেরিকে একবার আসতে বলে যেও।'

'ঠিক আছে, স্যার,' হতাশ মনে হল কিশোরকে।

ঘুরে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে হাঁটতে শুরু করল দুই গোয়েন্দা। দরজার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে, পেছন থেকে ডাক শোনা গেল মিস্টার ক্রিস্টোফারের, 'একটু দাঁড়াও।'

'বলুন, স্যার,' ঘুরে দাঁড়াল কিশোর। মুসাও ঘুরল।

চোখ কুঁচকে তাদের দিকে চেয়ে আছেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। 'কেন যেন মনে হচ্ছে, যা দেখাতে এসেছ তা দেখাওনি। কি দেখাবে বলে বলেছিল মিস ওয়াইল্ডার? নিশ্চয় তোমাদের ভিজিটিং কার্ড নয়?'

'ঠিকই বলেছেন, স্যার,' স্বীকার করল কিশোর। 'আমি লোকের গলার স্বর, কথা বলার ভঙ্গি, এমনকি অনেকের চেহারাও নকল করতে পারি। মিস ওয়াইল্ডারকে আপনার ছেলেবেলার চেহারা নকল করে দেখিয়েছিলাম।'

'আমার ছেলেবেলার চেহারা!' ভারি হয়ে গেল বিখ্যাত পরিচালকের স্বর। চেহারায় মেঘ জমতে শুরু করছে। 'কি বলতে চাইছ?'

'ঠিক আছে, দেখাচ্ছি, স্যার।'

চোখের পলকে বদলে গেল কিশোরের চেহারা। 'আমার ধারণা, মিস্টার ক্রিস্টোফার,' গলার স্বরও পাল্টে গেছে। 'হয়ত কোন ছবিতে আপনার ছেলেবেলার চেহারা দেখতে চাইবেন। মানে, ছেলেবেলার কোন ঘটনা কাউকে দিয়ে অভিনয় করাতে চাইবেন...'

হেসে ফেললেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। পরক্ষণেই গম্ভীর হয়ে গেলেন আবার। 'বিচ্ছিরি! থামাও ওসব!'

আপন চেহারায় ফিরে এল কিশোর। 'পছন্দ হল না, স্যার? আপনার ছেলেবেলার চেহারা নিশ্চয় এমন ছিল?'

'না না, এত বিচ্ছিরি ছিলাম না আমি! কিচ্ছু হয়নি তোমার!'

'তাহলে আরও কিছুদিন প্র্যাকটিস করতে হবে,' আপনমনেই বলল কিশোর। 'টেলিভিশন থেকে খুব চাপাচাপি করছে...'

'টেলিভিশন!' সতর্ক হয়ে উঠেছেন পরিচালক। 'কিসের চাপাচাপি?'

'মাঝেমধ্যে টেলিভিশনে কমিক দেখাই আমি। আগামী হপ্তায় বাচ্চাদের একটা অনুষ্ঠান আছে। ভাবছি, এবারে আপনার চেহারা, কথা বলার ধরন নকল করে...'

'খবরদার!' গর্জে উঠলেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। 'আমি নিষেধ করছি!'

'কেন, স্যার?' নিরীহ গলা কিশোরের। 'দোষ কি এতে? বাচ্চারা যদি একটু মজা পায়...'

'না-আ!' কি যেন একটু ভাবলেন পরিচালক। 'ঠিক আছে, তোমাদের প্রস্তাবে আমি রাজি। তবে কথা দিতে হবে, কক্ষণো, কোথাও আমার চেহারা নকল করে দেখাতে পারবে না।'

'থ্যাঙ্ক ইউ, মিস্টার ক্রিস্টোফার,' হাসিমুখে বলল কিশোর। 'তাহলে ভূতুড়ে বাড়ি খোঁজার অনুমতি দিচ্ছেন আমাদেরকে?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, দিচ্ছি। তেমন বাড়ি পেলেও ওটা ব্যবহার করব, এমন কথা দিতে পারছি না। তবে তোমাদের নাম প্রচারের ব্যবস্থা করব। এখন বেরোও, মেজাজ আরও খিঁচড়ে যাবার আগেই। হয়ত আবার মত পাল্টে বসতে পারি। ভয়ানক

চালাক ছেলে তুমি, কিশোর পাশা! নিজের কাজটা ঠিক উদ্ধার করে নিয়ে গেলে! ভীষণ চালাক!'

আর কিছু শোনার দরকার মনে করল না কিশোর আর মুসা। প্রায় ছুটে বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

তিন

পড়ন্ত বিকেল। হ্যাণ্ডেল ধরে সাইকেলটা ঠেলে নিয়ে এসে সবুজ ফটক এক-এর সামনে দাঁড়াল রবিন। গাল-মুখ লাল, হাঁপাচ্ছে। হতচ্ছাড়া টিউব ফুটো হবার আর সময় পেল না! বিড়বিড় করছে সে আপনমনেই।

ইয়ার্ডের ভেতরে এসে ঢুকল রবিন। মেরিচাচীর গলা শোনা যাচ্ছে অফিসের ওদিক থেকে। রাশেদ চাচার দুই সহকারী বোরিস আর রোভারকে কাজের নির্দেশ দিচ্ছেন। ওয়ার্কশপ খালি। কিশোর কিংবা মুসা, কেউই নেই।

এটাই আশা করেছিল রবিন। সাইকেলটা রেখে ছোট ছাপার মেশিনটার ওপাশ ঘুরে একটা জায়গায় এসে দাঁড়াল। একটা ওয়ার্ক-বেঞ্চের গায়ে হেলান দিয়ে ফেলে রাখা হয়েছে একটা লোহার পাত।

বিশাল এক গ্যালভানাইজটা পাইপের মুখ ঢেকে রাখা হয়েছে পাতটা ফেলে। বসে পড়ে ওটা একটু সরাল রবিন। ফাঁক গলে এসে ঢুকল পাইপের মুখের ভেতরে। পাতটা আবার আগের জায়গায় টেনে বসাল। দ্রুত ক্রল করে এগিয়ে চলল পাইপের ভেতর দিয়ে। এটাও একটা গুপ্ত পথ, নাম রাখা হয়েছে 'দুই সুড়ঙ্গ।'

পাইপের অন্য মাথায় চলে এল রবিন। একটা কাঠের বোর্ড কায়দা করে বসানো আছে ও-মাথায়। ঠেলা দিতেই সরে গেল বোর্ড।

হেডকোয়ার্টারে এসে ঢুকল সে।

হেডকোয়ার্টার মানে তিরিশ ফুট লম্বা একটা ক্যারাভান, মোবাইল হোম। গত বছর কিনেছিলেন রাশেদ চাচা। অ্যাক্সিডেন্ট করেছিল ক্যারাভানটা। ভেঙে চুরে বেঁকে দুমড়ে একেবারে শেষ।

ইয়ার্ডের এক প্রান্তে ফেলে রাখা হয়েছে। চাচার কাছ থেকে ওটা ব্যবহারের অনুমতি নিয়ে নিয়েছে কিশোর। বোরিস আর রোভারের সাহায্যে মোটামুটি ঠিকঠাক করে নিজের অফিস বানিয়েছে।

পুরো বছর ধরেই মালপত্র এনে ক্যারাভান ট্রেলারটার চারপাশে ফেলেছে কিশোর। একাজেও তাকে সাহায্য করেছে বোরিস আর রোভার, মুসা আর রবিন তো আছেই। ইস্পাতের বার, ভাঙাচোরা ফায়ার-এস্কেপ, কাঠ আর দেখে-চেনার-জো-নেই এমন সব জিনিসপত্রের আড়ালে এখন একেবারে ঢাকা পড়ে গেছে ট্রেলারটা। ওটার কথা ভুলেই গেছেন রাশেদ চাচা। তিনটে কিশোর ছাড়া আর

কেউ জানে না, ওই ট্রেলারের ভেতর কত কিছু গড়ে উঠেছে। তিন গোয়েন্দার অফিস ওটা। ল্যাবরেটরি আছে, ছবি প্রসেসিং-এর ডার্ক-রুম আছে। হেডকোয়ার্টার থেকে বেরোনর কয়েকটা পথও বানিয়ে নিয়েছে ওরা।

একটা ডেস্কের ওপাশে সুইভেল চেয়ারে বসে আছে কিশোর পাশা। ডেস্কের এক কোণ পোড়া। অন্যপাশে বসে আছে মুসা।

'দেরি করে ফেলেছ,' গম্ভীর গলায় বলল কিশোর। যেন ব্যাপারটা জানে না রবিন।

'চাকা পাংচার,' এখনও হাঁপাচ্ছে রবিন। 'লাইব্রেরি থেকে রওনা দেবার পর পরই পেরেক ঢুকেছে।'

'যে কাজ দিয়েছিলাম কিছু করেছ?'

'নিশ্চয়। অনেক কিছু জেনেছি টেরর ক্যাসলের ব্যাপারে।'

'টেরর ক্যাসল?' আপনমনেই বিড় বিড় করল মুসা। 'নামটাই অপছন্দ লাগছে আমার, কেমন যেন গা ছম ছম করে!'

'নাম শুনেই ছমছম, আসল কথা তো শোনইনি এখনও,' বলল রবিন। 'পাঁচজন লোকের একটা পরিবার রাত কাটাতে গিয়েছিল ওখানে। তারপর...'

'একেবারে গোড়া থেকে শুরু কর,' বলল কিশোর। 'গালগল্প বাদ দিয়ে সত্যি ঘটনাগুলো শুধু।'

'ঠিক আছে।' সঙ্গে করে নিয়ে আসা বড় একটা বাদামী খাম খুলছে রবিন। 'কিন্তু তার আগে শুঁটকো টেরির কথাটা জানানো দরকার। সেই সকাল থেকেই আমার পেছনে লেগেছিল ব্যাটা। আমি কি করছি না করছি, জানার চেষ্টা করেছে।'

'ইয়াল্লা?' ব্যাটাকে জানতে দাওনি তো কিছু!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'পেছন থেকে কি করে যে সরাই! খালি নাক গলাতে আসে আমাদের কাজে!'

'না, ওকে কিছু বলিনি আমি,' বলল রবিন। 'কিন্তু আঠার মত সঙ্গে লেগে ছিল ব্যাটা। লাইব্রেরিতে ঢুকতে যাচ্ছি, আমাকে থামাল শুঁটকো। কিভাবে রোলস-রয়েসটা পেল কিশোর জানতে চাইল। জিজ্ঞেস করল, তিরিশ দিন কোথায় কোথায় যাচ্ছি আমরা।'

'তারপর?' জানতে চাইল কিশোর।

'লাইব্রেরিতে আমার সঙ্গে সঙ্গে ঢুকল ব্যাটা,' নাক কোঁচকাল রবিন। 'আমার দিক থেকে চোখ সরাল না মুহূর্তের জন্যেও। দেখল, পুরানো পত্রিকা আর ম্যাগাজিন ঘাঁটাঘাঁটি করছি আমি। কি পড়ছি, দেখতে দিইনি ওকে। কিন্তু...'

'কিন্তু কি?'

'আমাদের কার্ড। যেটার পেছনে টেরর ক্যাসল লিখেছিলে তুমি...'

'হারিয়েছে, না? টেবিলে রেখেছিলে, কাজ করে ফিরে এসে আর পাওনি,' বলল কিশোর।

'তুমি জানলে কি করে?' রবিন অবাক।

'সহজ। না হারালে ওটার কথা তুলতে না তুমি।'

'টেবিলে রেখে ক্যাটালগ গোছাচ্ছিলাম,' বলল রবিন। 'মনে পড়তেই তুলে নিতে এলাম। পেলাম না। অনেক খুঁজেছি। শুঁটকো নিয়েছে, এটাও জোর দিয়ে বলতে পারছি না। তবে বেরিয়ে যাবার সময় ব্যাটাকে খুব খুশি খুশি মনে হয়েছে।'

'শুঁটকোর কথা যথেষ্ট হয়েছে,' বলল কিশোর। 'একটা জরুরি কাজ হাতে নিয়েছি আমরা। সময় নষ্ট করা চলবে না। টেরর ক্যাসলের ব্যাপারে কি জানলে, বল।'

'বেশ,' শুরু করল রবিন। 'হলিউড ছাড়িয়ে গেলে একটা সরু গিরিপথ পাওয়া যাবে। নাম ব্ল্যাক ক্যানিয়ন। ওই গিরিপথের এক ধারে পাহাড়ের ঢালে তৈরি হয়েছে টেরর ক্যাসল। এটার নাম ছিল আসলে ফিলবি ক্যাসল। বিখ্যাত অভিনেতা জন ফিলবির বাড়ি সে-ই তৈরি করিয়েছিল। নির্বাক-সিনেমার যুগে লোকের মুখে মুখে ফিরত ফিলবির নাম।' থামল রবিন।

বলে যাবার ইঙ্গিত করল কিশোর।

'টেরর ছবিতে অভিনয় করত ফিলবি। এই ভ্যাম্পায়ার কিংবা ওয়্যারউল্‌ভ্‌স্‌ মার্কা ছবিগুলো আরকি। ওসব ছবিতে সাধারণত পোড়ো বাড়ি দরকার পড়েই। প্ল্যান করে ওই মডেলেরই একটা বাড়ি তৈরি করল ফিলবি। ঘরে ঘরে ভরল যত্তোসব উদ্ভট জিনিস। মমির কফিন, বহু পুরানো লোহার বর্ম, মানুষের কঙ্কাল, এমনি সব জিনিস। কোনটাই কিনতে হয়নি তাকে। ছবিতে ব্যবহার হয়ে যাবার পর প্রযোজকের কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছে।'

'ভরসা পাচ্ছি,' আস্তে করে বলল কিশোর।

'শেষতক শোন আগে,' বলল মুসা। 'তা জন ফিলবির কি হল?'

'আসছি সে কথায়,' বলল রবিন। 'লক্ষমুখো মানব নামে সারা দুনিয়ায় খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল ফিলবির। এই সময়েই এল সবাক সিনেমা। চমৎকার অভিনয় ফিলবির, কিন্তু কথা বলতে গেলেই গুবলেট হয়ে যায়। চিঁ-চিঁ গলার স্বর! শুধু তাই না, জোরে বলতে গেলে কথা জড়িয়ে যায়। কখনও কোন শব্দের বেলায় তোতলায়ও।'

'ই-স্‌-স্‌!' আফসোস করে উঠল মুসা। 'চিঁ-চিঁ করা ওই তোতলা ভূতকে সিনেমায় যদি দেখতে পেতাম! হাসতে হাসতে নিশ্চয় পেট ব্যথা হয়ে যেত লোকের!'

'তা-ই হত,' সায় দিল রবিন। 'ছবিতে অভিনয় বন্ধ করে দিল ফিলবি। বেহিসেবী খরুচে ছিল সে। জমানো টাকা পয়সা তেমন ছিল না। কাজ নেই, টাকাও আসে না। একে একে সবকটা কাজের লোককে বিদেয় করে দিতে বাধ্য হল। সব শেষে বিদেয় করল তার বিজনেস ম্যানেজার হ্যারি প্রাইসকে। লোকের

সঙ্গে ফোনে কথা বলা বন্ধ করে দিল। ফোন আসে, ধরে না, চিঠি আসে, জবাব দেয় না। নিজেকে গুটিয়ে নিল ক্যাসলের সীমানায়। ধীরে ধীরে অভিনেতা ফিলবিকে ভুলে গেল লোকে।' থামল রবিন। দম নিয়ে আবার বলতে লাগল, 'তারপর একদিন, হলিউডের মাইল পঁচিশেক উত্তরে পড়ে থাকতে দেখা গেল একটা গাড়ি। ভেঙে চুরে দুমড়ে আছে। পাহাড়ী পথ থেকে নিচের পাথুরে সৈকতে পড়ে গিয়ে ওই অবস্থা হয়েছে ওটার। চুরচুর হয়ে গেছে কাচ। ভেঙে, খুলে দশহাত দূরে ছিটকে পড়েছে একটা দরজা।'

'ওই গাড়ির সঙ্গে ফিলবির সম্পর্ক কি?' রবিনের কথার মাঝেই প্রশ্ন করে বসল মুসা।

লাইসেন্স নাম্বার দেখে পুলিশ জানতে পারল, গাড়িটা ফিলবির,' ব্যাখ্যা করল রবিন। 'অভিনেতার লাশ পাওয়া যায়নি। এতে অবাক হবারও কিছু নেই। নিশ্চয় খোলা দরজা দিয়ে বাইরে ছিটকে পড়েছিল দেহটা। তারপর জোয়ারের সময় ভেসে গেছে সাগরে।'

'আহ্-হা!' দুঃখ প্রকাশ পেল মুসার গলায়। 'তোমার কি মনে হয়? ইচ্ছে করেই অ্যাক্সিডেন্ট করেছিল লোকটা?'

'শিওর না,' জবাব দিল রবিন। 'গাড়িটা সনাক্ত করার পরই ক্যাসলে গিয়ে উঠল পুলিশ। সদর দরজা খোলা। ভেতরে কেউ নেই। পুরো ক্যাসল খুঁজল পুলিশ। কোন লোককেই পাওয়া গেল না। লাইব্রেরিতে একটা টেবিলে পেপারওয়েট চাপা দেয়া একটা নোট পাওয়া গেল,' কপি করে আনা নোটটা বাদামী খামের ভেতর থেকে খুলে পড়ল রবিনঃ 'লোকে আর কোনদিনই জীবন্ত দেখতে পাবে না আমাকে। কিন্তু তাই বলে একেবারে হারিয়ে যাব না আমি। আমার আত্মা ঠিকই বিচরণ করবে তোমাদের মাঝে। আর, মরার পরেও আমার সম্পত্তি হয়ে রইল টেরর ক্যাসল। ওটা এই মুহূর্ত থেকে একটা অভিশপ্ত দুর্গ।—জন ফিলবি।'

'ইয়াল্লা!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'দুর্গটার ব্যাপারে যতই শুনছি, ততই অপছন্দ করছি ওটাকে!'

'থামলে কেন?' রবিনকে বলল কিশোর। 'বলে যাও।'

'ক্যাসলের আনাচে-কানাচে কোথাও খোঁজা বাকি রাখল না পুলিশ। না, ফাঁকি ঝুঁকি কিছুই নেই। গাড়িটা ভেঙে ফেলে দিয়ে এসে বাড়িতে লুকিয়ে বসে থাকেনি ফিলবি। পরে জানা গেল, ব্যাংকে পাহাড়-প্রামাণ ঋণ হয়ে আছে তার। বাড়িটা মর্টগেজ রয়েছে ব্যাংকের কাছে। ফিলবি আত্মহত্যা করেছে, শিওর হয়ে নিয়ে ক্যাসলে লোক পাঠাল ব্যাংক। তার জিনিসপত্র সব তুলে নিতে এল ওরা। কিন্তু অদ্ভুত একটা ব্যাপার ঘটল। কেন জানি থতমত খেয়ে গেল লোকেরা বাড়িতে ঢুকেই। উদ্ভট কিছু শব্দ শুনল ওরা, আজব কিছু চোখে পড়ল। কিন্তু কি শুনেছে,

কি দেখেছে, পরিষ্কার করে বলতে পারল না। মালপত্র আর বের করা হল না। নিজেরাই ছুটে বেরিয়ে এল। বাড়িটা বিক্রির সিদ্ধান্ত নিল এরপর ব্যাংক। লাভ হল না। লোকে থাকতেই চায় না ক্যাসলে, কিনতে যাবে কে শুধু শুধু? যে-ই ঢোকে বাড়িটাতে, খানিক পরেই কেমন অস্বস্তি বোধ করতে শুরু করে।' থেমে দুই বন্ধুর দিকে একবার চেয়ে নিল রবিন। কিশোরের কোন রকম ভাব পরিবর্তন নেই। হাঁ করে আছে মুসা। আবার বলল সে, 'সস্তায় এতবড় একটা বাড়ি কেনার লোভ ছাড়তে পারল না একজন এস্টেট এজেন্ট। ভূত-ফূত কিছু নেই, সব বাজে কথা!— প্রমাণ করতে এগিয়ে চলল সে। ঠিক করল, রাত কাটাবে ফিলবি ক্যাসলে। সাঁঝের আগেই ক্যাসলে ঢুকল সে। মাঝরাত পেরোনর আগেই পাগলের মত ছুটে বেরিয়ে এল। ব্ল্যাক ক্যানিয়ন পেরোনর আগে একবারও আর পেছন ফিরে তাকায়নি।'

খুব সন্তুষ্ট মনে হচ্ছে কিশোরকে। কিন্তু চোখ বড় হয়ে গেছে মুসার। রবিন তার দিকে চাইতেই ঢোক গিলল।

'বলে যাও,' অনুরোধ করল কিশোর 'যা আশা করেছিলাম, বাড়িটা তার চেয়ে অনেক বেশি ভূতুড়ে।'

'এরপর আরও কয়েকজন ক্যাসলে রাত কাটানর চেষ্টা করেছে,' জানাল রবিন। 'একজন উঠতি অভিনেত্রী পাবলিসিটির জন্যে রাত কাটাতে গেল ওখানে। সে বেরিয়ে এল মাঝরাত হবার অনেক আগেই। শীত ছিল না, তবু দাঁতে দাঁত বাড়ি খাচ্ছিল তার। কোটর থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসতে চাইছিল চোখ। স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল আতঙ্কে। তখন কোন কথাই বেরোয়নি মুখ দিয়ে। পরে জানিয়েছে, একটা নীল ভূতের দেখা পেয়েছে। আর কেমন একধরনের কুয়াশা নাকি ঢেকে ফেলছিল তাকে। অভিনেত্রী এর নাম দিয়েছে ফগ অব ফিয়ার।'

'নীল ভূত, আবার কুয়াশাতঙ্কও! ইয়াল্লা!' শুকনো ঠোঁটে জিভ বুলিয়ে ভেজাবার চেষ্টা করল মুসা। 'আর কিছু দেখা গেছে? মাথা ছাড়া ঘোড়সওয়ার, শেকলে-বাঁধা-কঙ্কাল…'

'রবিনকে কথা শেষ করতে দাও,' বাধা দিয়ে বলল কিশোর।

'আমার আর কিছু শোনার দরকার নেই,' মুসার মুখ ফ্যাকাসে। 'যা শুনেছি, এতেই বুক ধড়ফড় শুরু হয়ে গেছে!'

মুসার কথায় কান দিল না কিশোর। রবিনকে জিজ্ঞেস করল, 'আর কিছু বলবে?'

'হ্যাঁ,' আবার বলতে লাগল রবিন। 'একের পর এক ভূতুড়ে কাণ্ড ঘটেই চলল ফিলবি ক্যাসলে। পুবের কোন এক শহর থেকে নতুন এল একটা পরিবার। পাঁচজন সদস্য। থাকার জায়গা খুঁজছে। ব্যাংক ধরল ওদেরকে। পুরো একবছর ক্যাসলে থাকার অনুমতি দিল। এক পয়সা ভাড়া চায় না। শুধু বাড়িটার বদনাম

ঘোচাতে চায় ব্যাংক। খুশি মনেই ক্যাসলে গিয়ে উঠল পরিবারটা। রাত দুপুরে বেরিয়ে এল হুড়োহুড়ি করে। ক্যাসল তো ক্যাসল, সে-রাতেই শহর ছেড়ে পালাল ওরা। রকি বীচে আর কোনদিন দেখা যায়নি ওদের।'

'গোলমালটা শুরু হয় ঠিক কোন সময় থেকে?' জানতে চাইল কিশোর।

'রাতের শুরুতে সব চুপচাপ। মাঝরাতের কয়েক ঘন্টা আগে থেকে ঘটতে শুরু করে ঘটনা। দূর থেকে ভেসে আসে গোঙানির শব্দ। হঠাৎ করেই হয়ত সিঁড়িতে একটা আবছামূর্তি দেখা যায়। কখনও শোনা যায় দীর্ঘশ্বাস। অনেক সময় ক্যাসলের মেঝের তলা থেকে উঠে আসে চাপা চিৎকার। মিউজিক রুমে একটা অরগান পাইপ আছে, নষ্ট। মাঝরাতে হঠাৎ করে নাকি বেজে ওঠে ওটা, শুনেছে অনেকে। বাদককেও দেখেছে কেউ কেউ। অর্গানের সামনে বসে থাকে, আবছা একটা মূর্তি, শরীর থেকে নীল আলো বিচ্ছুরিত হয়! এর নামও দিয়ে ফেলেছে লোকেঃ নীল অশরীরী?'

'নিশ্চয় তদন্ত করে দেখা হয়েছে এসব?'

'হয়েছে,' নোট দেখে বলল রবিন। 'দু'জন প্রফেসর গিয়েছিলেন। তাঁরা কিছুই দেখতে পাননি। শোনেনওনি কিছু। তবে অদ্ভুত একটা ব্যাপার ঘটেছে। কেমন অস্বস্তি বোধ করেছেন সারাক্ষণ। দু'জনেই উদ্বিগ্ন, উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন। বেরিয়ে এসে জানিয়েছেনঃ অদ্ভুত কিছু একটা রয়েছে ক্যাসলে। কিছুই করতে পারল না ব্যাংক। না পারল বাড়িটা বেচতে, না পারল ভাড়া দিতে। মালপত্রগুলোও বের করে আনা গেল না। ক্যাসলে যাবার পথ আটকে দিল ব্যাংক। ব্যস। তারপর থেকে ওভাবেই পড়ে আছে ক্যাসলটা।' কিশোরের দিকে চেয়ে বলল রবিন, 'বিশ বছরে একটা পুরো রাত কেউ কাটাতে পারেনি ওর ভেতর। শেষে কয়েকজন ভবঘুরে মাতাল বাড়িটাতে আস্তানা গাড়ার চেষ্টা করেছিল, তাতেও বাধা দেয়নি ব্যাংক। কিন্তু প্রথম রাতেই পালাল মাস্তানেরা। ভূতে তাড়া করে দুর্গ থেকে বের করে আনল ওদের। সারা শহরে ছড়িয়ে দিল ওরা সে-কাহিনী। ক্যাসলের ত্রিসীমানায় ঘেঁষা বন্ধ করে দিল লোকে। ফিলবিক্যাসলের নাম হয়ে গেল টেরর ক্যাসল। এসব অনেক বছর আগের ঘটনা। কিন্তু আজও লোকে মাড়ায় না ওদিকটা।'

'ঠিকই করে,' বলে উঠল মুসা। 'আমিও যাব না, লাখ টাকা দিলেও না।'

'আজ রাতেই আমরা যাব ওখানে,' ঘোষণা করল কিশোর। 'সঙ্গে ক্যামেরা আর টেপ-রেকর্ডার নিয়ে যাব। সত্যিই ভূত আছে কিনা ক্যাসলে, দেখতে চাই। পরে আঁট ঘাট বেঁধে তদন্তে নামব। দুর্গটার ভীষণ বদনাম আছে। জায়গাটাও খারাপ। ভূতুড়ে ছবির শূটিঙের জন্যে এরচে ভাল জায়াগা আর পাবেন না মিস্টার ক্রিস্টোফার। হলপ করে বলতে পারি।'

চার

টেরর ক্যাসলের পুরো ইতিহাস লিখে এনেছে রবিন।

সারাটা বিকেল খুঁটিয়ে সব পড়ল কিশোর। তারপর উঠল, ক্যাসলে যাবার জন্যে তৈরি হল।

সারাক্ষণই 'যাব না যাব না' করল মুসা। কিন্তু শেষে দেখা গেল, সে-ও তৈরি হয়ে এসেছে। পুরানো এক সেট কাপড় পরেছে। সঙ্গে নিয়েছে তার পুরানো টেপরেকর্ডারটা।

পকেটে নোটবুক নিল রবিন। আর নিল চোখা-করে-শিশতোলা পেন্সিল। ফ্ল্যাশগান সহ ক্যামেরা কাঁধে ঝুলিয়ে নিল কিশোর।

খাওয়া-দাওয়া সেরে এসেছে তিনজনেই। মুসা আর রবিন বাড়িতে বলে এসেছে, রোলস-রয়েসে চড়ে হাওয়া খেতে যাচ্ছে। দু'জনের বাবা-মা কেউই আপত্তি করেননি। কিশোরও বেড়াতে যাবার অনুমতি নিয়েছে চাচির কাছ থেকে।

আঁধার নামল। স্যালভিজ ইয়ার্ডের গেটের বাইরে এসে দাঁড়াল তিন গোয়েন্দা। আগেই টেলিফোন করে দেয়া হয়েছে রেন্ট-আ-রাইড কোম্পানিতে। রোলস রয়েসের বিশাল জ্বলন্ত দুই চোখ দেখা গেল মোড়ের মাথায়। দেখতে দেখতে কাছে এসে দাঁড়াল গাড়ি।

গাড়িতে উঠে বসল তিন কিশোর।

কোথায় যাবে জানতে চাইল হ্যানসন।

কোলের ওপর একটা ম্যাপ বিছিয়ে নিয়েছে কিশোর। একটা জায়গায় আঙুল রেখে হ্যানসনকে দেখিয়ে বলল, 'ব্ল্যাক ক্যানিয়ন। এই যে, এ পথে যেতে হবে।'

'ঠিক আছে, মিস্টার পাশা।'

অন্ধকারে নিঃশব্দে ছুটে চলল রোলস রয়েস। ধীরে ধীরে ওপরে উঠে যাচ্ছে পাহাড়ী পথ ধরে। এক পাশে নিচে গভীর খাদ। খানিক পর পরই তীক্ষ্ণ মোড় নিয়েছে পথ। কিন্তু দক্ষ ড্রাইভার হ্যানসন। তার হাতে নিজেদের ভার ছেড়ে দিয়ে একেবারে নিশ্চিন্ত তিন কিশোর।

'আজ রাতে তদন্ত করার ইচ্ছে নেই,' পাশে বসা দুই সঙ্গীকে বলল কিশোর। 'শুধু দেখে আসব দুর্গটা। উদ্ভট কিছু চোখে পড়লে তার ছবি তোলার চেষ্টা করব। আর তুমি, মুসা, আজব যে-কোন শব্দ রেকর্ড করে নেবে টেপে।'

'আমাকে রেকর্ড করতে দিলে,' থেমে গল মুসা। আরেকটা তীক্ষ্ণ মোড় নিল গাড়ি। নিচের অন্ধকার খাদের দিকে চেয়ে শিউরে উঠল একবার। তারপর ফিরল আবার কিশোরের দিকে। 'হ্যাঁ, আমাকে রেকর্ড করতে দিলে শুধু দাঁতে দাঁতে বাড়ি খাবার শব্দ উঠবে, আর কিছু না।'

'রবিন,' মুসার কথায় কান না দিয়ে বলল কিশোর। 'তুমি গাড়িতে থাকবে। আমাদের ফেরার অপেক্ষা করবে।'

'এক্কেবারে আমার পছন্দসই কাজ,' খুশি হয়ে বলল রবিন। জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে আছে। 'ইস্স্, দেখেছ কি অন্ধকার!'

অন্ধকার গিরিপথে ঢুকে পড়েছে গাড়ি। দু'ধারে খাড়া উঠে গেছে পাহাড়। বার বার এঁকেবেঁকে এগিয়ে গেছে পথটা। কোথাও একবিন্দু আলো দেখা যাচ্ছে না। ঘুটঘুট অন্ধকার। একটা বাড়ি-ঘর চোখে পড়ছে না কোথাও।

'ব্ল্যাক ক্যানিয়নের নাম যে-ই রাখুক, ঠিকই রেখেছে,' চাপা গলায় বলল মুসা।

'সামনে বাধা দেখতে পাচ্ছি!' বলে উঠল কিশোর।

ঠিকই! সামনে পথ বন্ধ। পাথর আর মাটির স্তূপ। দু'ধারে পাহাড়ের গায়ে ঘন হয়ে জন্মে আছে মেলকোয়াইটের ঝোপ, কিন্তু ঘাসের নাম গন্ধও নেই। ফলে রোদ-বৃষ্টি বাতাসে আলগা হয়ে গেছে মাটি, পাথর। গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ে জমা হয়েছে পথের ওপর। স্তূপের ভেতর থেকে উঁকি দিয়ে আছে একটা ক্রসবারের মাথা। কোন এককালে লোক্ চলাচল ঠেকানর জন্যে লাগানো হয়েছিল। এখন আর বারের দরকার নেই। তার চেয়ে ভাল ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে মাটি আর পাথর।

স্তূপের কাছে এসে গাড়ি থামিয়ে দিল হ্যানসন। 'আর যাবে না,' বলল সে। 'তবে আপনাদের তেমন অসুবিধে হবে বলেও মনে হয় না। ম্যাপে দেখছি, কয়েকশো গজ এগিয়ে একটা মোড় ঘুরলেই পৌঁছে যাবেন ক্যাসলে।'

'তা ঠিক,' সায় দিল কিশোর। 'আমরা নেমেই যাচ্ছি। মুসা, এস।'

'নেমে এল দু'জনে। গাড়ি ঘুরিয়ে রাখছে হ্যানসন।'

'ঘন্টাখানেকের ভেতরেই ফিরব আমরা,' ডেকে হ্যানসনকে বলল কিশোর।

এগিয়ে চলল দুই গোয়েন্দা।

'খাইছে!' সঙ্কিত গলায় বলে উঠল মুসা। 'দেখেই গা ছম ছম করছে!' দাঁড়িয়ে পড়েছে সে।

দাঁড়িয়ে পড়ল কিশোরও। অন্ধকারে সামনে তাকাল। গিরিপথের শেষ প্রান্তে একটা পাহাড়ের ঢালে দাঁড়িয়ে আছে অদ্ভুত এক কাঠামো। তারাখচিত আকাশের পটভূমিতে বেশ স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে ওটা। বিশাল মোটা পাথরের একটা থাম যেন উঠে গেছে আকাশের দিকে। থামের চূড়ায় একটা রিঙ পরিয়ে দেয়া হয়েছে যেন। টেরর ক্যাসলের টাওয়ার। শুধু টাওয়ারটাই, ক্যাসলের আর বিশেষ কিছুই নজরে পড়ছে না এখান থেকে।

'দিনের বেলা এলেই ভাল হত,' বিড় বিড় করে বলল মুসা।

মাথা নাড়ল কিশোর। না'। 'দিনে কিছু ঘটে না ক্যাসলে। ভূতপ্রেতগুলো বেরোয় রাতের বেলা।'

'ভূতের তাড়া খেতে চাই না আমি। এমনিতেই প্যান্ট নষ্ট করার সময় হয়ে এসেছে।'

'আমারও,' স্বীকার করল কিশোর। 'পেটের ভেতর কেমন সুড়সুড়ি লাগছে। কয়েক ডজন প্রজাপতি ঢুকে পড়েছে যেন!'

'তাহলে চল ফিরে যাই,' সুযোগ পেয়ে বলল মুসা। হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে যেন। 'এক রাতে অনেক দেখা হয়েছে চল, হেডকোয়ার্টারে ফিরে গিয়ে নতুন কোন প্ল্যান ঠিক করি।'

'প্ল্যান তো ঠিকই আছে,' বলল কিশোর। 'একটা শেষ না করেই আরেকটা কেন?'

পা বাড়াল কিশোর। এগিয়ে চলল ক্যাসলের দিকে। মাঝে মাঝে টর্চ জ্বেলে পথ দেখে নিচ্ছে। প্রায় খাড়া হয়ে উঠে গেছে পথটা আলগা পাথরের ছড়াছড়ি। ছোট বড় মাঝারি, সব আকারের। হড়কে যাচ্ছে পা, কখনও হোঁচট খাচ্ছে। কিন্তু থামল না গোয়েন্দা প্রধান।

কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করল মুসা। তারপর পিছু নিল কিশোরের। তার হাতেও টর্চ।

'এমন অবস্থায় পড়ব জানলে,' কিশোরের কাছাকাছি হয়ে ক্ষুণ্ন গলায় বলল মুসা। 'গোয়েন্দা হওয়ার কথা কল্পনাও করতাম না!'

'কেসটা মিটে গেলেই অন্য রকম মনে হবে,' বলল কিশোর। 'কেউকেটা গোছের কিছু মনে হবে নিজেকে। প্রথম কেসেই কিরকম নাম হবে তিন গোয়েন্দার, ভেবে দেখেছ?'

'কিন্তু ভূতের সামনে যদি পড়ে যাই? কিংবা নিল অশরীরী তাড়া করে? দুয়েকটা দৈত্য-দানবের বাচ্চা এসে ঘাড় চেপে ধরলেও আশ্চর্য হব না!'

'ওরা আসুক, তা-ই আমি চাই, বলতে বলতে কাঁধে ঝোলানো ক্যামেরার গায়ে আলতো চাপড় দিল কিশোর। 'ব্যাটাদের ছবি তুলে নেব। বিখ্যাত হয়ে যাব রাতারাতি।

বিখ্যাত হবার আগেই যদি ঘাড়টা মটকে দেয়?'

'শ্ শ্ শ্!' ঠোঁটে আঙুল রেখে হুঁশিয়ার করে দিল সঙ্গীকে কিশোর। আচমকা দাঁড়িয়ে পড়েছে। নিভিয়ে দিয়েছে টর্চ।'

পাথরের মত স্থির হয়ে গেল মুসা। হঠাৎ আলো নিভে যাওয়ায় অন্ধকার যেন আরও বেশি করে চেপে ধরল চারদিক থেকে।

কেউ, কিংবা কিছু একটা, এদিকেই নেমে আসছে। সোজা ছেলে দুটোর দিকে।

অদ্ভুত পায়ের আওয়াজ। চাপা, মৃদু। সেই সঙ্গে পায়ের আঘাতে ছোট ছোট পাথর গড়িয়ে পড়ার কেমন সুরেলা শব্দ।

ক্যামেরা হাতে তৈরি হয়ে আছে কিশোর। আরও এগিয়ে এল পায়ের শব্দ, আরও। হঠাৎ ঝিলিক দিয়ে উঠল ফ্ল্যাশ-গানের তীব্র নীলচে-সাদা আলো। ক্ষণিকের জন্যে বড় বড় দুটো টকটকে লাল চোখ চোখে পড়ল। লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে আসছে চোখের মালিক। আরেক মুহূর্ত পরেই তাদের কাছে এসে গেল ওটা। পরক্ষণেই আরেক লাফে বেরিয়ে গেল পাশ কেটে। পাথর গড়ানর আওয়াজ তুলে লাফাতে লাফাতে চলে গেল জীবটা।

'খরগোশ!' বলল কিশোর। 'স্বরেই বোঝা গেল, হতাশ হয়েছে। জানোয়ারটাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছি আমরা।'

'আমরা দিয়েছি!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'আমাদেরকে দেয়নি ব্যাটা? আরেকটু হলেই তো ভিরমি খেয়ে পড়েছিলাম!'

'ও কিছু না। রাতের বেলা রহস্যজনক শব্দ আর নড়াচড়ার ফলে নার্ভাস সিস্টেমের ওপর বিশেষ প্রতিক্রিয়া। ঘটেই থাকে এমন,' বন্ধুকে অভয় দিল কিশোর। 'চল, এগোই।" মুসার হাত ধরে টান দিল সে। 'আর চুপি চুপি এগিয়ে লাভ নেই। ফ্ল্যাশারের আলোয় নিশ্চয় চমকে গেছে ভূতগুলো, যদি থেকে থাকে।'

'তাহলে কি গান গাইতে গাইতে এগোব?' মোটেই এগোনর ইচ্ছে নেই মুসার। পেছনে পড়ে গেছে। 'এতে একটা উপকার হবে। ভূতের গোঙানি, দীর্ঘশ্বাস, কিছুই কানে ঢুকবে না।'

'কানে ঢুকুক, তা-ই চাই আমি,' দৃঢ় শোনাল কিশোরের গলা। 'সব শুনতে চাই আমি। চেঁচানি, দীর্ঘশ্বাস, খসখস, শেকলের ঝনঝনানি ভূতেরা যতরকম শব্দ ব্যবহার করে, সব।'

মুসার মনের ভাব ঠিক উল্টো। কিন্তু বলল না আর কিছু। জানে লাভ নেই বলে। বন্ধুকে চেনে সে। একবার যখন সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে, দুর্গে ঢুকবেই কিশোর পাশা। কোন বাধাই এখন ঠেকাতে পারবে না তাকে। চুপচাপ সঙ্গীর পিছু পিছু এগিয়ে চলল মুসা।

যতই এগোচ্ছে ওরা, আকাশের পটভূমিতে ধীরে ধীরে বড় হচ্ছে টাওয়ারটা। ক্যাসলের অন্যান্য অংশও চোখে পড়ছে এখন। আবছাভাবে নিজের অজান্তেই শিউরে উঠল একবার মুসা। কি কি ঘটায় ওখানে ভূতেরা, সব বলেছে রবিন। ওই কাথাগুলোই বারবার ঘুরে ফিরে মনে আসছে গোয়েন্দা সহকারীর। ভুলে থাকতে চাইছে, পারছে না।

দুর্গ ঘিরে থাকা উঁচু পাথরের দেয়ালের কাছে এসে দাঁড়াল ওরা। থামল এক মুহূর্ত। তারপর গেট দিয়ে ঢুকে পড়ল দুর্গ প্রাঙ্গনে।

'এসে গেলাম,' থেমে দাঁড়িয়েছে কিশোর।

বড় টাওয়ারটার পাশেই আরেকটা ছোট টাওয়ার। এটার মাথা চোখা এমনি ছোট ছোট আরও কয়েকটা টাওয়ার। রয়েছে এদিক-ওদিক। জানালায় জানালায়

কাচের শার্সি, তারার আলোয় চিক চিক করছে ম্লানভাবে। মুসার মনে হচ্ছে, ওগুলো জানালা নয়, ভূতের চোখ। তার দিকে চেয়ে মুখ টিপে হাসছে।

কোনরকম জানান না দিয়ে হঠাৎ উড়ে এল ওটা। কালো একটা ছায়া, নিঃশব্দে। আঁতকে উঠে মাথা নুইয়ে ফেলল মুসা। চেঁচিয়ে উঠল, 'ইয়াল্লা! বাদুড়!'

'বাদুড়েরা শুধু পোকামাকড় খায়,' মনে করিয়ে দিল কিশোর। 'অত ভয় পাওয়ার কিছু নেই।'

'এটা হয়ত রুচি বদলাতে চায়। সুযোগ দিয়ে লাভ কি? ড্রাকুলার প্রেতাত্মাও তো হতে পারে!'

সঙ্গীর কথায় কান না দিয়ে আঙুল তুলে সামনে প্রাসাদের গায়ে বসানো বিরাট দরজা দেখাল কিশোর। 'চল, ঢুকে পড়ি।'

আমার পা কথা শুনবে বলে মনে হয় না। কেবলই পেছনে চলতেই চাইছে ও দুটো।

'আমার দুটোও,' স্বীকার করল কিশোর। 'জোর করে কথা শোনাতে হবে। এস।'

পা বাড়াল কিশোর।

ভয়াবহ ওই ক্যাসলে বন্ধুকে একা ঢুকতে দেয়া উচিত হবে না। পেছনে চলল মুসাও।

মার্বেলের সিঁড়ি ভেঙে একটা চওড়া বারান্দায় উঠে এল দু'জনে। দরজার নবের দিকে হাত বাড়াতেই কিশোরের কব্জি চেপে ধরল মুসা। 'থাম! শুনতে পাচ্ছ! বাজনা বাজাচ্ছে কেউ!'

কান পাতল দু'জনেই। লক্ষ লক্ষ মাইল দূর থেকে আসছে যেন অদ্ভুত কিছু শব্দের আভাস। এক মুহূর্ত। তারপরই হারিয়ে গেল শব্দগুলো। এখন শোনা যাচ্ছে আঁধার রাতের পরিচিত সব আওয়াজ। পোকামাকড়ের কর্কশ ডাক। হুহু বাতাসে মাঝেমধ্যে পাহাড়ের পাথুরে গা বেয়ে গড়িয়ে পড়া ছোট্ট পাথরের চাপা টুকুর-টাকুর।

'শুধুই কল্পনা,' গলায় জোর নেই কিশোরের। 'এমনও হতে পারে, গিরিপথের ওপারে কোন বাড়িতে টেলিভিশন চলছে। বাতাসে ভেসে এসেছে তার আওয়াজ। খালি বাতাসও হতে পারে। হাজারো রকম শব্দ করতে পারে বাতাস।'

'তা পারে,' বিড়বিড় করে বলল মুসা। তবে পাইপ অরগান হলেও অবাক হব না! হয়ত বাজানর নেশায় পেয়েছে এমুহূর্তে নীল ভূতকে!

'তাহলে চোখে দেখে শিওর হতে হবে,' বলল কিশোর। 'চল, ঢুকি!'

হাত বাড়িয়ে দরজার নব চেপে ধরল কিশোর। জোরে মোচড় দিয়ে ঠেলা দিতেই তীক্ষ্ণ একটা ক্যাঁ-এঁ-চ-চ আওয়াজ উঠল।

ভয়ানক জোরে বুকের খাঁচায় বাড়ি মারল একবার মুসার হৃৎপিণ্ড। পেছন

ফিরে দৌড় মারতে যাচ্ছিল, থেমে গেল শেষ মুহূর্তে। খুলে গেছে বিশাল দরজা। দরজার কব্জার আওয়াজ হয়েছে, বুঝতে পারল।

কিশোরের অবস্থাও বিশেষ সুবিধের নয়। বুকের ভেতর দুরদুর করছে-তারও। ফিরে ছুট লাগাতে ইচ্ছে করছে। মনোবল পুরো ভেঙে পড়ার আগেই বন্ধুর হাত চেপে ধরল। তাকে নিয়ে ঢুকে পড়ল ভেতরে।

গাঢ় অন্ধকার গিলে নিল যেন দুই কিশোরকে। টর্চ জ্বালল ওরা। লম্বা এক হলঘরে এসে দাঁড়িয়েছে। হলের ওপাশে একটা দরজা। সেদিকে এগিয়ে চলল দু'জনে।

ভ্যাপসা গন্ধ। বাতাস ভারি। চারদিকে নাচছে যেন ছায়া ছায়া অশরীরীর দল। দরজাটা পেরিয়ে এল ওরা। বিরাট আরেকটা হলে এসে দাঁড়াল। দোতলা সমান উঁচু ছাত।

দাঁড়িয়ে পড়ল কিশোর। 'এসে গেছি। এটা মেইন হল। ঘন্টাখানেক থাকব এখানে। তারপর যাব।'

'যা-বো!' চাপা, কাঁপা কাঁপা গলায় কিশোরের কথার প্রতিধ্বনি করে উঠল কেউ। কানের কাছে ফিসফিস করে উঠল শব্দটা।

পাঁচ

'শুনলে!' থরথর করে কাঁপছে মুসা। ফিসফিস করতেও ভয় পাচ্ছে। 'ভূতটা আমাদের সঙ্গে যাবে বলছে! চল, পালাই!'

'থাম!' সঙ্গীর হাত খামচে ধরল কিশোর।

'থা-মো!' আবার শোনা গেল কাঁপা কাঁপা কথা।

'হুঁ, বুঝেছি,' বলল কিশোর। 'প্রতিধ্বনি আর কিছু না। খেয়াল করেছ কতবড় ঘর? দেয়ালের কোন কোণ নেই, ড্রামের দেয়ালের মত গোল। এতে শব্দ প্রতিধ্বনিত হয় খুব বেশি। ইচ্ছে করেই হয়ত এমন ঘর তৈরি করিয়েছে জন ফিলবি, কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে। নামও রেখেছে মিলিয়ে, ইকো রুম।'

'রু-ম!' কানের কাছে ফিসফিসিয়ে উঠল আবার কাঁপা প্রতিধ্বনি।

কিশোরের কথা ঠিক, বুঝতে পারল মুসা! ভয় কেটে যাচ্ছে। সাধারণ একটা ব্যাপার তাকে কি রকম ভয় পাইয়ে দিয়েছিল ভেবে লজ্জা পেল মনে মনে। ফিরে গিয়ে রবিনকে নিশ্চয় কথাটা বলবে কিশোর। তাকে নিয়ে হাসাহাসি করবে তাই বলল, 'আসলে, আগেই বুঝতে পেরেছি আমি। ভয় পাওয়ার ভান করছিলাম শুধু।' এবং কথাটা প্রমাণ করার জন্যেই জোরে হা-হা করে হেসে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে উঠল প্রতিধ্বনিঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হা আ-আ-আ! ধীরে ধীরে অনেক দূরে কোথাও মিলিয়ে গেল যেন শব্দের রেশ।

ঢোক গিলল মুসা। 'কাণ্ডটা আমি করলাম!' জোড়ে কথা বলতে ভয় পাচ্ছে, ফিসফিসিয়ে বলল।

'তো কে করল?' নিচু গলায় বলল কিশোর। 'যা করেছ, করেছ, আর কোরো না।'

'পাগল!' ফিসফিস করে বলল মুসা। 'কথাই বলব না জোরে!'

'কথা বলবে না কেন? এস,' টেনে সঙ্গীকে এক পাশে নিয়ে গেল কিশোর। ঘরের ঠিক মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে কথা বললে প্রতিধ্বনি হবে। এখানে বলতে পার নিশ্চিন্তে।'

'তাহলে আগে আমাকে বলে নিলেই পারতে!' ক্ষুণ্ন মনে হল মুসাকে।

'আমি তো জানি প্রতিধ্বনির নিয়ম-কানুন সব তোমারও জানা আছে,' বলল কিশোর। 'পড়নি?'

'পড়েছি,' স্বীকার করল মুসা। 'কিন্তু ভুলে গিয়েছিলাম। আচ্ছা, পুবের কোন অঞ্চল থেকে এসেছিল একটা পরিবার, একটা রাতও কাটাতে পারেনি এখানে, ভেগেছে। কেন, বুঝেছ কিছু?'

'পশ্চিমে সুবিধে করতে পারবে না ভেবে হয়ত আবার পুবেই ফিরে গেছে,' নির্লিপ্ত গলা কিশোরের। তবে এটা ঠিক, বিশ বছরে কেউ পুরো একটা রাত কাটাতে পারেনি এখানে। আমাদের জানতে হবে, কি কারণে এত ভয় পেল ওরা!'

'কারণ আর কি? ভূত!' বলল মুসা। ঘরের চারদিকে টর্চের আলো ফেলছে সে। হলের এক প্রান্ত থেকে একটা সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলায়! কিন্তু ওই সিঁড়ি বেয়ে ওপরে যাবার কোন ইচ্ছেই তার নেই। কোন কোন জায়গার দেয়াল বিচিত্র রঙিন কাপড়ে ঢাকা, নষ্ট হয়ে গেছে কাপড়গুলো। তার নিচে কারুকাজ করা কাঠের বেঞ্চ পাতা। দেয়ালের গায়ে মাঝে মাঝেই ছোট ছোট চৌকোনা তাক। ওগুলোতে দাঁড় করিয়ে রাখা রয়েছে প্রাচিন বর্মপোশাক।

কয়েকটা বড় বড় ছবি ঝুলছে দেয়ালে। আলো ফেলে ফেলে প্রতিটি ছবি দেখছে মুসা। বিভিন্ন পোশাকে বিভিন্ন ভঙ্গিতে সব একজন লোকের ছবি। একটা ছবিতে সম্ভ্রান্ত এক ইংরেজের পোশাকে দেখা যাচ্ছে তাকে। পাশেই আরেকটাতে হয়ে গেছে কুঁজো অদ্ভুত পোশাক পরা একচোখা এক জলদস্যু।

অনুমান করল মুসা, ছবিগুলো দুর্গের মালিক, জন ফিলবির। সেই নির্বাক সিনেমার যুগের নাম করা কিছু ছবির দৃশ্য বড় করে এঁকে দেয়ালে সাজিয়ে রেখেছে অভিনেতা।

'চুপ করে থেকে এতক্ষণ বোঝার চেষ্টা করলাম,' হঠাৎ বলল কিশোর। 'কই, মুহূর্তের জন্যেও তো ভয় টের পেলাম না! তবে একটু কেমন কেমন যে করছে না, তা নয়!'

'আমারও,' জানাল মুসা। 'তবে ভয় ঠিক পাচ্ছি না। অনেক পুরানো একটা

বাড়িতে দাঁড়িয়ে থাকলে যেমন হয়, তেমনি অনুভূতি হচ্ছে।

'নোট পড়ে জেনেছি,' চিন্তিত দেখাচ্ছে কিশোরকে, 'লোকের ওপর প্রতিক্রিয়া ঘটাতে সময় নেয় টেরর ক্যাসল। শুরুতে হালকা এক ধরনের অস্বস্তিবোধ জন্মে। আস্তে আস্তে বাড়ে। প্রচণ্ড আতঙ্কে রূপ নেয় এক সময়।

কিশোরের শেষ কথাটা পুরোপুরি কানে ঢুকল না মুসার। দেয়ালে টাঙানো একটা ছবির ওপর আটকে গেছে তার দৃষ্টি। হঠাৎ এক ধরনের অস্বস্তিবোধ চেপে ধরছে তাকে। ক্রমেই বাড়ছে সেটা।

মুসার দিকে চেয়ে আছে একচোখা জলদস্যু! নষ্ট চোখটা গোল করে কাটা কালো কাপড়ে ঢাকা। কিন্তু ভাল চোখটা জ্যান্ত চোখের মতই চেয়ে আছে যেন তার দিকে। জ্বলছে। হালকা লালচে একটা আভা বিকিরণ করছে যেন! কিন্তু ও-কি! দ্রুত একবার চোখের পাতা পড়ল না!

'কিশোর।' গলা দিয়ে কোলা ব্যাঙের ঘড়ঘড়ে আওয়াজ বেরোল মুসার। 'ছবিটা!...আমাদের দিকেই চেয়ে আছে!'

'কোন ছবি!'

'ওই যে, ওটা!' টর্চের আলোর রশ্মি নাচিয়ে ছবিটা নির্দেশ করল মুসা। 'আমাদের দিকেই চেয়ে আছে।'

'দৃষ্টি বিভ্রম,' জবাব দিল কিশোর। 'ইচ্ছে করেই এমনভাবে আঁকে শিল্পি, মনে হয় দর্শকের দিকেই চেয়ে আছে চোখ। যেদিক থেকেই দেখ না কেন, তোমার দিকেই চেয়ে আছে মনে হবে।'

'কিন্তু...কিন্তু ওটা রঙে আঁকা চোখ নয়!' প্রতিবাদ করল মুসা। 'ওটা...ওটা সত্যিকারের চোখ...জ্যান্ত চোখ!'

'সে তোমার মনে হচ্ছে। ওটা রঙে আঁকা চোখই। চল, কাছ থেকে দেখি।'

ছবিটার কাছে এগিয়ে গেল কিশোর। একমুহূর্ত দ্বিধা করে শেষে তাকে অনুসরণ করল মুসা। দু'জনেই আলো ফেলল ছবির ওপর! ঠিক, কিশোরের কথাই ঠিক। রঙে আঁকা চোখ ওটা। তবে আঁকা হয়েছে দক্ষ হাতে। একেবারে জ্যান্ত মনে হচ্ছে।

'হ্যাঁ রঙে আঁকা।' চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা ঝোঁকাল মুসা। 'কিন্তু মেনে নিতে পারছি না!...চোখের পাতা পলক ফেলতে দেখছি...আরে।' হঠাৎ যেন কথা আটকে গেল তার। 'কিছু টের পাচ্ছ।'

'ঠাণ্ডা,' অবাক শোনাল কিশোরের গলা। 'ঠাণ্ডা একটা অঞ্চলে এসে ঢুকেছি আমরা। এরকম ঠাণ্ডা আবহাওয়া সব পোড়ো বাড়িতেই কিছু কিছু জায়গায় থাকে।'

'তাহলে স্বীকার করছ এটা পোড়ো বাড়ি!' রীতিমত কাঁপছে মুসা। দাঁতে দাঁতে বাড়ি খাওয়া শুরু হয়েছে। 'ভীষণ শীত করছে। মেরু অঞ্চলে এসে ঢুকলাম

নাকিরে বাবা। ভূত, সব ভূত এসে ঝাঁপিয়ে পড়ছে আমার ওপর। কিশোর, ভয় পাচ্ছি আমি!'

নিজেকে স্থির রাখার জোর চেষ্টা চালাচ্ছে মুসা। কিন্তু দাঁতে দাঁতে বাড়ি খাওয়া রোধ করতে পারছে না। কোথা থেকে গায়ে এসে লাগছে তীব্র ঠাণ্ডা হাওয়ার স্রোত। তারপরই চোখে পড়ল, বাতাসে হালকা ধোঁয়া। সূক্ষ্ম, অতি হালকা ধোঁয়ার ভেতর থেকে ধীরে ধীরে রূপ নিচ্ছে যেন একটা শরীর। মুহূর্তে ভয় প্রচণ্ড আতঙ্কে পরিণত হল। পাঁই করে ঘুরল মুসা। কথা শুনল না পা। তাড়িয়ে বের করে নিয়ে এল তাকে ঠাণ্ডা অঞ্চল থেকে। হল পার করে এনে বারান্দায় ফেলল। সেখান থেকে প্রায় উড়িয়ে নামিয়ে আনল সিঁড়ির নিচে, প্রাঙ্গনে, পথে। পেছনে তাড়া করে আসছে পায়ের শব্দ। আরও জোরে ছুটল মুসা।

ক্রমেই কাছে এসে যাচ্ছে পায়ের শব্দ। দেখতে দেখতে পাশে এসে গেল। হাল ছেড়ে দিল মুসা। পাশে চাইল। আরে! কিশোর!

অবাকই হল মুসা। তিন গোয়েন্দার নেতাকে কোন কারণে এত ভয় পেতে এর আগে কখনও দেখেনি সে।

'কি হল? তোমার পা-ও হুকুম মানছে না?' ছুটতে ছুটতেই জিজ্ঞেস করল মুসা।

'মানছে তো। ওদেরকে ছোটার হুকুম দিয়েছি আমি,' চেঁচিয়ে জাব দিল কিশোর।

থামল না ওরা। ছুটেই চলল। হাতে ধরা টর্চে ঝাঁকুনি লাগছে অনবরত, পথের ওপর অদ্ভুত ভঙ্গিতে নাচছে আলোর রশ্মি। টেরর ক্যাসলের কাছ থেকে দ্রুত সরে যাচ্ছে ওরা।

ছয়

ছুটতে ছুটতে বাঁকের কাছে চলে এল ওরা। গতি কমাল একটু। বাঁক ঘুরল। পেছনে ফিরে চাইল একবার কিশোর। বাঁকের ওপাশে অদৃশ্য হয়ে গেছে টেরর ক্যাসলের গর্বিত টাওয়ার।

সামনে অনেক নিচে উপত্যকায় লস অ্যাঞ্জেলেস শহরের আলো মিটমিট করছে। থামল না ওরা। ছুটতে ছুটতে পাথর-মাটির স্তূপের কাছে চলে এল। এখানেও থামল না। চলে এল ওপাশে। একশো গজ নিচে দাঁড়িয়ে আছে কালো রোলস-রয়েস।

গতি একটু কমাল দু'জনে। ঠিক এই সময়ই শোনা গেল তীক্ষ্ণ প্রলম্বিত একটা চিৎকার। অনেক পেছনে ক্যাসলের দিক থেকে আসছে। থেমে গেল হঠাৎ করেই। যেন দম আটকে গেছে গলায়। চমকে উঠে আবার ছোটার গতি বাড়িয়ে দিল দুই

গোয়েন্দা। এক ছুটে এসে দাঁড়াল গাড়ির কাছে।

তারার আলোয় চিকচিক করছে বিশাল রোলস-রয়েসের সোনালি হাতল। ঝটকা দিয়ে খুলে গেল এক পাশের দরজা। হাত বাড়িয়ে মুসাকে ভেতরে টেনে নিল রবিন। মুসার পরই উঠে বসল কিশোর। 'হ্যানসন!' চেঁচিয়ে উঠল সে, 'জলদি গাড়ি ছাড়ুন। বাড়ি ফিরে চলুন।'

'যাচ্ছি, মাস্টার পাশা,' শান্ত গলায় বলল হ্যানসন।

মৃদু গুঞ্জন তুলে স্টার্ট হয়ে গেল ইঞ্জিন। প্রায় নিঃশব্দে পাহাড়ী পথ ধরে ছুটল গাড়ি। যতই নামছে, গতি বাড়ছে ততই। আরও বেশি, আরও।

'কি হয়েছিল?' সিটে এলিয়ে পড়া দুই বন্ধুকে জিজ্ঞেস করল রবিন। 'ওই চিৎকারটা কিসের?'

'জানি না,' বলল কিশোর।

'এবং আমি জানতে চাই না,' কিশোরের কথার পিঠে বলল মুসা। 'যদি কেউ জানেও, আমাকে বলতে মানা করব।'

'কিন্তু হয়েছিল কি?' আবার জিজ্ঞেস করল রবিন। 'নীল ভূতের দেখা পেয়েছ?'

মাথা নাড়ল কিশোর। 'কিছুই দেখিনি। তবে ভয় পাইয়ে ছেড়েছে আমাদের কিছু একটা।'

'ভুল হল,' শুধরে দিল মুসা। 'আতঙ্কিত করে ছেড়েছে।'

'তাহলে গালগল্পগুলো সব সত্যি?' হতাশ হয়েছে যেন রবিন। 'ভূতের উপদ্রব আছে দুর্গে।'

'আছে মানে!' সারা আমেরিকার যত ভূতপ্রেত, জিন, ভ্যাম্পায়ার, ওয়্যারউলফ সবকিছুর আড্ডা ওটা। হেডকোয়ার্টার!' শ্বাসপ্রশ্বাস সহজ হয়ে আসছে মুসার। 'ওই ভূতের খনিতে আর কখনও ঢুকছি না আমরা, কি বল?'

সমর্থনের আশায় নেতার দিকে চাইল মুসা।

কিশোর শুনল কি-না বোঝা গেল না। হেলান দিয়ে বসে আস্তে আস্তে চিমটি কাটছে নিচের ঠোঁটে। গভীর চিন্তায় মগ্ন।

'আর ওই দুর্গে ফিরে যাচ্ছি না আমরা, তাই না?' আবার জিজ্ঞেস করল মুসা।

কিন্তু এবারেও সাড়া নেই কিশোরের। ছুটন্ত গাড়ির জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে আছে। একনাগাড়ে চিমটি কেটে যাচ্ছে নিচের ঠোঁটে।

ইয়ার্ডে এসে পৌঁছুল গাড়ি।

ড্রাইভারকে ধন্যবাদ জানিয়ে নেমে পড়ল তিন গোয়েন্দা।

'পরেরবার বেটার লাক আশা করছি, মাস্টার পাশা,' জানালা দিয়ে গলা বাড়িয়ে বলল হ্যানসন। 'সত্যি খুব ভাল লাগছে আপনাদের সঙ্গ। বুড়ো ব্যাংকার

আর ধনী বিধবাদের কাজ করে করে বিরক্ত হয়ে পড়েছিলাম। একঘেয়েমী কাটছে।'

গাড়ি নিয়ে চলে গেল ইংরেজ শোফার।

বন্ধুদের নিয়ে জাংক-ইয়ার্ডে এসে ঢুকল কিশোর।

ইয়ার্ডের ভেতরে একধারে একটা ছোট বাংলোমত বাড়ি। তারই একটা ছোট্ট ঘরে ঘুমান চাচা-চাচী। ঘরের জানালা দিয়ে আলো আসছে। টেলিভিশন দেখছেন দু'জনে।

'রাত বেশি হয়নি,' বলল কিশোর। 'তাড়াতাড়িই ফিরেছি।'

'আরও আগে ফেরা উচিত ছিল। তাড়া খাওয়ার আগেই,' বলল মুসা। এখনও ফ্যাকাসে হয়ে আছে চেহারা।

কিশোরের চেহারাও ফ্যাকাসে। 'আমি আশা করেছিলাম চিৎকারটা রেকর্ড করবে তুমি। তাহলে আবার এখন শোনা যেত। বোঝা যেত কিসের চিৎকার।'

'তুমি আশা করেছিলে!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'প্রাণ নিয়ে পালাতে দিশে পাচ্ছিলাম না, চিৎকার রেকর্ড করব!'

'আমার নির্দেশ ছিল, যে-কোন রকমের শব্দ রেকর্ড করার দায়িত্ব তোমার,' শান্ত গলায় বলল কিশোর। 'তবে পরিস্থিতি তো নিজের চোখেই দেখেছি, তোমাকে আর কি বলব!'

সহজ তিন-এর দিকে বন্ধুদের নিয়ে গেল কিশোর। হেডকোয়ার্টারে ঢোকার এটা সবচেয়ে সহজ গোপন পথ। ফ্রেমে আটকানো বিরাট একটা ওক কাঠের দরজা। গ্র্যানাইট পাথরে তৈরি ধসে পড়া একটা বাড়ি থেকে খুলে এনেছেন রাশেদ চাচা। ওটাকেই একটা দানবীয় স্টীম ইঞ্জিনের পুরানো বয়লারে এক প্রান্তে কায়দা করে বসিয়ে নেয়া হয়েছে।

লোহালক্কড়ের মাঝে একটা খোঁড়লে হাত ঢুকিয়ে দিল কিশোর। ভেতরে বসানো আছে একটা ছোট বাক্স, তাতে চাবি রাখা। এমন জায়গায় বাক্স, আর তার ভেতর দরজার চাবি থাকতে পারে, কল্পনাই করবে না কেউ। দরজার তালা খুলল কিশোর। টান দিয়ে খুলল পাল্লা। ঢুকে গেল বিরাট বয়লারে।

পুরো সোজা হয়ে দাঁড়ানো যায় না। মাথা সামান্য নুইয়ে বয়লারের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলল তিন কিশোর। শেষ মাথায় বড় গোল একটা ফুটো। ওটার ভেতরে মাথা ঢুকিয়ে দিল কিশোর। শরীরটা বের করে নিয়ে এল ট্রেলারের ভেতর। তার পেছনে একে একে ঢুকে পড়ল মুসা আর রবিন।

সুইচ টিপে আলো জ্বেলে দিল কিশোর। ডেস্কের ওপাশে সুইভেল চেয়ারে গিয়ে বসে পড়ল।

'এখন,' কথা শুরু করল কিশোর, 'দুর্গে কি কি ঘটেছে, আলোচনা করব আমরা। মুসা, কিসে ছুট লাগাতে বাধ্য করল তোমাকে?'

'কেউ বাধ্য করেনি,' সাফ জবাব দিল মুসা। 'আমার নিজেরই ছুটতে ইচ্ছে করছিল।'

'বুঝতে পারনি আমার প্রশ্ন। ছুটতে ইচ্ছে হল কেন তোমার? কি হয়েছিল?'

'শুরুতে কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। আস্তে আস্তে বাড়ল অস্বস্তি, ভয় ভয় করতে লাগল। তারপর হঠাৎ করেই চেপে ধরল দারুণ আতঙ্ক। এরপর আর না ছুটে উপায় আছে?'

'ঠিক,' নিচের ঠোঁটে চিমটি কেটে বলল কিশোর, 'ঠিক একই ব্যাপার ঘটেছে আমার বেলায়ও। শুরুতে অস্বস্তি তারপর ভয় ভয়। শেষে দারুণ আতঙ্ক। কিন্তু আসলে কি ঘটেছিল! প্রথম থেকে ভেবে দেখা উচিত। ইকো হল—প্রতিধ্বনি শুনে প্রথম ভয় পাওয়া। জলদস্যুর ছবি। কাছে পরখ করতে যাওয়া। তারপর ঠাণ্ডা বাতাসের স্রোত...'

'হিম শীতল বাতাসের স্রোত!' শুধরে দিল মুসা। 'ছবিটার কথা নতুন করে ভেবেছ কিছু? ওটার চোখ এত জ্যান্ত মনে হল কেন প্রথমে?'

'হয়ত নিছক কল্পনা,' বলল কিশোর। 'আসলে সত্যি সত্যি এমন কিছু দেখিনি আমরা, কিংবা শুনিনি, যাতে আতঙ্কিত হতে হয়।'

'নাই বা দেখলাম, টের তো পেয়েছি!' বলল মুসা। 'এমনিতেই পুরানো আমলের বাড়িগুলোতে ঢুকতে ভয় ভয় লাগে। আর ক্যাসলটা তো ভূতের আড্ডাখানা। তা-ও যে সে ভূত না, বাঘা বাঘা সব ব্যাটাদের বাস। মানুষ তো মানুষ, ছোটখাট ভূতেরাই ঢুকতে সাহস করবে না ওখানে! জায়গাটা দেখলেই ভয় লাগে!'

'আসল রহস্যটা হয়ত ওখানেই,' বলল কিশোর। 'আবার টেরর ক্যাসলে ঢুকব...' বাধা পেয়ে থেমে গেল। বেজে উঠেছে টেলিফোন।

অবাক হয়ে সেটটার দিকে চেয়ে আছে তিন গোয়েন্দা। মাত্র হপ্তা খানেক আগে এসেছে ওটা। টেলিফোন বুকে নাম ওঠেনি এখনও কিশোরের। অফিসের দু'চারজন, আর তারা তিনজন ছাড়া আর কেউই জানে না নাম্বারটা। তাহলে! কে করল ফোন!

আবার হল রিঙ। আবার।

'তুমিই ধর,' ফিসফিস করে কিশোরকে বলল মুসা।

হাত বাড়াল কশোর। আরেকবার রিঙ হতেই ধরল রিসিভার। তুলে কানে ঠেকাল। 'হ্যালো' বলেই নামিয়ে আনল, ধরল একটা মাইক্রোফোনের সামনে।

পুরানো মাইক্রোফোনটা জাংক-ইয়ার্ড থেকেই জোগাড় করেছে কিশোর। পুরানো একটা রেডিও থেকে খুলে নিয়েছে স্পীকার। মাইক্রোফোন আর স্পীকারের কানেকশন করে দিয়েছে। টেলিফোন এলে, তিনজনে একই সঙ্গে শোনার জন্যে এই ব্যবস্থা।

কথা নেই, শুধু অদ্ভুত একটা গুঞ্জন স্পীকারে।

আবার রিসিভার কানে ঠেকাল কিশোর। 'হ্যালো?' নামিয়ে এনে ধরল মাইক্রোফোনের সামনে।

এবারেও শুধু গুঞ্জন। ক্রেডলে রিসিভার রেখে দিল কিশোর। 'রঙ নাম্বার-টাম্বার কিছু একটা হয়েছে। হ্যাঁ, যা বলেছিলাম। টেরর ক্যাসলে...'

আবার বেজে উঠল টেলিফোন।

স্থির চোখে এক মুহূর্ত সেটটার দিকে চেয়ে রইল কিশোর। ছোঁ মেরে তুলে নিল রিসিভার।

'হা হ্যাল্লো?' নামিয়ে আনল মাইক্রোফোনের সামনে।

আবার গুঞ্জন স্পীকারে। না, আগের মত নয়। একটু যেন পরিবর্তন হয়েছে। বহুদূর থেকে আসছে যেন শব্দটা, কাছিয়ে আসছে ধীরে ধীরে। হঠাৎই গুঞ্জনের ভেতর থেকে ভেসে এল বিদঘুটে একটা ঘড়ঘড়ানি, গলার কাছে পানি নিয়ে কুলি করছে যেন কেউ। তারপর অনেক কষ্টে যেন একটা শব্দ উচ্চারিত হল, 'দূরে...' থেমে গেল কথা। শাঁই শাঁই ঝড় বইছে যেন স্পীকারে। আবার উচ্চারিত হল দুটো শব্দ, 'দূরে...থাকবে...' থেমে গেল কথা। হঠাৎ গলা টিপে ধরে থামিয়ে দেয়া হয়েছে যেন।

ধীরে ধীরে কমে এল শাঁই শাঁই, দূর থেকে দূরে মিলিয়ে গেল গুঞ্জন।

'কি থেকে দূরে থাকব?' রিসিভারের দিকে চেয়ে ওটাকেই যেন প্রশ্ন করল কিশোর। তারপর আস্তে করে নামিয়ে রাখল ক্রেডলে।

দীর্ঘ এক মুহূর্ত কেউ কোন কথা বলল না। তারপর হঠাৎ করেই উঠে দাঁড়াল মুসা। বাড়ি যেতে হচ্ছে আমাকে। এই মাত্র মনে পড়ল, জরুরি একটা কাজ ফেলে এসেছি।'

'আমি যাব,' রবিনও উঠল। 'আমিও যাব তোমার সঙ্গে।'

'আমারও যাওয়া দরকার। মেরিচাচী হয়ত ভাবছেন,' উঠে দাঁড়াল কিশোরও।

হুড়োহুড়ি ঠেলাঠেলি করে বেরুতে গিয়ে একে অন্যের গায়ে ধাক্কা খেল ওরা। কে কার আগে বেরোবে সেই চেষ্টায় ব্যস্ত।

বাক্য পুরো করতে পারেনি অদ্ভুত গলাটা। কিন্তু বুঝতে একটুও অসুবিধে হল না ছেলেদের, আসলে কি বলতে চেয়েছে ওটা।

বলতে চেয়েছে ঃ টেরর ক্যাসল থেকে দূরে থাকার!

সাত

'সত্যিই, একটা সমস্যায়ই পড়া গেল!' বলল কিশোর।

পরদিন বিকেলে হেডকোয়ার্টারে বসে আছে দুই গোয়েন্দা। কিশোর বসে

আছে তার সুইভেল চেয়ারে। পোড়া ডেস্কের এপাশে বসেছে মুসা। রবিন গেছে লাইব্রেরিতে।

'সমস্যা আসলে দুটো,' আবার বলল গোয়েন্দাপ্রধান।

'বলছি, কি করে সমাধান করবে সমস্যার?' বলল মুসা! 'খুব সহজ। রিসিভার তুলে ফোন কর মিস্টার ক্রিস্টোফারকে। বলে দাও, তাঁর জন্যে ভূতুড়ে বাড়ি খুঁজে বের করতে পারব না আমরা। জানাও, একটার কাছে গিয়েছিলাম কোনমতে প্রাণ বাঁচিয়ে ফিরেছি। আর একবার ওটার কাছে ঘেঁষতে চাই না।'

মুসার পরামর্শের ধার দিয়েও গেল না কিশোর। 'আমাদের প্রথম সমস্যা,' বলল সে। 'জানা, কে ফোন করেছিল গতরাতে।'

'কে নয়,' শুধরে দিল মুসা। 'বল কিসে। ভূত, প্রেতাত্মা, ওয়্যারউলফ, ভ্যাম্পায়ার!'

ওদের কেউই টেলিফোন ব্যবহার করতে জানে না,' মনে করিয়ে দিল কিশোর।

'সে-তো পুরানো আমলের কথা। আমরা আধুনিক হয়েছি, ভূতেদেরও আধুনিক হতে দোষ কি? গতরাতে যে-ই ফোন করে থাকুক, গলাটা মোটেই মানুষের মত মনে হয়নি আমার।'

চিন্তিত দেখাল গোয়েন্দাপ্রধানকে। 'ঠিকই বলছ। আমরা তিনজন আর হ্যানসন ছাড়া কোন মানুষের জানার কথা না, গতরাতে টেরর ক্যাসলে গিয়েছিলাম!'

'প্রেতাত্মাদের জানতে বাধা কোথায়?' প্রশ্ন রাখল মুসা।

'তা নেই,' অনিচ্ছা সত্ত্বেও সায় দিল কিশোর। তবে, দুর্গটা সত্যিই ভূতুড়ে কিনা দেখে ছাড়ব। জন ফিলবির ব্যাপারে আরও অনেক বেশি জানতে হবে আমাদের। টেরর ক্যাসলে কারও প্রেতাত্মা থেকে থাকলে, ওরই আছে।'

'হ্যাঁ, এটা একটা কথার মত কথা বলেছ,' খুশি হয়ে বলল মুসা। 'এবার বল দ্বিতীয় সমস্যাটা কি?'

'এমন কাউকে খুঁজে বের করা, যে জন ফিলবির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশেছে।'

'কিন্তু সে-তো অনেক বছর আগের কথা! তেমন কাকে পাব আমরা?'

'অনেক আর কত? আত্মহত্যা না করলে এখনও বেঁচে থাকতে পারত জন ফিলবি। তার সঙ্গী-সাথীদের অনেকেই নিশ্চয় বেঁচে আছে এখনও। হলিউডে খোঁজ করলে তেমন কাউকে না কাউকে পেয়ে যাবই আমরা।'

'তা হয়ত পেয়ে যাব।'

'আমার মনে হয়, ফিলবির ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি বলতে পারবে তার ম্যানেজার, মিস্টার ফিসফিস।'

'মিস্টার ফিসফিস!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'এটা আবার কেমন নাম?'

'ডাক নাম। লোকে ওই নামেই ডাকত। আসল নাম হ্যারি প্রাইস। এই যে, ওর ছবি।'

একটা কাগজ সহকারীর দিকে ঠেলে দিল গোয়েন্দাপ্রধান। একটা ছবি, তার নিচে কিছু লেখা। পুরানো একটা খবরের কাগজ থেকে ফটোকপি করে এনেছে রবিন। ছবিতে দু'জন লোক। একজন লম্বা, হালকা-পাতলা, পুরো মাথায় টাক। হাত মেলাচ্ছে তার চেয়ে সামান্য বেঁটে একটা লোকের সঙ্গে। মাথায় ঘন চুল। হাসিখুশি সুন্দর চেহারা। টাকমাথা লোকটার চোখ দেখলেই ভয় লাগে, গলায় একটা গভীর কাটা দাগ।

'ইয়াল্লা!' বিস্মিত মুসা। 'এই জন ফিলবির আসল চেহারা! খামোকাই ছদ্মবেশে অভিনয় করেছে। আসল চেহারা দেখালেই ভয় বেশি পেত লোকে! এই চোখ আর গলার কাটা কলজে কাঁপিয়ে দেয়।'

'ভুল করছ। ও নয়, জন ফিলবি হল অন্য লোকটা। চেহারা সুন্দর, হাসিটাও আন্তরিক।

'খাইছে!' আরও বিস্মিত হল মুসা। 'ওই লোকটা ফিলবি। ভূত-প্রেত আর দানবের অভিনয় করত! এত সুন্দর মানুষটা!'

'হ্যাঁ। ব্যক্তিগত জীবনে নাকি খুবই লাজুক লোক ছিল ফিলবি। তাছাড়া তোতলাতো। বন্ধু-বান্ধব ছিল না বললেই চলে। কি করে জানি ফিসফিসের সঙ্গে ভাব হয়ে গিয়েছিল, শেষে ম্যানেজার নিযুক্ত করে ফেলল। লোকে আগে ঠকাত ফিলবিকে। ফিসফিস ম্যানেজার হওয়ার পর আর পারেনি।'

'স্বাভাবিক!' মন্তব্য করল মুসা। 'সামনে না করে কার বাপের সাধ্য। করলেই তো ছুরি বের করবে।'

'ওকে খুঁজে পেলে কাজ হত। অনেক কিছু জানতে পারতাম ফিলবির ব্যাপারে।'

'কি করে ওর খোঁজ পাওয়া যাবে, কিছু ভেবেছ?'

'টেলিফোন গাইড।'

গাইডের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল দুই গোয়েন্দা। শেষ অবধি নামটা খুঁজে পেল মুসা।

'এই যে!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'হ্যারি প্রাইস। আটশো বারো উইণ্ডিং ভ্যালি রোড। ফোন করবে ওকে?'

'না, লোক জানাজানি হয়ে যেতে পারে। ওর সঙ্গে দেখা করব আমরা,' টেলিফোনের দিকে হাত বাড়াল কিশোর। গাড়ি দরকার।

'গাড়িটা পাওয়ায় খুব উপকার হয়েছে!' কিশোরের দিকে চেয়ে বলল মুসা, 'আচ্ছা, তিরিশ দিন শেষ হয়ে গেলে কি করব, বল তো?'

'সে তখন দেখা যাবে। বুদ্ধি একটা ভেবে রেখেছি···হ্যালো।···কিশোর

পাশা।...গাড়িটা চাই, এখুনি।' রিসিভার নামিয়ে রাখল কিশোর। 'চল, উঠি। চাচীকে বলতে হবে, রাতে দেরি করে খাব।'

বুঝিয়েসুঝিয়ে রাজি করাতে পারল বটে কিশোর, কিন্তু সন্দেহ গেল না মেরিচাচীর। গাড়ি এসে গেছে। রাজকীয় রোলস রয়েসের দিকে চেয়ে চিন্তিত ভঙ্গিতে এদিক ওদিক মাথা নাড়লেন তিনি। 'এর পর কি করবি কিশোর, তুইই জানিস! এই বয়েসেই রোলস রয়েস...! তা-ও আবার আরব শেখের ফরমাশ দেয়া! নষ্ট হয়ে যাবি তো!'

আবার যদি মত পাল্টে ফেলে মেরিচাচী, এই ভয়ে কিশোর তাড়াতাড়ি গিয়ে উঠে পড়ল গাড়িতে। মুসা উঠে বসতেই দ্রুত ইয়ার্ড থেকে বেরিয়ে যাবার নির্দেশ দিল হ্যানসনকে।

কোথায় যেতে হবে শোফারকে জানাল কিশোর।

ম্যাপ বের করে দেখে নিল হ্যানসন উইণ্ডিং ভ্যালিটি কোথায়। রকি বীচ থেকে বেশ দূরে একটা পর্বতমালার ধারে উপত্যকাটা। নিঃশব্দে ছুটে চলল রোলস রয়েস।

পাহাড়ী পথ ধরে উঠে যাচ্ছে গাড়ি। সেদিকে চেয়ে বলল কিশোর, 'হ্যানসন, ব্ল্যাক ক্যানিয়নের দিকে যাচ্ছি কেন?'

'ওদিক দিয়েই যেতে হবে, মাস্টার পাশা। ক্যানিয়নের মাইলখানেক দূর দিয়ে বেরিয়ে যাব।'

'ভালই হল। আবার একবার ঢুকব ব্ল্যাক ক্যানিয়নে। কয়েকটা ব্যাপারে শিওর হওয়া দরকার।'

মিনিট কয়েক পরেই গিরিপথের প্রবেশমুখে পৌঁছ গেল ওরা। ভেতরে ঢুকে পড়ল গাড়ি। পরিচিত পথ, অথচ কেমন অপরিচিত মনে হচ্ছে এখন! দিনের আলোয় একেবারে অন্যরকম লাগছে পথটাকে।

ভেঙে পড়া ক্রসবার আর পাথরের স্তূপের কাছে এনে গাড়ি রাখল হ্যানসন। পথের দিকে চেয়ে বলে উঠল, 'দেখুন দেখুন, আরেকটা গাড়ির টায়ারের দাগ! গতরাতেই ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছি। কেউ অনুসরণ করেছিল আমাদেরকে।'

'অনুসরণ! কে?' একে অন্যের দিকে চাইল মুসা আর কিশোর।

'আরেক রহস্য মাথা চাড়া দিচ্ছে,' বলল কিশোর। 'যাকগে। আগের কাজ আগে শেষ করি। টেরর ক্যাসলের বাইরেটা ঘুরে দেখব চল।'

'চল,' বলল দ্বিতীয় গোয়েন্দা। 'বাইরে দিয়ে ঘুরতে আমার কোন আপত্তি নেই।'

দিনের আলোয় অনেক সহজে অনেক কম সময়ে দুর্গের কাছে পৌঁছে গেল ওরা। বিশাল টাওয়ার, আকাশ ছুঁতে চাইছে যেন।

'গতরাতে ওই ভূতের আড্ডায় ঢুকেছিলাম, ভাবলে এখনও গা ছমছম করে।'

বলল মুসা।

দুর্গের বাইরের দিকে পুরো একপাক ঘুরে এল কিশোর। তারপর আবার চলল পেছনে। ওখান থেকে প্রায় খাড়া নিচে নেমে গেছে পাহাড়টা।

'বাড়িটাতে মানুষ থাকে কিনা বুঝতে চাইছি,' বলল কিশোর। তাহলে তার কিছু না কিছু চিহ্ন থাকবেই। জুতোর ছাপ...সিগারেটের পোড়া টুকরো...'

পাওয়া গেল না তেমন কিছু। পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ল দু'জনেই। দুর্গের পাশে বিশ্রাম করতে বসল।

'নাহ্, মানুষ থাকে না এখানে,' বলল কিশোর। 'ভূত আছে, তা-ও বিশ্বাস করতে পারছি না...'

হঠাৎ তীক্ষ্ণ এক চিৎকারে চমকে উঠল দু'জনেই। মানুষ! মানুষের গলা! লাফিয়ে উঠে ছুটল ওরা। কয়েক পা এগিয়েই দাঁড়িয়ে পড়ল। দুর্গের সদর দরজা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছে দুটো মানুষ। আতঙ্কিত গলায় চেঁচাচ্ছে। হঠাৎ কিসে হোঁচট লেগে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল একজন। চকচকে কিছু একটা ছিটকে পড়ল হাত থেকে। কিন্তু ওটা তুলল না সে। হাঁচড়ে-পাঁচড়ে কোনমতে উঠেই সঙ্গীর পেছনে ছুট লাগাল আবার।

'ভূত না!' বিস্ময়ের ঘোর কাটতেই বলে উঠল মুসা। 'তবে ছোটার ধরন দেখে মনে হচ্ছে ভূতের সঙ্গে দেখা হয়েছে!'

'জলদি!' বলেই ছুটতে শুরু করল কিশোর। 'ব্যাটাদের চেহারা দেখা দরকার।'

দ্রুত দৌড়াচ্ছে কিশোর। পেছনে মুসা।

প্রায় চোখের আড়ালে চলে গেছে। বাঁকটা ঘুরলেই অদৃশ্য হয়ে যাবে, ধরা যাবে না ওদেরকে। বুঝে ছোটার গতি কমিয়ে দিল কিশোর। দাঁড়িয়ে পড়ল এসে, যেখানে আছাড় খেয়েছিল একজন। কাছেই পড়ে আছে চকচকে জিনিসটা। টর্চ। নিচু হয়ে তুলে নিল কিশোর। খুদে একটা নেমপ্লেট আটকানো টর্চের গায়ে। তাতে দুটো অক্ষর খোদাই করা।

'টি ডি!' জোরে জোরে পড়ল কিশোর। 'কে হতে পারে, বল তো, মুসা?'

'টেরিয়ার ডয়েল!' প্রায় ফেটে পড়ল মুসা। 'শুটকো টেরি! কিন্তু তা কি করে হয়? ব্যাটা এখানে আসবে কেন?'

'এসেছে! লাইব্রেরিতে রবিনের কাজকর্ম দেখছিল, ভুলে গেছ? আমাদের কার্ড ওই ব্যাটাই চুরি করেছে। গতরাতে ফলো করেছিল ওই। সব সময়েই তো পেছনে লেগে থাকে শুটকো। কি করি না করি জানার চেষ্টা করে। এবারেও নিশ্চয় একই ব্যাপার। আমাদের কাজে গোল বাধানর তালে আছে।'

'তা হতে পারে,' চিন্তিত দেখাচ্ছে সহকারী গোয়েন্দাকে। 'রাতে আমরা ঢুকেছি, দেখেছে! তখন সাহস করেনি। দিনের বেলা দেখতে এসেছে, কেন

গিয়েছিলাম দুর্গের ভেতরে। কেমন মজা! খেলি তো ভূতের তাড়া।' হাসি একান-ওকান হয়ে গেল মুসার।

ব্যাপারটাকে এত হালকাভাবে নিতে পারল না কিশোর। টর্চটা পকেটে ঢুকিয়ে রাখতে রাখতে বলল, 'এত হাসির কিছু নেই। ভূত আমাদেরকেও ছাড়েনি। তবে আমরা আবার ঢুকব ওদের আড্ডায়, কিন্তু শুটকো আর এদিক মাড়াবে না। ভাবছি, এখুনি আবার ঢুকব দুর্গে। দিনের আলোয় ভাল করে দেখতে চাই সব।'

প্রতিবাদ করতে গিয়েও থেমে গেল মুসা। ভারি কিছু ধসে পড়ার শব্দ কানে আসছে। চমকে চোখ তুলে চাইল দু'জনেই। ঠিক মাথার ওপরে পাহাড়ের চূড়ার কাছ থেকে গড়িয়ে নেমে আসছে বিশাল এক পাথর।

ছুট লাগাতে যাচ্ছিল মুসা, খপ করে তার হাত ধরে ফেলল কিশোর। 'থাম! আমাদের ওপর পড়বে না! কয়েক গজ দূর দিয়ে চলে যাবে।'

ঠিকই। ওদের কয়েক গজ দূর দিয়ে তুমুল গতিতে ছুটে গেল পাথরটা, দশ গজ নিচের রাস্তায় আছড়ে পড়ল। পথের সর্বনাশ করে দিয়ে, চারদিকে কংক্রীটের গুঁড়ো ছড়িয়ে ফেলে গড়িয়ে নেমে চলে গেল ঢালু পথ বেয়ে।

'ইয়াল্লা!' এখনও গা কাঁপছে মুসার। গায়ে পড়লে টেরর ক্যাসলের ভূতের সংখ্যা আরও দুটো বাড়ত!'

'দেখ দেখ!' মুসার হাত খামচে ধরে টান দিল কিশোর। 'ঢালের গায়ে ওই যে ঝোপটা, কে যেন নড়াচড়া করছে ওর ভেতরে! নিশ্চয় ব্যাটা শুটকো। অন্য ধার দিয়ে ঘুরে আমাদের অলক্ষ্যে গিয়ে চড়েছে ওখানে। পাথর গড়িয়ে দিয়েছে আমাদের দিকে।'

'এবার আর ব্যাটাকে ছাড়ছি না আমি,' শার্টের হাতা গুটাতে লাগল মুসা। 'শিক্ষা দিয়ে ছাড়ব।'

খাড়াই বেয়ে তাড়াহুড়ো করে উঠতে শুরু করল দুই গোয়েন্দা। আলগা পাথর আর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে জন্মে থাকা কাঁটা ঝোপ বাধা সৃষ্টি করছে। খানিকটা ওঠার পরেই দেখল ওরা, দ্রুত সরে যাচ্ছে একটা মূর্তি, দেখতে দেখতে হারিয়ে গেল একপাশে।

আরও দ্রুত ওঠার চেষ্টা করল দু'জনে। পাহাড়ের গা থেকে কার্নিসের মত বেরিয়ে থাকা বিরাট এক চ্যাপ্টা পাথরের কাছে এসে থমকে গেল। ওটা ডিঙানো সম্ভব না। ওখানেই দাঁড়িয়ে জোরে জোরে হাঁপাতে লাগল দু'জনে।

কার্নিসের মত পাথরটার একপাশে পাহাড়ের গায়ে বড়সড় একটা চৌকোণা গুহামুখ। গুহার নিচ থেকে টেনে সামনে বেরিয়ে আছে বড় আরেকটা চ্যাপ্টা পাথর, অনেকটা ঝোলা বারান্দার মত। আরাম করে বসা যাবে ওখানে। ওটার দিকে এগিয়ে চলল দুই বন্ধু।

প্রায় পৌঁছে গেছে বারান্দার কাছে, এই সময় মাথার ওপরে চাপা গম্ভীর একটা

শব্দ হল। তারপরই পাথরে পাথরে ঠোকাঠুকির আওয়াজ। চমকে আবার চোখ তুলে চাইল দু'জনেই। এবার আর একটা নয়, অসংখ্য পাথরের ধস নেমে আসছে।

বরফের মত জমে গেল যেন মুসা। কি করবে বুঝে উঠতে পারল না।

কিন্তু বুদ্ধি হারাল না কিশোর। এক মুহূর্ত দ্বিধা করল। পরক্ষণেই সঙ্গীর হাত ধরে হ্যাঁচকা টান মারল। ঝোলা বারান্দার ওপর প্রায় হুমড়ি খেয়ে এসে পড়ল দু'জনে। জোরে এক ধাক্কা দিয়ে মুসাকে গুহার ভেতরে ঠেলে দিল কিশোর। নিজেও গড়িয়ে চলে এল ভেতরে। দ্রুত গড়াতে গড়াতে গর্তের একেবারে শেষ সীমায় চলে এল দু'জনে। ঠিক এই সময় প্রথম পাথরটা আঘাত হানল বারান্দায়। দেখতে দেখতে শুরু হয়ে গেল পাথরবৃষ্টি। ছোট, মাঝারি, বড়, সব রকমের, সব আকারের পাথর পড়ছে একনাগাড়ে।

বজ্রের গর্জন তুলে আছড়ে এসে বারান্দায় পড়ছে পাথর, কিছু গড়িয়ে নেমে যাচ্ছে, কিছু যাচ্ছে আটকে, কিছু গড়িয়ে চলে আসছে ভেতরে। একটার পর একটা জমছে পাথর, দেয়াল উঠে যাচ্ছে গর্তের সামনের খোলা অংশে।

গর্তের শেষ মাথায় দেয়ালের গায়ে সেঁটে বসে রইল দুই বন্ধু। আলো অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে তাদের চোখের সামনে থেকে, হারিয়ে যাচ্ছে আকাশ। কয়েক সেকেণ্ডেই পাহাড়ের ঢালে পাথরের কবরে আটকে গেল ওরা। জ্যান্ত কবর। আলো আর আকাশ পুরোপুরি অদৃশ্য হয়ে গেছে চোখের সামনে থেকে। ঘুটঘুটে অন্ধকার।

আট

বাইরে ধীরে ধীরে কমে এল পাথর। ধসের গর্জন। স্তব্ধ হয়ে গেছে দুই বন্ধু। নিকষ কালো অন্ধকার। গর্তের ভেতরে ছোট্ট পরিসর, বাতাসে ভাসছে ধূলিকণা। দম আটকে দিতে চাইছে।

'কিশোর!' কাশতে কাশতে বলল মুসা। 'ফাঁদে আটকে গেছি আমরা! আর বেরোতে পারব না! দম বন্ধ হয়ে মরব এবার!'

'নাকে রুমাল চাপা দাও, জলদি!' বলল কিশোর। 'শিগগিরই নেমে যাবে ধূলিকণা।' অন্ধকারে হাত বাড়িয়ে সঙ্গীর কাঁধ চেপে ধরল সে। 'ভেব না, দম বন্ধ হয়ে মরব না। ভূমিকম্পের ফলে সৃষ্টি হয়েছে এই গুহা। আমি দেখেছি, এক পাশের দেয়ালে বড় একটা ফাটল আছে। কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে জানি না। তবে ওটা দিয়ে বাতাস চলাচল করে। শুটকোকে ধন্যবাদ। ওর সৌজন্যেই একটা টর্চ আছে এখন আমার পকেটে।'

'ঠিকই, শুটকোকে ধন্যবাদ,' ব্যঙ্গ করল মুসা। 'ওর সৌজন্যেই এই কবরে আটকেছি আমরা! ইসস, বগাটাকে যদি হাতের কাছে পেতাম এখন। সরু ঘাড়টাই মটকে দিতাম!'

'কিন্তু ও-ই করেছে কাজটা, কোন প্রমাণ নেই। পাথরের ধস কেন নেমেছে কিছুই জানি না আমরা এখনও,' বলতে বলতেই টর্চের বোতাম টিপে দিল কিশোর। গাঢ় অন্ধকার চিরে দিল তীব্র আলোর রশ্মি।

আলো ফেলে দেখল কিশোর। ফুট ছয়েক উঁচু গুহাটা, পাশ চার ফুট মত। এক পাশের দেয়ালে ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত নয় দশ ইঞ্চি চওড়া একটা ফাটল। ঝিরঝির করে বাতাস আসছে ওপথে। কিন্তু ওদিক দিয়ে বেরনো যাবে না।

বিরাট এক পাথর আটকে গেছে গর্তের মুখে। ওটার আশপাশে ওপরে ছোট বড় আরও পাথর ঠেসে আটকেছে, তার ওপর জমেছে বালি আর মাটি।

'হুঁম্‌ম্‌ খুব সুন্দর ভাবেই পাথরের দেয়াল উঠেছে,' যেন ভাল একটা কাজের কাজ হয়েছে এমনি ভঙ্গিতে বলল কিশোর।

'এখনও বড় বড় কথা গেল না তোমার!' মুসার গলায় ক্ষোভ। 'বলে ফেললেই হয় ভালমত আটকে গেছি আমরা। আর বেরোতে পারব না।'

'সেটা বলতে যাব কেন? এখনও জানি না বের হতে পারব কিনা। এস ঠেলা লাগাই। যদি নাড়াতে পারি...'

গায়ের জোরে ঠেলা লাগাল দু'জনে। এক চুল নড়ল না পাথর। হাঁপাতে হাঁপাতে বসে পড়ল ওরা বিশ্রাম নিতে।

'হ্যানসন নিশ্চয় আসবে।' কেঁদেই ফেলবে যেন মুসা। 'কিন্তু কিছুতেই খুঁজে পাবে না আমাদের। শেষে পুলিশে খবর দেবে। পুলিশ আসবে, বয় স্কাউটরা আসবে, খোঁজাখুঁজি হবে প্রচুর। আমরা চেঁচালেও সে আওয়াজ বাইরে যাবে না। তারমানে আর কোন দিনই...' চুপ করে গেল সে।

কিশোর শুনছে না কথা। মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে আছে। হাতের টর্চের আলোয় আলোকিত হয়ে আছে গুহার পেছন দিকটা। তীক্ষ্ণ চোখে সেদিকেই চেয়ে আছে সে।

'ছাই দেখা যাচ্ছে,' বলল কিশোর। 'কোন কারণে এখানে আশ্রয় নিয়েছিল কেউ।' বলতে বলতেই উঠে গিয়ে ছাইয়ের কাছে বসল সে। এক হাতে টর্চ নিয়ে অন্য হাতে খুঁড়তে শুরু করল ছাই আর ধূলোর গাদা। আধ ইঞ্চিমত বেরিয়েছিল, খুঁড়ে খুঁড়ে প্রায় ইঞ্চি চারেক বের করে ফেলল ওটার মাথা। একটা শক্ত ডাল। টানাহেঁচড়া করে ডালটা বের করে নিয়ে এল সে। ফুট চারেক লম্বা, ইঞ্চি দুয়েক পুরু। এক মাথা পোড়া।

'কপাল ভাল আমাদের,' বলে উঠল কিশোর। 'ডালটা পেয়ে গেছি। নিশ্চয় এর মাথায় খাবার গেঁথে পুড়িয়ে খেয়েছিল লোকটা।'

ডালটার দিকে হাবার মত চেয়ে রইল মুসা। পুরানো, আধপোড়া ওই লাঠি তাদের কি কাজে লাগবে বুঝতে পারছে না।

'এটা দিয়ে চাড় লাগিয়ে পাথর সরানর কথা ভাবছ নাকি?' জানতে চাইল

মুসা। 'খামোকাই খাটবে তাহলে।'

'না, চাড় দেব না।'

কোন কথা মনে এলে আগেভাগেই সেটা জানিয়ে দেয়ার পক্ষপাতী নয় কিশোর। আগে দেখে নেয়, তার পরিকল্পনায় খুঁত বেরোয় কিনা, তারপর দরকার হলে প্রকাশ করে। এটা জানে মুসা, তাই, ডালটা দিয়ে কি করবে না করবে সে ব্যাপারে আর কোন প্রশ্ন করল না সঙ্গীকে।

কোমরের বেল্টে ঝোলানো আটফলার ছোট সুইস ছুরিটা খুলে নিল কিশোর। একটা কাটিয়ং ব্লেড বের করে কাজে লেগে গেল।

ডালের পোড়া মাথাটা চেঁছে চোখা করে ফেলল কিশোর। ছুরিটা আবার আগের জায়গায় রেখে দিয়ে ডাল হাতে করে গিয়ে দাঁড়াল পাথরের দেয়ালের সামনে। আলো ফেলে ভালমত পরীক্ষা করে দেখল দেয়ালটা। বোঝার চেষ্টা করল কোন্ দিকে পাথরে সংখ্যা কম। তারপর লাঠির চোখা মাথা দিয়ে খোঁচা লাগাল দেয়ালের একপাশে। কয়েক ইঞ্চি ঢুকেই ঠেকে গেল লাঠির মাথা। জোরাজুরি করেও আর ঢোকানো গেল না। নিশ্চয় পাথরে আটকে গেছে। টেনে বের করে এনে আবার খানিকটা ওপরে ঢোকাল সে। আবার কয়েক ইঞ্চি ঢুকে ঠেকে গেল মাথা। আবার বের করে এনে আরেক জায়গায় ঢোকাল। এবার আর ঠেকল না। ওপাশে বেরিয়ে গেল চোখা মাথাটা। হ্যাঁচকা টানে বের করে আনতেই হড়হড় করে ঝরে পড়ল কিছু বালি মাটি।

আপন মনেই মাথা ঝোঁকাল কিশোর। ছিদ্রটাতে আবার লাঠি ঢোকাল। আস্তে আস্তে চাড় দিতে লাগল চারদিকে। বালি-মাটি ঝরে পড়তে লাগল। হাত ঢোকানো যায় এমন একটা গর্ত হয়ে গেল দেয়ালের গায়ে শিগগিরই। আলো চুঁইয়ে ঢুকছে গুহার ভেতর।

আবার কাজে লেগে গেল কিশোর। কয়েক মিনিটেই গর্তটার পাশে ওরকম আরেকটা গর্ত করে ফেলল। দুটো গর্তের মাঝামাঝি আবার লাঠি ঢুকিয়ে দিল। খোঁচাতে খোঁচাতে বালি-মাটি ফেলে এক করে ফেলল দুটো গর্ত। বেশ বড় একটা ফোকর হয়ে গেছে এখন। ফোকরের কাছে চোখ নিয়ে গিয়ে বাইরে তাকাল সে। চোখের সামনে ফুটে উঠল গোল একটা বড় পাথর।

'এবার,' সন্তুষ্ট গলায় বলল কিশোর, 'এস, হাত লাগাও।'

ফোকর দিয়ে লাঠি ঢুকিয়ে দিল আবার। পাথরে ঠেকাল লাঠির মাথা। দু'জনে মিলে এপাশ থেকে ঠেলা লাগাল জোরে।

প্রথমে নড়তে চাইল না পাথর! শেষ অবধি পরাজিত হতেই হল। চাপা ভোঁতা একটা আওয়াজ তুলে বালি মাটি আর সঙ্গী পাথরের আলিঙ্গন থেকে ছাড়িয়ে নিল নিজেকে, গড়িয়ে পড়তে লাগল। পড়ার সময় কিছু আলগা সঙ্গীকে নিয়ে গেল সাথে করে। ফোকরের বাইরের মুখটা বড় হল আরেকটু।

ফোকরের ওপর দিকে একটা পাথর বেছে নিল কিশোর। কতখানি বড় পাথর, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। লাঠির মাথা পাথরের নিচের দিকে ঠেকিয়ে ঠেলে যেতে লাগল দু'জনে। এক চুল নড়ল না পাথর। পরিশ্রমে দরদর করে ঘামছে দু'জনে। পিচ্ছিল হয়ে আসছে লাঠি ধরা হাত। কিন্তু বিরত হল না। বেশিক্ষণ আর অনড় থাকতে পারল না পাথর। হড়াৎ করে একটা শব্দ তুলে খুলে এল বালিমাটির আকর্ষণ থেকে। বিশাল পাথর। ধুপ করে আছড়ে পড়ল নিচের সঙ্গী সাথীদের ওপর। অনেকগুলো পাথরকে নড়িয়ে ফেলল ধাক্কা দিয়ে, সঙ্গে নিয়ে গড়াতে গড়াতে চলে গেল ঢাল বেয়ে।

বেশ প্রশস্ত হয়ে গেছে এখন ফোকরের বাইরের দিকটা। এপাশটাও প্রশস্ত করতে লেগে গেল ওরা। খুব বেশিক্ষণ লাগল না। ক্রল করে বেরিয়ে যাবার উপযোগী একটা সুড়ঙ্গ তৈরি করে ফেলল ওরা।

'কিশোর, তুমি একটা জিনিয়াস।' প্রশংসা না করে পারল না মুসা।

'বেশি বাড়িয়ে বলছ,' প্রতিবাদ করল কিশোর। 'যা করেছি, এর জন্যে প্রতিভার দরকার পড়ে না। বাঁচার তাগিদেই মাথায় এসে গিয়েছিল বুদ্ধিটা।'

'কিন্তু আমার মাথায় তো আসেনি...'

'হয়েছে হয়েছে, বেরোও এখন। বেশি নড়াচড়া কোরো না। ওপর থেকে পাথর পড়ে থেঁতলে যেতে পারে মাথা।'

খুব সাবধানে পাঁকাল মাছের মত দেহটাকে মুচড়ে মুচড়ে গর্তের বাইরে বের করে নিয়ে এল মুসা। সামনের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে মাথা ঢোকাতে বলল বন্ধুকে।

বেশি কষ্ট করতে হল না কিশোরকে। হাত ধরে টেনে ওকে গুহার বাইরে বের করে নিয়ে এল মুসা।

ঢাল বেয়ে নিরাপদ জায়গায় সরে এল দু'জনে। নিজেদের দিকে তাকাবার সময় পেল এতক্ষণে।

'সেরেছে! চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'কেউ দেখলে আমাদেরকেই ভূত ঠাউরাবে এখন।'

'ও কিছু না,' বলল কিশোর। 'কোন সার্ভিস স্টেশনে থেমে হাত-মুখ ধুয়ে নিলেই হবে। ভাল করে ঝাড়লে কাপড়েও বালি থাকবে না আর তেমন। এ অবস্থায় দেখা করতে হচ্ছে না মিস্টার ফিসফিসের সঙ্গে!'

'এত কিছুর পরেও দেখা করতে যাচ্ছি আমরা!' অবাক হয়ে বন্ধুর দিকে চাইল মুসা।

'কেন নয়? ওটাই তো আসল কাজ, সেজন্যেই তো বেরিয়েছি। চল চল, দেরি হয়ে যাচ্ছে,' তাড়া দিল কিশোর।

সারা পথে পাথরের ছড়াছড়ি। হাঁটতেই কষ্ট হচ্ছে। এমনিতে যা লাগার কথা

তার দ্বিগুণ সময় লেগে গেল পথটা পেরোতে।

কাছে এসে ভয়ে ভয়ে দুর্গের সদর দরজার দিকে তাকাল মুসা।

'না, আজ আর ঢুকছি না,' বন্ধুকে অভয় দিল কিশোর। 'এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে। মিস্টার ফিসফিসের সঙ্গে দেখা করাটা বেশি জরুরি।'

বাঁক পেরিয়ে এল দু'জনে। গাড়িটা দেখা যাচ্ছে। অস্থিরভাবে পায়চারি করছে হ্যানসন। উদ্বিগ্ন।

কিশোর আর মুসাকে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল শোফার। 'ফিরেছেন তাহলে! খুব ভাবনায় পড়ে গিয়েছিলাম!' দু'জনের সারা গায়ে একবার চোখ বোলাল সে। 'কোন দুর্ঘটনা?'

'তেমন কিছু না,' জবাব দিল কিশোর। 'আচ্ছা, মিনিট চল্লিশেক আগে দুটো ছেলেকে এদিক দিয়ে যেতে দেখেছেন?'

'চল্লিশ মিনিট নয়, তারও বেশি আগে,' গাড়িতে উঠে বসতে বসতে বলল হ্যানসন! 'ক্যাসলের দিক থেকে ছুটে এল দুটো ছেলে। আমাকে দেখেই পাশ কেটে একটা ঝোপের ওপাশে চলে গেল। খানিক পরেই ইঞ্জিনের শব্দ শুনলাম। ঝোপের ওপাশ থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল একটা নীল স্পোর্টস কার।

একে অন্যের দিকে চাইল মুসা আর কিশোর। মাথা ঝোঁকাল দু'জনেই। টেরিয়ারের গাড়িটাও নীল রঙের স্পোর্টস কার।

'তারপর,' আগের কথার খেই ধরল হ্যানসন, 'পাথর গড়িয়ে পড়ার আওয়াজ শুনলাম। অপেক্ষায় রইলাম আপনাদের। দেরি হচ্ছে দেখে ভাবনায়ই পড়ে গিয়েছিলাম। আমার ওপর হুকুম আছে, কিছুতেই যেন গাড়িটাকে চোখের আড়াল না করি। কিন্তু আপনাদের ফিরতে আরেকটু দেরি হলেই হুকুম অমান্য করতাম, না গিয়ে পারতাম না।'

'ছেলে দুটো চলে যাবার পর পাথর গড়ানর আওয়াজ শুনেছেন? ঠিক?' নিশ্চিত হতে চাইছে কিশোর।

'নিশ্চয়,' জবাব দিল হ্যানসন। 'এখন কোথায় যাব, স্যার?'

'আটশো বারো উইণ্ডিং ভ্যালিরোড, যেখানে রওনা হয়েছিলাম,' কেমন আনমনা মনে হল কিশোরকে।

বন্ধুর মনে এখন কিসের ভাবনা চলছে, জানে মুসা। নিশ্চয় ভাবছে, পাথর ধসের আগেই যদি চলে গিয়ে থাকে টেরিয়ার, তাহলে পাথর ঠেলে ফেলল কে? পাশে বসা সঙ্গীর দিকে চাইল সে। নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর, গভীর চিন্তায় মগ্ন।

'শুটকো নয়, তাহলে কে করল কাজটা?' আপনমনেই বিড়বিড় করল কিশোর। 'একটা মানুষকে দেখেছি পাহাড়ের ওপরে, সে-তো মিথ্যে নয়!'

'না, মিথ্যে নয়,' বন্ধুর সঙ্গে একমত হল মুসা। 'এবং ও মানুষই। ভূত-প্রেত

কিছু নয়।'

'ব্যাপারটা একটু অদ্ভুতই।' বাস্তবে ফিরে এল যেন কিশোর। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বলল, 'হ্যানসন, একটা সার্ভিস স্টেশনে একটু রাখবেন। হাত-মুখ ধুতে হবে।'

ঝেড়েঝুড়ে জামাকাপড় যতটা সম্ভব পরিষ্কার করে নিল দুই গোয়েন্দা। হাত-মুখ ধুয়ে চুল আঁচড়ে নিল। তারপর আবার এসে উঠল গাড়িতে।

পাহাড়ী পথ ধরে আবার ছুটে চলল রোলস রয়েস। পাহাড়ের ওপাশে নিচের উপত্যকায় নেমে গেছে পথটা। ডানে মোড় নিয়ে আরও মাইল খানেক এগিয়ে গিয়ে মিশেছে উইণ্ডিং ভ্যালি রোডে।

শুরুতে পথটা বেশ চওড়া, দু'ধারে সুন্দর সুন্দর বাড়িঘর। ধীরে ধীরে সরু হয়ে গেছে, হঠাৎ করেই ঢুকে পড়েছে একটা গিরিপথে। দু'ধারে কোথাও কোথাও খাড়া পাহাড়ের দেয়াল, দু'দিক থেকে চেপে ধরতে চাইছে যেন। অনেক বেশি ঘুরেফিরে এগিয়ে গেছে পথ। হঠাৎ করেই কোন এক পাশের দেয়াল যেন লাফ দিয়ে সরে যাচ্ছে, বেরিয়ে পড়ছে খানিকটা খোলা জায়গা। ছোটখাট একআধটা বাংলোমত বাড়ি উঠেছে ওখানে। তারপরই যেন আবার লাফিয়ে পথের গা ঘেঁষে এসে দাঁড়াচ্ছে পাহাড়। এত বেশি ঘোরপ্যাঁচ বলেই পথটার নাম হয়েছে উইণ্ডিং ভ্যালি রোড।

একটা জায়গায় এসে আবার ওপরের দিকে উঠে চলল পথ, আরও সরু হয়ে আসতে লাগল। কয়েলের মত ঘুরে ঘুরে উঠে যাওয়া পথ হঠাৎ করে এসে শেষ হয়ে গেছে একজায়গায়। তারপরেই গোল একটু সমতল জায়গা পাহাড়ের মাথায়, গাড়ি ঘোরানর জন্যে। তার উল্টোদিকে খাড়া নেমে গেছে দেয়াল, তলায় গভীর খাদ। নিচে কঠিন পাথর। ঘোরানর সময় ড্রাইভার একটু অসতর্ক হলেই তলায় গিয়ে আছড়ে পড়বে গাড়ি।

গোলমত জায়গাটায় এনে গাড়ি থামিয়ে দিল হ্যানসন। জায়গা দেখে অবাকই হয়েছে যেন সে, চেহারাই জানান দিচ্ছে।

'পথের শেষ মাথায় চলে এসেছি!' এদিক ওদিক চেয়ে বলল হ্যানসন। 'কই, কোন বাড়িঘর তো চোখে পড়ছে না।'

'ওই যে, একটা মেলবক্স!' হঠাৎ বলে উঠল মুসা। বাক্সের গায়ের লেখাটা পড়ল, 'প্রাইস আটশো বারো! তার মানে কাছে পিঠেই কোথাও আছে বাড়িটা।'

গাড়ি থেকে নেমে এল দুই গোয়েন্দা। ক্ষতবিক্ষত একটা ঝোপের পাশে কাত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মেলবক্স। ওটার ধার দিয়ে চলে গেছে একটা এবড়োখেবড়ো পাথুরে পথ। জায়গায় জায়গায় ঝোপঝাড়। ওগুলোর মাঝখান দিয়ে সোজা ওপরের দিকে উঠে গেছে পথটা। উঠে চলল দু'জনে। শিগগিরই তাদের অনেক নিচে পড়ে গেল গাড়িটা।

বেশ কয়েকটা ঝোপঝাড় পেরিয়ে এল ওরা। ছোট একটা জংলা মত জায়গা পেরোতেই চোখে পড়ল বাড়িটা। পাহাড়ের ঢালে জোর করে বসিয়ে দেয়া হয়েছে যেন লাল টালির ছাত দেয়া পুরানো টাইপের একটা স্প্যানিশ বাংলো। বাংলোর একপাশে পাহাড়ের গা ঘেঁষে দাঁড় করিয়ে দেয়া হয়েছে এক বিশাল খাঁচা, ছোটখাট ঘরের সমান। ভেতরে পুরে রাখা হয়েছে অসংখ্য কাকাতুয়া। একনাগাড়ে কিচ-কিচ করে যাচ্ছে পাখিগুলো, হুড়োহুড়ি করছে, উড়ছে খাঁচার স্বল্প পরিসরে।

খাচার কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল দুজনে। চেয়ে আছে উজ্জ্বল রঙের পাখিগুলোর দিকে। এই সময় পেছনে শোনা গেল পায়ের আওয়াজ।

প্রায় একই সঙ্গে ঘুরে দাঁড়াল দু'জনে। যে পথে এসেছে ওরা, সেপথেই আসতে দেখল লোকটাকে। লম্বা, পুরো মাথা জুড়ে টাক, বিরাট সানগ্লাসের আড়ালে ঢাকা পড়েছে চোখ। এক কানের নিচ থেকে শুরু হয়েছে গভীর কাটা একটা দাগ, গলা বেয়ে নেমে গেছে নিচের দিকে, বুকের হাড়ের কাছে গিয়ে ঠেকেছে।

কথা বলে উঠল লোকটা। গা ছমছম করা কেমন এক ধরনের ফিসফিসে আওয়াজ। 'খবরদার, যেখানে আছ দাঁড়িয়ে থাক! একচুল নড়বে না কেউ।'

স্থির হয়ে গেল দু'জনেই।

ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে লাগল লোকটা। বাঁ হাতে বাগিয়ে ধরে আছে একটা মাচেটে। রোদ লেগে ঝিলিক দিয়ে উঠছে বিশাল ছুরির তীক্ষ্ণধার ফলা।

নয়

এক পা দু'পা করে এগিয়ে আসছে লোকটা।

'একটু নড়বে না!' ফিসফিসিয়ে উঠল আবার সে। 'প্রাণের ভয় থাকলে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাক!'

মুসার কাছে এই হুঁশিয়ারি অহেতুক। নড়ছে না সে এমনিতেই। হঠাৎ বিদ্যুতের চমক দেখা দিল তার আর কিশোরের মাঝামাঝি। দু'জনের উরুর কাছ দিয়ে উড়ে চলে গেল মাচেটে। ঘ্যাচ করে গিয়ে বিঁধল মাটিতে।

হতাশ গলায় বলে উঠল লোকটা, 'উঁহুঁ, গেল মিস হয়ে!' সানগ্লাস খুলে আনল চোখের ওপর থেকে। নীল আন্তরিক চোখে চেয়ে আছে ছেলেদের দিকে। খানিক আগের মত ভয়াবহ আর লাগছে না এখন তাকে।

'তোমাদের পেছনে ঘাসের ভেতরে ছিল সাপটা,' সাফাই গাইল লোকটা। 'র‍্যাটলার কিনা বুঝতে পারলাম না। বেশি তাড়াহুড়ো করে ফেলেছি, সেজন্যেই ফসকে গেল নেশানা।'

সাদায়-লালে মেশানো একটা রুমাল বের করে ভুরুর কাছের ঘাম মুছল

লোকটা। 'পাহাড়ের ওপাশে ঝোপঝাড় পরিষ্কার করছিলাম। বাজে জিনিস দাবানল ছড়ানর ওস্তাদ। ইস্‌স্‌, ঘেমে নেয়ে গেছি একেবারে। এক গ্লাস করে লেমোনেড খেলে কেমন হয়, অ্যাঁ?'

লোকটার ফিসফিসানিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে ইতিমধ্যে দুই গোয়েন্দা। মুসা আন্দাজ করল, গলার বিচ্ছিরি কাটাটাই ওই স্বর বিকৃতির জন্যে দায়ী।

বাংলোর দিকে হাঁটতে শুরু করল হ্যারি প্রাইস। পিছু পিছু চলল দুই গোয়েন্দা। একটা ঘরে এসে ঢুকল। একপাশে লম্বালম্বি পর্দা ঝোলানো। এপাশে একটা টেবিল ঘিরে কয়েকটা ইজি চেয়ার। টেবিলে বড়সড় একটা জগে বরফ দেয়া লেমোনেড। পর্দার ওপার থেকে ভেসে আসছে কাকাতুয়ার কর্কশ কিচির-মিচির।

'পাখি পুষে, পাখি বিক্রি করেই পেট চালাই আমি,' জগ থেকে তিনটে গ্লাসে লেমোনেড ঢালতে ঢালতে বলল প্রাইস। দুটো গ্লাস তুলে দিল দুই কিশোরের হাতে। 'তোমরা খাও। আমি আসছি, এক মিনিট।' সানগ্লাসটা টেবিলে নামিয়ে রেখে পাশের ঘরে চলে গেল সে।

ধীরে ধীরে লেমোনেডে চুমুক দিতে লাগল কিশোর। চিন্তিত। 'মিস্টার প্রাইসকে দেখে কি মনে হয়?'

'ভালই তো,' জবাব দিল মুসা। 'ফিসফিসানিটাই শুধু খারাপ লাগে। এমনিতে লোকটা মন্দ না।'

'হ্যাঁ, বেশ মিশুক। কিন্তু মিথ্যে কথা বলল কেন? হাত তো দেখলাম পরিষ্কার। ঝোপঝাড় কাটলে কিছু না কিছু লেগে থাকতই।'

'কিন্তু মিথ্যে কথা বলবে কেন? এর আগে কখনও দেখেনি আমাদের। কোন কারণ নেই।'

মাথা নাড়ল কিশোর। 'বুঝতে পারছি না। আরও একটা ব্যাপার। ঝোপ কাটতেই যাক আর যেখানেই যাক, বেশিক্ষণ যায়নি। লেমোনেডে বরফের টুকরো রেখে গিয়েছিল। খুব একটা গলেনি।'

'তাই তো!'

কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল কিশোর, প্রাইসকে ঢুকতে দেখে থেমে গেল।

কাপড় বদলে এসেছে প্রাইস। গায়ে স্পোর্টস শার্ট। গলায় জড়িয়ে নিয়েছে একটা স্কার্ফ।

'কাটা দাগটা দেখলে অনেকেরই অস্বস্তি লাগে,' ফিসফিস করে বলল লোকটা। 'কারও সঙ্গে কথা বলার সময় তাই স্কার্ফ জড়িয়ে নিই। অনেক বছর আগে মালয়ের এক দ্বীপে দুর্ঘটনায় পড়েছিলাম। তখন কেটেছে। সে যাকগে। তা তোমরা এখানে কি মনে করে?'

একটা কার্ড বের করে প্রাইসের দিকে বাড়িয়ে ধরল কিশোর।

হাতে নিয়ে দেখল প্রাইস। 'তিন গোয়েন্দা! বেশ বেশ! তা এখানে কি তদন্ত করতে এসেছ?'

কিশোর জানাল, জন ফিলবির ব্যাপারে কিছু আলোচনা করতে চায়।

সানগ্লাসটা তুলে নিয়ে পরল প্রাইস। 'দিনের আলো সইতে পারি না। রাতে ভাল দেখি।...তো ফিলবির ব্যাপারে হঠাৎ এত আগ্রহ কেন তোমাদের?'

'একটা আজব কথা কানে এসেছে,' বলল কিশোর। 'জন ফিলবি নাকি মরার পরে ভূত হয়ে গেছে। ঠাঁই নিয়েছে ক্যাসলেই। লোককে থাকতে দেয় না। জোর করে কেউ থাকতে চাইলে ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দেয়।'

কালো কাচের ওপাশে চোখ দুটো আবছা। দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। দেখছে কিশোরকে।

'আমিও শুনেছি,' ফিসফিসিয়ে বলল লোকটা। 'ছবিতে ভূতপ্রেত দৈত্য-দানবের অভিনয় করেছে জন। ভয় পাইয়েছে দর্শককে। কিন্তু আসলে সে ছিল খুবই ভদ্র, লাজুক। খালি ফাঁকি দিত তাকে লোকে। ঠকাতো। বাধ্য হয়ে শেষে আমাকে ম্যানেজার রেখেছিল। এই যে, এই ছবিটা দেখ।'

পেছনে টেবিলে রাখা ফ্রেমে বাঁধানো ছবিটা দেখাল প্রাইস। তুলে বাড়িয়ে ধরল কিশোরের দিকে।

হাতে নিল কিশোর। মুসাও দেখল, দু'জন মানুষ দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে। হাত মেলাচ্ছে। একজন প্রাইস। আরেকজন তার চেয়ে বেঁটে, বয়েসও কম। এই ছবিটাই পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল, ফটোকপি করেছে রবিন।

ছবির তলায় লেখাঃ প্রিয় বন্ধু হ্যারিকে। জন।

'ছবি দেখেই আন্দাজ করতে পারছ, কেমন লোক ছিল জন,' বলল প্রাইস। 'লোকের সঙ্গে তর্ক করতে পারত না সে, রাগারাগি করতে পারত না,' কানের নিচে কাটা জায়গায় একবার আঙুল ছোঁয়াল সে। 'আমাকে কেন জানি ভয় পায় লোকে। বেশি গোলমাল করে না। জনের অনুরোধে নিলাম তার ম্যানেজারি। অভিনয়ে আরও বেশি মন দিতে পারল সে। কাজটা শুধু তার পেশাই না, নেশাও ছিল। হলে বসে তার অভিনয় দেখে শিউরে উঠত দর্শক। সবাক চলচ্চিত্রের কদর বাড়ল। দেখা দিল বিপত্তি। ভীষণ চেহারার ভূতের তোতলামিতে লোকে হেসেই খুন। ভেঙে পড়ল জন। তখনকার তার মনের অবস্থা নিশ্চয় বুঝতে পারছ?'

'হ্যাঁ, স্যার,' বলল কিশোর। 'বুঝতে পারছি। আমাকে নিয়ে কেউ হাসাহাসি করলে, আমারও খুব খারপ লাগে।'

'হপ্তার পর হপ্তা পেরিয়ে গেল,' ফিসফিসিয়ে বলে চলল লোকটা। 'ঘর থেকে বেরোয় না জন। একে একে বিদায় করে দিল চাকর-বাকরদের। কি আর করব? ওর বাজার-সদাই আমিই করে দিতে লাগলাম। চারদিক থেকে খবর আসছে তখন। ছবিটার ব্যাপারে। যেখানেই দেখানো হচ্ছে, হাসাহাসি করছে লোকে। অনেক বোঝালাম তাকে। লোকের কথায় কান দিতে মানা করলাম। কিন্তু কোন

কাজ হল না,' থামল প্রাইস।

অপেক্ষা করে রইল দুই গোয়েন্দা।

'তারপর একদিন, আমাকে ডেকে, ছবিটার যে কয়টা প্রিন্ট আছে সব জোগাড় করে নিয়ে আসতে বলল জন। কেউ যেন আর না দেখতে পারে ছবিটা, কেউ যেন আর হাসাহাসি না করতে পারে। বেরোলাম। প্রচুর খরচ-খরচা করে কিনে নিয়ে এলাম সবকটা প্রিন্ট। মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা মারতেই যেন এই সময় এল ব্যাংকের সমন। অনেক টাকা ধার হয়ে গেছে। শোধ না দিতে পারলে ক্যাসলটা দখল করে নেবে ব্যাংক। টাকা-পয়সা জমাত না জন। এক হাতে আয় করত আরেক হাতে খরচ করত। ভেবেছিল, বয়েস কম, খ্যাতি হয়েছে। অনেক সময় আছে টাকা জমানর,' বলে যাচ্ছে প্রাইস। 'একদিন, ক্যাসলের মেইন রুমে বসে আছি দু'জনে আলোচনা হচ্ছে বাড়িটা রাখতে পারবে কিনা সে ব্যাপারে ও বলল, মরে গিয়ে হলেও বাড়িটা দখলে রাখবে সে। তার দেহ পচেগলে শেষ হয়ে যায় যাবে, কিন্তু প্রেতাত্মা বেরোবে না ক্যাসল ছেড়ে।'

চুপ করল প্রাইস। কালো কাচের ওপাশে আবছা চোখের দৃষ্টিতে নির্লিপ্ততা

কেঁপে উঠল একবার মুসা, 'ইয়াল্লা! মরে তাহলে সত্যি সত্যিই ভূত হওয়ার ইচ্ছে ছিল ফিলবির!'

'তাই তো মনে হচ্ছে,' বলল কিশোর। 'আচ্ছা, মিস্টার প্রাইস, ফিলবি তো খুব ভদ্র ছিল। এমন একজন লোকের প্রেতাত্মাও নিশ্চয় ভদ্রই হবে। লোককে সে ভয় দেখাচ্ছে, তাড়িয়ে দিচ্ছে ক্যাসল থেকে, বিশ্বাস হতে চায় না।'

'ঠিকই,' একমত হল প্রাইস। 'আমার মনে হয় জন না, লোককে তাড়াচ্ছে অন্য প্রেতাত্মা। ওগুলো অনেক বেশি পাজী।'

'অন্য…!' ঢোক গিলল মুসা। 'বেশি পাজী!'

'হ্যাঁ। বুঝিয়ে বলছি। তোমরা জান, পাহাড়ের তলায় সাগরের ধারে পাওয়া গেছে জন ফিলবির গাড়ি?'

মাথা ঝোঁকাল দুই কিশোর।

'তাহলে এ-ও জান, একটা নোট রেখে গেছে জন লিখে গেছে, চিরকালের জন্য অভিশপ্ত করে রেখেছে টেরর ক্যাসলকে?'

আবার মাথা ঝোঁকাল দুই গোয়েন্দা। দু'জনেই চেয়ে আছে প্রাইসের মুখের দিকে।

'পুলিশের ধারণা,' বলল প্রাইস। 'ইচ্ছে করেই পাহাড়ের ওপর থেকে গাড়ি নিয়ে পড়েছে জন। আমিও তাদের সঙ্গে একমত। সেই যে সেদিন কথা হয়েছিল ক্যাসলে, তারপর আর কোনদিন ওর সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। আমাকে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছে জন, কোন দিন যেন আর টেরর ক্যাসলে না ঢুকি। হ্যাঁ, কোন কথা থেকে যেন…'

'অন্য প্রেতাত্মার কথা বলছিলেন,' মনে করিয়ে দিল কিশোর। 'খুব খারাপ।'

'হ্যাঁ, খারাপ প্রেতাত্মা,' বলল প্রাইস। 'সারা দুনিয়ার বিখ্যাত সব ভূতুড়ে বাড়ি থেকে মালমশলা জোগাড় করে এনে দুর্গ সাজিয়েছে জন। জাপানের এক ভূতুড়ে মন্দির থেকে এনেছে কাঠ। ভূমিকম্পে ধসে পড়েছিল ওই মন্দির। ভেতরে যে কয়জন লোক ছিল, সব মারা গিয়েছিল ইঁট কাঠ চাপা পড়ে। ইংল্যাণ্ডের এক ধ্বংস হয়ে যাওয়া প্রাসাদ থেকে এসেছে কিছু লোহার বরগা। ওই বরগার একটাতে দড়ি বেঁধে ফাঁসি দিয়ে আত্মহত্যা করেছিল এক সুন্দরী মেয়ে। ধসে পড়ার আগে নাকি প্রায় রাতেই মেয়েটার প্রেতাত্মা ঘুরে বেড়াতে দেখা যেত প্রাসাদের ছাতে। রাইন নদীর ধারের এক পোড়ো দুর্গের পাথর কিনে এনে লাগানো হয়েছে টেরর ক্যাসলে। ওই দুর্গের ভাঁড়ারে নাকি আটকে রাখা হয়েছিল এক পাগলা বাদককে। আটকে থেকে না খেয়ে মরে গেছে লোকটা। তারপর থেকেই গভীর রাতে দুর্গের ভেতর থেকে ভেসে আসত মিষ্টি হালকা বাজনা।'

'খাইছে!' চোখ বড় বড় হয়ে গেছে মুসার। 'দে.-বিদেশের কুখ্যাত সব ভূতকে এনে টেরর ক্যাসলে তুলেছে জন। ওরা তো লোককে ভয় দেখিয়ে তাড়াবেই। গলা টিপে আজও মারেনি কাউকে, এটাই আশ্চর্য!'

'কেউ গিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি করলে হয়ত মারবে,' ফিসফিসিয়ে বলল প্রাইস। 'তবে আমি যা জানি, কেউ যায় না টেররর ক্যাসলের ধারেকাছে। চোর-ডাকাত ভবঘুরেরা পর্যন্ত এড়িয়ে চলে। মাসে একবার করে ওদিক থেকে ঘুরে আসি আমি। পুরানো বন্ধুকে মনে রাখি। কোন বারই কাউকে ক্যাসলের কাছেপিঠে দেখিনি।'

ওরা ক্যাসলে গিয়েছিল, বলল না কিশোর। 'আচ্ছা, অনেক কাহিনীই তো শোনা যায় ক্যাসলের ভূত সম্পর্কে। গভীর রাতে নাকি পাইপ অর্গান বাজে, নীল ভূত দেখা যায়। কতখানি সত্যি, বলতে পারেন?'

'আমিও শুনেছি ওসব কিচ্ছা। বাজনা শুনিনি কখনও, কোন ভূতকে দেখিনি। তবে জন বলত, প্রোজেকশন রুম থেকে গভীর রাতে নাকি ভেসে এসেছে বাজনা। কয়েকবার এই ঘটনা ঘটে যাবার পর একদিন অর্গানের ইলেকট্রিক কানেকশন কেটে রাখল। বন্ধ করে রাখল প্রোজেকশন রুমের দরজা। কিন্তু লাভ হল না কিছু। সে-রাতেও ঠিক শোনা গেল সেই বাজনা।'

ঢোক গিলল মুসা।

চশমা খুলে নিল প্রাইস। দুই কিশোরের দিকে চেয়ে চোখ মিটমিট করছে। 'টেরর ক্যাসলে ভূত আছে কি নেই, জানি না আমি,' ফিসফিস করে বলল সে। 'তবে, আমাকে ঢুকতে বললে ঢুকব না। রাতে ক্যাসলের দরজার ওপাশেই যাব না। লক্ষ-কোটি টাকা দিলেও না।'

দশ

'কিশোর!' ডাক শোনা গেল মেরিচাচীর। 'এদিকে আয়। রডগুলো বেড়ার ধার ঘেঁষে তুলে রাখবি? মুসা...রবিন, তোমরা একটু সাহায্য কর বন্ধুকে

কড়া রোদ। ইয়ার্ডে ব্যস্ততা। রবিনের পা ভাঙা, ভারি কাজ তার পক্ষে সম্ভব না। উল্টে রাখা পুরানো একটা বাথটাবে আরাম করে বসে রডের হিসেব রাখছে সে। গত দু'দিন ধরেই খুব কাজ হচ্ছে ইয়ার্ডে। কবে আবার হেডকোয়ার্টারে আলোচনায় বসতে পারে তিনজন কে জানে! মিস্টার ফিসফিসের সঙ্গে দেখা করে আসার পর আর এগোয়নি তদন্ত। আসলে সময়ই পায়নি। ইয়ার্ডে ব্যস্ত থেকেছে কিশোর। মুসার বাড়িতে কি কাজ ছিল, সারতে হয়েছে। লাইব্রেরিতে রবিনেরও কাজের চাপ পড়েছিল বেশ।

গত দু'দিন খুব কম সময়ই বাড়িতে থাকতে পেরেছেন রাশেদ চাচা। বড়সড় একটা নিলাম হচ্ছে এক জায়গায়। ওখানে মাল কিনতে ব্যস্ত তিনি। ট্রাক বোঝাই হয়ে কেবলই মালের পর মাল এসে জমা হচ্ছে ইয়ার্ডে। কবে যে শেষ হবে, কে জানে!

একটানা কাজ করে গেল ওরা খুশিমনেই। মেরিচাচীর কাজ করে দিতে দ্বিধা নেই তিন গোয়েন্দার। প্রচুর চুইংগাম কিংবা টফির লোভ আছে। সঙ্গে আছে মেরিচাচীর হাতে তৈরি কেক। বয়ে বয়ে বেড়ার কাছে নিয়ে রড জমা করছে মুসা আর কিশোর। বাথটাবে বসে ওগুলোর হিসেব রাখছে রবিন। দুপুরের দিকে ফুরসত মিলল কিছুক্ষণের জন্য। বড় ট্রাকটা দেখা গেল ইয়ার্ডের গেটে। রাশেদ চাচা এসেছেন। ছোটখাট হালকা পাতলা মানুষ, ঈগলের মত বাঁকানো বিরাট নাকের তলায় পেল্লাই গোঁফ। ট্রাক বোঝাই মালপত্রের স্তূপের ওপর একটা পুরানো ধাঁচের চেয়ারে বসে আছেন রাজকীয় ভঙ্গিতে।

পুরানো জিনিস কিনতে গেলে, যা যা চোখে পড়ে কিছুই ফেলে আসেন না রাশেদ চাচা। কাজে লাগবে কি লাগবে না, বিক্রি হবে কিনা, ওসব নিয়ে মাথা ঘামান না। কিনে নিয়ে আসেন। পরে দেখা যাবে কি করা যায়।

ইয়ার্ডের চত্বরে এসে থামল ট্রাক। মালের দিকে একবার চেয়েই স্বামীর উদ্দেশ্যে বলে উঠলেন মেরিচাচী, 'তুমি...তুমি পাগল হয়ে গেছ! ওটা এনেছ কেন?'

পায়ে পায়ে চাচীর কাছে এসে দাঁড়িয়েছে তিন কিশোর। দাঁতের ফাঁক থেকে পাইপটা নিয়ে ওদের দিকে একবার দোলালেন রাশেদ চাচা। হাসলেন।

অবাক চোখে এক গাদা ধাতব পাইপের দিকে চেয়ে আছে তিন কিশোর। আট ফুট উঁচু একটা পাইপ অর্গান।

'অর্গানটা কিনেই ফেললাম, মেরি,' গলা খুব ভারি রাশেদ চাচার। 'বোরিস···রোভার ধর তো। নামিয়ে ফেলি। খুব সাবধানে নামাতে হবে। ভেঙে-টেঙে ফেল না আবার ।'

লাফ দিয়ে মাটিতে নেমে এলেন রাশেদ চাচা। অর্গানটা নামাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল বোরিস আর রোভার।

'পাইপ অর্গান···,' কথা আটকে গেল মেরিচাচীর। 'যেশাস! পাগল হয়ে গেছে লোকটা!···অর্গান···পাইপ-অর্গান দিয়ে কি হবে!'

নাক-মুখ দিয়ে গলগল করে ধোঁয়া ছাড়লেন রাশেদ চাচা। রসিকতা করলেন, 'বাজানো শিখব। পার্ট টাইম চাকরি করা যাবে সার্কাসে।' হাসলেন তিনি। হাত লাগালেন বোরিস আর রোভারের সঙ্গে।

বোরিস আর রোভার দুই ভাই। বাভারিয়ার লোক। দু'জনেই ছয় ফুট চার ইঞ্চি লম্বা, সেই অনুপাতে চওড়া। মাথার চুল সোনালি। গায়ে মোষের জোর। সহজেই ধরে ধরে নামিয়ে আনছে ভারি পাইপগুলো।

শোবার ঘরের কাছে বেড়ার ধারে অর্গানটা বসানর সিদ্ধান্ত নিলেন রাশেদ চাচা। ওখানেই নিয়ে গাদা করে রাখা হল অর্গানের পাইপ আর অন্যান্য যন্ত্রপাতি। পরে জুড়ে দেয়া হবে।

খুব ভাল জিনিস,' তিন কিশোরকে বললেন রাশেদ চাচা। 'লস আঞ্জেলেসের পুরানো এক থিয়েটার হাউজ থেকে এনেছি।'

'খুব ভাল করেছ!' গোমরা মুখে বললেন মেরিচাচী। 'কপাল ভাল, কাছেপিঠে প্রতিবেশী নেই।' কাজ করতে চলে গেলেন তিনি।

'অনেক বড় অডিটোরিয়ামের জন্যে তৈরি হয়েছিল অর্গানটা,' ছেলেদেরকে বললেন রাশেদ চাচা। 'জোরে বাজালে কানের পর্দা ফেটে যাবে মানুষের। চাইলে খুব নিচুতে নিয়ে আসা যায় এর শব্দ। এতই নিচু, মানুষের কানেই ঢোকে না সে-আওয়াজ।'

'না-ই যদি শোনা গেল, ওটা আবার শব্দ হল নাকি?' চাচার দিকে চেয়ে বলল কিশোর।

'মানুষের কানে ঢোকে না, সার্কাসের হাতির কানে ঢুকবে,' মুচকে হাসলেন রাশেদ চাচা। চলে গেলেন সেখান থেকে।

'কান তো সবারই এক,' বলল মুসা। 'মানুষের কানে না ঢুকলে হাতির কানে ঢুকবে নাকি?'

'ঢুকতেও পারে,' জবাবটা দিল রবিন। 'কুকুরের হুইসেলের নাম শোনোনি? মানুষের কানে ঢোকে না, কিন্তু কুকুর ঠিকই শুনতে পায় ওই বাঁশির আওয়াজ।'

'সাবসোনিক,' যোগ করল কিশোর। 'বিলো সাউণ্ডও বলে একে। ভাইব্রেশন বেশি না হলে মানুষের কানে ঢোকে না শব্দ। একটা বিশেষ রেঞ্জের কাঁপন হলে

ভবেই শুনতে পায় মানুষ।'

পাইপ অর্গান আর শব্দ-রহস্য নিয়ে এতই মগ্ন ওরা, গেটের কাছে দাঁড়াল এসে নীল স্পোর্টস কারটা, খেয়ালই করল না। ড্রাইভার—টিং-টিঙে রোগাটে শরীর, লম্বা এক তরুণ। জোরে হর্ন বাজাল।

চমকে ফিরে চাইল তিন কিশোর।

তিন গোয়েন্দাকে চমকে দিতে পেরে খুব মজা পেল যেন গাড়ির আরোহীরা। জোরে হেসে উঠল ড্রাইভার আর তার দুই সঙ্গী।

'শুটকো টেরি!' লম্বা তরুণকে ড্রাইভিং সিট থেকে নেমে আসতে দেখে বলে উঠল মুসা।

'ওর এখানে কি?' বিড় বিড় করল রবিন।

বছরের একটা বিশেষ অংশ রকি বীচে কাটাতে আসে ডয়েল পরিবার, সারা বছর থাকে না। কিন্তু ওই কয়েকটা মাসই যথেষ্ট। জ্বালিয়ে মারে কিশোর, মুসা আর রবিনকে। খালি পেছনে লেগে থাকে।

নিজের বুদ্ধির ওপর অগাধ আস্থা টেরিয়ার ডয়েলের, অন্য কেউ সেটা মানল কি মানল না, তা নিয়ে মাথা ঘামায় না। নিজের গাড়ি নিজেই ড্রাইভ করে। বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়ায়। কিশোর বয়েসী ছেলেছোকরাদেরকে অধীনে রাখার চেষ্টা করে। রকি বীচের বেশির ভাগ ছেলেমেয়েই পাত্তা দেয় না তাকে, এড়িয়ে চলে। তবে বখে যাওয়া কিছু ছেলেকে দলে টানতে পেরেছে টেরিয়ার। প্রায়ই পার্টি দেয়, ওদেরকে দাওয়াত করে। তার গাড়িতে তুলে ঘোরায় সারা শহর। দরাজ হাতে খরচ করে।

এগিয়ে আসছে টেরিয়ার। হাতে একটা জুতোর বাক্স। গাড়িতে বসা দুই সঙ্গীর চোখ তার ওপর। তিন গোয়েন্দাও দেখছে তাকে। কাছাকাছি এসেই পকেটে হাত ঢোকাল সে। ঝটকা দিয়ে বের করে আনল আবার। হাতে একটা ম্যাগনিফাইং গ্লাস। রাশেদ চাচা আর দুই বাভারিয়ান ভাইয়ের দিকে তাকাল। পাইপ অর্গানটা নিয়ে ব্যস্ত তারা। এখান থেকে তার কথা শুনতে পাবে না। বিশেষ কায়দায় ভুরু কুঁচকাল সে। গুরুগম্ভীর একটা ভাব ফুটিয়ে তুলল চেহারায়। ম্যাগনিফাইং গ্লাসের ভেতর দিয়ে পুরো ইয়ার্ডে চোখ বোলাল একবার। 'ভুল জায়গায় এসে পড়লাম না তো!'

টেরিয়ারের অভিনয়ে খুব মজা পেল তার দুই সঙ্গী, হেসে উঠল হো হো করে।

হাত মুঠো হয়ে গেল মুসার। এক পা সামনে বাড়াল। 'কি চাই এখানে, শুটকি?'

মুসার কথা যেন শুনতেই পেল না টেরিয়ার। ম্যাগনিফাইং গ্লাসের ভেতর দিয়ে তাকাল কিশোরের দিকে। অনেক কষ্টে যেন চিনতে পারল। গ্লাসটা আবার ভরে রাখল পকেটে। 'এই যে কিশোর হোমস, পৃথিবী বিখ্যাত গোয়েন্দা। দেখা করতে

পেরে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি। একটা কেস নিয়ে এসেছি আপনার কাছে, স্যার। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডও বিমূঢ় হয়ে গেছে, কোন সুরাহা করতে পারেনি কেসটা। শেষ পর্যন্ত আপনার শরণাপন্ন হতে হল। নির্দয়ভাবে খুন করা হয়েছে বেচারাকে। আশা করি এই জটিল রহস্যের সমাধান করতে পারবেন।' বাক্সটা বাড়িয়ে ধরল সে।

টেরিয়ারের বলার ভঙ্গিতে হেসে লুটোপুটি খেতে লাগল তার দুই বন্ধু।

বিচ্ছিরি গন্ধ আসছে বাক্সের ভেতর থেকে। কি আছে, আন্দাজ করতে পারল তিন গোয়েন্দা। হাত বাড়িয়ে বাক্সটা নিল কিশোর। ডালা খোলার আগে একবার চাইল টেরিয়ারের দিকে।

হাসছে টেরিয়ার। অপেক্ষা করছে।

ডালা খুলল কিশোর। নাকে এসে যেন বাড়ি মারল পচা গন্ধ। বিরাট এক সাদা ইঁদুর, পচে ফুলে ঢোল হয়ে আছে।

'কি মনে হয়, মিস্টার হোমস?' সামান্য সামনে ঝুঁকে এল টেরিয়ার। 'ভয়াবহ এই খুনের কিনারা করতে পারবেন? আসামীকে ধরতে পারলে বড় পুরস্কার পাবেন। পঞ্চাশটা স্ট্যাম্প।'

হাসির রোল উঠেছে গাড়িতে।

আড়চোখে সেদিকে একবার চাইল কিশোর। চেহারায় কোন পরিবর্তন হল না। গম্ভীর চোখ মুখ, আস্তে করে মাথা ঝোঁকাল। গাড়িতে বসা টেরিয়ারের দুই বন্ধুকে শুনিয়ে জোরে জোরে বলল, 'আপনার মনের অবস্থা আমরা বুঝতে পারছি, মিস্টার শুটকি। খুবই দুঃখ পেয়েছেন। পাবেনই তো? হাজার হোক, নিহত জীবটা আপনার খুব প্রিয় বন্ধু ছিল।'

হঠাৎ থেমে গেল হাসির শব্দ সতর্ক হয়ে উঠেছে গাড়িতে বসা ছেলে দুটো। চোখ মুখ লাল হয়ে উঠেছে টেরিয়ারের।

'বেচারার মৃত্যুর কারণ অনুমান করতে পারছি,' আবার বলল কিশোর। 'বদহজম। খইল খেয়েছিল এক গরু বন্ধুর সঙ্গে, একই গামলায়। গরুটার নামের আদ্যাক্ষর দুটো জানি। টি ডি। ভুরিভোজনের পরই হয়ত টেরর ক্যাসলে গিয়েছিল, ভূতের তাড়া খেয়ে প্যান্ট নষ্ট করতে করতে ফিরেছে।'

'নিজেকে খুব চালাক মনে কর, না?' হিসিয়ে উঠল টেরিয়ার।

'বিশ্বাস হচ্ছে না? দাঁড়াও, দেখাচ্ছি,' বলেই ঘুরল কিশোর। একছুটে গিয়ে ঢুকল ঘরে। কয়েক মুহূর্ত পরেই বেরিয়ে এল।

'এই যে, আদ্যাক্ষর খোদাই করা আছে এটাতে,' টর্চটা টেরিয়ারের দিকে বাড়িয়ে ধরে বলল কিশোর। 'আগে একটা এস থাকলেই তোমার পুরো নাম হয়ে যেত। শুটকি টেরিয়ার ডয়েল।'

হা হা করে হেসে উঠল মুসা। 'টর্চটা শুটকিকে দিয়েই দাও না, কিশোর

একটা এস বসিয়ে নেবে।'

থাবা মেরে কিশোরের হাত থেকে টর্চটা নিয়ে নিল টেরিয়ার। ঘুরে দাঁড়াল। গটমট করে হেঁটে চলে গেল গাড়ির কাছে। ড্রাইভিং সিটে উঠে বসে ফিরে চাইল। 'আহাহা, তিন গোয়েন্দা! শুনলেই হাসি পায়! শহরের ছেলেদের কারই জানতে বাকি নেই ভড়ঙের কথা। কেউ হাসি ঠেকাতে পারছে না।'

জবাবে তালে তালে হাততালি দিতে লাগল কিশোর, মুসা আর রবিন।

আরও খেপে গেল টেরিয়ার। রাগে ভাষা হারিয়ে ফেলল। ঝাল মেটাল গাড়িটার ওপর। বন বন করে ঘুরে উঠল স্টিয়ারিং। কর্কশ আর্তনাদ উঠল টায়ারের। ঘুরে গেল নীল স্পোর্টস কারের নাক। জোর এক ঝাঁকুনি খেয়েই লাফ দিল সামনে। তীব্র গতিতে ছুটে চলে গেল।

'লাইব্রেরিতে আমার কার্ড ও-ব্যাটাই চুরি করেছে,' কথা বলল রবিন। 'আমরা কাজে নেমেছি, জেনে গেছে ব্যাটা।'

'জানুক। লোককে জানাতেই তো চাই আমরা,' বলল কিশোর। 'তবে, কাজটা আরও জরুরি হয়ে পড়ল আমাদের জন্যে। প্রথম কেসে ফেল করা চলবে না কিছুতেই।'

পেছনে ফিরে চাইল একবার কিশোর। পাইপ অর্গান নিয়ে ব্যস্ত এখন রাশেদ চাচা, বোরিস আর রোভার। চাচীকে দেখা যাচ্ছে না। নিশ্চয় টেবিলে খাবার সাজাতে গেছেন।

'একটু সময় পাওয়া গেল,' বলল কিশোর। 'চল, লাঞ্চের ডাক পড়ার আগেই মীটিং শেষ করে ফেলি।'

দুই সুড়ঙ্গের দিকে এগিয়ে চলল তিন গোয়েন্দা।

তাড়াহুড়ো করে এগোতে গিয়ে অঘটন ঘটাল কিশোর। মাটিতে পড়ে থাকা একটা আলগা পাইপে পা দিয়ে বসল। গড়িয়ে চলে গেল পাইপ। তাল সামলাতে না পেরে বেকায়দা ভঙ্গিতে পড়ে গেল সে।

তাড়াতাড়ি দু'দিক থেকে গোয়েন্দা প্রধানকে তুলে বসাল রবিন আর মুসা।

প্রচণ্ড ব্যথায় দাঁতে দাঁত চেপে আছে কিশোর। 'আমার পা!...ভেঙেই গেছে বোধহয়!' গুঙিয়ে উঠল সে। 'উফফ্, এই যে, এখানে!'

দেখা গেল, ইতিমধ্যেই ফুলে উঠতে শুরু করেছে ডান পায়ের গোড়ালির ওপরের গাঁট।

'ভীষণ ব্যথা!' বিকৃত হয়ে গেছে কিশোরের মুখ। 'উফফ্, বোধহয় ডাক্তারই ডাকতে হবে!'

এগারো

দুই দিন পর।

বিছানায় পড়ে আছে কিশোর। সেদিন, সঙ্গে সঙ্গে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সারাদিন আটকে রাখলেন ডাক্তার। পায়ের এক্সরে করলেন। তারপর কি একটা তরল পাদার্থে পা ভিজিয়ে রাখতে দিলেন। বিকেলের দিকে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছে সে।

ডাক্তার অভয় দিয়েছেন, শিগগিরই আবার দৌড়াতে পারবে কিশোর। সারাদিন বিছানায় পড়ে না থেকে একটু একটু হাঁটাচলা করতেও বলেছেন।

ওঠার চেষ্টা করে কিশোর, পারে না। একটু নড়াচড়া করলেই প্রচণ্ড যন্ত্রণা শুরু হয়।

মনে স্বস্তি নেই গোয়েন্দা প্রধানের। দেরি হয়ে যাচ্ছে। নিশ্চয় আর অপেক্ষা করবেন না মিস্টার ডেভিস ক্রিস্টোফার। হয়ত ইতিমধ্যেই একটা ভূতুড়ে বাড়ি ঠিক করে ফেলেছেন তিনি।

কাজে নামতে না নামতেই এই অঘটন। এর চেয়ে বড় অস্বস্তিকর কারণ আর কি হতে পারে তিন গোয়েন্দার জন্যে?

কিশোরের বিছানার পাশে মলিন মুখে বসে আছে মুসা আর রবিন।

'এখনও ব্যথা করে?' জানতে চাইল মুসা।

'করে,' বলল কিশোর। 'আক্কেল হয়েছে আমার। এত অসাবধান কেন হলাম? পা-টা যে ভাঙেনি এই যথেষ্ট। যাক গে। এখন আসল কথায় আসছি। ওই টেলিফোন কল,, ওটার তো কোন সুরাহা হল না। হ্যানসনের সঙ্গে আলাপ করেছি। ও জানিয়েছে, সে রাতে টেরর ক্যাসল থেকে ফেরার পথেও নাকি কে অনুসরণ করেছিল আমাদেরকে। শুটকি হতে পারে।'

'সহজেই পারে,' সায় দিল রবিন। 'ওই ব্যাটা জানে, টেরর ক্যাসলের ব্যাপারে আমরা কৌতূহলী।'

'আমার বিশ্বাস হয় না,' এদিক ওদিক মাথা নাড়ল মুসা। 'গলার স্বর এভাবে বদলে ফেলার ক্ষমতা ওই ব্যাটার নেই। অন্য কেউ করেছে। মানুষ হয়ে থাকলে, মস্তবড় অভিনেতা ওই লোক।'

'ঠিক,' বলল কিশোর। 'তবে সবই অনুমান।' একটু থেমে বলল, 'নিজের চোখে না দেখলে, ভূতে ফোন করেছে এটা মোটেই বিশ্বাস করব না আমি।'

'তা না হয় হল,' অনিশ্চিত রবিনের গলা। 'ধরে নিলাম ভূতে করেনি ফোন। কিন্তু তোমাদের ওপর পাথর ফেলল কে?'

'ঠিক,' রবিনের কথায় জোর পেল মুসা। 'পাথর ফেলল কে?'

'আপাতত ওটা নিয়ে ভাবছি না,' বলল কিশোর! 'তবে আমার ধারণা, ভূত নয়। শুটকিও না! এর পেছনে অন্য কেউ রয়েছে।'

'কে?' জানতে চাইল মুসা।

'জানলে তো বলতামই। আরও কিছু ঘটনা না ঘটলে জানা যাবে না। হ্যারি

প্রাইসের কথায় আসা যাক। কেন মিছে কথা বলল লোকটা? ঝোপ কাটছিল না, তবু কেন বলল কাটছিল? লেমোনেডের কথাই ধর। সাজিয়েই রেখেছিল টেবিলে। ফ্রিজ থেকে বরফও বের করে রেখে ছিল। যেন জানত, আমরা যাব। অবাক লাগছে না?'

কয়েক মুহূর্ত নীরবতা।

মাথা চুলকাল মুসা। বিড়বিড় করল, 'খালি প্যাঁচ। বাড়ছেই! সুরাহা হবার কোন লক্ষণই দেখছি না!'

ঠিক এই সময় ঘরে এসে ঢুকলেন মেরিচাচী। কাছে এসে দাঁড়ালেন। 'এখন কেমন লাগছে রে?'

'ভাল,' দায়সারা জবাব দিল কিশোর। তাদের আলোচনায় বাধা পড়েছে। চাইছে, মেরিচাচী চলে যাক এখন।

গেলেন না চাচী। বিছানার পাশে বসে কিশোরের আহত জায়গায় হাত রাখলেন। 'ব্যথা লাগে এখনও?'

'না।'

হেসে ফেললেন চাচী। 'আমাকে তাড়াতে চাইছিস, না?'

'না, ইয়ে...মানে...,' ধরা পড়ে গিয়ে আমতা আমতা করতে লাগল কিশোর।

'একটা কথা জানাতে এসেছি, বললেন চাচী। 'আরও আগেই বলতাম। কিন্তু ভুলে গিয়েছিলাম। ইস্স্, কি ভাবনায়ই না ফেলে দিয়েছিলি!' বাবা-মা হারা ছেলেটার জন্যে ভাবনার অন্ত নেই তাঁর।

'চাচী, কি বলবে, বলে ফেল না?' তাড়া দিল কিশোর।

'গতকাল সকালে এক বুড়ি এসেছিল। তুই তখন ঘুমিয়েছিলি। সে এক আজব বুড়ি!'

'আজব বুড়ি,' সতর্ক হয়ে উঠল কিশোর।

চাচীর কথায় আগ্রহী হয়ে উঠেছে মুসা আর রবিনও।

'এক জিপসি বুড়ি।'

জিপসি বুড়ি! পিঠ সোজা হয়ে গেছে মুসা আর রবিনের। কিশোরও বালিশে পিঠ রেখে আধশোয়া হল। ব্যথা ভুলে গেছে। 'তারপর?'

'দরজায় টোকা দিল বুড়ি। খুললাম। ভেতরে ডাকব কি ডাকব না ভাবছি, এই সময়ই তোর নাম বলল সে। পা মচকানর কথা বলল। ভবিষ্যৎদ্বাণী করলঃ সাবধান না হলে আরও বড় বিপদ হবে তোর। এর আগে কখনও দেখিনি ওকে। তোর নাম জানল কি করে, পা মচকানর খবর পেল কোথায়, ঈশ্বরই জানে!'

সাবধান হতে বলেছে! এক জিপসি বুড়ি। একে অন্যের দিকে চাইছে তিন গোয়েন্দা।

'ভেতরে ডাকলাম বুড়িকে,' আবার বললেন মেরিচাচী। 'এল। বসল। ঝোলার

ভেতর থেকে কয়েকটা তাস বের করল। বুঝলাম, তাসের ম্যাজিক জানে বুড়িটা। তাস চালাচালি করে লোকের ভবিষ্যৎ জানতে পারে। এসবে কোনদিনই বিশ্বাস নেই আমার। কিন্তু বুড়িটা যেভাবে বলল, অবিশ্বাসও করতে পারলাম না। তিনবার তাস চালল সে তোর নাম করে। তিন বারে তিনটে কথা বললঃ টি সি থেকে দূরে থাকতে হবে তোকে। পা মচকানর পেছনে টি সি রয়েছে। এরপরও যদি টি সি-কে এড়িয়ে না চলিস, আরও বিপদ হবে তোর।'

'তুমি কিছু বললে না?'

'কি আর বলব? হেসে উড়িয়ে দিয়েছি বুড়ির কথা। একটু যেন ক্ষুণ্ন হল সে। ঝোলার ভেতরে তাসগুলো ভরে উঠে চলে গেল। কিছু একটা দেখেছি ওর চোখে, খটকা লেগেছে মনে।...কিশোর, বাপ, একটু সাবধানে থাকিস তুই! কি জানি, কিছু ঘটেও যেতে পারে।' উঠলেন চাচী। 'তোরা কথা বল। আমি যাই। কাজ পড়ে আছে ওদিকে।'

বেরিয়ে গেলেন মেরি চাচী। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ। নিচে নেমে যাচ্ছেন তিনি।

চাচী বেরিয়ে যাবার পরও অনেকক্ষণ কোন কথা বলতে পারল না তিন গোয়েন্দা। একে অন্যের দিকে চেয়ে রইল।

'টি সি...' অবশেষে কথা ফুটল রবিনের মুখে। শুকনো গলা। 'মানে, টেরর ক্যাসল।'

'শুটকির কাজও হতে পারে,' বলল কিশোর। সামান্য ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে তার চেহারা। 'সে-ই হয়ত পাঠিয়েছে বুড়িকে। কিন্তু টেরির এত বুদ্ধি, নাহ্! বিশ্বাস হচ্ছে না! মরা ইঁদুর এনে ইয়ার্কি মারা পর্যন্তই তার দৌড়।'

'কেউ...,' বলল মুসা। 'মানে, কিছু একটা চায় না, আমরা টেরর ক্যাসলে যাই। প্রথমে ফোনে হুঁশিয়ার করেছে। তারপর জিপসি বুড়ির ওপর ভর করে তাকে হাঁটিয়ে এনেছে ইয়ার্ডে। তার মুখ দিয়ে নিজে কথা বলেছে।' দুই সঙ্গীর দিকে চাইল সে। কেউ কিছু বলল না। মৌনতা সম্মতির লক্ষণ ধরে নিয়ে বলল, 'এরপর থেকে টেরর ক্যাসলের ধারেকাছে যাওয়াও আর উচিত না আমাদের। কি বল, রবিন?'

'ঠিক।'

'কিশোর?'

'ঠিক বেঠিক জানি না, তবে আবার যেতে হবে টেরর ক্যাসলে,' বলল গোয়েন্দাপ্রধান। 'লোক হাসাতে চাও? শুটকি কি বলে গেছে, মনে নেই? ভয় পেয়ে এখন পিছিয়ে গেলে থু থু দেবে সে আমাদের মুখে। সারা রকি বীচে আমাদের গোয়েন্দাগিরির খবর রটিয়ে দিয়েছে। প্রথম কেসেই ফেল করলে মুখ টিপে হাসবে সবাই আমাদের দেখলে। পিছিয়ে আসার আর উপায় নেই। এগিয়ে যেতেই হবে।'

চুপ করে রইল দুই সহকারী।

'তাছাড়া,' আবার বলল কিশোর, 'জিপসি বুড়ি এসে নতুন আরেক রহস্য যোগ করে দিয়ে গেল। বুঝতে পারছি, ঠিক পথেই এগোচ্ছি আমরা।'

'মানে?' জানতে চাইল মুসা।

'এর আগে অনেকেই ঢুকেছে টেরর ক্যাসলে। এর রহস্য ভেদ করতে চেয়েছে। কাউকেই হুঁশিয়ার করা হয়নি আমাদের মত। এর একটাই মানে। ঠিক পথেই এগোচ্ছি আমরা। টেরর ক্যাসলের আজব রহস্য ভেদ করে ফেলি, চায় না কেউ একজন।'

'বেশ, ধরে নিলাম তোমার কথাই ঠিক,' বলল মুসা। 'তাহলেও আর এগুতে পারছি না আমরা। তুমি পড়ে আছ বিছানায়। তোমার পা ভাল না হলে কাজে নামতে পারছি না আর।'

'ভুল বললে,' বলল কিশোর। 'বিছানায় শুয়ে আছি বটে, ব্রেনটা অকেজো হয়ে যায়নি, বরং ঠাণ্ডা মাথায় ভাবার সুযোগ পেয়েছি বেশি, আমি না হয় না-ই যেতে পারলাম, তোমরা যাও, আরেকবার ঘুরে এস ক্যাসল থেকে।'

'আমরা যাব!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল রবিন 'মোটেই না। টেরর ক্যাসলের ওপর বড়জোর লেখাপড়া চালিয়ে যেতে পারি আমি। তার বেশি কিচ্ছু করতে পারব না।'

'খুব বেশি কিছু করতে হবেও না তোমাদেরকে,' সহজ গলায় বলল কিশোর। 'একটা ব্যাপারে শুধু শিওর হয়ে আসতে হবে। অস্বস্তি বেড়ে আতঙ্কে রূপ নেয় কিনা জানতে হবে, আর সে আতঙ্ক কতখানি তীব্র, তাও বুঝে আসতে হবে।'

'কতখানি তীব্র!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা। এখনও বোঝার বাকি আছে নাকি? আতঙ্কে হার্টফেল করতে বসেছিলাম গত বার, মনে নেই?'

'সেজন্যেই রবিনকে যেতে বলছি এবার সঙ্গে,' বলল কিশোর। 'ওরও একই অবস্থা হয় কিনা, জানা দরকার। আরেকটা ব্যাপার। অবস্থাটা কতক্ষণ স্থায়ী হয়, জেনে আসতে হবে। মানে, ক্যাসলের বাইরে ঠিক কতদূরে এলে পরে ওই আতঙ্ক চলে যায়, বুঝতে হবে।'

'এর আগের বারে ছিল পনেরো মাইল,' জবাব দিল মুসা। 'বাড়িতে গিয়ে নিজের বিছানায় শোয়ার পর তবে গেছে।'

'এবারে গিয়ে শিওর হয়ে নাও, সত্যিই পনেরো মাইল কিনা,' শান্ত গলা কিশোরের। 'আগের বারের মত পড়িমড়ি করে ছুটবে না। আস্তে আস্তে পিছিয়ে আসবে, ক্যাসলের বাইরে বেরোবে, পথে নামবে। খানিক পর পরই থেমে বোঝার চেষ্টা করবে, আতঙ্ক চলে গেছে কিনা।'

'আস্তে আস্তে,' শুকনো হাসি হাসল মুসা। 'আবার থামবও খানিক পর পর।'

'হয়ত আতঙ্কিতই হবে না,' বলল কিশোর। 'কারণ এবারে দিনে যাচ্ছ। দিনের আলো থাকতে থাকতেই পরীক্ষা করবে ক্যাসলের ঘরগুলো। সাহসে কুলালে

রাত নামার পরেও অপেক্ষা কোরো একটু। হ্যাঁ, আগামীকাল বিকেলেই যাচ্ছ তোমরা।'

'কি?' রবিনের দিকে চেয়ে বলল মুসা। 'যাবে তো?'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল রবিন। 'আগামীকাল হলে আমি পারছি না। লাইব্রেরিতে কাজ আছে। পরশু এবং তার পরদিনও পারব না।'

'আগামী দু'তিন দিন আমারও কাজ আছে,' বলল মুসা। 'বাড়িতে। আমিও যেতে পারছি না।'

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর। 'হুঁমম, ভাবনার কথাই। তাহলে তো প্ল্যান বদলাতেই হচ্ছে!'

'ঠিক,' খুশি হয়ে বলল মুসা। 'প্ল্যান বদলাতেই হচ্ছে।'

'বেশ,' বলল কিশোর। 'এখনও দিনের আলো থাকবে কয়েক ঘন্টা। তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘন্টাখানেকের মধ্যেই বেরিয়ে পড়। ঘুরে এস ক্যাসল থেকে।'

বারো

'ধুত্তরি।' মুখ গোমড়া মুসার। 'কখনও পারি না ওর সঙ্গে। কথার প্যাঁচে ফেলে দিয়ে ঠিক কাজ আদায় করে নেয়।'

'ঠিক,' সায় দিল রবিন। আর কিছু বলল না।

গিরিপথে এসে দাঁড়িয়েছে দু'জনে। সামনেই পাহাড়ের ঢালে টেরর ক্যাসল আকাশে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে। পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছে সূর্য। তেরছাভাবে রোদ এসে পড়েছে বিশাল টাওয়ারের গায়ে। পেঁচিয়ে ওঠা আঙুর-লতার ফাঁকে ফাঁকে শার্শিভাঙা জানালার ফোকর, ভয়াবহ দানবের চোখ যেন।

শিউরে উঠল একবার রবিন। 'চল, ঢুকে পড়ি। সুরুজ ডুবতে বড়জোর আর দু'ঘন্টা। তারপর ঝপাৎ করে নামবে অন্ধকার।'

ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করল দু'জনে। মাঝামাঝি উঠে পেছনে ফিরে চাইল একবার মুসা। বাঁকের ওপারে। পাথরের স্তূপের ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে রোলস রয়েস। অপেক্ষা করছে হ্যানসন।

'কি মনে হয়?' উঠতে উঠতে জিজ্ঞেস করল মুসা। 'এবারেও শুটকি ফলো করছে আমাদের?'

'না,' এদিক ওদিক মাথা নাড়ল রবিন। পা ভাঙা। উঠতে কষ্ট হচ্ছে তার, কিন্তু মুসাকে বুঝতে দিচ্ছে না। 'আমি খেয়াল রেখেছিলাম। ওর নীল গাড়ির ছায়াও দেখিনি। কিশোরের ধারণা, টেরর ক্যাসলের ধার মাড়াবে না আর শুটকি।'

'আমরাও মাড়াতে চাইনি, জোর করে পাঠানো হয়েছে। তবে, শুটকিকে হয়ত

জোর করেও পাঠানো যাবে না।'

রবিনের কাঁধে ঝুলছে ক্যামেরা। মুসার হাতে টেপ রেকর্ডার। কোমরের বেল্টে আটকে নিয়েছে টর্চ, দু'জনেই। টেরর ক্যাসলের বারান্দায় উঠে এল ওরা। হলে ঢোকার বড় দরজাটা বন্ধ।

'তাজ্জব ব্যাপার তো!' ভুরু কুঁচকে গেছে মুসার। 'শুটকি দরজা খোলা রেখেই পালিয়েছিল, দেখেছি।'

'বাতাসে বন্ধ হয়ে গেছে হয়ত,' বলল রবিন।

হাত বাড়িয়ে দরজার নব চেপে ধরল মুসা। ঘোরাল। ঠেলা দিতেই তীক্ষ্ণ ক্যাঁ-অ্যাঁ-চ্-চ্-চ্ শব্দ করে খুলে গেল ভারি দরজা।

'মরচে পড়ে গেছে কবজায়,' মন্তব্য করল রবিন। 'ওই শব্দে ভয় পাবার কিছু নেই,' নিজেকেই যেন বোঝাল সে।

'কে বলল, ভয় পেয়েছি?' স্বীকার করতে রাজি না মুসা।

দরজা খোলা রেখেই হলে ঢুকে পড়ল ওরা। হলের এক পাশে একটা বড় ঘর। ঢুকল ওরা। পুরানো আসবাবপত্রে বোঝাই। কাঠের ভারি ভারি চেয়ার টেবিল, বিরাট ফায়ার প্লেস। রহস্যজনক কিছু দেখলেই ছবি তুলে নিতে বলে দিয়েছে কিশোর। কিন্তু তোলার মত তেমন কিছুই চোখে পড়ল না রবিনের। তবু ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ঘরের গোটা দুয়েক ছবি তুলে নিল সে।

তারপর ইকো রুমে এসে ঢুকল ওরা। ঘরে আবছা আলো আঁধারির খেলা! গা শিরশিরে একটা অনুভূতি আবহাওয়ায়, অস্বস্তিকর। বিচিত্র আর্মার সুট আর বিভিন্ন ভঙ্গিতে তোলা জন ফিলবির ছবিগুলোর দিকে চাইলে আরও বেড়ে যায় অস্বস্তি ভাবটা। একপাশে সিঁড়ি, দোতলায় উঠে গেছে। মাঝামাঝি জায়গায় একপাশের দেয়ালে কয়েকটা জানালা। কাচের শার্সি। ধুলোর পুরু আস্তরণ। ওপথেই আসছে আলো।

'মিউজিয়ম মনে হচ্ছে,' বলল রবিন। 'জানই তো, যে-কোন মিউজিয়মে ঢুকলেই কেমন জানি হয়ে যায় মন।'

'ঠিক,' সায় দিল মুসা। 'ঠিক ধরেছ। সেই অনুভূতি। মিউজিয়মে ঢুকলে এমন হয়।' কথা বলতে বলতে এগিয়ে গেল সে। 'ধুলো-বালি, পুরানো, কেমন যেন মরা মরা...।'

'মরা-অরা-অরা-অরা-অরা-অরা!'

ঘরের ঠিক মাঝামাঝি গিয়ে শেষ শব্দটা উচ্চারণ করছে মুসা, বেশ জোরে। এক লাফে পিছিয়ে এল।

'ওরে-ব্বাপরে! এত জোরাল!' বলতে বলতেই ঘরের ঠিক মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল রবিন। 'প্রতিধ্বনি।'

'ধ্বনি-অনি-অনি-অনি-অনি-অনি!'

হাত চেপে ধরে একটানে রবিনকে সরিয়ে আনল মুসা। 'ওখানে দাঁড়িয়ে জোরে কথা বললেই ওই কাণ্ড ঘটে।'

প্রতিধ্বনি পছন্দ করে রবিন। জোরে 'হাল্লো' বলার ইচ্ছেটা চাপা দিতে হল। ইকো হলের প্রতিধ্বনি মজার নয়, বরং কেমন অস্বস্তি জাগায়।

'চল, ছবিটা দেখি,' বলল রবিন। 'ওই যে, যেটা চোখ টিপেছিল তোমার দিকে চেয়ে।'

'ওই তো,' হাত তুলে দেখাল মুসা। 'জলদস্যুর সাজে জন ফিলবি।'

'চল, ভালমত দেখি,' বলল রবিন। 'একটা চেয়ারে দাঁড়িয়ে দেখ তো, নাগাল পাও কিনা।'

ভারি, পিঠবাঁকা একটা কাঠের চেয়ার ছবিটার তলায় নিয়ে এল মুসা। উঠল চেয়ারে। পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েও নাগাল পেল না ছবিটার।

'ওই যে একটা ব্যালকনি,' ছবিটার ওপর দিকে চেয়ে বলল রবিন। ওখান থেকে লম্বা তার দিয়ে ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে ছবি। 'চল উঠে যাই। তার ধরে টেনে তুলে নিতে পারব ছবিটা।'

সিঁড়ির দিকে এগোনর জন্যে ঘুরে দাঁড়াতে গেল রবিন। আধপাক ঘুরেছে, এই সময় তার ক্যামেরা-কেসের চামড়ার ফিতে আটকাল কেউ। চমকে ফিরে চাইল রবিন। ঠিক তার পেছনে, আবছা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে লম্বা এক মূর্তি। গলা চিরে বিকট চিৎকার বেরিয়ে এল তার, খিঁচে দৌড় মারতে চাইল দরজার দিকে।

পারল না। ফিতেয় হ্যাঁচকা টান লাগল, আবার পিছিয়ে গেল রবিন। ভারসাম্য হারাল। কাত হয়ে গেল এক পাশে। মুখ ফিরিয়ে চাইল কি আছে পেছনে। আর্মার সুট পরা এক বিরাট মূর্তি, কোপ মারার ভঙ্গিতে মাথার উপর তুলে রেখেছে তলোয়ার।

আবার চিৎকার বেরোল রবিনের গলা চিরে। পড়ে গেল মার্বেলের মেঝেতে। সঙ্গে সঙ্গে গড়ান দিয়ে সরে গেল একপাশে।

খটাং করে মেঝেতে পড়ল তলোয়ার, মুহূর্ত আগে ঠিক ওই জায়গাতেই ছিল রবিন। তলোয়ারের পাশেই পড়ল মূর্তিটা। বদ্ধ ঘরে বিকট আওয়াজ হল। ইস্পাতের খালি ড্রাম পড়ল যেন একটা।

ফিতেয় টান নেই আর এখন। গড়িয়ে দূরে সরে গেল রবিন। দেয়ালে এসে ঠেকার আগে থামল না। ফিরে চাইল। খাড়া হয়ে গেছে ঘাড়ের চুল। তার দিকে তেড়ে আসছে না আর্মার সুট পরা মূর্তি। ধড় থেকে মাথা আলাদা হয়ে গেছে ওটার। গড়াতে গড়াতে চলে যাচ্ছে মেঝের ওপর দিয়ে। থেমে গেল দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে।

আরও কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে উঠল রবিন। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল পড়ে থাকা ধড়টার দিকে। পাশে গিয়ে বসল ভয়ে ভয়ে। ধড়ের গলার তেতরে

একবার উঁকি দিয়েই হাঁপ ছাড়ল। খালি। আসলে ওটা একটা আর্মার সুট। আস্ত। কায়দা করে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিল দেয়ালে ঠেকা দিয়ে। একটা হাত ওপরের দিকে তুলে আটকে দেয়া হয়েছিল কোনভাবে। হাতের মুঠোয় ধরিয়ে দেয়া হয়েছিল তলোয়ার। খুব কাছাকাছি গিয়েছিল রবিন। বেধে গিয়েছিল ফিতে। রবিন পাশে ঘোরার সময় টান লেগেছে, পড়ে গেছে মূর্তিটা। চোট সইতে না পেরে গলা থেকে আলগা হয়ে গেছে লোহার শিরস্ত্রাণ।

চোখ বড় বড় করে সুটটার দিকে চেয়ে আছে রবিন। চমকে উঠল অট্টহাসির শব্দে। হো হো করে ঘর ফাটিয়ে হাসছে মুসা।

হাসিতে যোগ দিল না রবিন। বেকায়দা ভঙ্গিতে পড়ে থাকা সুটের ধড়ের একটা ছবি তুলল। আরেকটা ছবি তুলল মুসার।

'যাক,' বলল রবিন। 'ক্যাসলের এক ভূতের ছবি তুললাম।' চেয়ারে দাঁড়িয়ে হাসছে। 'দেখে নিশ্চয় মজা পাবে কিশোর।'

'ক্যামেরাটা আমার হাতে থাকা উচিত ছিল, রবিন,' চোখের পানি মুছতে মুছতে বলল মুসা। 'কাত হয়ে পড়ে যাচ্ছ তুমি। পেছনে তলোয়ার উঁচিয়ে আছে আর্মার সুট পরা এক মূর্তি। আহ্, যা দারুণ একখান ছবি হত না!' আবার হাসতে লাগল সে।

আর্মার সুটটার দিকে একবার তাকাল রবিন। দৃষ্টি দিয়ে ওটাকে ভস্ম করার চেষ্টা চালাল যেন। ব্যর্থ হয়ে ফিরল দেয়ালে ঝোলানো ছবির দিকে। ক্যামেরা চোখের সামনে তুলে এনে শটাশট শাটার টিপে চলল একের পর এক।

কয়েকটা ছবি তুলে নিয়ে মুসার দিকে ফিরল রবিন। 'হাসি থামবে এবার? অনেক কাজ পড়ে আছে। ওই যে দরজাটা, চল ওঘরে ঢুকি।' দরজার কপালে বসানো প্লেটের লেখা পড়ল, 'প্রোজেকশন রুম।'

চেয়ার থেকে নেমে এল মুসা! বাবার মুখে শুনেছি, আগে বড় বড় অভিনেতার বাড়িতে নিজস্ব প্রোজেকশন রুম থাকত। ঘরে বসেই নিজের ছবি দেখত, বন্ধুদের দেখাত। চল দেখি ঘরটা।'

হাতল ধরে জোরে টান দিল রবিন। ধীরে ধীরে খুলে গেল পাল্লা, যেন ওপাশ থেকে টেনে ধরে রেখেছে কেউ। এক ঝলক হাওয়া এসে ঝপটা মারল গায়ে, নাকে এসে লাগল ভ্যাপসা গন্ধ। দরজার ওপাশে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। নিরেট অন্ধকার।

বেল্টে ঝোলানো টর্চ খুলে নিল মুসা। আলো ফেলল ভেতরে।

অন্ধকারের কালো চাদর ফুঁড়ে বেরিয়ে গেল আলোক রশ্মি। চোখের সামনে ভেসে উঠল প্রোজেকশন রুম। বেশ বড় একটা হলঘর। কয়েক সারিতে রাখা হয়েছে শ'খানেক চেয়ার! একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে বিরাট এক পাইপ অর্গান!'

'মুভি-থিয়েটারের মত সাজানো হয়েছে,' বলল মুসা। 'অর্গানটা দেখেছ?

রাশেদ চাচারটার চেয়েও অনেক বড়।'

নিজের টর্চ খুলে আনল রবিন। সুইচ টিপল। আলো জ্বলল না। ভাল করে দেখে বুঝল, ভেঙে গেছে কাচ। সে যখন মেঝেতে পড়ে গিয়েছিল, বাড়ি লেগেছিল তখনই।

একটা টর্চের আলোই যথেষ্ট। প্রোজেকশন রুমের ভেতরে এসে ঢুকল দু'জনে। এগোল পাইপ অর্গানটার দিকে।

হাসাহাসি করে হালকা হয়ে গেছে মন। ভয় কেটে গেছে দু'জনেরই। অর্গানের কাছে এসে দাঁড়াল ওরা।

ছাতের কাছাকাছি উঠে গেছে বিশাল পাইপগুলো। ধুলোবালি আর মাকড়সার জাল লেগে আছে। অর্গানের একটা ছবি তুলল রবিন।

আলো ফেলে ফেলে পুরো ঘরটা দেখল ওরা। যত্নের অভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে চেয়ারগুলো। জায়গায় জায়গায় উঠে গেছে ছাল-চামড়া-গদি। ছবি দেখানর পর্দার জায়গায় ঝুলছে এখন কয়েক ফালি সাদা কাপড়। গুমোট গরম ঘরে।

'এখানে কিছু নেই,' বলল মুসা। 'চল, ওপরে যাই।'

প্রোজেকশন রুম থেকে বেরিয়ে এল ওরা। ইকো হল পেরিয়ে এক প্রান্তের সিঁড়ির গোড়ায় চলে এল। উঠতে শুরু করল সিঁড়ি বেয়ে। আধপাক ঘুরে দোতলায় গিয়ে শেষ হয়েছে সিঁড়ির আরেক মাথা। মাঝামাঝি উঠে থামল ওরা। ধুলোয় ঢাকা জানালার শার্শি দিয়ে বাইরে তাকাল। চোখে পড়ছে গিরিপথ।

'আরও ঘন্টা দেড়েক আলো থাকবে,' বলল রবিন। 'এরমধ্যেই দেখে নিতে হবে যা দেখার।'

'আগে জলদস্যুর ছবিটা ভালমত দেখি, চল,' পরামর্শ দিল মুসা।

ব্যালকনিতে এসে থামল ওরা। দু'জনেই ধরল ছবির তার, টান দিল। ভীষণ ভারি ফ্রেম। দু'জনে টেনে তুলতেও বেগ পেতে হল।

উঠে এল ছবি। ওটার ওপর টর্চের আলো ফেলল মুসা। সাধারণ ছবি। তেল রঙে আঁকা, এজন্যেই আলো পড়লে সামান্য চকচক করে। রবিনের ধারণা হল, হয়ত বিশেষ কোন একটা দৃষ্টিকোণ থেকে ছবির চোখের দিকে চেয়েছিল মুসা, চকচক করতে দেখেছিল। জ্যান্ত চোখ বলে মনে হয়েছিল তখন। সেটা তাকে বলল রবিন।

কিন্তু সন্দেহ গেল না মুসার। জ্যান্তই মনে হয়েছিল! কি জানি, ভুলও দেখে থাকতে পারি! যাকগে, আবার নামিয়ে রাখি ছবিটা, এস।'

আবার আগের জায়গায় ছবিটা ঝুলিয়ে রাখল ওরা। সরে এল ব্যালকনি থেকে। আবার চলে এল সিঁড়িতে।

সিঁড়ি ভেঙে উঠতেই থাকল ওরা। একটু পরেই মোটা থামের মত একটা টাওয়ারের ভেতরে আবিষ্কার করল নিজেদেরকে। চারদিকে ছোট ছোট জানালা।

বাইরে তাকাল। ক্যাসলের চূড়ার কাছে উঠে এসেছে ওরা। অনেক নিচে ব্ল্যাক ক্যানিয়ন। যতদূর চোখ যায়, শুধু পাহাড় আর পাহাড়।

'আরে! দেখেছ!' হঠাৎ বলে উঠল মুসা। 'একটা এরিয়্যাল! টেলিভিশনের!'

চাইল রবিন। ঠিকই। ওদের একেবারে কাছের পাহাড় চূড়ায় দাঁড়িয়ে আছে একটা এরিয়্যাল। হয়ত পাহাড়ের ওপাশেই রয়েছে কোন বাড়ি। ভাল রিসিপশনের জন্যে এরিয়্যালটা লাগিয়েছে বাড়ির লোকে!

'পাহাড়ের মাঝে মাঝে অনেক গিরিপথ রয়েছে, দেখেছ?' আঙুল তুলে একটা দিক দেখিয়ে বলল মুসা। 'ব্ল্যাক ক্যানিয়নের মত নির্জন নয় ওগুলো।'

'ডজন ডজন সরু গিরিপথ আছে এদিকে পাহাড়ের ভেতরে ভেতরে,' বলল রবিন। 'আমি ভাবছি এরিয়্যালটার কথা। পাহাড়ের ঢাল কি খাড়া দেখেছ? ওতে চড়তে চাইলে...! মনে হচ্ছে, ওদিক দিয়ে ঘুরে যেতে হবে।'

'আমারও তাই ধারণা,' বলল মুসা। 'চল, নামি। এখানে আর কিছু দেখার নেই।'

খানিকটা নেমে একটা বড় ঘরে এসে ঢুকল ওরা। গাদা গাদা বই র‍্যাকে। লাইব্রেরি। এখানকার দেয়ালেও অনেক ছবি ঝোলানো, ইকো হলের ছবিগুলোর চেয়ে আকারে ছোট।

'চল, দেখি ছবিগুলো,' প্রস্তাব রাখল মুসা।

রবিন রাজি।

জন ফিলবির অভিনীত ছবির দৃশ্য। কোথাও সে জলদস্যু, কোথাও ছিনতাইকারী, ওয়্যারউলফ, জোম্বি, ভ্যাম্পায়ার, আবার কোথাও বা সাগর থেকে উঠে আসা কোন নাম-না জানা ভয়াবহ দানব।

'ইস্‌স্ ফিল্মগুলো যদি দেখতে পারতাম!' বলল মুসা। 'একই লোকের মত চেহারা!'

'লোকে এজন্যেই তাকে লক্ষমুখো ডাকত,' মনে করিয়ে দিল রবিন। 'আরে, দেখ দেখ!'

এক জায়গায় দেয়ালের একটা চারকোণা ফোকরে একটা বাক্স, মমিকেস। ডালা বন্ধ। রূপার একটা প্লেট লাগানো বাক্সের গায়ে। এগিয়ে গিয়ে প্লেটে টর্চের আলো ফেলল মুসা। খোদাই করে ইংরেজিতে লেখা রয়েছেঃ

> **জন ফিলবি,**
> **তোমার অভিনীত ছবি দেখে অনেক মজা পেয়েছি বেঁচে**
> **থাকতে। মৃত্যুর পর আমার দেহের এই বিশেষ**
> **অংশগুলো তোমাকেই দান করে গেলাম। তোমার**
> **মিউজিয়মে সাজিয়ে রেখ।—পিটার হেনশ।**

'সেরেছে!' চাপা গলায় বলল মসা। 'ভেতরে কি আছে!'

'আর কি? নিশ্চয় মমি-টমি কিছু!'
'অন্য কিছুও হতে পারে! এস, দেখি!'
ডালা ধরে ওপরের দিকে টান দিল মুসা। বেজায় ভারি। তুলতে কষ্ট হচ্ছে।
ডালাটা অর্ধেক উঠে যেতেই ভেতরে চাইল মুসা। 'ওরেব্বাপরে!' বলেই ছেড়ে দিল ডালা। সরে এল এক লাফে।
'কি, কি হল?' রবিনের গলায় উৎকণ্ঠা।
'দাঁত বের করে হাসছে! কঙ্কাল! উরিব্বাপরে!'
বার দুই ঢোক গিলল রবিন। 'কঙ্কাল! নড়েচড়ে ওঠেনি তো!'
'বুঝতে পারলাম না!'
'এস তো, আবার তুলে দেখি!'
ভয়ে ভয়ে এসে আবার ডালা ধরল মুসা। রবিনও হাত লাগাল।
ডালা তুলে ভেতরে উঁকি দিল দু'জনেই। সাধারণ একটা কঙ্কাল পড়ে আছে চিত হয়ে। না, নড়ছে না। একেবারে স্থির।
'খামোকা ভয় পেয়েছ,' বলল রবিন। 'নিশ্চয় ওটা পিটার হেনশর কঙ্কাল। একটা ছবি তুলে নিই। কিশোর খুশি হবে।'
ছবি তুলে নিল রবিন। মুসা নেই ওখানে। জানালার ধারে সরে যাচ্ছে।
'সর্বনাশ!' হঠাৎ চিৎকার শোনা গেল মুসার। 'রবিন, জলদি কর! অন্ধকার···
'তা কি করে হয়?' হাতঘড়ির দিকে চাইল রবিন। এখনও এক ঘন্টা আলো থাকার কথা!'
'কি জানি! দেখে যাও!'
জানালার ধারে সরে এল রবিন। ঠিকই, বাইরে গিরিপথে অন্ধকার নামতে শুরু করেছে। উঁচু পাহাড়ের ওপারে হারিয়ে গেছে সূর্য।
'ভুলেই গিয়েছিলাম,' রবিনের গলায় শঙ্কা, 'এসব পাহাড়ী অঞ্চলে সূর্য একটু তাড়াতাড়িই ডোবে।'
'চল, বেরিয়ে পড়ি,' তাগাদা দিল মুসা। 'অন্ধকারে এখানে এক মুহূর্ত থাকতে রাজি নই আমি।'
বারান্দায় বেরিয়ে এল ওরা। দুই প্রান্ত থেকেই সিঁড়ি নেমে গেছে। দেখতে ঠিক একই রকম। কাছের সিঁড়িটার দিকে এগিয়ে গেল ওরা। নামতে শুরু করল।
এক জায়গায় এসে শেষ হল সিঁড়ি। একটা হল ঘরে এসে ঢুকেছে ওরা। আবছা অন্ধকার। এক নজর দেখেই বুঝল, এটা ইকো রুম নয়, অন্য ঘর। এক প্রান্ত থেকে সিঁড়ি নেমে গেছে।
'এদিক দিয়ে যাইনি আমরা,' বলল রবিন। 'চল ফিরি। ওপর তলায় উঠে অন্য সিঁড়ি দিয়ে নামব।'
'কি দরকার?' বাধা দিল মুসা। 'ওই তো সিঁড়ি নেমে গেছে। নিশ্চয় নিচের

তলায়ই নেমেছে।'

অপ্রশস্ত সিঁড়ি। গায়ে গায়ে ঠেকে যায়। দ্রুত নেমে চলল দু'জনে। কয়েক ধাপ নেমেই সরু ছোট একটা প্যাসেজে শেষ হয়েছে সিঁড়ি। প্যাসেজের দু'পাশে দেয়াল। ও মাথায় দরজা।

তাড়াতাড়ি দরজার কাছে চলে এল ওরা। ঘন হয়ে আসছে অন্ধকার। নব ঘুরিয়ে ঠেলা দিতেই দরজা খুলে গেল! ওপাশ থেকে আবার সিঁড়ি নেমেছে। মুসা চলে গেল ওপাশে। ছেড়ে দিতেই বন্ধ হয়ে যেতে চাইল স্প্রিং লাগানো পাল্লা। খপ করে আবার ধরে ফেলল সে। রবিনও চলে এল এপাশে। পাল্লা ছেড়ে দিল মুসা।

দরজা বন্ধ হয়ে যেতেই গাঢ় অন্ধকার গ্রাস করল ওদেরকে।

'চল ফিরে যাই,' আবার বলল রবিন। 'এই অন্ধকারে অচেনা পথে চলতে মন সায় দিচ্ছে না।'

'ঠিকই বলেছ! এখন আমারও কেমন কেমন লাগছে!' ফিরে যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়াল মুসা। দরজার নব ধরে মোচড় দিল। অন্ধকারে তার শঙ্কিত গলা শোনা গেল। 'ইয়াল্লা! রবিন, নব ঘুরছে না! অটোমেটিক লক! পুশ বাটন ওপাশে। তাড়াহুড়োয় চাপ লেগে গেছে হয়ত!'

'তাহলে আর কি করা!' গলা স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করল রবিন। 'না চাইলেও সামনেই বাড়তে হবে আমাদের!'

'কিছুই দেখা যাচ্ছে না! দেখি, টর্চ জ্বালি!...আরে, টর্চ কোথায় গেল আমার!...কোথায়!...নিশ্চয়, মমিকেসের ডালা তোলার সময় নামিয়ে রেখেছিলাম!'

'খুব ভাল করেছ! আমার টর্চটাও নষ্ট! এখন? কি উপায়?'

'কাচ ভেঙেছে, বালব তো ভাঙেনি। দেখি, টর্চটা দাও আমার হাতে,' অন্ধকারে রবিনের বাহুতে হাত রাখল মুসা।

সঙ্গীর হাতে টর্চ তুলে দিল রবিন।

টর্চের গায়ে বার দুই থাবা লাগাল মুসা। জোরে জোরে ঝাঁকুনি দিল বার কয়েক। সুইচ টিপল। জ্বলে উঠল বালব। নিভে গেল। আবার ঝাঁকুনি দিতেই আবার জ্বলল, মিটমিট করে। ম্লান আলো।

'ঠিকমত ব্যাটারি কানেকশন পাচ্ছে না,' মন্তব্য করল মুসা। 'তবে কাজ চালানো যাবে। এস, নামি।'

ঘুরে ঘুরে নেমে গেছে সরু সিঁড়ি। আগে নেমে চলল মুসা। তাকে অনুসরণ করল রবিন। শেষ হল সিঁড়ি। ম্লান আলোয় দেখল, ছোট একটা ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে ওরা। দু'দিকে দুটো দরজা। বেরোবে কোন্ দরজা দিয়ে?

সিদ্ধান্ত নিয়ে একটা দরজার দিকে পা বাড়াল রবিন। সঙ্গে সঙ্গে তার বাহু খামছে ধরল মুসা। 'শুনছ! শুনতে পাচ্ছ!'

কান পাতল রবিন। সে-ও শুনতে পেল।

বাজনা। মৃদু, কাঁপা কাঁপা, বহুদূর থেকে আসছে যেন। প্রোজেকশন রুমের ভাঙা অর্গান পাইপ বাজছে! অস্বস্তি বোধ করতে লাগল রবিন। হঠাৎ করেই।

'ওদিক থেকে আসছে,' আঙুল তুলে একটা দরজা দেখিয়ে বলল মুসা।

'তাহলে চল ওদিকে যাই,' উল্টো দিকের আরেকটা দরজা দেখাল রবিন।

'না, ওটা দিয়েই যাওয়া উচিত,' আগের দরজাটা আবার দেখাল মুসা। 'নিশ্চয় প্রোজেকশন রুমে ঢুকব গিয়ে। ঘরটা চেনা। অচেনা কোন ঘরে ঢুকতে আর রাজি নই আমি। এখন তো নয়ই।'

দরজা খুলল মুসা। অন্ধকার একটা ঘরে ঢুকল দু'জনে। ম্লান আলোয় পথ দেখে এগিয়ে চলল। বাড়ছে বাজনার শব্দ। এখনও অনেক দূরে মনে হচ্ছে। তীক্ষ্ণ ক্যাঁচকোঁচ আর চাপা চিৎকার কেমন ভূতুড়ে করে তুলেছে অর্গানের বাজনাকে!

এগিয়ে চলেছে দু'জনে। সামনে মুসা! তার ঠিক পেছনেই রবিন। যতই এগোচ্ছে, বাড়ছে অস্বস্তি-বোধ।

হলের শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়াল ওরা। একটা দরজা। ঠেলে দিল মুসা। খুলে গেল পাল্লা। প্রোজেকশন রুমে ঢুকল দু'জনে।

সামনেই পড়ে আছে সারি সারি চেয়ার। ম্লান আলোয় সামনের কয়েকটা চেয়ার দেখা যাচ্ছে আবছাভাবে। অর্গান পাইপটা রয়েছে অন্য প্রান্তে। অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না। যেদিক থেকে বাজনার শব্দ আসছে, সেদিকে তাকাল মুসা। খপ করে চেপে ধরল রবিনের একটা হাত।

রবিনও তাকাল। স্থির হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। মেঝের ফুট চারেক উঁচুতে বাতাসে ঝুলে আছে অদ্ভুত নীল আলো। নির্দিষ্ট কোন আকার নেই। মুহূর্তে মুহূর্তে বিভিন্ন আকৃতি নিচ্ছে আলোটা, কাঁপছে থিরথির করে। ক্রমেই বাড়ছে অর্গান পাইপের বাজনা, সেই সঙ্গে তীক্ষ্ণ ক্যাঁচকোঁচ আর চাপা চিৎকার যেন সঙ্গত করছে।

'নীল ভূত!' ফিসফিস করে বলল রবিন। অস্বস্তিবোধ উৎকণ্ঠায় রূপ নিয়েছে। ভয়ে বুক কাঁপছে দুরু-দুরু। তীব্র আতঙ্কে রূপ নিতে বেশি দেরি নেই আর। কোন্ দরজা দিয়ে গেলে ইকো রুমে যাওয়া যায়, আন্দাজ করে নিল ওরা। ছুটল।

ধাক্কা দিয়ে পাল্লা খুলে ফেলল মুসা। প্রায় ছিটকে এসে পড়ল ইকো রুমে। হলের দিকে ছুটল।

হল, সদর দজা পেরিয়ে বারান্দায় বেরিয়ে এল দু'জনে! তবু থামল না। সিঁড়ি টপকে নেমে চলল। মুসার সঙ্গে পেরে উঠছে না রবিন, পা ভাঙা। পেছনে পড়ে গেল সে।

খিঁচে দৌড়াচ্ছে মুসা। পা টেনে টেনে যত জোরে সম্ভব, ছুটছে রবিন।

অন্ধকার। ঢাল বেয়ে নামতে নামতে হঠাৎ পা পিছলাল রবিন। হুমড়ি খেয়ে পড়ল। বার দুই ডিগবাজি খেল, তারপর গড়াতে শুরু করল তার দেহ। কিছুতেই

ঠেকাতে পারছে না। কয়েক গড়ান দিয়ে একটা পাথরের স্তূপে এসে ধাক্কা খেয়ে থেমে গেল দেহটা। কান্নার মত ফোঁপানি বেরিয়ে এল মুখ দিয়ে।

ধরেই নিয়েছে রবিন, পেছনে তাড়া করে আসছে নীল অশরীরী। অপেক্ষা করছে ওটার জন্যে। বুকের ভেতরে হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে যেন। হাপরের মত ওঠা নামা করছে বুক।

শব্দটা হঠাৎ কানে এল রবিনের। পায়ের আওয়াজ। চাপা। এক কদম...দুই কদম করে এগিয়ে আসছে। নিশ্চয় নীল ভূত! অন্ধকারে খুঁজছে তাকে!

থামছে না, এগিয়েই আসছে শব্দটা। কাছে, আরও কাছে। ঠিক পেছনে। থেমে গেল শব্দ।

ফিরে চাইবার সাহস নেই রবিনের। পাথরে মুখ গুঁজে পড়ে আছে।

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল মূর্তিটা। তার শ্বাস ফেলার চাপা ফোঁস ফোঁস কানে আসছে রবিনের। হঠাৎ পিঠে ছোঁয়া লাগল, হাতের তালুর আলতো চাপ। তারপর আলতো ঘষা, ধীরে ধীরে ওপরের দিকে উঠে যাচ্ছে। নিশ্চয় গলা খুঁজছে, আন্দাজ করল রবিন। নড়ার শক্তি নেই যেন, অবশ হয়ে আসছে দেহ।

ঘাড়ের কাছে এসে থামল হাতটা। চাপ বাড়ল একটু। চেঁচিয়ে উঠল রবিন। তীক্ষ্ণ তীব্র চিৎকারে খান খান হয়ে ভেঙে গেল অখণ্ড নীরবতা। প্রতিধ্বনি তুলল পাহাড়ে পাহাড়ে বাড়ি খেয়ে।

তেরো

'তারপর? নীল ভূত তোমার ঘাড়ে হাত রাখল, তারপর কি হল?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

হেডকোয়ার্টারে বসে আছে তিন গোয়েন্দা। তিন দিন পর আবার এক জায়গায় মিলতে পেরেছে তিনজনে। বাবা-মার সঙ্গে স্যান ফ্রান্সিসকোয় আত্মীয়ের বাড়ি গিয়েছিল মুসা। লাইব্রেরিতে কাজের চাপ পড়েছিল রবিনের এক সহকর্মী ছুটি নিয়েছিল, ফলে দু'জনের কাজ একাই করতে হয়েছে তাকে। কিশোর পড়েছিল বিছানায়, একনাগাড়ে তিনটে দিন। কথা বলার কেউ ছিল না। খালি বই পড়ে কাটিয়েছে।

'তারপর কি হল, বললে না?' রবিনকে চুপ করে থাকতে দেখে আবার জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'মানে...আমি চেঁচিয়ে উঠার পর?' ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করতে চাইছে না রবিন, বোঝা যাচ্ছে।

'নিশ্চয়। চেঁচিয়ে উঠলে, তারপর?'

'মুস্যাকেই জিজ্ঞেস কর না,' এড়িয়ে যেতে চাইছে রবিন। 'ও-ও তো ছিল সঙ্গে।'

'ঠিক আছে। মুসা, কি ঘটেছিল?'

ঢোক গিলল একবার মুসা। 'ইয়ে···আমি পড়লাম···মানে···

'পড়ল তো রবিন, তুমি পড়লে কি করে?'

'ওর ঘাড়ে হাত রাখতেই চেঁচিয়ে উঠল। জোরে ল্যাথি মেরে বসল আমার পায়ে। পায়ের তলায় পাথর ছিল, সামলাতে পারলাম না। পড়ে গেলাম ওর পিঠে। নিচে পড়ে ছটফট করতে লাগল ও, এঁকেবেঁকে সরে যাবার চেষ্টা করল। গলা ফাটিয়ে চেঁচাতে লাগল। বললঃ আমাকে ছেড়ে দাও, ভূত, প্লীজ! খামোকা ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করবে কেন···'

'কক্ষণো বলিনি আমি একথা!' চেঁচিয়ে প্রতিবাদ করল রবিন।

'হ্যাঁ, বলেছ। ভুলে গেছ এখন।'

'না, বলিনি!'

'বললেই বা কি হয়েছে?' রবিনের পক্ষ নিল কিশোর। 'ওর সাহস আছে, স্বীকার করতেই হবে। ওই অবস্থায় আমি পড়লেও ভয় পেতাম। ও তো প্যান্ট খারাপ করেনি। হ্যাঁ, তারপর?'

'জোরে জোরে বললাম, অত ভয় পাবার কিছু নেই। আমি মুসা। আমার কথা কানেই ঢুকল না যেন রবিনের। কানের কাছে মুখ নিয়ে চেঁচাতে তবে থামল। শান্ত হল। ওকে ধরে তুললাম।'

'ইচ্ছে করেই ভয় পাওয়ানর চেষ্টা করেছ আমাকে তুমি!' রবিনের গলায় অনুযোগ।

'কসম খোদার, রবিন, তোমাকে ভয় পাওয়াব কি, আমারই তো অবস্থা তখন কাহিল। পেছন ফিরে দেখলাম তুমি নেই। ফিরতেই হল। খুব ভয়ে ভয়ে পা ফেলেছি। সারাক্ষণই মনে হয়েছে, এই বুঝি ধরল এসে নীল ভূতের বাচ্চা!'

দু'জনেই তাকাল কিশোরের দিকে।

ওদের কথা শুনছে না গোয়েন্দাপ্রধান। নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে চুপচাপ।

'দুজনেই উঠে দাঁড়ালে তোমরা, তারপর?' হঠাৎ প্রশ্ন করল কিশোর। 'আবিষ্কার করলে আতঙ্ক, ভয়, কিছুই নেই। এমনকি অস্বস্তিবোধও চলে গেছে, তাই না?'

চাওয়া চাওয়ি করল মুসা আর রবিন। কি করে আন্দাজ করল কিশোর? এই কথাটা সব শেষে বলে চমকে দেবে প্রধানকে, ভেবে রেখেছে ওরা।

'ঠিক,' জবাব দিল মুসা। 'কিন্তু তুমি জানলে কি করে?'

মুসার প্রশ্নটা যেন শুনতেই পায়নি কিশোর। আপনমনে বলল, 'তারমানে, টেরর ক্যাসলের বাইরে এলেই চলে যায় ওসব অনুভূতি! গুড। একটা কাজের কাজ

ফিরে এসেছ।'

'তাই?' রবিনের প্রশ্ন।

'তাই। হ্যাঁ, ছবিগুলো নিশ্চয় শুকিয়েছে এতক্ষণে। আন না, দেখি। নাহ্, জ্বালিয়ে মারবে চাচা!' ভেন্টিলেটর বন্ধ করতে উঠে গেল কিশোর।

অর্গান পাইপ বসানর কাজ শেষ করে ফেলেছেন রাশেদ চাচা। বোরিস আর রোভার তাঁকে সাহায্য করেছে। কিশোরও করেছে, বিছানায় শুয়ে শুয়ে। অর্গান পাইপের ওপর লেখা একটা বই খুঁটিয়ে পড়েছে সে। চাচাকে জানিয়েছে, কোন্ জোড়াটা কোথায় কিভাবে লাগাতে হবে। কাজ শেষ করেই বাজাতে বসে গেছে চাচা। ইয়ার্ডের আর সব কাজ বাদ দিয়ে তাঁর সঙ্গে জুটেছে বোরিস আর রোভার।

আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে বাজছে অর্গান। ভয়াবহ আওয়াজ। 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি'-র সুর বাজানর চেষ্টা করছেন চাচা আনাড়ি হাতে। ঠিক হচ্ছে না। তবু তালে তালে মাথা দোলাচ্ছে দুই ব্যাভারিয়ান ভাই। তারিফ করছে সুরের। ওঁদের ধারণা, বাদক হিসেবে জুড়ি নেই রাশেদ পাশার।

শব্দের ধাক্কায় কাঁপছে পুরো ইয়ার্ড। ট্রেলারের ছাতের খোলা ভেন্টিলেটর দিয়ে আসছে আওয়াজ। কান ঝালাপালা করে দিতে চাইছে। সুর চড়া পর্দায় যখন উঠছে, থরথর করে কেঁপে উঠছে ট্রেলারের দেয়াল।

ভেন্টিলেটর বন্ধ করে দিয়ে ফিরে এল কিশোর।

ডার্করুম থেকে ছবি নিয়ে ফিরল রবিন।

ছবি পরীক্ষা করে দেখতে বসল কিশোর। ভেজা ভেজা রয়েছে এখনও। একটা করে ছবি টেনে নিয়ে বড় রীডিং গ্লাসের তলায় ফেলছে সে, ভাল করে দেখছে, তারপর ঠেলে দিচ্ছে রবিন আর মুসার দিকে।

অনেক সময় লাগিয়ে পরীক্ষা করল আর্মার সুট আর জন ফিলবির লাইব্রেরির ছবি। মুখ না তুলেই বলল, 'ভাল ছবি তুলেছ, রবিন। তবে আসল কাজটাই পারনি। নীল ভূতের ছবি তোলা দরকার ছিল।'

'ভাল বলেছ! অন্ধকারে কয়েক ডজন চেয়ার ডিঙিয়ে অর্গানের কাছে যাই! ছবি তোলার আগেই তো আমার ঘাড়টা মটকে দিত নীল হারামজাদা!'

'পালাতে পেরেছি এই যথেষ্ট, আবার ছবি!' যোগ করল মুসা। 'তীব্র আতঙ্ক চেপে ধরেছে। দিশেহারা হয়ে পড়েছি। তুমিও ছবি তুলতে পারতে না তখন।'

'ঠিকই, পারতাম না,' স্বীকার করল কিশোর। 'আতঙ্কিত হয়ে পড়লে মাথার ঠিক থাকে না। তবে, তুলে আনা গেলে খুব সুবিধে হত। কিনারা করা যেত রহস্যটার।'

চুপ করে রইল মুসা আর রবিন।

'অদ্ভুত একটা ব্যাপার ভেবে দেখেছ?' বলল কিশোর। 'টেরর ক্যাসলের ভূত সূর্য ডোবার আগেই দেখা দিয়েছে!'

'কিন্তু ক্যাসলের ভেতরে অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল,' প্রতিবাদ করল মুসা। 'বেড়ালেও দেখতে পেত কিনা সন্দেহ!'

'তবু, বাইরে তখনও সূর্য ডোবেনি। রাত নামার আগে ভূত বেরিয়েছে, এমন শোনা যায়নি কখনও। যাকগে। ওসব নিয়ে পরে ভাবা যাবে। এখন ছবিগুলো দেখি।'

আর্মার সুটের ছবির দিকে আবার চাইল কিশোর। 'এখনও চকচকে আছে সুটটা। মরচে পড়েনি।'

'ঠিকই,' সায় দিল রবিন। 'দুয়েকটা জোড়ায় মরচে দেখেছি শুধু। এছাড়া পুরো সুটটাই চকচকে।'

'আর এই যে, লাইব্রেরির বইগুলো। ধুলোয় মাখামাখি হয়ে থাকার কথা ছিল। নেই।'

'হালকা ধুলো ছিল,' বলল মুসা। 'তবে অনেক দিন পড়ে থাকলে যতটা থাকার কথা, ততটা নয়।'

'হুমম!' মমিকেসে রাখা কঙ্কালের ছবিটা টেনে নিল কিশোর। নিজের কঙ্কাল উপহার দেয়া! সত্যি অদ্ভুত!'

ঠিক এই সময় দড়াম করে শব্দ হল একটা! জঞ্জালের স্তূপ থেকে লোহার ভারি কিছু খসে পড়েছে, আছড়ে পড়েছে ট্রেলারের গায়ে। কারণ— অর্গান পাইপ। আরও জোরে বাজছে এখন।

'সর্বনাশ!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'ভূমিকম্প শুরু হবে!'

'কান খারাপ হয়ে গেল নাকি চাচার!' ভুরু কোঁচকাল কিশোর। আর সইতে পারছি না! বেরিয়ে যেতে হবে! জিনিসটা দিয়েই বেরিয়ে পড়ব।'

অপেক্ষা করে রইল রবিন আর মুসা, উৎসুক দৃষ্টি।

টেবিলের ড্রয়ার থেকে তিনটে লম্বা চক বের করল কিশোর। সাধারণ চক। একটা নীল, একটা সবুজ, অন্যটা সাদা।

'এগুলো কেন?' জানতে চাইল মুসা।

'আমাদের চিহ্ন রেখে যাবার জন্যে,' বলতে বলতেই সাদা চক দিয়ে দেয়ালে বড় একটা প্রশ্নবোধক আঁকল কিশোর। 'সাদা প্রশ্নবোধক, আমার চিহ্ন। সবুজ রবিনের, আর নীল তোমার। কোথাও পথ হারিয়ে ফেললে, এই চিহ্ন রেখে যাব আমরা। কে হারিয়েছি, কোন্ পথ দিয়ে গেছি, খুব সহজেই বুঝতে পারব অন্য দু'জন। অনুসরণ করা সহজ হবে।'

'দারুণ!' বিড়বিড় করল মুসা। 'কিশোর, তোমার তুলনা হয় না!'

'অনেক সুবিধে এতে,' মুসার কথায় কান দিল না কিশোর। 'দেয়াল, দরজা জানালার পাল্লা, কিংবা অন্য যে কোনখানে চক দিয়ে প্রশ্নবোধক আঁকতে পারব আমরা। অন্য কারও চোখে পড়লেও তেমন কিছুই বুঝবে না। ভাববে, কোন দুষ্টু

...র খেয়াল। অথচ আমাদের কাছে এটা মহামূল্যবান। এখন থেকে যার যার ...র চক বয়ে বেড়াব আমরা। কখনও কাছছাড়া করব না। ঠিক আছে?'

মাথা কাত করে সায় জানাল অন্য দু'জন।

'আর হ্যাঁ,' আসল কথায় এল কিশোর। 'মিস্টার ক্রিস্টোফারের অফিসে ফোন করেছিলাম, আজ সকালে। কেরি জানিয়েছে, আগামীকাল সকালে স্টাফদের নিয়ে ...টিঙে বসবেন পরিচালক। সিদ্ধান্ত নেবেন, কোন ভূতুড়ে বাড়িতে ছবির শূটিং করবেন। তারমানে, কাল সকালের আগেই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে হবে আমাদের। ...র মানে...'

'না!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'আমি পারব না! আমি আর যাব না টেরর ক্যাসলে। শিওর, ওই বাড়িতে ভূত আছে! কোন প্রমাণের দরকার নেই আমার।'

'বিছানায় শুয়ে শুয়ে অনেক ভেবেছি,' মুসার কথায় কোনরকম ভাবান্তর হল না কিশোরের। 'সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি, টেরর ক্যাসলে ভূত থাকলে, দেখে ছাড়ব। মিস্টার ক্রিস্টোফার কথা দিয়েছেন, আমাদের নাম প্রচার করবেন। এ-সুযোগ কিছুতেই হাতছাড়া করব না আমি। তোমাদেরও করা উচিত হবে না। বাড়িতে বলে আসবে, আজ রাতে আর না-ও ফিরে যেতে পার। আবার ঢুকব আমরা টেরর ক্যাসলে। আজই ভেদ করব এর রহস্য।'

চোদ্দ

চাঁদ নেই। গাঢ় অন্ধকারে ডুবে আছে ব্ল্যাক ক্যানিয়ন। তারার আলোয় আবছা দেখা যাচ্ছে টেরর ক্যাসলের অবয়ব।

'আরিব্বাপরে, কি অন্ধকার!' ফিসফিসিয়ে বলল কিশোর। 'যা থাকে কপালে, চল ঢুকে পড়ি।'

মুসার হাতে নতুন টর্চ। হাত খরচের পয়সা বাঁচিয়ে কিনেছে। আগের টর্চটা এখনও উদ্ধার করা যায়নি, নিশ্চয় পড়ে আছে মমিকেসের কাছে। টেরর ক্যাসলের লাইব্রেরিতে।

সিঁড়ি বেয়ে বারান্দায় উঠতে শুরু করল দু'জনে। এক পায়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, সামান্য খোঁড়াচ্ছে কিশোর। অখণ্ড নীরবতা। তাদের পায়ের চাপা শব্দই অনেক বেশি জোরাল মনে হচ্ছে। হঠাৎ কাছের একটা ছোট ঝোপের ভেতরে শব্দ হল। বেরিয়ে ছুটে পালাল কি যেন! টর্চের আলো ফেলল মুসা। একটা খরগোশ।

'মনে জানান দিয়েছে ব্যাটার, আজ গোলমাল হবে ক্যাসলে,' বিড়বিড় করে বলল মুসা। 'বুদ্ধিমানের মত আগেই পালিয়ে যাচ্ছে।'

কোন জবাব দিল না কিশোর। বারান্দা পেরিয়ে দরজার সামনে দাঁড়াল। টান দিল হাতল ধরে। এক চুল নড়ল না পাল্লা।

'এস, হাত লাগাও,' বলল কিশোর। 'আটকে গেছে দরজা।'

দু'জনে চেপে ধরল পিতলের বড় হাতল। জোরে হ্যাঁচকা টান লাগাল। খুলে চলে এল হাতল। টাল সামলাতে না পেরে ছিটকে পেছনে পড়ে গেল দু'জনে।

'উফফ!' ওপর থেকে কিশোরকে ঠেলে সরানর চেষ্টা করে বলল মুসা, 'সর সর! পেটের ওপর পড়েছ! দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে আমার!'

মুসার পেটের ওপর থেকে গড়িয়ে সরে এল কিশোর। উঠে দাঁড়াল।

মুসাও উঠল। টিপেটুপে দেখছে কোথাও ভেঙেছে কিনা বুকের পাঁজর। 'নাহ্, ঠিকই আছে মনে হচ্ছে!'

মুসার কথায় কান নেই কিশোরের। টর্চের আলোয় পরীক্ষা করে দেখছে হাতলটা।

'দেখেছ?' বলল কিশোর। 'হাতলের ছিদ্রে আটকে আছে স্ক্রুগুলো। মাথার খাঁজে খোঁচার দাগ।'

'ঘষা লেগেছে হয়ত কোন কারণে। গত পনেরো দিনে অনেকবার টানা হয়েছে ওটা ধরে। পুরানো জিনিস। সইতে পারেনি। খুলে এসেছে।'

'আমি অন্য কথা ভাবছি,' বলল কিশোর। 'খুলে আসতে সাহায্য করা হয়নি তো? মানে, ঢিল করে রাখা হয়নি তো?'

'খালি সন্দেহ!' বলল মুসা। 'দরজা খুলতে না পারলে ভেতরে ঢুকব কি করে? ফিরেই যেতে হবে।'

'না। ঢোকার অন্য কোন পথ বের করতে হবে। ওই যে,' পাশে আঙুল তুলে দেখাল কিশোর। 'জানালা। ওদিক দিয়ে চেষ্টা করে দেখি, চল।'

বারান্দার এক প্রান্তে চলে এল দু'জনে। দেয়ালে বড় বড় জানালা, ফ্রেঞ্চ উইণ্ডো। আঙিনার দিকে মুখ করে আছে। মোট ছয়টা। ঠেলেঠুলে দেখল ওরা। পাঁচটাই ভেতর থেকে আটকানো। একটা পাল্লার ছিটকিনি ভাঙা। আধইঞ্চি মত ফাঁক হয়ে আছে। ধরে টান দিল কিশোর। জোর লাগল না, হাঁ হয়ে খুলে গেল পাল্লা। ভেতরে উঁকি দিল সে। গাঢ় অন্ধকার।

টর্চের আলো ফেলল কিশোর। লম্বা একটা টেবিল চোখে পড়ল। চারপাশে চেয়ার। টেবিলের শেষ মাথায় কয়েকটা বাসন পড়ে আছে।

'ডাইনিং রুম,' নিচু গলায় বলল কিশোর। 'এদিক দিয়ে ঢুকতে পারব।'

জানালা টপকে ভেতরে এসে ঢুকল দু'জনে। আলো ফেলে দেখল কি কি আছে ঘরের ভেতরে। দেয়ালের একপাশে বসানো কাঠের বড় দেয়াল আলমারি। পাশে কয়েকটা তাক।

'দরজা কয়েকটা,' বলল কিশোর। 'কোনটা দিয়ে যাব?'

'ফিরে গেলেই ভাল...ওরেব্বাপরে!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা। কথা বেরোল না আর। গলা টিপে ধরেছে যেন কেউ।

'কি, কি হল?' কাছে সরে এল কিশোর।
'ও-ওই যে!' তোতলাচ্ছে মুসা। 'ও-ওটা!'
মুসার নির্দেশিত দিকে তাকাল কিশোর। স্থির হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। আবছা আলোয় দেখল, লম্বা একটা মেয়ে চেয়ে আছে তাদের দিকে। পরনে তিনশো বছর আগের পোশাক। গলায় দড়ির ফাঁস। দড়ির অন্য মাথা বুকের ওপর দিয়ে ঝুলছে, নেমে এসেছে মাটিতে।
অপলকে চেয়ে আছে মুসা আর কিশোর। মেয়েটাও চেয়ে আছে ওদের দিকে।
মুসা ধরেই নিয়েছে, ওটা প্রেতাত্মা। বাড়ি ছিল ইংল্যাণ্ডে। ফাঁসি দিয়ে মরেছে, ওই যার কথা বলেছে হ্যারি প্রাইস।
দীর্ঘ কয়েকটা মুহূর্ত। তারপর কিশোর বলল, 'আমি বললেই সরাসরি ওটার ওপর আলো ফেলবে!...ফেল!'
নড়ে উঠল মেয়েটা। নড়ে উঠল একটা চকচকে কি যেন।
একই সঙ্গে ঘুরে গেল দুটো টর্চ।
কিন্তু কোথায় মেয়ে! একটা বড় আয়নার ওপর আলো পড়েছে। প্রতিফলিত হয়ে এসে লাগছে দু'জনের চোখে।
'আয়না!' অবাক গলায় বলল মুসা। 'তারমানে আমাদের পেছনে রয়েছে মেয়েটা!'
পাঁই করে ঘুরল মুসা। আলো ফেলল পেছন দিকে। নেই। কোন মেয়ে নেই। শুধু দেয়াল।
'চলে গেছে!' মুসার গলায় ভয়। 'আমিও যাচ্ছি। এই ভূতের আড্ডায় আর আমি নেই!' পা বাড়াল সে।
'দাঁড়াও!' সঙ্গীর হাত চেপে ধরল কিশোর। 'আয়নার দিকে চেয়েছিলাম আমরা। মেয়েটেয়ে নয়, চোখের ভুলও হতে পারে। বেশি তাড়াহুড়ো করে ফেলেছি। আরও সাবধান হওয়া উচিত ছিল আমাদের।'
'হলে না কেন? ক্যামেরা তো তোমার কাঁধেই। ছবি তুললে না কেন?'
'ভুলেই গিয়েছিলাম ক্যামেরার কথা।' নিজের ওপরই বিরক্ত কিশোর।
'মনে থাকলেও লাভ হত না। ছবি ওঠে না ভূতের। ওরা তো অশরীরী।'
অশরীরীর প্রতিবিম্ব হয় না,' মনে করিয়ে দিল কিশোর। 'মানে দাঁড়াচ্ছে, সে অশরীরী নয়। আয়নার ভেতরে ছিল, তাই বা বিশ্বাস করি কি করে! আয়না-ভূতের কথা শুনিনি কখনও! আবার যদি দেখা দিত মেয়েটা!'
'দেখা না দিলেই ভাল,' জোরে বলল মুসা, ভূতকে শোনাল যেন। 'আর দাঁড়িয়ে থেকে লাভ কি হবে? কি দেখবে? টেরর ক্যাসলে ভূত আছে, এটা প্রমাণ হয়ে গেল। চল, ফিরে গিয়ে সব জানাই মিস্টার ক্রিস্টোফারকে।'
'এখুনি ফিরে যাব কি? মাত্র তো এলাম। আরও অনেক কিছু জানার আছে।

নীল ভূতকে না দেখে যাব না। ছবি তুলব ওটার,' স্থির শান্ত গলা কিশোরের।

কিশোর ভয় পাচ্ছে না, সে অত ঘাবড়াচ্ছে কেন?--নিজেকে ধমক লাগাল মুসা। কাঁধ ঝাঁকাল। 'ঠিক আছে। আচ্ছা, এক কাজ করলে তো পারি? এ ঘর থেকেই চকের চিহ্ন রেখে যাই আমরা।'

'ঠিক বলেছ! হল কি আমার! সব খালি ভুলে যাচ্ছি!'

খোলা জানালাটার কাছে এগিয়ে গেল কিশোর। এটা দিয়েই ঢুকেছে ওরা। পাল্লায় বড় করে একটা প্রশ্নবোধক আঁকল। ডাইনিং টেবিলে আঁকল একটা। তারপর গিয়ে দাঁড়াল আয়নার সামনে। প্রশ্নোধক আঁকবে। 'আমরা এ ঘরে ছিলাম, জানবে হ্যানসন আর রবিন।'

'আমরা আর ফিরে না গেলে, তখন তো?' প্রশ্ন করল মুসা।

জবাব দিল না কিশোর। আয়নায় প্রশ্নেবোধক আঁকার চেষ্টা করল। প্রথমবারে চকের দাগ বসল না ঠিকমত। দ্বিতীয়বার জোরে চাপ দিয়ে আঁকতে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ঘটল একটা অদ্ভুত কাণ্ড। নিঃশব্দে পেছনে সরে গেল আয়না, দরজার পাল্লার মত। ওপাশে প্যাসেজ। গাঢ় অন্ধকারে ঢাকা।

পনেরো

অবাক হয়ে অন্ধকার প্যাসেজের দিকে চেয়ে আছে দু'জন।

'ইয়াল্লা!' বলে উঠল মুসা। 'একটা গোপন পথ!'

'আয়নার পেছনে লুকানো!' ভুরু কুঁচকে গেছে কিশোরের। 'ভেতরে ঢুকব, দেখবে, কি আছে!'

মুসা প্রতিবাদ করার আগেই প্যাসেজে পা রাখল কিশোর। টর্চের আলোয় দেখা গেল, সরু লম্বা একটা প্যাসেজ। দু'পাশে অমসৃণ পাথরের দেয়াল। প্যাসেজের শেষ মাথায় একটা দরজা।

'এস,' ফিরে মুসাকে ডাকল কিশোর। 'কোথায় আমাদেরকে নিয়ে যায় প্যাসেজটা, দেখি।'

দ্বিধায় পড়ে গেল মুসা। প্যাসেজে ঢোকাটা মোটেই পছন্দ হচ্ছে না তার। এদিকে অন্ধকার ঘরে একা থাকতেও চায় না। শেষে ঢুকেই পড়ল।

আলো ফেলে দু'পাশের দেয়াল দেখল কিশোর। আয়না বসানো দরজাটা পরীক্ষা করল। সাধারণ দরজা, কাঠের পাল্লা। এক পাশে পাল্লার সমান একটা আয়না বসানো। কোন নব নেই, ছিটকিনি নেই।

'আশ্চর্য!' বিড়বিড় করল কিশোর। 'বন্ধ করে আবার খোলে কি করে! নিশ্চয় গোপন কোন ব্যবস্থা আছে!'

ঠেলে পাল্লাটা বন্ধ করে দিল কিশোর। মোলায়েম একটা ক্লিক করে আটকে

গেল পাল্লা।

'সেরেছে।' চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'বন্দি হয়ে গেলাম!'

'হুমম!' আপনমনেই মাথা দোলাল কিশোর। পাল্লার ধারে আঙুল চালিয়ে দেখল, কোন খাঁজ আছে কিনা, ধরে টান দেয়া যায় কিনা। কিছু নেই। দরজার ফ্রেম, পাল্লা মসৃণ করে চাঁছা। ফ্রেমের মধ্যে নিখুঁত ভাবে বসে গেছে পাল্লাটা, ফাঁক নেই।

'কোন না কোন উপায় আছেই খোলার,' বিড়বিড় করল কিশোর। 'ওপাশ থেকে তো খুব সহজেই খুলে গেল! ব্যাপারটা কি?'

'সেটা তুমি বোঝ,' বলল মুসা। 'আবার সহজে খুলে গেলেই বাঁচি! বেরিয়ে যেতে চাই আমি।'

'তেমন জরুরি অবস্থায় পড়লে ভেঙেই বেরোতে পারব। কাঠ বেশি পুরু না। ভাঙার দরকার পড়বে মনে হয় না। প্যাসেজের আরেক দিকে তো পথ রয়েছেই।'

কিছু একটা বলতে গিয়েও থেমে গেল মুসা। ঘুরে রওনা হয়ে গেছে গোয়েন্দাপ্রধান।

'দু'পাশের দেয়ালে আঙুলের গাঁট দিয়ে টোকা দিচ্ছে কিশোর, এক পা দু'পা করে এগিয়ে চলেছে। 'নিরেট,' এক সময় বলল সে। হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। 'শুনতে পাচ্ছ!'

দাঁড়িয়ে পড়ল মুসাও। কান পাতল।

অর্গান বাজছে। বহুদূর থেকে ভেসে আসছে যেন শব্দটা। কাঁপা কাঁপা। সেই সঙ্গে মিশেছে তীক্ষ্ণ ক্যাঁচকোঁচ আর চাপা চিৎকার। এর আগের বার যেমন শুনেছিল মুসা, ঠিক তেমনি। পরিবর্তন নেই।

'নীল ভূত!' চাপা গলায় বলল গোয়েন্দা সহকারী। 'অর্গান বাজাচ্ছে!'

একদিকের দেয়ালে কান চেপে ধরল কিশোর। ধরে রইল দীর্ঘ এক সেকেণ্ড। সরে এল। 'দেয়াল ভেদ করেই যেন আসছে আওয়াজ! মানে কি? দেয়ালের ঠিক ওপাশেই আছে অর্গানটা!'

'বলতে চাইছ, এই দেয়ালের ওপাশেই আছে ভূতটা!' আঁতকে উঠল মুসা।

'আমার তাই ধারণা,' বলল কিশোর। 'যে করেই হোক, আজ ওর ছবি তুলবই। সম্ভব হলে কথাও বলব।'

'কথা বলবে?' গোঙানি বেরোল মুসার গলা থেকে। 'ভূতের সঙ্গে কথা বলবে!'

'যদি ধরতে পারি।'

'আমরা ধরার আগেই যদি আমাদেরকে ধরে? ঘাড় মটকে দেয়?'

'সে-ভয় কম,' জোর দিয়ে বলল কিশোর। 'এ-পর্যন্ত কারও কোন ক্ষতি করেনি ওটা। রেকর্ড নেই। এর ওপর অনেকখানি নির্ভর করছি আমি। বিছানায় শুয়ে শুয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনেক ভেবেছি। একটা ধারণা জন্মেছে মনে। পরীক্ষা

করে দেখব আজ। আর খানিক পরেই জানব, ধারণাটা ঠিক কিনা।'

'যদি ভুল হয়? হঠাৎ যদি আজ ঠিক করে ভূতটা, তার দল বাড়াবে, তাহলে?'

'তখন মেনে নেব ভুল করেছি,' শান্ত গলায় বলল কিশোর। 'একটা আগাম কথা বলছি। আর কয়েক মুহূর্ত পরেই তীব্র আতঙ্ক এসে চেপে ধরবে আমাদেরকে।'

'কয়েক মুহূর্ত পরে!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'তাহলে এখন কি বোধ করছি?'

'অস্বস্তি।'

'চল পালাই। দু'জনে ছুটে গিয়ে ধাক্কা দিলে ভেঙে যাবে পাল্লা। লাগাব ছুট?'

'না,' মুসার হাত চেপে ধরল কিশোর। 'অস্বস্তি, ভয় কিংবা আতঙ্ক কারও কোন ক্ষতি করে না। ওগুলো এক ধরনের অনুভূতি। আতঙ্কিত হয়ে উল্টোপাল্টা কিছু করে না বসলে, কোন ক্ষতিই হবে না তোমার।'

জবাবে কিছু একটা বলতে গিয়েও থেমে গেল মুসা। অদ্ভুত এক পরিবর্তন ঘটছে প্যাসেজে। বাজনার শব্দ আর নিজেদের কথাবার্তায় মগ্ন থাকায় এতক্ষণ খেয়াল করেনি ব্যাপারটা। কুয়াশা! আজব এক ধরনের ধোঁয়াটে কুয়াশা উদয় হয়েছে হঠাৎ। মেঝেতে কুয়াশা, দেয়ালের ধার ঘেঁষে কুয়াশা, সিলিঙে কুয়াশা।

ওপরে নিচে আলো ফেলল মুসা। উজ্জ্বল আলোয় দেখা গেল, পাক খাচ্ছে কুয়াশা, কুণ্ডলী পাকিয়ে ভাসছে বাতাসে। কোথা থেকে আসছে, বোঝা যাচ্ছে না। বাড়ছে ধীরে ধীরে। কুয়াশার ভেতর অদ্ভুত কিছু আকৃতি দেখতে পেল যেন সে।

'দেখ দেখ!' কাঁপা গলায় বলল মুসা। 'বিচ্ছিরি সব মুখ! ওই, ওই যে একটা ড্রাগন...একটা বাঘ...ওরেব্বাপরে! ভয়ানক এক জলদস্যু...'

'থাম!' বাধা দিয়ে বলল কিশোর। 'আমিও দেখছি ওসব! ছাতে বসে ভেসে যাওয়া মেঘের দিকে চাইলেও দেখতে পাবে ওই কাণ্ড। এই কুয়াশা কোন ক্ষতি করবে বলে মনে হয় না। তবে আতঙ্ক আসছে।'

সঙ্গীর হাতে হাতের চাপ বাড়াল কিশোর। কিশোরের হাত চেপে ধরল মুসা। ঠিকই বলেছে গোয়েন্দাপ্রধান। হঠাৎ তীব্র আতঙ্ক এসে ভর করল মনে, ছড়িয়ে পড়তে লাগল যেন সারা শরীরে। পায়ের তালু থেকে মাথার চাঁদি পর্যন্ত সব জায়গায়। অদ্ভুত শিরশিরে এক অনুভূতি চামড়ায়, কুঁচকে যাবে যেন। ছুটে পালাতে চাইছে সে। শক্ত করে তার হাত ধরে রেখেছে কিশোর, যেতে দিচ্ছে না। একই অনুভূতি হচ্ছে কিশোরেরও, কিন্তু পাথরের মত অটল দাঁড়িয়ে আছে সে।

আতঙ্কের একটা স্রোতের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে যেন ওরা। খেয়াল করল, কুয়াশা বাড়ছে, ঘন হচ্ছে। কুণ্ডলী পাকাচ্ছে, ঘুরছে ফিরছে, ভাসছে বাতাসে। সৃষ্টি করছে আজব আজব সব আকৃতি। 'কুয়াশাতঙ্ক,' অল্প অল্প কাঁপছে কিশোরের গলা। কিন্তু মুসার বাহুতে আঙুলের বাঁধন শিথিল হচ্ছে না সামান্যতম। 'অনেক বছর আগে এখানে ঢুকে এর কবলে পড়েছিল কে একজন। রেকর্ড আছে। লোক

ভূতানর শেষ অস্ত্র টেরর ক্যাসলের। চল, ওপাশ দিয়ে বেরিয়ে পড়ি এবার। নীল ভূতকে ধরতে হবে। ও হয়ত ভেবে বসে আছে, এতক্ষণে ভয়ে অবশ হয়ে গেছি আমরা।'

'আমি যাব না,' কোনমতে বলল মুসা। দাঁতে দাঁত ঠোকাঠুকি করছে। 'আমার শরীর অবশ! কিছুতেই পা নাড়াতে পারছি না!'

কি ভাবল কিশোর। তারপর বলল, 'শোন, খামোকা ভয় পেয় না। ভাবনা-চিন্তা করে কি বুঝেছি আমি জান? বুঝেছি, টেরর ক্যাসল সত্যিই ভূতুড়ে…'

'সেকথাই তো তোমাকে বোঝাতে চেয়েছি এত দিন!'

'…তবে ভূতুড়ে করে তোলার পেছনে রয়েছে একজন মানুষ। জীবন্ত মানুষ। জন ফিলবি নিজে। যে আত্মহত্যা করেছে বলে লোকের ধারণা।'

'বল কি!' এতই অবাক হয়েছে মুসা, আতঙ্ক ভুলে গেছে।

'ঠিকই বলছি। ভূত সেজে এতগুলো বছর বাস করে আসছে টেরর ক্যাসলে। লোককে ভয় দেখিয়ে তাড়িয়েছে।

'কিন্তু তা কি করে হয়?' বিশ্বাস করতে পারছে না মুসা। 'আমরাও তো কয়েকবার ঢুকলাম ক্যাসলে। কখনও তার দেখা পাইনি। তাছাড়া খাবার? লোকের চোখ এড়িয়ে কি করে জোগাড় করে?'

'জানি না। দেখা হলে জিজ্ঞেস করব। আসলে লোককে ভয় দেখিয়ে তাড়ানো পর্যন্তই, এর বেশি কিছু করে না সে। কারও কোন ক্ষতি করে না। ক্যাসলটা তার দখলে থাকলেই খুশি। আতঙ্ক গেছে?'

'আরে! হ্যাঁ! চলে গেছে! আর ভয় পাচ্ছি না! পা-ও উঠছে। যেদিকে নিয়ে যাব, যাবে।'

'চল তাহলে। নীল ভূতের সঙ্গে দেখা করি।'

পা বাড়াল কিশোর। পেছনে চলল মুসা। ভয় কেটে গেছে। অবাক হয়ে ভাবছে, এতগুলো বছর একা টেরর ক্যাসলে কি করে বাস করল জন ফিলবি! আরও অনেক প্রশ্ন এসে ভিড় করছে মনে, কিন্তু জবাব খুঁজে পাচ্ছে না ওগুলোর।

প্যাসেজের শেষ মাথায় দরজার কাছে চলে এল ওরা। অবাক কাণ্ড! ধাক্কা দিতেই খুলে গেল পাল্লা। ওপাশে গাঢ় অন্ধকার। কি আছে না আছে, আলো না জ্বেলে বোঝার উপায় নেই। হঠাৎ বেড়ে গেল যেন বাজনার শব্দ। দেয়ালে প্রতিহত হচ্ছে। একটা বড় ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে ওরা।

'প্রোজেকশনরুম,' ফিসফিস করে মুসার কানের কাছে বলল কিশোর। 'আলো জ্বেল না। চমকে দিতে হবে ওকে।'

দেয়ালের ধার ঘেঁষে পাশাপাশি এগিয়ে চলল দু'জনে। একটা কোণে এসে ঠেকল।

হঠাৎ গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল মুসা। নরম হালকা কিছু একটা তার মুখ-

মাথা পেঁচিয়ে ধরেছে। টেনে সরাতে গিয়েই বুঝল, মখমলের ছেঁড়া পর্দার কাপড়।

কোণ ঘুরে আবার এগোল ওরা। কয়েক পা এগিয়েই থমকে দাঁড়াল কিশোর। হাত চেপে ধরল মুসা। ভাঙা অর্গানের সামনে নড়াচড়া করছে ম্লান নীল আলো। অন্ধকারেই বুঝতে পারল মুসা, ক্যামেরা রেডি করছে তার সঙ্গী।

'পা টিপে টিপে এগোবে,' ফিসফিস করে বলল কিশোর। 'ওর ঠিক পেছনে গিয়ে দাঁড়াব। ছবি তুলব।'

কাঁপা কাঁপা আলোটার দিকে চেয়ে রইল মুসা। হঠাৎই দুঃখ হল জন ফিলবির জন্যে। বেচারা! এতগুলো বছর নিরাপদে কাটিয়ে বুড়ো বয়েসে একটা ধাক্কা খাবে। মুখোশ খুলে যাবে টেরর ক্যাসলের ভূতের।

ওকে ভয় পাইয়ে দিতে হবে,' ফিসফিসিয়ে বলল মুসা। 'নাম ধরে ডাকলেই তো পারি। বোঝাতে পারি, আমরা ওর শত্রু নই, বন্ধু।'

'ভাল কথা,' সায় দিল কিশোর। 'তবে এখন না। আরও কাছে গিয়ে ডাকব।'

নীল আলোর দিকে আবার এগিয়ে চলল ওরা।

'মিস্টার ফিলবি!' হঠাৎ জোরে ডাক দিল কিশোর। 'মিস্টার ফিলবি, আমরা আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই। বন্ধু।'

কিছুই ঘটল না। বেজেই চলল অর্গান, কাঁপতে থাকল নীল আলো।

'মিস্টার ফিলবি!' আরও কয়েক পা এগিয়ে আবার ডাকল কিশোর। 'আমি কিশোর পাশা। আমার সঙ্গে মুসা আমান। আপনার সঙ্গে শুধু কথা বলতে চাই।'

থেমে গেল বাজনা।

জোরে কেঁপে উঠল একবার আলোটা। তারপর চলতে শুরু করল। ধীরে ধীরে উঠে যাচ্ছে উপরের দিকে। ছাতের কাছে গিয়ে ঝুলে রইল।

আলোটার দিকে চেয়ে আছে কিশোর আর মুসা। এই সময়ই টের পেল, কেউ এসে দাঁড়িয়েছে তাদের পেছনে। ওরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই ঘটল ঘটনা। ক্যামেরা হাতেই ধরা রইল কিশোরের। জ্বলে উঠল মুসার হাতের টর্চ। জালে আটকা পড়ে গেল দু'জনে। মাথার ওপর থেকে নেমে এসেছে জাল। এতই আচমকা, কিছু করারই সুযোগ পেল না ওরা। কাছেই দাঁড়িয়ে আছে দু'জন আরব।

ছুটতে গেল মুসা। জালের খোপে পা বেধে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল কার্পেটে ঢাকা মেঝেতে। পড়েই গড়ান খেল। পিছলে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করল জালের তলা থেকে। পারল না। আরও পেঁচিয়ে গেল। জালে আটকা পড়লে মাছের কেমন লাগে, অনুভব করতে পারল সে।

'কি-শো-র!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'আমাকে ছাড়াও!'

সাড়া এল না।

ঘাড় ফেরাল মুসা। টর্চটা হাতেই ধরা আছে। জ্বালল আবার। বুঝল, কেন সাড়া দিল না কিশোর।

আরেকটা জালে তারই মত আটকে পড়েছে কিশোর। ময়দার বস্তার মত ওকে তুলে নিয়েছে দুই আরব। একজন ধরেছে পায়ের দিক, আরেক জন কাঁধ। এগিয়ে যাচ্ছে দরজার দিকে।

জালের ভেতর আটকা পড়ে ছটফট করছে মুসা। নিজেকে ছাড়ানর চেষ্টা করে ব্যর্থ হল। গড়াগড়ি করে ছাড়াতে গিয়ে আরও জড়িয়ে ফেলল নিজেকে।

চিত হয়ে পড়ে রইল মুসা। ছাতের কাছে এখনও আছে নীল আলো। কাঁপছে। গোয়েন্দা সহকারীর করুণ অবস্থা দেখে নীরব হাসিতে ফেটে পড়ছে যেন।

ষোলো

ম্লান হতে হতে এক সময় মিলিয়ে গেল নীল আলো। গাঢ় অন্ধকার চেপে ধরল যেন মুসাকে। নিজেকে ছাড়ানর চেষ্টা করল সে আরেকবার। পারল না। আরও বেশি শক্ত হল জালের জট। টর্চটা খসে গেছে হাত থেকে। খুঁজে বের করার উপায় নেই।

কায়দামত আটকেছি—ভাবল মুসা। বুড়ো এক অভিনেতাকে ধরতে এসে নিজেরাই ধরা পড়ে গেছে। খুব সুবিধের লোক মনে হল না দুই আরবকে। ওরা তাদের জন্যে অপেক্ষা করছিল অন্ধকারে।

হ্যানসন আর রবিনের কথা ভাবল মুসা। গিরিখাতে বাঁকের ওপাশে অপেক্ষা করছে ওরা। ওদের সঙ্গে কি আর কখনও দেখা হবে? আর কোন দিন কি বাড়ি ফিরে যেতে পারবে সে? মা-বাবার সঙ্গে দেখা হবে?

জীবনে এমন বিপদে আর পড়েনি মুসা। ভাবছে। এইসময় দেখা গেল আলো। এগিয়ে আসছে দুলেদুলে। কাছে এসে দাঁড়াল লম্বা এক লোক। হাতে একটা বৈদ্যুতিক লণ্ঠন। সিল্কের আলখেল্লা গায়ে।

ঝুঁকল লোকটা। হাতের লণ্ঠন তুলে ভাল করে দেখল মুসাকে। নিষ্ঠুর এক জোড়া চোখ, কেমন ঘোলাটে চাহনি।

হাসল লোকটা। ঝকঝক করে উঠল সোনার দাঁত। 'বোকা ছেলে! আর সবার মত ভয় পেয়ে চলে গেলেই ভাল করতে। এখন মরবে।' জবাই করার ভঙ্গিতে নিজের গলায় আঙুল চালাল লোকটা। বিচ্ছিরি ঘড়ঘড়ে একটা আওয়াজ করল।

ইঙ্গিতটা বুঝল মুসা। দুরুদুরু করে উঠল বুকের ভেতর। 'কে আপনি?' গলা দিয়ে কোলা ব্যাঙের আওয়াজ বেরোল তার। 'এখানে কি করছেন?'

'কি করছি?' হাসল লোকটা। 'পাতালে গেলেই বুঝতে পারবে।'

লণ্ঠন নামিয়ে রাখল লোকটা। উবু হয়ে দু'হাতে ধরে তুলে নিল মুসাকে। যেন একটা কোলবালিশ, এমনি ভাবে, কাঁধে ফেলল মুসার ভারি দেহটা। লণ্ঠনটা

আবার হাতে তুলে নিয়ে এগোল যেদিক থেকে এসেছিল।

কাঁধে ঝুলে থেকে চলেছে, কোথায় চলেছে, বুঝতে পারল না মুসা। একটা দরজা পেরোল লোকটা, প্যাসেজ পেরোল। একটা সিঁড়ির মাথায় এসে পৌঁছুল। ঘুরে ঘুরে নেমে গেছে সিঁড়ি। নেমে চলল লোকটা। অনেক ধাপ পেরিয়ে একটা করিডরে এসে পৌঁছুল। বাতাস ঠাণ্ডা, কেমন ভেজা ভেজা। করিডর পেরোল, আরও কয়েকটা দরজা পেরিয়ে এসে ছোট একটা ঘরে ঢুকল। জেলখানার সেলের মত ঘর। নিশ্চয় মাটির তলায়, অনুমান করল মুসা। দেয়ালে গাঁথা মরচে পড়া কয়েকটা রিং-বোল্ট।

সাদা বস্তার মত কি একটা পড়ে আছে এক কোণে। কাছে বসে আছে একজন আরব, বেঁটেটা। বিশাল এক ছুরিতে শান দিচ্ছে।

'আবদাল কোথায়?' আলখেল্লাধারী লোকটা জিজ্ঞেস করল। ধপাস করে সাদা বস্তাটার পাশে নামিয়ে রাখল মুসাকে।

'সিলভিয়াকে ডাকতে গেছে,' ভারি গলা আরবটার। ঘড়ঘড়ে আওয়াজ বেরোয় কথা বলার সময়। 'সিলভিয়া আর জিপসি কাটি লুকিয়ে রেখেছে মুক্তাগুলো। ছেলেদুটোকে নিয়ে কি করা যায়, সবাই বসে আলোচনা করব।'

'কিছুই করার দরকার নেই,' বলল এশিয়ান। 'এই ঘরে রেখে বাইরে থেকে দরজায় তালা দিয়ে চলে যাব। কেউ কখনও খুঁজে পাবে না ওদেরকে। মরে ভূত হয়ে যাবে শিগগিরই। টেরর ক্যাসল আগলে রাখবে।'

'মন্দ হবে না,' হাসল আরব। গলায় কফ আটকে আছে যেন। 'তবে, ছুরিটায় কষ্ট করে শান দিয়েছি। একটু ব্যবহার না করলে কেমন দেখায়?'

দেখছে মুসা, বুড়ো আঙুলে ছুরির ধার পরীক্ষা করছে আরবটা। সামান্য নড়ে উঠল সাদা বস্তা। আড়চোখে দেখল মুসা। বুঝল, ওটা বস্তা নয়। জালে আটকানো গোয়েন্দাপ্রধান কিশোর পাশা।

'বড় দেরি করছে,' বলল আরবটা। 'যাই দেখি, সিলভিয়া কোথায়,' উঠে দাঁড়াল সে। ছুরিটা ঢুকিয়ে রাখল কোমরের খাপে। একবার চাইল মেঝেতে পড়ে থাকা ছেলে দুটোর দিকে। আলখেল্লাধারীকে বলল, 'এস আমার সঙ্গে। গোপন পথটা পরিষ্কার করতে হবে। আমরা এসেছিলাম, তার কোন প্রমাণ থাকা চলবে না। এদেরকে নিয়ে ভাবনা নেই। বেরোতে পারবে না জাল থেকে।'

'ঠিক। তাড়াতাড়ি করা দরকার আমাদের,' লণ্ঠনটা দেয়ালের বোল্ট রিঙে ঝোলাল আলখেল্লা। আলো পড়ছে এখন ছেলেদুটোর ওপর।

বেরিয়ে গেছে লোকদুটো। মিলিয়ে গেল ওদের পায়ের আওয়াজ। ভারি পাথর ঘষা লাগার আওয়াজ হল। তারপর সব চুপচাপ।

'মুসা,' ডাকল কিশোর, 'ঠিকঠাক আছ?'

'ঠিকঠাক বলতে কি বোঝাতে চাইছ?' নিরস গলায় বলল মুসা। 'হাড়টাড়

ভাঙেনি, এটুকু ঠিক আছি।'

'ভাল,' কিশোরের গলায় ক্ষোভ, নিজের প্রতি। 'বোকার মত তোমাকে এই বিপদে এনে ফেললাম! নিজের বুদ্ধির ওপর খুব বেশি ভরসা ছিল আমার!'

'খামোকা ভেবে মন খারাপ কোরো না,' বলল মুসা। 'একদল ডাকাত এসে আস্তানা গেড়েছে টেরর ক্যাসলে, কি করে জানবে? কোন প্রমাণ তো পাওয়া যায়নি আগে।'

'হ্যাঁ। আমি শিওর ছিলাম, টেরর ক্যাসলের সব কিছুর মূলে শুধু জন ফিলবি। কল্পনাই করিনি, আর কেউ থাকতে পারে। যা হবার হয়ে গেছে, ওসব নিয়ে ভেবে লাভ নেই। তা হাত-পা নাড়াতে পারছ কিছু?'

'পারছি। শুধু বাঁ হাতের কড়ে আঙুল।'

'আমি ডান হাত নাড়াতে পারছি,' বলল কিশোর। 'নিজেকে ছাড়াতে পারব মনে হয়। ঠিক জায়গায় পৌঁছাচ্ছি কিনা, দেখ।'

কাত হয়ে পড়ে আছে কিশোর। মুসা আছে চিত হয়ে। শরীরটাকে বান মাছের মত বাঁকিয়ে-চুরিয়ে অনেক কষ্টে কাত হল। কিশোরের পিঠ এখন তার দিকে। দেখল, কোমরের বেল্টে আটকানো সুইস ছুরিটা খুলে ফেলতে পেরেছে কিশোর। বিভিন্ন আকারের ছোটবড় আটটা ব্লেড, ছোট একটা স্ক্রু-ড্রাইভার আর একটা কাঁচিও লাগানো আছে বিশেষ কায়দায়।

কাঁচি দিয়ে জালের কয়েকটা ঘর কেটে ফেলল কিশোর। কাটা জায়গা দিয়ে বের করতে পারছে ডান হাত।

'বাঁ পাশে কাটতে পার কিনা দেখ,' ফিসফিস করে বলল মুসা। 'ওই হাতটা বের করতে পারলেই কেল্লা ফতে।'

ছোট্ট কাঁচি। নাইলনের শক্ত সুতায় তৈরি জাল। এগোতে চাইছে না কাজ। থামল না কিশোর। চেষ্টা চালিয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত মুক্ত করে ফেলল দুই হাত। কোমরের কাছে কাটা শুরু করল। নিচের দিকে ফুট খানেক কেটে ফেলেছে, এই সময় শোনা গেল পায়ের আওয়াজ। তাড়াতাড়ি কাটা জায়গাটা টেনে পিঠের দিকে নিয়ে গিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল সে। দু'হাত ঢুকিয়ে নিল জালের ভেতর।

কয়েক মুহূর্ত পরেই ঘরে এসে ঢুকল এক বুড়ি। হাতে বৈদ্যুতিক লণ্ঠন। পরনে জিপসি-আলখেল্লা। কানে সোনার বড় বড় রিঙ।

'বেশ বেশ,' হাঁসের মত প্যাকপ্যাক করে উঠল যেন বুড়িটা। 'খুব আরামেই আছ দেখছি, বাছারা। জিপসি কাটির হুঁশিয়ারি তো মানলে না, বিপদে পড়বেই। আমার কথা শুনলে আর এ-অবস্থা হত না।'

লণ্ঠন তুলে দেখছে বুড়ি। হঠাৎই মনে হল তার, বড় বেশি স্থির হয়ে আছে ছেলেদুটো। কোন কথা বলছে না, নড়ছে না চড়ছে না। সন্দেহ হল। মুসার কাছে এসে দাঁড়াল। সন্দেহজনক কিছু দেখল না। ঘুরে কিশোরের পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

'তুমি একটু কাত হও তো, বাছা,' প্যাঁকপ্যাঁক করে উঠল হাঁসের গলা। 'পারছ না? বেশ, এই যে, আমি সাহায্য করছি।' লণ্ঠনটা নামিয়ে রাখল সে।

জালের কাটা দেখে ফেলল বুড়ি। কিশোরের ডান হাতের কব্জি চেপে ধরল। মোচড় দিয়ে মুঠো থেকে নিয়ে নিল ছুরিটা। 'বাহ্, চমৎকার! পালানর চেষ্টা করছিলে, ছানারা!' হঠাৎ গলা চড়িয়ে ডাকল সে, 'সিলভি! দড়ি, দড়ি নিয়ে এস! শক্ত করে বাঁধতে হবে ছানাদুটোকে, নইলে উড়ে যাবে!'

'আসছি,' সাড়া এল মহিলাকণ্ঠে। কথায় ব্রিটিশ টান।

খানিক পরেই লম্বা একটা মেয়ে এসে দাঁড়াল দরজায়। হাতে দড়ির বাণ্ডিল।

'চালাক, ভীষণ চালাক ছানাদুটো,' বলল বুড়ি। 'শক্ত করে বাঁধতে হবে। এস, সাহায্য কর আমাকে।'

অসহায় ভাবে চেয়ে চেয়ে সব দেখল মুসা। কোন সাহায্যই করতে পারল না বন্ধুকে। কিশোরের মাথা, গলা আর পিঠের জাল কাটল ওরা প্রথমে। দু'হাত পিঠের কাছে নিয়ে শক্ত করে বাঁধল দড়ি দিয়ে। টেনে হিঁচড়ে জাল খুলে নিল। তারপর বাঁধল পা। কব্জির বাঁধনের ওপর আরেক টুকরো দড়ি বাঁধল। একটা রিং বোল্টের সঙ্গে বেঁধে দিল দড়ির আরেক মাথা।

লম্বা এক টুকরো দড়ি দিয়ে মুসাকে বাঁধা হল এরপর। ওর জাল কাটা নেই কোন জায়গায়। কাজেই জাল ছাড়িয়ে নেবার দরকার মনে করল না বুড়ি। ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে আনল কয়েক প্যাঁচ। বেঁধে দিল দড়ির দুই প্রান্ত।

'আর পালাতে পারবে না ছানারা,' বলল হাঁস-গলা। 'কোন দিনই আর বেরোতে পারবে না এখান থেকে। ওরা জবাই করে ফেলতে চাইছে, কিন্তু তার দরকার হবে বলে মনে হয় না। বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে গেলে, এই পাতাল থেকে কখনই আর বেরোতে পারবে না এরা।'

'আমার দুঃখ হচ্ছে ওদের জন্যে,' বলল ইংরেজ মেয়েটা। 'চেহারা দেখে ভাল ছেলে বলেই মনে হচ্ছে।'

'খামোকা দরদ দেখিও না,' তীক্ষ্ণ হল হাঁসের গলা। 'সবাই একমত হয়েছে, ওদেরকে ছেড়ে দেয়া চলবে না। দলের সবার বিরুদ্ধে যেতে পার না তুমি। চল, কেটে পড়ি। সময়ই নেই। চিহ্নটিহ্নগুলো মুছে দিয়ে যেতে হবে আবার।'

দেয়ালে ঝোলানো লণ্ঠনটা নামিয়ে নিল বুড়ি। বেরিয়ে গেল।

মেঝেতে রাখা লণ্ঠনটা তুলে ছেলেদুটোর দিকে আবার তাকাল মেয়েটা। 'কেন এলে, ছেলেরা? কেন আর সবার মত দূরে থাকলে না? অর্গানের বাজনা একবার শুনেই পালায় লোকে, আর ফেরে না। কিন্তু তোমরা ঠিক ফিরে এলে আবার।'

'তিন গোয়েন্দা কখনও হাল ছাড়ে না,' গম্ভীর গলা কিশোরের।

'অনেক সময় হাল ছেড়ে দেয়াই ভাল,' বলল মেয়েটা। 'তো থাক, আমরা

যাই। আশা করি, অন্ধকারে ভয় পাবে না। গুডবাই।'

'যাবার আগে,' বলল কিশোর। আশ্চর্য শান্ত গলা। অবাক হল মুসা। 'একটা প্রশ্নের জবাব দেবে?'

'কি?' জানতে চাইল মেয়েটা।

'এখানে কি কুকাজ করছ তোমরা? কিসের দল?'

'বাহ্, সাহস আছে তোমার, ছেলে!' হাসল মেয়েটা। 'কুকাজ, না? হ্যাঁ, কুকাজই। আমরা স্মাগলার। এশিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে দামি জিনিসপত্র স্মাগল করে আনি, বিশেষ করে মুক্তো। টেরর ক্যাসল আমাদের হেডকোয়ার্টার। লোকে জানে ভূতুড়ে বাড়ি। ধারেকাছে ঘেঁষে না। লুকানর দারুণ জায়গা। বহু বছর ধরে আছি আমরা এখানে।'

'কিন্তু ওই বিচিত্র পোশাক পরে আছ কেন? যেন সার্কাসের সং। লোকের নজরে পড়ে যাবে সহজেই।'

'আমাকে দেখলে তো নজরে পড়ব,' বলল মেয়েটা। 'হয়েছে, আর না। একটার জায়গায় তিনটা প্রশ্নের জবাব দিয়ে ফেলেছি। এবার যেতে হচ্ছে। গুডবাই।'

লণ্ঠন হাতে বেরিয়ে গেল মেয়েটা। শব্দ তুলে বন্ধ হয়ে গেল সেলের দরজা। ঘুটঘুটে অন্ধকার চেপে ধরল দুই গোয়েন্দাকে। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে মুসার। শুকনো ঠোঁটের ওপর একবার বুলিয়ে আনল জিভ।

'কিশোর!' খসখসে গলা মুসার! 'চুপ করে আছ কেন? কিছু বল। নইলে পাগল হয়ে যাব! যা নীরব!'

'উঁ!' আনমনা শোনাল কিশোরের গলা। ভাবছিলাম। খাপেখাপে মেলাতে চাইছি কিছু ব্যাপার।

'ভাবছিলে! এই সময়ে!'

'হ্যাঁ। খেয়াল করেছ, এখান থেকে বেরিয়ে ডানে ঘুরেছে জিপসি কাটি? ওদিকে করিডর ধরে এগিয়েছে?'

'তাতে কি?'

'আমরা যেদিক থেকে এসেছি তার উল্টো দিকে গেল। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠেনি সে। আরও পাতালে নেমেছে। এর মানে কি? মাটির তলা দিয়ে বেরোনর কোন গোপন পথ আছে। কোন গোপন সুড়ঙ্গ। ওই পথে বেরোলে লোকের চোখে পড়বে না।'

কিশোরের মাথা ঠাণ্ডা রাখার ক্ষমতা দেখে অবাক না হয়ে পারল না মুসা। পাতালের এই সেলে, এই বিপদে থেকেও ঠিক খাটিয়ে নিচ্ছে মগজের ধূসর কোষগুলোকে!

'অনেক কিছুই তো ভাবছ,' বলল মুসা। 'এখান থেকে কি করে বেরোনো

যায়, ভেবেছ কিছু?'

'না, সোজাসাপ্টা জবাব দিল কিশোর। 'ভেবে লাভ নেই। পরিষ্কার বুঝতে পারছি, বাইরের সাহায্য ছাড়া এখান থেকে বেরোনর কোন উপায় নেই আমাদের। বাস্তবকে স্বীকার করে নেয়াই ভাল। আমাকে ক্ষমা কর, মুসা। আমার ভুলের জন্যেই ঘটল এটা।'

চুপ করে রইল মুসা। বলার নেই কিছুই। কি বলবে?

ঘুটঘুটে অন্ধকার। অখণ্ড নীরবতা। কাছেই কোথাও হুটোপুটি করছে একটা ইঁদুর, শোনা যাচ্ছে। আরেকটা একঘেয়ে শব্দও কানে আসছেঃ টুপ্…টুপ্…টুপ্!

সময় নিয়ে খুব আস্তে আস্তে পড়ছে পানির ফোঁটা। তারই আওয়াজ।

সতেরো

উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে রবিন আর হ্যানসন। এক ঘন্টা হল গেছে মুসা আর কিশোর, ফেরার নাম নেই। প্রতি পাঁচ মিনিট পরপর রোলস রয়েস থেকে বেরিয়ে আসছে রবিন, ব্ল্যাক ক্যানিয়নের দিকে তাকাচ্ছে। বন্ধুরা আসছে কিনা দেখছে। প্রতি দশ মিনিট পর পর বেরোচ্ছে হ্যানসন।

'মাস্টার রবিন,' আর থাকতে না পেরে বলল হ্যানসন। 'মনে হয় এবার যাওয়া উচিত।'

'কিন্তু গাড়ি ফেলে যাবার হুকুম নেই আপনার,' মনে করিয়ে দিল রবিন। 'চোখের আড়াল করা নিষেধ।'

'তা হোক,' বলল হ্যানসন। 'মানুষের জীবনের কাছে রোলস রয়েস কিচ্ছু না। আমি ওঁদের খুঁজতে যাব।'

গাড়ি থেকে বেরিয়ে এল হ্যানসন। বুট খুলে বড় একটা বৈদ্যুতিক লণ্ঠন বের করল। পাশে এসে দাঁড়িয়েছে রবিন। তার দিকে চেয়ে বলল, 'আমি যাচ্ছি।'

'আমিও যাব,' বলল রবিন।

'ঠিক আছে, আসুন যাই।'

বুট বন্ধ করতে গিয়েও থেমে গেল হ্যানসন। বড় একটা হাতুড়ি বের করে নিল, দরকার পড়তে পারে। একটা অস্ত্র তো বটেই।

রওনা হয়ে পড়ল দু'জনে। দ্রুত হাঁটছে হ্যানসন। ভাঙা পা নিয়ে তার সঙ্গে পেরে উঠছে না রবিন। তবু কাছাকাছি থাকার যথেষ্ট চেষ্টা করছে।

টেরর ক্যাসলের বারান্দায় এসে উঠল দু'জনে। দরজা বন্ধ। হাতল ঝুলে পড়ে আছে। খোলা যাবে না পাল্লা।

'এদিক দিয়ে ঢোকেননি,' বলল হ্যানসন। 'তাহলে? কোন্দিক দিয়ে গেলেন?' এদিক ওদিক তাকাল সে। 'ওই জানালাগুলো দেখা দরকার!'

পাল্লাখোলা জানালাটার সামনে এসে দাঁড়াল দু'জনে। আলো ফেলল রবিন। চোখে পড়ল সাদা চকে বড় করে আঁকা একটা '?'। 'এদিক দিয়েই গেছে ওরা!' সংক্ষেপে চিহ্নটার মানে বুঝিয়ে বলল রবিন।

জানালা দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল হ্যানসন। রবিনকে ঢুকতে সাহায্য করল। লণ্ঠনের আলোয় বুঝতে পারল ওরা, একটা ডাইনিং রুমে এসে ঢুকেছে।

'এরপর? এরপর কোন্দিকে গেলেন!' খুঁজছে হ্যানসন। 'কয়েকটা দরজা। কোথাও চিহ্ন নেই।'

এই সময় রবিনের চোখ পড়ল আয়নার ওপর। বড় করে আঁকা রয়েছে প্রশ্নবোধক চিহ্ন? দেখাল হ্যানসনকে।

'অসম্ভব!' বলল হ্যানসন। 'আয়নার ভেতর দিয়ে কেউ যেতে পারে না! দেখতে হচ্ছে!'

আয়নাটার চারপাশে খুঁজে কোন ফোকর দেখতে পেল না ওরা। দরজার চিহ্ন নেই। কি ভেবে আয়নার ফ্রেম ধরে ঠেলা দিল হ্যানসন। ওদেরকে অবাক করে দিয়ে খুলে গেল পাল্লা। ওপাশে অন্ধকার প্যাসেজ।

'গোপন দরজা!' বিস্মিত হ্যানসন। 'নিশ্চয় এদিক দিয়ে গিয়েছেন। চলুন, আমরাও যাই।'

গাঢ় অন্ধকার সুড়ঙ্গে ঢুকতে ভয় পাচ্ছে রবিন, আবার একাও থাকতে পারবে না ডাইনিং রুমে। শেষে যাওয়াই ঠিক্ করল।

ঢুকে পড়ল হ্যানসন। পেছনে ঢুকল রবিন। দেয়ালে প্রশ্নবোধক। চিহ্ন ধরে ধরে এগিয়ে চলল দু'জনে।

ও-প্রান্তের দরজায়ও আঁকা আছে প্রশ্নবোধক। ওপাশে চলে এল দু'জনে। প্রোজেকশন রুমে।

উজ্জ্বল আলোয় ঘরের অনেকখানিই পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। একসারি চেয়ারের ধার দিয়ে পাইপ অর্গানটার দিকে এগোল ওরা। একটা কোণে এসে থামল। নিচে পড়ে আছে পর্দার একটা ছেঁড়া টুকরো। কোণ ঘুরে এগিয়ে চলল আবার। কিন্তু কই? কিশোর আর মুসার আর তো কোন চিহ্ন নেই।

এই সময়ই জিনিসটা চোখে পড়ল রবিনের। একটা সিটের তলায় পড়ে আছে। এগিয়ে গিয়ে তুলে নিল সে। 'হ্যানসন! মুসার টর্চ! নতুন কিনেছে!'

'নিশ্চয় ইচ্ছে করে ফেলে যাননি!' আশপাশের মেঝে পরীক্ষা করল হ্যানসন। 'দেখুন দেখুন। ধুলোতে অনেক পায়ের ছাপ। আর এই যে এখানে, কেমন আধ খাপচা হয়ে সরে গেছে ধুলো। মনে হচ্ছে, ধস্তাধস্তি হয়েছে। আরে, একটা চকের টুকরো পড়ে আছে।'

বেশ কয়েকটা জুতোর ছাপ একদিকে এগিয়ে যেতে দেখল ওরা। পুরু হয়ে জমেছে ধুলো. তাতে ছাপগুলো স্পষ্ট। ছাপ ধরে ধরে এগোল দু'জনে।

সামনের সারির সিটগুলোর সামনে দিয়ে এগিয়ে গেছে ছাপ।

একদিকের শেষ প্রান্তে এসে মোড় নিয়েছে ডানে। পর্দার পাশের একটা দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেছে ওপাশে। একটা হলে এসে থামল ওরা। এক ধার থেকে নেমে গেছে সিঁড়ি। আরেক দিক থেকে উঠে গেছে। দু'দিকেই গেছে জুতোর ছাপ।

'এবার কোন্‌দিকে যাব!' দ্বিধায় পড়ে গেল হ্যানসন। উঠে যাবার সিঁড়িটার দিকে চেয়ে আছে। এগিয়ে গেল। কয়েক ধাপ উঠেই থেমে গেল আবার। মাথা নাড়ল। 'কেন যেন মনে হচ্ছে, এদিক দিয়ে যায়নি। চলুন, আগে নেমে গিয়েই দেখি।'

নেমে যাবার সিঁড়ির কাছে চলে এল ওরা। নিচের দিকে আলো ফেলেই চেঁচিয়ে উঠল রবিন, 'ওই যে, চকভাঙা! এদিক দিয়েই গেছে!'

'মাস্টার কিশোরের ওপর শ্রদ্ধা বেড়ে যাচ্ছে আমার,' বলল হ্যানসন।

'কি হয়েছে ওদের, আপনার কি মনে হয়?' সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বলল রবিন।

'ঠিক বুঝতে পারছি না,' বলল হ্যানসন। 'তবে এটা ঠিক, নিজেরা হেঁটে যাননি। তাহলে দেয়ালে প্রশ্ন এঁকে যেতেন। চক ভেঙে ফেলে যেতে হত না। নিশ্চয় বয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।'

'কিন্তু কে বয়ে নিয়ে যাবে! ভূত? আরে, কোথায় নেমে চলেছি! পাতালেই চলে এসেছি মনে হচ্ছে!'

'হ্যাঁ। ওই যে, দেখতে পাচ্ছেন? একটা ঘরে শেষ হয়েছে সিঁড়ি। ইংল্যাণ্ডে দেখেছি আমি এ-ধরনের ঘর। একটা দুর্গে। পাতাল কক্ষ। ডানজন বলে!'

সিঁড়ি শেষ। ঘরটা থেকে তিনটে পথ তিন দিকে গেছে। তিনটে সুড়ঙ্গ মুখ দেখা যাচ্ছে। গাঢ় অন্ধকার ওপাশে। চকের চিহ্নও নেই আর। কোন্‌দিকে যাবে?

'এক কাজ করি, বাতি নিভিয়ে দিই,' বলল হ্যানসন। 'সত্যি সত্যি ভূত হলে অন্ধকারে নড়াচড়া করার কথা। দেখি, কি ঘটে!'

গাঢ় অন্ধকারে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল দু'জনে। কানখাড়া। যে-কোন রকম শব্দ শোনার জন্যে তৈরি। অখণ্ড নীরবতা। বাতাস কেমন ভেজা ভেজা, ভ্যাপসা গন্ধ।

কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে বলতে পারবে না। হঠাৎই কানে এল অতি মৃদু একটা শব্দ। পাথরের ওপর আলতো ঘষা লাগল যেন আরেকটা পাথরের। কয়েক মুহূর্ত পরেই দেখা গেল ম্লান আলো। মাঝখানের সুড়ঙ্গের ভেতরে। ওদিক থেকেই এসেছে শব্দ।

কেঁপে কেঁপে এগিয়ে আসছে আলো। বোকামি করে বসল হ্যানসন। চেঁচিয়ে ডাকল, 'মাস্টার কিশোর!'

ধমকে থেমে গেল আলোর অগ্রগতি। ঘুরে যাচ্ছে। ক্ষণিকের জন্যে দু'জনের চোখে পড়ল মেয়েমানুষের পোশাকের এক অংশ। তারপরই দ্রুত মিলিয়ে গেল

আলো।

'ছুটুন।' রবিনের উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে উঠল হ্যানসন। ছুটতে শুরু করেছে। জ্বলে উঠেছে তার হাতের আলো। ঢুকে পড়ছে মাঝখানের সুড়ঙ্গে।

হ্যানসনের পিছু পিছু ছুটল রবিন! বেশিদূর এগোতে পারল না। শোফারের পিঠের ওপর এসে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছে হ্যানসন। সামনে দু'পাশে পাথরের দেয়াল। পথ নেই। এখানে এসে শেষ হয়ে গেছে সুড়ঙ্গ।

'ওই দেয়ালের ভেতর দিয়ে চলে গেছে!' বিশ্বাস করতে পারছে না যেন হ্যানসন। আলো তুলে পরীক্ষা করে দেখল। না, কোন গোপন দরজা আছে বলে তো মনে হয় না! কি ভেবে কোমরে ঝোলানো হাতুড়িটা খুলে নিল। ঠোকা দিল সামনের পাথরের দেয়ালে। 'আরে! ফাঁপা! নিশ্চয় গোপন দরজা!'

হাতুড়ি দিয়ে জোরে জোরে ঘা মারতে লাগল হ্যানসন। শিগগিরই একটা ফোকর হয়ে গেল। শক্ত তারের জালে সিমেন্টের পুরু আস্তর লাগিয়ে তৈরি হয়েছে দরজার পাল্লা। ওপাশ থেকে আটকানো। দেখে মনে হয় সাংঘাতিক ভারি, আসলে পাতলা। জোরে জোরে কয়েক ঘা মেরেই জাল থেকে সিমেন্ট খসিয়ে দিল সে। কাঁধ দিয়ে জোরে জোরে ধাক্কা মারতে লাগল তারের জালে। কয়েক ধাক্কায়ই ফ্রেম থেকে খুলে চলে এল জালের এক প্রান্ত । ওই প্রান্ত ধরে টেনে ফ্রেম সহ খুলে নিয়ে এল সে।

'চলুন, দেখি!' বলেই সামনে পা বাড়াল হ্যানসন। 'বেটি এদিক দিয়েই গেছে!'

হ্যানসনের সঙ্গে পেরে উঠছে না রবিন। শেষে তার একটা হাত ধরে টেনে নিয়ে চলল শোফার।

খানিকটা এগোতেই সরু হয়ে এল সুড়ঙ্গ। সোজা হতে পারছে না হ্যানসন। মাথা নুইয়ে হাঁটতে হচ্ছে। যতই সামনে বাড়ছে, আরও সরু হয়ে আসছে সুড়ঙ্গ। মাথা নিচু করে রাখতে হচ্ছে, সামনের দিকে সোজা চাইতে পারছে না। হঠাৎ তার কপালে এসে জোরে লাগল একটা কি যেন! চমকে যাওয়ায় হাত থেকে খসে পড়ে গেল লণ্ঠন। নিভে গেল।

রবিনের গালেও এসে বাড়ি মারল কি একটা। ফড়ড়ড়ড় করে মাথার ওপর দিয়ে উড়ে চলে গেল কি যেন! 'বাদুড়!' চেঁচিয়ে উঠল সে। 'হ্যানসন, বাদুড়ে আক্রমণ করেছে!'

'চুপ করুন, শান্ত হোন!' নিচু হয়ে বসে লণ্ঠন খুঁজছে হ্যানসন! 'ভয় পাবেন না!'

কিন্তু ভয় না পেয়ে উপায় আছে! একের পর এক এসে গায়ে মাথায় মুখে ঝাঁপিয়ে পড়ছে ওগুলো। একটা এসে বসে পড়ল মাথায়। চেঁচিয়ে উঠল রবিন।

থাবা মেরে ওটাকে ফেলে দিতে দিতে বলল, 'হ্যানসন ভ্যাম্পায়ার! সব রক্ত খেয়ে নেবে!'

'ওসব গপ্পো!' অভয় দেবার চেষ্টা করল হ্যানসন। 'ভ্যাম্পায়ার বলে কিছু নেই!'

লণ্ঠনটা খুঁজে পেয়েছে হ্যানসন। সুইচে খামোকাই টেপাটেপি করল। বার দুই ঝাঁকুনি দিল। জ্বলল না আলো। 'বিগড়ে গেছে! বিপদেই পড়ে গেলাম দেখছি! এখন উপায়!'

হঠাৎ কোমরে হাত পড়ল রবিনের, শক্ত কিছু একটার ছোঁয়া লাগল। 'আছে হ্যানসন, মুসার টর্চটা কোমরে ঝুলিয়ে নিয়েছিলাম।'

জ্বলে উঠল টর্চ। উড়ন্ত প্রাণীগুলোকে দেখল ওরা। একটা দুটো নয়, ডজন ডজন। বড় আকারের কাকাতুয়া। আলো দেখে তীক্ষ্ণ চিৎকার করতে করতে ছুটে এল। ঠোকর মেরে টর্চের কাঁচই ভেঙে দেবে হয়ত। তাড়াতাড়ি আলো নিভিয়ে ফেলল রবিন।

বাড়ছেই পাখির সংখ্যা। স্রোতের মত একটানা আসছে সরু সুড়ঙ্গ দিয়ে। আছড়ে পড়ছে গায়ে মুখে মাথায়। ইতিমধ্যেই কপালে গোটা দুয়েক ঠোকর লেগে গেছে রবিনের। ফুলে গেছে। ব্যথা করছে। চোখে ঠোকর লাগলে সর্বনাশ!

'এগোনো যাবে না,' চেঁচিয়ে বলল হ্যানসন। 'আসুন, পিছিয়ে যাই।'

অন্ধকারে রবিনের হাত ধরে টেনে নিয়ে চলল হ্যানসন। অনেকখানি পিছিয়ে আসার পর কমে এল পাখি। সুড়ঙ্গের শেষ মাথায় হুটোপুটি করছে পাখিগুলো, তীক্ষ্ণ চিৎকার ভেসে আসছে। আলো জ্বাললেই হয়ত উড়ে আসবে। তারের দরজাটা তুলে আগের জায়গায় দাঁড় করিয়ে দিল হ্যানসন। সেই ছোট ঘরটায় ফিরে এল আবার দু'জনে।

'মনে হচ্ছে, ওই সুড়ঙ্গ দিয়ে নেয়া হয়নি ওঁদেরকে,' বলল হ্যানসন। 'দরজা খোলার সময় নামিয়ে রাখতেই হত। সেই সুযোগে কোন চিহ্ন রেখে যেতেন মাস্টার কিশোর।'

একমত হল রবিন।

হ্যানসন বলল আবার, 'এই ঘর পর্যন্ত এসেছেন ওঁরা, কোন সন্দেহ নেই। তারপর কোন একটা সুড়ঙ্গ দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। মাঝখানেরটা দেখলাম। এবার বাঁয়েরটা দেখি। তারপর ডানেরটা দেখব। ডাকতে ডাকতে এগোব। কাছে পিঠে থেকে থাকলে, সাড়া দেবেন।'

মন্দ বলেনি হ্যানসন। তার কথায় সায় জানাল রবিন।

টর্চ জ্বালল রবিন। প্রথমে এগিয়ে গেল বাঁয়ের সুড়ঙ্গের দিকে। সুড়ঙ্গ মুখে দাঁড়িয়ে জোরে চেঁচাল হ্যানসন, 'মাস্টার কিশোর, আপনারা কোথায়!

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জবাব এল। কার গলা, চিনতে ভুল হল না হ্যানসনের।

রবিনের হাত থেকে টর্চটা নিয়ে এগোল।

কয়েক গজ এগোতেই দেয়ালের গায়ে দরজা দেখতে পেল। ঠেলা দিতেই খুলে গেল ভেজানো পাল্লা। আলো ফেলল ভেতরে।

'উফফ! রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে!' বাঁধনের দাগগুলো জোরে জোরে ডলছে মুসা।

কিশোরও ডলছে। সংক্ষেপে হ্যানসন আর রবিনকে জানাল, কি করে বন্দি হয়েছিল ওরা।

'তাড়াতাড়ি যাওয়া দরকার,' বলল হ্যানসন। 'পুলিশ নিয়ে আসতে হবে। ভয়ানক লোক ওরা! আমরা না এলেই তো গেছিলেন!'

ছোট ঘরটায় ফিরে এল ওরা। সিঁড়ির দিকে পা বাড়াতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল কিশোর। কান পাতল। 'কিসের শব্দ!'

'পাখি!' বলল রবিন।

'পাখি!'

কি করে মেয়েমানুষটাকে তাড়া করে গিয়েছিল, জানাল রবিন। সবশেষে জানাল, কি পাখি ওগুলো।

'কাকাতুয়া!' কিশোরের মুখ দেখে মনে হল বোলতা হুল ফুটিয়েছে। 'জলদি, এস আমার সঙ্গে!' এক থাবায় হ্যানসনের হাত থেকে টর্চটা নিয়ে ছুটল। ঢুকে পড়ল মাঝের সুড়ঙ্গে।

আগে আগে ছুটছে কিশোর, পেছনে অন্যেরা। তারের দরজাটার কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। একটানে ফেলে দিল পাল্লা। আবার ছুটল। ওর সঙ্গে তাল রাখাই কঠিন হয়ে পড়েছে অন্যদের জন্যে।

ক্রমে সরু হয়ে আসছে সুড়ঙ্গ। আলো দেখে উড়ে এল পাখির ঝাঁক। ঝুপ করে বসে পড়ল কিশোর। আলো নিভিয়ে দিল। সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে বলল, 'হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে হবে।'

এগিয়ে চলেছে ওরা। সবার আগে কিশোর। মাঝে মাঝে টর্চ জ্বেলে দেখে নিচ্ছে পথ। মাথার উপরে উড়ছে পাখিগুলো, হুটোপুটি করছে। বসার জায়গা পাচ্ছে না। অন্ধকারে বেরোনর পথ পাচ্ছে না। আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। আলো দেখলেই ডাইভ দিয়ে নেমে আসছে। তাড়াতাড়ি আবার নিভিয়ে দিতে হচ্ছে টর্চ।

এঁকেবেঁকে এগিয়ে গেছে সুড়ঙ্গ। একটা জায়গায় এসে আর বাঁক নেই, সোজা এগিয়েছে। সামনে অন্ধকার ফিকে হয়ে এসেছে। ওটাই সুড়ঙ্গমুখ।

কাঠের পাল্লা দিয়ে দরজা লাগানো হয়েছে সুড়ঙ্গমুখে। হাঁ করে খুলে আছে এখন পাল্লাদুটো। বেরিয়ে এল কিশোর। তারার আলোয় দেখল, বিরাট এক খাঁচায় এসে ঢুকেছে।

একে একে অন্যেরাও বেরিয়ে এল সুড়ঙ্গের বাইরে, খাঁচার ভেতরে।

'কাকাতুয়ার খাঁচা এটা,' বলল কিশোর। 'হ্যারি প্রাইসের পাখি।'

টেরর ক্যাসল থেকে ওই গোপন সুড়ঙ্গ চলে এসেছে পাহাড়ের তলা দিয়ে। ব্ল্যাক ক্যানিয়ন থেকে পাহাড় ঘুরে গেলে হ্যারি প্রাইসের বাড়ি কয়েক মাইল। অথচ পাহাড়ের তলা দিয়ে মাত্র কয়েক শো ফুট।

এগিয়ে গেল কিশোর। জোরে ঠেলা দিল খাঁচার দরজায়। ঝটকা দিয়ে খুলে গেল দরজা। বেরিয়ে এল বাইরে। সামনেই হ্যারি প্রাইসের বাংলো।

ফিসফিসিয়ে সঙ্গীদেরকে বলল কিশোর, 'চমকে দেব ওদের। চল, যাই।'

নিঃশব্দে বাংলোর দরজার কাছে এসে দাঁড়াল ওরা। বেলপুশ টিপে দিল কিশোর।

কয়েক মুহূর্ত পরেই খুলে গেল দরজা। দাঁড়িয়ে আছে হ্যারি প্রাইস। চোখে অবাক দৃষ্টি। কুৎসিত দেখাচ্ছে চকচকে টাক আর গলার কাটা দাগ। 'কি চাই?' ফিসফিসিয়ে বলল সে।

'কথা বলতে চাই,' বলল কিশোর।

'এত রাতে! এখন সময় নেই। ঘুমোতে যাব।'

'তাহলে হাজতে গিয়ে ঘুমোতে হবে, এখানে নয়,' এগিয়ে এল হ্যানসন। 'পুলিশকে ফোন করব।'

সতর্ক হয়ে উঠল হ্যারি প্রাইস। ভাবল এক মুহূর্ত। সরে জায়গা করে দিল। 'এস,' ফিসফিস করল সে। 'ভেতরে এস।'

ঘরে ঢুকল ওরা। টেবিলের ওপাশে বসে আছে একজন লোক। হালকা-পাতলা, লম্বায় পাঁচ ফুটের সামান্য বেশি হবে। হাতে তাস। বোঝা গেল, খেলা ফেলে দরজা খুলতে উঠেছে প্রাইস।

'রড মিলার, আমার বন্ধু,' পরিচয় করিয়ে দিল মিস্টার ফিসফিস। 'রড, এরা তিন গোয়েন্দা। টেরর ক্যাসলে ভূত আছে কিনা তদন্ত করছে। তো, ছেলেরা, ভূত-টুত দেখেছ কিছু ক্যাসলে?'

'হ্যাঁ,' বলল কিশোর। 'টেরর ক্যাসল রহস্য সমাধান করে ফেলেছি।'

কিশোরের আত্মবিশ্বাস দেখে অবাক হল মুসা আর রবিন। সত্যিই কি সমাধান করে ফেলেছে?

'তাই নাকি?' বলল মিস্টার ফিসফিস। 'তা রহস্যটা কি?'

'আপনারা দু'জন,' বলল কিশোর। 'হ্যাঁ, আপনারা দু'জনই টেরর ক্যাসলের ভূত। ভূতুড়ে করে রেখেছেন বাড়িটাকে। কয়েক মিনিট আগে আমাকে আর মুসাকে আপনারাই ধরে বেঁধেছেন। মরার জন্যে ফেলে রেখে এসেছেন অন্ধকার সেলে।'

ভুরু কুঁচকে গেছে প্রাইসের। ভাব দেখে মনে হল ধরে মারবে কিশোরকে।

হাতুড়ির হাতলে আঙুল চেপে বসল হ্যানসনের।

'খুব সাংঘাতিক অভিযোগ, খোকা,' বলল মিস্টার ফিসফিস। 'কিন্তু প্রমাণ করতে পারবে না।'

মুসারও তাই ধারণা, প্রমাণ করতে পারবে না কিশোর। হ্যারি প্রাইস কিংবা মিলার নয়, তাদেরকে বেঁধেছে দুই আরব দস্যু। সঙ্গে ছিল এক বুড়ি জিপসি আর একটা ইংরেজ মেয়ে।

'নিশ্চয় পারব,' জোর গলা কিশোরের। 'পায়ের জুতো দেখুন না। আমাকে বাঁধার সময়ই এঁকে দিয়েছি।'

চমকে উঠল প্রাইস আর মিলার। চোখ চলে গেল জুতোর দিকে। অন্যেরাও তাকাল।

চকচকে কালো চামড়ার জুতো। দু'জনেরই ডান পায়ের জুতোর মাথার কাছে সাদা চকে আঁকা '?'। তিন গোয়েন্দার ট্রেডমার্ক।

আঠারো

হ্যারি প্রাইস আর রড মিলার তো বটেই, মুসা, রবিন এমনকি হ্যানসনও অবাক হয়ে গেছে।

'কিন্তু...,' শুরু করেই থেমে গেল মুসা।

'বুঝতে পারলে না?' মুসার দিকে চেয়ে বলল কিশোর। 'মেয়েমানুষের পোশাক আর উইগ পরেছিল ওরা। আমাকে বাঁধার সময় ছুঁয়ে দেখেছিলাম। তখনই বুঝেছি, পুরুষের বুট। বুঝলাম, ছদ্মবেশ ধরেছে। পাঁচজনকে একবারও একসঙ্গে দেখিনি। তারমানে, দু'জনেই পাঁচজনের অভিনয় করেছে। এক কুমিরের ছানা সাতবার দেখানর মত, অনেকটা।'

'তারমানে...দুই আরব, দুই মহিলা আর এক আলখেল্লাঅলা, সব ওই দু'জনেরই কাণ্ড!' তাজ্জব হয়ে গেছে মুসা।

'ঠিকই বলেছে ও,' কিশোরের আগেই জবাব দিল হ্যারি প্রাইস। 'তোমাদের ভয় দেখাতে বার বার চেহারা বদলেছি। তবে, ক্ষতি করার কোন ইচ্ছে ছিল না আমাদের। বাঁধন খুলে দেবার জন্যেই আবার ফিরে গিয়েছিলাম। কিন্তু তোমাদের বন্ধুরা দেখে ফেলল। তাড়া খেয়ে ফিরে এসেছি।'

'আমরা খুনী নই,' বলল বেঁটে লোকটা, রড মিলার। 'স্মাগলারও না। ভূতও না। যা করেছি, সব তোমাদেরকে ভয় পাওয়ানর জন্যে।' মুখ টিপে হাসল সে।

'তবে আমি খুনী,' গম্ভীর দেখাচ্ছে প্রাইসকে। 'জন ফিলবিকে আমিই খুন করেছি!'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক,' এমন ভাবে বলল মিলার, যেন ভুলেই গিয়েছিল কথাটা।

'তবে বিশেষ কিছু এসে যায় না তাতে।'

'পুলিশের হয়ত এসে যাবে,' বলল হ্যানসন। কিশোরের দিকে চেয়ে বলল, 'চলুন আমরা যাই। পুলিশকে খবর দেই গিয়ে।'

'দাঁড়ান দাঁড়ান,' হাত তুলে বাধা দিল প্রাইস। 'একটু সময় দিন আমাকে জন ফিলবির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি আপনাদের।'

'জন ফিলবির ভূতের সঙ্গে তো?' ভুরু কুঁচকে গেছে মুসার।

'ভূতই বলতে পার। ও নিজেই বলবে, তাকে কেন খুন করেছি আমি।'

আর কিছু কেউ বলার আগেই ঘুরে হাঁটতে শুরু করল ফিলবি। পাশের ঘরে চলে গেল।

তাড়াতাড়ি পা বাড়াল সেদিকে হ্যানসন।

'থামুন থামুন,' বাধা দিল মিলার। 'ভয় নেই, পালাবে না। মিনিট খানেকের ভেতরেই ফিরে আসবে। হ্যাঁ, কিশোর পাশা, এই যে নাও, তোমার ছুরি

'থ্যাংক্যু,' বলল কিশোর। আট ফলার ছুরিটা নিয়ে কোমরের বেল্টে আটকাল।

ঠিক এক মিনিট পরেই দরজায় এসে দাঁড়াল লোকটা। না, মিস্টার ফিসফিস নয়। তার চেয়ে বেঁটে, কিছু কম বয়েসী একজন লোক। পরিপাটি করে আঁচড়ানো ধূসর চুল। পরনে টুইডের জ্যাকেট। মুখে হাসি।

'গুড ইভনিং,' বলল লোকটা। 'আমি জন ফিলবি। আমাকে নাকি দেখতে চাও?'

মিলার ছাড়া আর সবাই হাঁ করে চেয়ে আছে। একেবারে চুপ। এমন কি কিশোরও চুপ হয়ে গেছে।

মিটি মিটি হাসছে মিলার। বলল, 'ও সত্যিই জন ফিলবি।'

হঠাৎই ব্যাপারটা বুঝে ফেলল কিশোর। মুখ দেখে মনে হল, পোকা গিলে ফেলেছে। 'আপনি জন ফিলবি, আপনিই হ্যারি প্রাইস, মিস্টার ফিসফিস, তাই না?'

'মিস্টার ফিসফিস!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'তা কি করে হয়' মিস্টার প্রাইসের চেয়ে বেঁটে, চুল আছে...'

'কিশোর ঠিকই বলেছে,' পকেট থেকে একটা উইগ বের করে পরে ফেলল ফিলবি। আবার মাথা টাক হয়ে গেল তার। বুক চিতিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল, লম্বা দেখাল একটু। হঠাৎ ফিসফিসে গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'একটু নড়বে না! প্রাণের ভয় থাকলে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাক!'

চমকে উঠল তিন গোয়েন্দা, হ্যানসনসহ। পরক্ষণেই বুঝল ব্যাপারটা। নিজেকে মিস্টার ফিসফিস প্রমাণ করল ফিলবি। অবাক হল তিন গোয়েন্দা, লোকটা কত বড় অভিনেতা, বুঝল এখন।

পকেট থেকে কি যেন একটা বের করল ফিলবি। প্লাস্টিক তৈরি। গলায় লাগিয়ে দিতেই গভীর কাটা দাগ হয়ে গেল। 'ছেলেরা, বুঝতে পেরেছ তো এবার?

জন ফিলবিকে হ্যারি প্রাইস বানিয়ে ফেলা কিছুই না। গলার স্বর বদলে ফেলি। শুধু বলি ভয়াবহ ফিসফিসে গলায়। কেউ ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করতে পারে না, আমিই জন ফিলবি।'

গলার নকল দাগ আর মাথার উইগটা খুলে আমার পকেটে রেখে দিল ফিলবি। 'এস, বস সবাই। তারপর বল, কে কি জানতে চাও। তবে, আগে আমিই বলে নিচ্ছি কিছু,' টেবিলে রাখা ছবিটা দেখিয়ে বলল, 'দেখছ, মিস্টার ফিসফিসের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছি আমি। কি করে করলাম? খুব সহজে। ফটোগ্রাফির একটা কৌশল অনেক বছর আগে, ছবিতে যখন অভিনয় করতাম, গলার স্বর খুব খারাপ ছিল তোতলাতাম। লোকের সঙ্গে কথা বলতেই লজ্জা লাগত। আশ্চর্য লোকের স্বভাব! এটাকেই দুর্বলতা ধরে নিল ওরা। ঠকাত। অনেক ভেবে চিন্তে শেষে নিজেকে মিস্টার ফিসফিস বানিয়ে নিলাম। ভয় পাওয়ানর মত চেহারা। গলায় কাটা দাগ দেখে ধরেই নিল লোকে, লোকটা ডাকাত-ফাকাত গোছের কিছু তার ওপর ভয়ঙ্কর ফিসফিসে গলা। বুঝে গেলাম, হ্যারি প্রাইসকে ভয় পায় লোকে ব্যস, তাকেই ম্যানেজারের পদটা দিয়ে দিলাম। এরপর থেকে টাকা পয়সা আদায় বা কোন কঠিন কাজ করার দরকার পড়লেই ফিসফিস সেজে হাজির হতাম লোকের সামনে। কেউ ধরতে পারেনি। লোকে জেনেছে জন ফিলবি আর হ্যারি প্রাইস আলাদা লোক। একমাত্র রড মিলার ছাড়া আর কেউ জানত না ব্যাপারটা। ও আমার মেকআপ ম্যান ছিল। ফিসফিস সাজার ফন্দিটা ওর মাথা থেকেই বেরিয়েছে,' থামল জন ফিলবি। হাসল। 'কেমন লাগছে শুনতে?'

'ভাল, ভাল,' বলে উঠল মুসা। 'বলে যান!'

'ভালই কাটছিল দিন,' বলে চলল ফিলবি! 'এই সময়ই এল টকিং-পিকচার। ভাবলাম, অভিনয়কেই বেশি গুরুত্ব দেবে লোকে। গলার স্বরে সামান্য খুঁত, সেটা মাপ করে দেবে। কিন্তু না, দিল না। ওটাকেই অস্ত্র বানিয়ে আমার মন গুঁড়িয়ে দিল। গরম লোহার শিক ঢুকিয়ে যেন ছ্যাঁকা দিয়ে দিল কলজেয়। ছেড়ে দিলাম অভিনয়। ঘরকুণো হয়ে গেলাম। এই সময়ই নোটিশ এল ব্যাংক থেকে, ঋণের দায়ে আমার বাড়ি দখল করে নেবে। ফিলবি ক্যাসল অন্যের হয়ে যাবে, ভাবতেই খারাপ লাগে আমার। বেপরোয়া হয়ে উঠলাম।' থামল একটু সে। তারপর বলল, 'ক্যাসল তৈরির সময়ই সুড়ঙ্গটা আবিষ্কার করেছি। ক্যাসল বানিয়ে শ্রমিকেরা চলে গেল। রড আর আমি ছাড়া আর কেউ জানত না এটা। সুড়ঙ্গের মাঝামাঝি একটা দরজা বানিয়ে নিলাম, তারের জাল আর সিমেন্ট দিয়ে। এখানে এই বাড়িটা বানালাম। লোকে জানল, এটা হ্যারি প্রাইসের বাড়ি। এক ঝড়ের রাতে পাহাড়ের ওপর থেকে আমার গাড়িটা ফেলে দিলাম নিচে। লোকের কাছে মরে গেল জন ফিলবি।

'ভূত-প্রেতগুলো বানালেন কখন?' জানতে চাইল কিশোর।

'শেষ ছবিটাতে অভিনয় করার সময়! ভেবেছিলাম, যেদিন ছবি মুক্তি পাবে, বন্ধুদেরকে দাওয়াত করে এনে মজা দেব। তা আর হল না। ছবি দেখে হাসাহাসি শুরু করল লোকে। মন খারাপ হয়ে গেল,' থামল ফিলবি। তারপর বলল, 'পরে খুব কাজে লেগেছে জিনিসগুলো। এমনিতেই পুরানো ধাঁচের ক্যাসল, ভেতরে অদ্ভুত সব জিনিসে ঠাসা। দেখেই গা ছমছম করে লোকের, ভয় পেতে শুরু করে। তারপর দুয়েকটা ভূত কিংবা প্রেতাত্মা সামনে হাজির হয়ে গেলে, ভিরমি খেতে বাকি থাকে শুধু,' হাসল সে। 'লোকে জানল ক্যাসলে ভূতের উপদ্রব আছে। ওরা আর ওদিকে মাড়াল না। পথটাও বন্ধ করে দিলাম পাথর ফেলে ফেলে। ক্যাসল আর বেচতে পারল না ব্যাংক। হাতে সময় পেলাম। বসে না থেকে দুষ্প্রাপ্য কাকাতুয়ার ব্যবসা শুরু করে দিলাম। কিছু টাকা জমেছে এখন আমার হাতে। আর সামান্য কিছু জমলেই ব্যাংকের টাকা পুরো শোধ করে দিতে পারতাম,' জোরে নিঃশ্বাস ফেলল ফিলবি। 'কিন্তু তোমরা বোধহয় তা হতে দিলে না!'

'মিস্টার ফিলবি,' এতক্ষণ মন দিয়ে অভিনেতার কথা শুনছিল কিশোর। 'আপনিই আমাদেরকে ফোন করেছিলেন, না? ভয় দেখাতে চেয়েছিলেন?'

মাথা ঝোঁকাল অভিনেতা। 'ভেবেছিলাম, এরপর আর ক্যাসলের ধারে কাছে আসবে না। কিন্তু সাহস অনেক বেশি তোমাদের!'

'কি করে জানলেন, সেরাতে আমরা যাব? আমাদের পরিচয় জানলেন কি করে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

মৃদু হাসল ফিলবি 'রড মিলার, স্পাইয়ের কাজটা ওই করেছে। ব্ল্যাক ক্যানিয়নের ধারে, একটা পাহাড়ের ঢালে ছোট একটা বাংলো আছে। ওটা তার বাড়ি! নিচে থেকে সহজে লোকের চোখে পড়ে না বাড়িটা। কাছাকাছি থাকে, ক্যাসলের ওপর নজর রাখতে সুবিধে তার। তোমাদেরকে দেখেছিল। সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোনে জানিয়েছে আমাকে,' থামল সে।

পাহাড়ের মাথায় টেলিভিশন এরিয়্যাল কে বসিয়েছে, বুঝতে আর অসুবিধে হল না তিন গোয়েন্দার।

'কিন্তু আমাদের নাম জানলেন কি করে?' আবার জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'বলছি,' হাত তুলল ফিলবি। 'কাগজে পড়েছি রোলস রয়েস প্রতিযোগিতার কথা। ব্ল্যাক ক্যানিয়নে গাড়িটাকে দেখল রড। আমাকে জানাল। তাড়াতাড়ি গিয়ে ঢুকলাম ক্যাসলে। ভয় দেখিয়ে তাড়ালাম তোমাদেরকে। সত্যি, ভয় পেতে দেরি করেছ তোমরা। আরও অনেক আগেই ভয় পেয়ে পালিয়েছে অন্যেরা। যাই হোক, তারপর ফিরে এলাম এখানে। টেলিফোন গাইডে খুঁজলাম তোমার নাম নেই। ধরেই নিলাম, টেলিফোন নেই তোমার। তবু শিওর হবার জন্যে ফোন করলাম ইনফরমেশনে। ওরা জানাল, আছে। আর কি? পেয়ে গেলাম নাম্বার।'

'অ,' মাথা চুলকাচ্ছে কিশোর। 'শুটকিকেও নিশ্চয় দেখেছিলেন মিস্টার মিলার?'

'শুটকি!' অবাক চোখে তাকাল ফিলবি।

'আমরা ছাড়াও আরও দুটো ছেলে এসেছিল। একজন রোগা-পাতলা ঢ্যাঙা। নীল একটা স্পোর্টস কার নিয়ে এসেছিল...'

'ও হ্যাঁ হ্যাঁ। শুটকি! ভাল নাম দিয়েছ!' হাহ্ হাহ্ করে হাসল ফিলবি।

উসখুস করছে রড মিলার। শেষে বলেই ফেলল, 'একটা খুব খারাপ কাজ করে ফেলেছিলাম সেদিন। আরেকটু হলেই সর্বনাশ হয়ে গেছিল! ওই যে পাথরের ব্যাপারটা। ক্যাসলের ওপরে পাহাড়ের মাথায় আমিই লুকিয়ে ছিলাম সেদিন ওখানে বসেই নজর রাখছিলাম তোমাদের ওপর। কতগুলো পাথরের আড়ালে ছিলাম। হঠাৎ পা লেগে হড়কে গেল একটা পাথর। চমকে উঠলাম। নিচে রয়েছ তোমরা। কি হল, দেখার জন্যে উঁকি দিলাম। আমাকে দেখে ফেললে তোমরা। ধরার জন্যে উপরে উঠতে লাগলে। লাফিয়ে সরে এসে ছুটলাম। কয়েকটা পাথর গড়িয়ে গিয়ে ধাক্কা লাগল আলগা পাথরের স্তূপে। ব্যস, নামল পাথর ধস। ওই জায়গাটাই এমন। তোমরা আটকে গেলে গুহায়। তাড়াতাড়ি নেমে গিয়ে গুহার বাইরে দাঁড়ালাম। কি করব না করব, দিশেহারা হয়ে পড়েছিলাম। ধরেই নিয়েছিলাম, চ্যাপ্টা হয়ে গেছ তোমরা। মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছিলাম ওখানেই। পাথরের ফাঁক গলে লাঠির মাথা বেরোতে দেখে কি যে খুশি লেগেছিল, বলে বোঝাতে পারব না,' থামল সে।

'গুহাটা না থাকলেই তো খতম করে দিয়েছিলেন!' গোমরা মুখে বলল মুসা।

'সত্যি বলছি,' বলল মিলার। 'ইচ্ছে করে ফেলিনি। ওটা নিতান্তই দুর্ঘটনা...'

এরপর আর কোন কথা চলে না। চুপ করে গেল মুসা।

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর। হঠাৎ মুখ তুলে বলল, 'কিন্তু কয়েকটা ব্যাপার পরিষ্কার হচ্ছে না এখনও!'

'কি ব্যাপার?' জানতে চাইল ফিলবি।

'আপনার সঙ্গে যেদিন দেখা করলাম,' বলল কিশোর। 'মিছে কথা বলেছেন। ঝোপ পরিষ্কার করেননি, অথচ বলেছেন করছিলেন। কেন? টেবিলে লেমোনেড রেডি রেখেছিলেন। কি করে জানলেন আমরা যাব?'

হাসল অভিনেতা, 'কি করে জানলাম? গুহা থেকে বেরোলে তোমরা। গাড়ি পর্যন্ত তোমাদেরকে অনুসরণ করে গিয়েছিল মিলার। বেশ জোরেই শোফারকে আমার এ-জায়গাটার নাম বলেছিলে। পাথরের আড়ালে লুকিয়ে শুনেছিল মিলার। খবর দিল আমাকে। লেমোনেড রেডি করলাম। জানালায় দাঁড়িয়ে দেখলাম, রোলস রয়েসটা আসছে। একটা মাচেটে নিয়ে চট করে গিয়ে ঢুকে পড়লাম একটা ঝোপে। হঠাৎ নাটকীয় ভাবে বেরিয়ে এসে, চমকে দিতে চেয়েছিলাম তোমাদেরকে। চাপ সৃষ্টি করতে চেয়েছিলাম স্নায়ুর ওপর। তারপর শোনালাম টেরর ক্যাসলে ভূত আমদানি করার কাহিনী,' হাসল ফিলবি। 'মুসা কিন্তু সত্যিই

ভয় পেয়ে গিয়েছিল।'

চট করে আরেক দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল মুসা।

'তোমাদেরকে ক্যাসল থেকে দূরে রাখার অনেক চেষ্টা করেছি,' আবার বলল ফিলবি। 'কিন্তু পারলাম না। বড় বেশি একরোখা ছেলে তোমরা। বেশি বাড়াবাড়ি করতে গিয়ে আজ ধরাই পড়ে গেলাম। এতই তাড়াহুড়ো করেছি, সুড়ঙ্গ মুখের দরজা বন্ধ করতে ভুলে গেছি। পাখিগুলো গিয়ে ঢুকল সুড়ঙ্গে। আরও ফাঁস করে দিল ভূতের পরিচয়।'

আবার ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। 'জিপসি বুড়ি সেজে কে গিয়েছিলেন? নিশ্চয় আপনার বন্ধু, মিস্টার মিলার?'

'হ্যাঁ। ভয় দেখাতে চেয়েছিলাম তোমাদেরকে,' বলল ফিলবি

'ভয় পাইনি, বরং কৌতূহল আরও বেড়ে গিয়েছিল সন্দেহও বাড়ল বুঝলাম, ভূত নয়, টেরর ক্যাসলে মানুষের বাস আছে। সেটা আরও স্পষ্ট করে দিল রবিনের তুলে আনা ছবি। আর্মার সুটে মরচে নেই, লাইব্রেরির বইয়ে ধুলো নেই। তার মানে, কেউ একজন নিয়মিত পরিষ্কার করে রাখে ওগুলো কে? কার এত দরদ জিনিসগুলোর জন্যে? আন্দাজ করলাম, একজনেরই হতে পারে সে আপনি, মিস্টার ফিলবি।...তবে, আজ রাতে কিন্তু বোকাই বানিয়ে ফেলেছিলেন আরব দস্যু সেজে। স্মাগলাররা ক্যাসলটাকে ঘাঁটি বানিয়েছে, প্রায় বিশ্বাসই করে ফেলেছিলাম।'

'হ্যাঁ, ঠিকই অনুমান করেছিলে। আমিই পরিষ্কার করি জিনিসপত্রগুলো আর কিছু জানার আছে?'

'অনেক!' বলে উঠল মুসা। 'জানতে চাই, জলদস্যুর ছবিটা সত্যিই কি চোখ টিপেছিল?'

'আমি টিপেছিলাম,' বলল ফিলবি। 'ছবিটার পেছনের দেয়াল আসলে কাঠের তৈরি। সাদা রঙ করা কাঠের একটা বোর্ড। টেনে খুলে আনা যায়। ঠেলে দিলেই আবার বসে যায় খাপে খাপে। বোর্ডটা সরিয়ে ছবির পেছনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। চোখের পেছনে ছোট গোল প্লাস্টিকের চাকতি সরিয়ে, ওই ছেদায় নিজের চোখ রেখেছিলাম। তুমি চাইতেই টিপলাম।'

'কিন্তু পরে ছবিটা ভালমত পরীক্ষা করে দেখেছি। রবিনও দেখেছে। কোন ছিদ্র ছিল না চোখের জায়গায়।'

'ওটা আরেকটা ছবি। একই রকম দেখতে। তোমরা ফিরে আসবে সন্দেহ করে সরিয়ে ফেলেছিলাম আগের ছবিটা।'

'কিন্তু নীল ভূত? ওটা কি দিয়ে বানালেন?' একের পর এক প্রশ্ন করে গেল মুসা। 'অর্গানের কাঁপা ভূতুড়ে বাজনা? আয়নার ভেতরে মেয়ে ভূত? ইকো হলের ঠাণ্ডা বায়ুপ্রবাহ?'

'বলতে খারাপই লাগছে,' বলল অভিনেতা। 'রহস্যগুলো আর রহস্য থাকবে না। ঠিক আছে, তবু বলছি...'

'কয়েকটা রহস্য এমনিতেও আর রহস্য নেই,' বাধা দিয়ে বলল কিশোর। 'আমি জানি, কি করে কি করেছেন। বরফের ভেতর দিয়ে কোন ধরনের গ্যাস প্রবাহিত করেছেন, দেয়ালের গোপন কোন ছিদ্র দিয়ে ওই ঠাণ্ডা গ্যাস ঢুকিয়ে দিয়েছেন ইকো হলে, হয়ে গেল ঠাণ্ডা বায়ুপ্রবাহ। বিচিত্র বাজনা, সেই সঙ্গে চেঁচামেচি, গোলমাল সৃষ্টি করা খুব সহজ। রেকর্ডকে উল্টো ঘোরানর ব্যবস্থা করেছেন, এই উল্টো বাজনা অ্যামপ্লিফাই করে ছড়িয়ে দিয়েছেন স্পীকারের সাহায্যে। নীল ভূত বানানোও সহজ। নীল লুমিনাস পেইন্ট মাখিয়ে নিয়েছেন পাতলা অয়েল পেপারে। সুতোয় কাগজের এক মাথা বেঁধে ঝুলিয়ে দিয়েছেন ওপর থেকে, সুতো ধরে টেনে নাচিয়েছেন ওটাকে। তারপর, কুয়াশাতঙ্ক, কোন ধরনের কেমিক্যাল পুড়িয়ে সৃষ্টি করেছেন এমন ধোঁয়া, এমন কোন ধরনের কেমিক্যাল, যেটার ধোঁয়ার গন্ধ নেই, দেয়ালের গোপন ছোট ছোট ছিদ্র দিয়ে চালান করে দিয়েছেন প্যাসেজে। কি, ঠিক বলছি তো?'

'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ,' মাথা ঝোঁকাল ফিলবি, 'না, মাথায় ঘিলু আছে তোমার, স্বীকার করতেই হবে!'

'আয়নার ভূত তো আপনি নিজেই,' আবার বলল কিশোর। মেয়ে মানুষের পোশাক পরে, প্যাসেজ দিয়ে গিয়ে পাল্লা খুলে দাঁড়িয়ে পড়েছেন। তারপর সুযোগ বুঝে চট করে আবার ঢুকে গেছেন প্যাসেজে, বন্ধ করে দিয়েছেন পাল্লা। খুব সহজ। কিন্তু একটা জিনিস বুঝতে পারছি না, কোন কৌশলে লোকের স্নায়ুর ওপর চাপ ফেলেছেন আপনি, অস্বস্তি, ভয়, শেষে আতঙ্ক এসে চেপে ধরে, কি করে করলেন?'

'আরও ভাব আরও ভাব, মাথা খাটিয়ে বের করার চেষ্টা কর, শেষ পর্যন্ত না পারলে, বলে দেব। এখন এস, কিছু জিনিস দেখাচ্ছি তোমাদের।'

সবাইকে পাশের ঘরে নিয়ে এল ফিলবি, বিরাট এক ড্রেসিং রুম। নানাধরনের উইগ, পোশাক আর মেকআপের সরঞ্জাম থরে থরে সাজানো রয়েছে কয়েকটা আলমারিতে। এক পাশে বিরাট এক র‍্যাকে অনেকগুলো গোল ক্যান।

'ওগুলোতে ফিল্ম,' ক্যানগুলো দেখিয়ে বলল ফিলবি। 'আমার অভিনয় করা সমস্ত ছবির একটা করে ফিল্ম। এক সময় কোটি কোটি লোককে অনেক আনন্দ দিয়েছি। অথচ আজ আমাকে ভূত সেজে লুকিয়ে থাকতে হচ্ছে লোকচক্ষুর আড়ালে!' কেমন বিষণ্ণ গলা অভিনেতার, সবারই মন ছুঁয়ে গেল, 'তা-ও রেহাই পেলাম না। তোমরা এলে। ছদ্মবেশ খুলে ফেললে আমার। কাল সকাল থেকেই পিলপিল করে লোক আসতে থাকবে। হাসাহাসি করবে, টিটকিরি দেবে।'

কেউ কোন কথা বলল না।

'তবে, গলার স্বর নিয়ে আর কেউ হাসতে পারবে না এখন,' আবার বলল ফিলবি। 'ওষুধ খেয়ে আর প্র্যাকটিস করে করে সারিয়ে ফেলেছি আমি।'

নিচের ঠোঁটে সমানে চিমটি কেটে চলেছে কিশোর।

'কিন্তু এত কষ্ট করে কি পেলাম!' অভিনেতার গলায় ক্ষোভ। 'আবার আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করবে লোকে। ক্যাসলটা আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবে ব্যাংক। এবার হয়ত সত্যিই আত্মহত্যা করতে হবে আমাকে!'

'মিস্টার ফিলবি,' হঠাৎ বলল কিশোর, 'ওই ক্যানগুলোতে আপনার অভিনীত সমস্ত ছবি আছে, না?'

'হ্যাঁ। কোথাও ভূত সেজেছি আমি, কোথাও দানব, কোথাও জলদস্যু...'

'নির্বাক ছবির যুগ তো অনেক আগেই শেষ। তারমানে অনেকদিন থেকেই পড়ে আছে। আর কোন হলে দেখানো হচ্ছে না এখন।'

'না, হচ্ছে না। সবাক ছবি ফেলে নির্বাক ছবি কেন দেখবে লোকে? কিন্তু এসব কথা কেন?'

'মনে হচ্ছে, আপনার ক্যাসল আপনারই থাকবে একটা বুদ্ধি এসেছে মাথায়। আগামী কাল জানাব আপনাকে আর হ্যাঁ, এখান থেকে কোথাও যাবেন না। ভয়ের কিচ্ছু নেই। আপনিই টেরর ক্যাসলের ভূত, কথাটা এখনই ফাঁস করছি না আমরা। অনেক রাত হল। আচ্ছা চলি কাল দেখা হবে '

সুড়ঙ্গ পথেই আবার ক্যাসলে ফিরে এল ওরা তিন গোয়েন্দা আর হ্যানসন। বেরিয়ে এল ক্যাসল থেকে।

আজ আর ভূতের ভয় নেই। ধীরেসুস্থে নেমে এল পথে। রোলস রয়েছে উঠল।

উনিশ

পরদিন সকালে আবার হলিউডে রওনা হল দুই গোয়েন্দা, কিশোর আর মুসা। রবিন আসতে পারেনি। কাজের চাপ বেশি লাইব্রেরিতে চলে গেছে।

প্যাসিফিক স্টুডিওর ফটকে এসে থামল রোলস রয়েস। আজ আর কোন অসুবিধে হল না। কেরি ওয়াইল্ডার জানে ওরা আসছে, জানিয়ে রেখেছে গার্ডকে। খুলে গেল দরজা। ভেতরে ঢুকে পড়ল রোলস রয়েস।

কয়েক মিনিট পরেই মিস্টার ক্রিস্টোফারের অফিসে এসে ঢুকল দুই গোয়েন্দা।

'এসে গেছ। বস,' ভারি গলা পরিচালকের, 'তারপর? কি খবর?'

'ভূতুড়ে বাড়ি খুঁজে পেয়েছি, স্যার,' বসতে বসতে বলল কিশোর।

'তাই নাকি?' ভুরু কোঁচকালেন পরিচালক। 'কি ধরনের ভূত?'

'ধরন ঠিক করা কঠিন,' বলল কিশোর। 'আসলে ভূতুড়ে করে রেখেছিলেন

একজন মানুষ। মরা নয়, জ্যান্ত।'

'তাই! মজার ব্যাপার!' চেয়ারে হেলান দিলেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। 'খুলে বল তো, সব।'

চুপচাপ সব শুনলেন পরিচালক। তারপর বললেন, 'জন ফিলবি বেঁচে আছে জেনে ভালই লাগছে। এককালের মস্ত অভিনেতা, কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু একটা ব্যাপার তো বললে না। নার্ভাস করত কি করে লোককে?'

'গতরাতে মিস্টার ফিলবির ওখান থেকে ফিরে অনেক ভেবেছি, স্যার। শেষে বুঝে ফেলেছি ব্যাপারটা। পাইপ অর্গান।'

'পাইপ অর্গান!'

'হ্যাঁ, স্যার। চাচার বুক শেলফে অর্গানের ওপর একটা বই আছে। এক জায়গায় লেখা আছেঃ সাবসোনিক ভাইব্রেশন অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া করে মানুষের স্নায়ুর ওপর। এক ধরনের চাপ সৃষ্টি করে। প্রথমে অস্বস্তি বোধ শুরু হয়। বাড়তে থাকে অস্বস্তি, তারপর ভয়, এবং সব শেষে আতঙ্কিত করে তোলে।'

'বুদ্ধি আছে লোকটার!' বললেন পরিচালক, 'কিন্তু, ভূতুড়ে ক্যাসলের ভূতকে লোকের সামনে বের করে আনাটা কি উচিত হবে? একেবারে ধ্বংস হয়ে যাবে ফিলবি।'

'এখন একমাত্র আপনিই বাঁচাতে পারেন ওঁকে,' বলল কিশোর।

'আমি?'

'হ্যাঁ, স্যার, আপনি। ওঁর সমস্ত নির্বাক ছবিকে সবাক করে তুলতে পারেন। কণ্ঠ উনিই দিতে পারবেন এখন। গলায় আর কোন দোষ নেই প্রচুর আয় হবে। ক্যাসলটা আবার কিনে নিতে পারবেন মিস্টার ফিলবি। এতদিন ভূত সেজে মানুষকে কি করে ভয় দেখিয়েছেন, প্রকাশিত হবে খবরের কাগজে লোকে দেখতে আসবে টেরর ক্যাসল। ভেতরের অদ্ভুত সব কাণ্ডকারখানা পয়সার বিনিময়ে দেখাতে পারবেন তিনি। বেশ ভালই আয় হবে ওখান থেকেও। মস্ত বড় একটা প্রতিভাকে প্রায় ধ্বংস করে দিয়েছিল লোকে, না বুঝে। এতগুলো বছরে অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে তাঁর, তবে আপনি সাহায্য করলে পুষিয়ে নিতে পারবেন কিছুটা।'

'হুম্‌ম্‌ম্‌!' হালকা পাতলা ছেলেটার দিকে চেয়ে আছে মিস্টার ক্রিস্টোফার। 'তোমার অনুরোধ আমি রাখব, কিশোর পাশা, কথা দিলাম।'

'থ্যাঙ্ক ইউ, স্যার, থ্যাঙ্ক ইউ!' খুশি হয়ে উঠল কিশোর। 'মিস্টার ফিলবির অভিনীত ছবিগুলো এবার দেখতে পাব।'

'হ্যাঁ, এবার দেখতে পাব,' বলল পাশে বসা মুসা।

'হ্যাঁ, ভাল কথা, অনেক খোঁজ-খবর করেছি আমি,' বললেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। 'কিন্তু সত্যি সত্যি কোন ভূতুড়ে বাড়ি নেই কোথাও। গুজব থাকে,

ভূত আছে ভূত আছে কিন্তু ভালমত খোঁজখবর করলেই বেরিয়ে পড়ে অন্য কিছু যাই হোক, ওই প্রোজেক্ট বন্দ দিতে হচ্ছে আমার।'

'তাহলে কি...' সামনে ঝুঁকল কিশোর।

হাত তুললেন মিস্টার ক্রিস্টোফার 'আগে শোন সব কথা। কথা দিয়েছিলাম, তোমাদের নাম প্রচার করব ব্যবস্থাটা আসলে তোমরাই করে দিলে। চমৎকার এক গল্প হবে, সত্যি ঘটনার ওপর ভিত্তি করে। টেলিভিশনের জন্য যদি একটা ফিল্ম তৈরি করি? নাম দিইঃ মিস্টার ফিলবি অভ টেরর ক্যাসল, কেমন হয়?'

প্রায় লাফিয়ে উঠল কিশোর আর মুসা হাততালি দিয়ে উঠল। চেঁচিয়ে উঠল, 'খুব ভাল হয়, স্যার, খুব ভাল!'

'হ্যাঁ, আরেকটা ব্যাপার। তোমাদের মাঝে সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি আমি গোয়েন্দা হিসেবে ভালই নাম করতে পারবে চালিয়ে যাও দরকার হলে আমিও সাহায্য করব তোমাদের

খুশিতে ধেই ধেই করে লাফানো বাকি রাখল শুধু দুই গোয়েন্দা

কিশোর বলল, 'আমরা যাই, স্যার রবিনকে খবরটা দিতে হবে

ঘর থেকে প্রায় ছুটে বেরিয়ে এল দুই কিশোর পেছনে তাকালে, দেখতে পেত, সারাক্ষণ সদা-গম্ভীর চিত্র-পরিচালকের মাঝেও সংক্রামিত হয়েছে তাদের আনন্দ কুৎসিত ঠোঁটে ফুটেছে নিষ্পাপ সুন্দর এক চিলতে হাসি।

-০-

কঙ্কাল দ্বীপ

প্রথম প্রকাশ ঃ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৫

'ডুবুরি-পোশাক পরে সাগরে ডুব দিয়েছ কখনও?' জিজ্ঞেস করলেন ডেভিস ক্রিস্টোফার

প্যাসিফিক স্টুডিও বিখ্যাত চিত্রপরিচালকের অফিসে বসে আছে তিন গোয়েন্দা।

বিশাল টেবিলের ওপাশে বসা মিস্টার ক্রিস্টোফারের দিকে চেয়ে বলল মুসা আমান, 'হ্যাঁ, স্যার, ডুবেছি। গতকাল শেষ পরীক্ষা নিয়েছেন আমাদের ইনস্ট্রাক্টর। পাস করেছি ভালভাবেই।'

'অভিজ্ঞ ডুবুরি নই আমরা,' যোগ করল কিশোর পাশা 'তবে নিয়মকানুন সব জানি ফেস মাস্ক আর ফ্লিপার আছে আমাদের তিনজনেরই

'গ্যাস ট্যাংক আর অন্যান্য যন্ত্রপাতি?' জানতে চাইলেন চিত্রপরিচালক।

'যখন দরকার হয়, ভাড়া করে আনি

'গুড, বললেন মিস্টার ক্রিস্টোফার 'মনে হয় কাজটা করতে পারবে তোমরা।'

'কাজ!' বলে উঠল রবিন।

'হ্যাঁ,' বললেন চিত্রপরিচালক। 'একটা রহস্যের কিনারা করতে হবে সেজন্যেই ডেকেছি তোমাদের! আর হ্যাঁ, এক-আধটু অভিনয়ও করতে হবে।'

'অভিনয়?' ভুরু কোঁচকাল মুসা। 'কিন্তু আমরা তো স্যার, অভিনেতা নই। কিশোর অবশ্য মাঝেমধ্যে টেলিভিশনে···

'অভিজ্ঞ অভিনেতার দরকার নেই ওদের,' বললেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। 'মুসা, তোমার বাবা কোথায় আছে এখন, জান?'

'জানি, স্যার,' অভিজ্ঞ টেকনিশিয়ান মুসার বাবা রাফাত আমান ছবির শুটিঙের সময় বিভিন্ন যন্ত্রপাতি তদারকির ভার থাকে তাঁর ওপর। 'ফিলাডেলফিয়ায়।'

'ভুল বললে,' হাসলেন পরিচালক। 'রাফাত এখন একটা দ্বীপে।'

'কিন্তু বাবা তো গিয়েছিল ডিরেক্টর জন নেবারের সঙ্গে! এসকেপ ছবির শুটিঙে।'

'জনের সঙ্গেই আছে। ছবির একটা বিশেষ দৃশ্যের জন্যে পুরানো পার্ক দরকার। স্কেলিটন আইল্যাণ্ডে আছে তেমনি একটা পার্ক

'স্কেলিটন আইল্যাণ্ড!' ভুরু কুঁচকে গেছে রবিনের। 'শুনে মনে হচ্ছে জলদস্যুদের দ্বীপ।'

'ঠিকই ধরেছ,' বললেন পরিচালক। 'এককালে জলদুস্যদের ঘাঁটি ছিল ওই দ্বীপ। নামটা সত্যিই অদ্ভুত। আজও নাকি ভূতের উপদ্রব রয়েছে ওখানে। বালির তলা থেকে মাঝে মধ্যেই বেরিয়ে পড়ে মানুষের কঙ্কাল। ভীষণ ঝড়ের পর কখনও-সখনও সৈকতে পড়ে থাকতে দেখা যায় সোনার মোহর। বেশি না, একটা দুটো। ভেবে বস না, গুপ্তধন আছে স্কেলিটন আইল্যাণ্ডে। অনেক খোঁজাখুঁজি করা হয়েছে, পাওয়া যায়নি। উপসাগরের তলায় হয়ত ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে কিছু মোহর। ঝড়ের সময় ঢেউয়ের ধাক্কায় সৈকতে এসে পড়ে।'

এবং ওই দ্বীপেই যেতে বলছেন আমাদেরকে?' আগ্রহে সামনে ঝুঁকল কিশোর। 'রহস্যের কিনারা করতে?'

'হ্যাঁ,' এক হাতের আঙুলের মাথা সব একত্র করে মোচার মত বানালেন পরিচালক। দু'জন সহকর্মীকে নিয়ে আছে ওখানে মুসার বাবা। পার্কটার জঞ্জাল পরিষ্কারের জন্যে লোক লাগিয়েছে। কিন্তু গোলমাল শুরু হয়ে গেছে প্রথম দিন থেকেই। জিনিসপত্র চুরি যাচ্ছে। স্থানীয় একজন লোককে পাহারাদার নিযুক্ত করা হয়েছে, কিন্তু চুরি ঠেকানো যাচ্ছে না। ভাবনায় পড়ে গেছে জন। খবর পাঠিয়েছে আমাকে।'

'আমাদের কাজ কি?' জানতে চাইল কিশোর।

'আসছি সে কথায়,' হাত তুললেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। 'এসকেপ ছবিটার প্রযোজক আমি। ঠিক করেছি, তোমাদেরকে পাঠাব। নাম যা-ই হোক, দ্বীপটা কিন্তু খুব সুন্দর। চারদিক ঘিরে আছে আটলান্টিক উপসাগর, গভীরতা খুবই কম। ওখানে ইচ্ছেমত ডোবাডুবি করতে পারবে তোমরা। কেউ কিছু সন্দেহ করবে না। ভাববে, তিনটে ছেলে গুপ্তধন খুঁজছে।'

'খুব...খুবই ভাল হবে, স্যার,' বলল কিশোর।

জনের সঙ্গে কোম্পানির একজন লোক আছে, জোসেফ গ্র্যাহাম। দক্ষ ডুবুরি। ভাল ছবি তুলতে পারে, বিশেষ করে পানির তলায়। দরকার পড়লে সে তোমাদেরকে সাহায্য করতে পারবে। আরও একজন আছে, জনের সহকারী, পিটার সিমন্‌স। সে-ও সাহায্য করবে তোমাদের। তা-ছাড়া মুসার বাবা তো আছেই। গুপ্তধন শিকারির ছদ্মবেশে চোর ধরার চেষ্টা করবে। আর হ্যাঁ, তোমরা গোয়েন্দা, অপরিচিত কারও কাছে সেকথা ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করবে না।'

'খুব মজা হবে! তবে,' রবিনের গলায় দ্বিধা, বাবা যেতে দিলে হয়।'

'না দেবার তো কোন কারণ দেখি না,' বললেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। 'খরচ-খরচা সব কোম্পানির। তোমাদের স্কুল ছুটি। তাছাড়া ওখানে মুসার বাবা আছে। দরকার হলে আমিও নাহয় ফোন করব মিস্টার মিলফোর্ডকে। কিশোর, তোমার

কোন অসুবিধে আছে?'

'নাহ্। মুসা আর রবিন যাচ্ছে। তাছাড়া রাফাত চাচা আছে ওখানে, অমত করবে না মেরিচাচী।'

'তো কখন রওনা হচ্ছি আমরা?' পরিচালকের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করল মুসা।

'আগামী কালই বেরিয়ে পড়,' বললেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। 'বাড়িতে গিয়ে জিনিসপত্র গুছিয়ে নাওগে। বিকেলে প্লেনের টিকেট পাঠিয়ে দেব। হ্যাঁ, রবিন, তোমাকে একটা জিনিস দিচ্ছি,' ড্রয়ার খুললেন পরিচালক। একটা বড় খাম বের করে ঠেলে দিলেন টেবিলের ওপর দিয়ে। 'এতে একটা ম্যাগাজিন আছে। রেকর্ড আর রিসার্চের ভার যখন তোমার ওপর, তুমি রাখ এটা। স্কেলিটন আইল্যাণ্ডের ওপর একটা সচিত্র ফিচার আছে। পড়ে দেখ। অনেক কিছু জানতে পারবে দ্বীপটা সম্পর্কে।'

উঠে দাঁড়াল তিন গোয়েন্দা।

'যাত্রা শুভ হোক তোমাদের,' বললেন মিস্টার ক্রিস্টোফার।

'থ্যাংকু, স্যার,' বলে বেরিয়ে এল তিন কিশোর।

দুই

'ওই যে, কঙ্কাল দ্বীপ!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল রবিন। এই বাংলা নামটা শিখেছে কিশোরের কাছ থেকে। স্কেলিটন আইল্যাণ্ড-এর চেয়ে ছন্দময়।

'কই!...কোথায়!' বলে উঠল কিশোর।

'দেখি দেখি!' বলল মুসা।

দু'জনে একই সঙ্গে ঝুঁকে এল জানালার কাছে, রবিনের গায়ের ওপর দিয়ে।

লম্বা, সরু উপসাগরের ওপর দিয়ে উড়ে চলেছে প্লেন। আঙুল তুলে দেখাল রবিন। তাদের নিচেই একটা ছোট্ট দ্বীপ। ঠিক যেন একটা মানুষের মাথার খুলি।

'ম্যাপের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে,' বললো রবিন।

কৌতূহলী চোখে অদ্ভুত দ্বীপটার দিকে চেয়ে আছে তিন গোয়েন্দা। মিস্টার ক্রিস্টোফারের দেয়া ম্যাগাজিন পড়ে জেনেছে ওরা অনেক কিছু। তিনশো বছরেরও বেশি আগে জলদস্যুদের ঘাঁটি ছিল কঙ্কাল দ্বীপ। অনেক খোঁজাখুঁজি করা হয়েছে, পাওয়া যায়নি গুপ্তধন। তার মানে এই নয় যে, ধনরত্ন লুকানো নেই। হয়ত দ্বীপে নেই, কিন্তু উপসাগরের তলায় থাকতে বাধা কোথায়? নিশ্চয় পানির তলায় কোথাও লুকানো আছেই গুপ্তধন। তিন গোয়েন্দার আশা, খুঁজে পাবে ওরা।

আরেকটা ছোট দ্বীপ নজরে পড়ল।

'ওই যে, দ্য হ্যাণ্ড!' বলল কিশোর। 'হস্ত।'

'আর ওগুলো নিশ্চয় দ্য বোনস,' যোগ করল মুসা। আঙুল তুলে দেখাল।

কঙ্কাল দ্বীপ আর হস্তের মাঝামাঝি এক সারি ছোট প্রবাল-প্রাচীর দেখিয়ে বলল মুসা। 'ইয়াল্লা! এত তাড়াতাড়ি এসে পড়লাম! দুপুরের খাওয়াই হজম হয়নি এখনও!'

'দেখ, দেখ!' বলল রবিন। 'হাতের আঙুল। ওগুলো সরু প্রবাল-প্রাচীর! পানির তলায় রয়েছে, অথচ ওপর থেকে কি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে!'

'হস্তে যাব একদিন,' বলল কিশোর। 'প্রাকৃতিক ফোয়ারা দেখব। কখনও দেখিনি।'

দ্বীপগুলোকে পেছনে ফেলে এল প্লেন। মূল ভূখণ্ডের ওপর এসে পড়েছে। নিচে একটা গ্রাম। নাম ফিশিংপোর্ট। ওখানেই উঠবে তিন গোয়েন্দা। একটা বোর্ডিং হাউসে ঘর ভাড়া করে রাখা হয়েছে তাদের জন্যে।

ফিশিংপোর্ট ছাড়িয়ে এল প্লেন। দ্রুত উচ্চতা হারাচ্ছে। ডানে ছোট্ট একটা শহর। নাম মেলভিল। এয়ারপোর্ট ওখানেই। কয়েক মুহূর্ত পরেই রানওয়ে ছুঁল প্লেনের চাকা। এয়ার টার্মিনাল বিল্ডিঙের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল।

প্লেন থেকে নেমে এল তিন কিশোর। একপাশে তারের জালের বেড়া। বেড়ার ওপাশে লোকের ভিড়।

'রাফাত চাচা এসেছেন কিনা কে জানে!' বলল রবিন।

'ফোনে তো বলল আসবে,' ভিড়ের দিকে চেয়ে হাঁটছে মুসা। 'কোন কারণে নিজে না আসতে পারলে অন্য কাউকে নিশ্চয়ই পাঠাবে।'

বেড়ার বাইরে এসে দাঁড়াল তিনজন। এদিক ওদিক চাইল। মুসার বাবাকে দেখা গেল না

'অন্য কেউই এসেছে,' নিচু গলায় বলল রবিন। 'ওই যে, আমাদের দিকে এগোচ্ছে।'

ভিড়ের ভেতর থেকে বেরিয়ে এগিয়ে আসছে বেঁটে মোটা এক লোক। লালচে নাক।

'এই যে,' কাছে এসে বলল লোকটা। 'নিশ্চয়ই হলিউড থেকে এসেছ? তোমাদেরকে নিয়ে যেতে পাঠানো হয়েছে আমাকে!' তিন কিশোরকে দেখছে সে। ছোট ছোট চোখে শীতল চাহনি। 'কিন্তু তোমরা গোয়েন্দা! বয়স্ক লোক আশা করেছিলাম আমি

স্থির হয়ে গেল রবিনের পাশে দাঁড়ানো কিশোর। 'আমরা গোয়েন্দা আপনার তো জানার কথা নয়!'

'আরও অনেক কিছুই জানি,' দাঁত বের করে হাসল লোকটা। 'এখন এসো। গাড়ি অপেক্ষা করছে তোমাদের মালপত্র যাবে অন্য গাড়িতে। আমারটায় জায়গা নেই। হলিউড থেকে অনেক জিনিসপত্র এসেছে, বোঝাই হয়ে গেছে।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করল লোকটা। পেছনে চলল তিন গোয়েন্দা।

পুরানো একটা স্টেশন ওয়াগনের সামনে এসে দাঁড়াল।

'জলদি উঠে পড় গাড়িতে,' বলল লোকটা। 'আধ ঘন্টা লেগে যাবে যেতে।' আকাশের দিকে তাকাল। 'তার আগেই ঝড় এসে পড়বে কিনা কে জানে!'

আকাশের দিকে মুখ তুলল রবিন। পশ্চিম দিগন্তে ছোট্ট এক টুকরো কালো মেঘ, ছড়িয়ে পড়ছে ধীরে ধীরে। ঢাকা পড়েছে সূর্য। আজ আর বেরোতে পারবে বলে মনে হয় না। মেঘের চূড়ার কাছে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে থেকে থেকে। ঝড় আসবে, ভীষণ ঝড়।

পেছনের সিটে উঠে বসল তিন কিশোর। ড্রাইভিং সিটে বসল লোকটা। গাড়ি ছাড়ল। এয়ারপোর্ট ছাড়িয়ে এসে রওনা হল উত্তরে।

'আপনার সঙ্গে এখনও পরিচয়ই হল না, মিস্টার,...' থেমে গেল কিশোর।

'হান্ট বলেই ডাকবে আমাকে। সবাই তাই ডাকে,' বলতে বলতে এক্সিলারেটরে পায়ের চাপ বাড়াল লোকটা। তাড়াতাড়ি যেতে হবে। দ্রুত নামছে অন্ধকার।

'হ্যাঁ, মিস্টার হান্ট,' আবার বলল কিশোর, 'আপনি কি সিনেমা কোম্পানিতে কাজ করেন?'

'সব সময় না,' জবাব দিল হান্ট। এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে আপন মনেই বিড়বিড় করল, 'ঝড় আসছে! রাত নামতে দেরি নেই! নিশ্চয় বেরোবে আজ নাগরদোলার ভূত! ইস্‌স্, বোকামিই করলাম! বেরোনই উচিত হয়নি!'

শিরশির করে একটা শীতল স্রোত নেমে গেল রবিনের মেরুদণ্ড বেয়ে। নাগরদোলার ভূত! কঙ্কাল দ্বীপের ওই ভূতের কথা লেখা আছে ম্যাগাজিনে। বাইশ বছর আগে প্লেজার পার্কের নাগোরদোলায় চড়েছিল এক সুন্দরী তরুণী। নাম স্যালি ফ্যারিংটন। হঠাৎ উঠল ঝড়। পার্কে আরও অনেকেই এসেছিল সেদিন, তাড়াহুড়ো করে পালাল। থেমে গেল নাগরদোলা। স্যালিকে নামতে বলল দোলার চালক। কিন্তু নামল না মেয়েটা। দোলা আবার চালাতে অনুরোধ করল। ঝড়ের মধ্যে নাগরদোলায় চড়তে কেমন লাগে, দেখতে চায়।

কিছুতেই মেয়েটাকে নামাতে পারল না চালক। ঝড় বেড়েই চলল। নিরাপদ জায়গায় গিয়ে আশ্রয় নিল সে। স্যালি বসে রইল কাঠের ঘোড়ার গলা আঁকড়ে ধরে। হঠাৎ পড়ল বাজ। পড়ল এসে একেবারে নাগরদোলার ওপর।

বজ্রপাতে মারা গেল স্যালি। এর কয়েক হপ্তা পরেই আরেক ঝড়ের রাতে নাকি দেখা গেল, আলো জ্বলে উঠেছে নাগরদোলার। পার্ক বন্ধ হয়ে গেছে বিকেলেই। কে জ্বাললো আলো! কয়েকজন লোক সঙ্গে নিয়ে মোটরবোটে করে দেখতে গেলেন পার্কের মালিক মিস্টার স্মিথ। দ্বীপের কাছে গিয়ে দেখলেন, ঘুরছে নাগরদোলা। একটা কাঠের ঘোড়ায় চেপে বসেছে সাদা একটা মূর্তি। হঠাৎ দপ করে নিভে গেল সমস্ত আলো। থেমে গেল দোলা। কয়েক মিনিট পরে তীরে ভিড়ল

বোট। দোলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল লোকেরা। একটা ছোট রুমাল খুঁজে পেল, মহিলাদের রুমাল। এক কোণে সুতো দিয়ে তোলা হয়েছে দুটো অক্ষরঃ এস এফ।

খবরটা ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করলেন মিস্টার স্মিথ, নইলে বন্ধ হয়ে যাবে পার্ক। কিন্তু গুজব ঠেকানো গেল না। পরদিন সকাল হতে না হতেই ছড়িয়ে পড়ল খবর। লোকে জানল, ভূতের উপদ্রব শুরু হয়েছে পার্কে। ওটার কাছ থেকে দূরে রইল সবাই। পড়ে পড়ে নষ্ট হতে লাগল সাগরদোলা, নাগরদোলা, দোলনা।

স্যালি ফ্যারিংটনের ভূত নাকি আজও দেখা যায়। ইদানীং নাকি বেড়েছে। প্রায় ঝড়ের রাতেই জেলেরা দেখতে পায়, সাদা একটা মূর্তি। ঘুরে বেড়াচ্ছে দ্বীপে। নষ্ট হয়ে গেছে নাগরদোলা। লোকের ধারণা, ওটা আবার চালু হবার অপেক্ষায় আছে স্যালির প্রেতাত্মা।

বহু বছর ধরে নির্জন পড়েছিল কঙ্কাল দ্বীপ। গ্রীষ্মকালে মাঝে মধ্যে দু'চারজন বিদেশী যেত ওখানে পিকনিক করতে, তবে দিনের বেলা।

'সিনেমা কোম্পানি ঠিক করছে আবার নাগরদোলাটা,' বলল হান্ট। 'স্যালির প্রেতাত্মা তাহলে খুব খুশি হবে। আবার চড়তে পারবে…' থেমে গেল সে। জানালার কাচে ধাক্কা দিতে শুরু করেছে ঝড়ো বাতাস। গাড়ি চালনায় মন দিল হান্ট।

পথের দু'ধারে জলাভূমি, লোক বসতির চিহ্নও নেই। আধ ঘন্টা পর একটা জায়গায় এসে পৌঁছুল গাড়ি। সামনে দুদিকে ভাগ হয়ে গেছে রাস্তাটা। বাঁদিকের পথের পাশে মাইলপোস্ট। লেখাঃ ফিশিংপোর্টঃ ২ মাইল। ছেলেদেরকে অবাক করে দিয়ে ডানে গাড়ি ঘোরাল হান্ট। খানিক পরেই শেষ হয়ে এল পিচঢালা পথ। সামনে কাঁকর বিছানো ধুলোভরা কাঁচা রাস্তা।

'মাইলপোস্ট বসানো বাঁয়ের রাস্তার পাশে,' বলেই ফেলল মুসা। 'এ পথে যাচ্ছি কেন আমরা, মিস্টার হান্ট?'

'দ্বীপে নিয়ে যেতে বলেছেন, মিস্টার আমান,' কাঁধের ওপর দিয়ে বলল হান্ট। 'আজ রাতে বোর্ডিং হাউসে যেতে মানা করেছেন।'

'অ!' চুপ করে গেল মুসা। কিন্তু সন্তুষ্ট হতে পারল না। কোথায় যেন একটা খটকা রয়ে গেল!

ঝাঁকুনি খেতে খেতে এগোল গাড়ি। গতি কম। মাইল দুয়েক এসে থেমে পড়ল। হেডলাইটের আলোয় চোখে পড়ল একটা নড়বড়ে জেটি। ছোট, ঝরঝরে একটা মাছ ধরা বোট বাঁধা আছে জেটিতে। 'জলদি বেরোও!' বলল হান্ট। 'গড নোজ! ঝড় এসে গেলেই…'

গাড়ি থেকে নামল তিন গোয়েন্দা। বোটটা দেখে অবাক। এতবড় মুভি-কোম্পানি, এর চেয়ে ভাল কোন বোট জোগাড় করতে পারল না! নাকি হান্টের নিজের বোট ওটা?

'আমাদের মালপত্র?' হান্ট নামতেই জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'ওগুলোর জন্যে ভাবতে হবে না তোমাদের,' বলল হান্ট। 'নিরাপদেই পৌঁছে যাবে বোর্ডিং হাউসে। জলদি এসো, বোটে ওঠ। এখনও অনেক পথ বাকি।'

বোটে উঠল ওরা। মোটরের ওপর ঝুঁকল হান্ট। একটা বোতাম টিপে দিতেই স্টার্ট হয়ে গেল পুরানো ইঞ্জিন। ঢেউ কেটে ধুঁকতে ধুঁকতে এগিয়ে চলল বোট। একবার এদিক কাত হচ্ছে একবার ওদিক। ডুবেই যাবে যেন। ভয়ে বুক কাঁপছে তিন কিশোরের।

এল বৃষ্টি। প্রথমে গুঁড়ি গুঁড়ি, জোর বাতাসের ধাক্কায় রেণু রেণু হয়ে আছড়ে পড়ল গায়ে। তারপর নামল বড় বড় ফোঁটায়। পাতলা ক্যানভাসের ঢাকনার তলায় গুটিসুটি হয়ে বসল তিন কিশোর। অল্পক্ষণেই ভিজে চুপচুপে হয়ে গেল।

'রেনকোট নেই?' চেঁচিয়ে বলল মুসা। এভাবে বসে থাকলে বোট ডুবে যাবার আগেই মরব!'

মাথা ঝোঁকাল হান্ট। দড়ি দিয়ে বাঁধল হুইলের একটা স্পোক। দড়ির অন্য মাথা দিয়ে বাঁধল বোটের গায়ে একটা খুঁটির সঙ্গে। কোনদিকেই এখন ঘুরতে পারবে না হুইল। উঠে গিয়ে একটা ছোট আলমারি খুলল। বের করে আনল চারটে হলুদ রেনকোট। একটা নিজে পরল। বাকি তিনটে দিল তিন কিশোরকে।

'পরে ফেল,' চেঁচিয়ে বলল হান্ট। বাতাসের গর্জন, আস্তে কথা বললে শোনা যায় না। 'বোটেই রাখতে হয় এগুলো। কখন বৃষ্টি আসে, ঠিকঠিকানা তো নেই।'

মুসার গায়ে ঠিকমত লাগল কোট, কিশোর আর রবিনের গায়ে বড় হল। তাতে কিছু যায় আসে না এখন। গায়ে পানি না লাগলেই হল।

আবার গিয়ে হুইল ধরল হান্ট। অনবরত বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। বেড়েছে বাতাসের বেগ। আকারে বড় হয়েছে ঢেউ। ধরেই নিয়েছে ছেলেরা, যে-কোন মুহূর্তে উল্টে যেতে পারে বোট।

বিদ্যুতের আলোয় ডাঙা দেখা গেল সামনে। ছেলেদের মনে হল, জেটি ছাড়ার পর কয়েক যুগ পেরিয়ে গেছে।

ডাঙার কাছে চলে এল বোট। জেটি চোখে পড়ল না। অবাক হয়ে দেখল ছেলেরা, চ্যাপ্টা একটা পাত্রের ধারে এসে বোট রেখেছে হান্ট। পানির তলা থেকে বেরিয়ে আছে পাথরটা।

'লাফাও, লাফিয়ে নাম!' চেঁচিয়ে বলল হান্ট। 'গড নোজ!'

নীরবে একে একে লাফিয়ে তীরে নেমে এল ছেলেরা।

'আপনি নামবেন না?' চেঁচিয়ে বলল কিশোর।

ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে বোট। 'নামা যাবে না,' চেঁচিয়ে জবাব দিল হান্ট। 'পথ ধরে এগোও। ক্যাম্পে পৌঁছে যাবে।'

ইঞ্জিনের আওয়াজ বাড়ল। দ্রুত সরে গেল বোট। দেখতে দেখতে হারিয়ে

গেল ঝড়ো রাতের অন্ধকার।

বাতাসের তাড়নায় গায়ে যেন সুচ ফুটাচ্ছে বৃষ্টি। মাথা নুইয়ে রাখতে হল তিন কিশোরকে।

'চল, পাথরটা খুঁজে বের করি!' বলল মুসা।

মাথা ঝুঁকিয়ে সায় দিল কিশোর।

হঠাৎ শোনা গেল শব্দটা। অদ্ভুত। জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছে যেন কোন বিশাল দানব। হু-উ-উ-উ-উ-হু-ই-শ-শ! হু-উ-উ-উ-উ-হু-ই-শ-শ!

'শুনছ!' চেঁচিয়ে উঠল রবিন। 'কিসের শব্দ!'

আবার শোনা গেল অদ্ভুত আওয়াজ।

'কিছু একটা আছে দ্বীপে!' বলল কিশোর। 'আবার বিদ্যুৎ চমকালেই দেখার চেষ্টা করব! তোমরাও কর।'

যেদিক থেকে শব্দ এসেছে, সেদিকে তাকিয়ে রইল তিন গোয়েন্দা। বিদ্যুৎ চমকাল। ক্ষণিকের জন্যে দেখল ওরা, ছোট্ট এক দ্বীপে দাঁড়িয়ে আছে। এটা অন্য কোন দ্বীপ, কঙ্কাল দ্বীপ এত ছোট না।

একটা টিলা, উটের কুঁজের মত ঠেলে বেরিয়ে আছে দ্বীপের গা থেকে। আশপাশে ছোটবড় পাথরের ছড়াছড়ি। এদিক ওদিক দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটা গাছ, বাতাসের ঝাপটায় মাথা নুইয়ে ফেলেছে। কোন পথ চোখে পড়ল না, দেখা গেল না ক্যাম্প

অদ্ভুত শব্দ হল আবার। ঠিক এই সময় আবার বিদ্যুৎ চমকাল। অবাক হয়ে দেখল তিন কিশোর, কুঁজের ঠিক মাঝখান থেকে তীব্র গতিতে আকাশে উঠে যাচ্ছে পানি, বিশাল এক ফোয়ারা। বাতাসের আঘাতে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে ছিটকে পড়ছে পানি, অদ্ভুত আওয়াজ হচ্ছে সে-জন্যেই।

'প্রাকৃতিক ফোয়ারা!' বলে উঠল কিশোর। 'কঙ্কাল দ্বীপ না, এটা হস্ত!'

স্তব্ধ হয়ে গেল অন্য দু'জন।

তাদেরকে হস্তে নামিয়ে দিয়ে গেল কেন হান্ট? এই ভয়াবহ ঝড়ের রাতে নির্জন দ্বীপে ফেলে রেখে গেল কেন?

তিন

কুঁজের গায়ে একটা ছোট্ট খোঁড়ল। ওতেই ঠাঁই নিল তিন গোয়েন্দা। কোনমতে গাদাগাদি করে বসল। কষ্ট হচ্ছে বটে, কিন্তু বাতাস আর বৃষ্টির কবল থেকে রেহাই মিলল এখানে।

কয়েক মিনিট আগে খোঁড়লটা খুঁজে বের করেছে ওরা। নিশ্চিত হয়ে গেছে, এটা হস্ত দ্বীপ। দ্বীপে ক্যাম্প নেই, মানুষ নেই, জেটি নেই, বোট নেই।

'এখানে নামিয়ে দিয়ে গেল কেন হান্ট,' কপালে লেগে থাকা পানির ক' মুছতে মুছতে বলল মুসা, 'বুঝতে পারছি না!'

'ভুল করেছে হয়ত,' বলল রবিন। 'কঙ্কাল দ্বীপ ভেবে হস্তে নামিয়ে দিয়ে গেছে।'

'না,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'ভুল করেনি। ইচ্ছে করেই এখানে ফেলে গেছে ব্যাটা। প্রথম থেকেই লোকটাকে ভাল লাগেনি। আমরা গোয়েন্দা, জানল কি করে! কোথাও কিছু একটা গোলমাল হয়েছে!'

'যা খুশি হোকগে,' মুসার গলায় হতাশা। না খেয়ে না মরলেই হল। কেউ আমাদেরকে খুঁজে···

'সকালে খুঁজে পাবে,' বলল কিশোর। 'ভোর রাতেই মাছ ধরতে বেরোয় জেলেরা।'

'কিন্তু এদিকে কোন জেলেনৌকা আসার কথা না,' রবিনের গলায় সন্দেহ। 'পড়নি, এক ধরনের লাল পরজীবি কীটের আক্রমণে নষ্ট হয়ে গেছে এখানকার ঝিনুক? খাওয়া নিরাপদ নয়। মেলভিলের একেবারে দক্ষিণে ঝিনুক তুলতে যায় এখন জেলেরা। ফিশিংপোর্টের এদিকে আসে না। আর কিছুদিন এভাবে চললে গ্রাম ছেড়ে চলে যাবে সবাই।'

'তবু, কেউ না কেউ আসবেই,' জোর দিয়ে বলল কিশোর। 'আমরা নিরুদ্দেশ হয়েছি, জানবেন রাফাত চাচা। খোঁজখবর শুরু হয়ে যাবে। আজ এখানে নেমে বরং ভালই হল। ফোয়ারাটা দেখতে পেলাম।'

আর বিশেষ কিছু বলার নেই কারও। চুপ হয়ে গেল ওরা। বাইরে ঝড়-বৃষ্টি হচ্ছে, কিন্তু খোঁড়লের ভেতর মোটামুটি নিরাপদ। যেমন হঠাৎ আসে, তেমনি হঠাৎই আবার চলে যায় এ-অঞ্চলের ঝড়। তিন কিশোর আশা করল, সকাল নাগাদ থেমে যাবে। শিগগিরই ঢুলতে শুরু করল ওরা।

হঠাৎ তন্দ্রা টুটে গেল মুসার। কোথায় আছে বুঝতেই পেরিয়ে গেল কয়েক মুহূর্ত। তারা চোখে পড়ল। ঝড় থেমে গেছে। তন্দ্রা ছুটে যাবার এটাই কি কারণ? না। চোখে আলো পড়েছিল। এখন আবার পড়ল। শ'খানেক গজ দূর থেকে আসছে, তীব্র আলোর রশ্মি। এক মুহূর্ত স্থির থাকল, তারপরই সরে গেল আবার আলো।

লাফিয়ে দাঁড়াতে গিয়ে মাথায় বাড়ি খেল মুসা। 'ইয়াল্লা!' বলে চেঁচিয়ে উঠে আবার বসে পড়ল। সাবধানে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল খোঁড়লের বাইরে। গা থেকে রেনকোট খুলে নাড়তে নাড়তে চেঁচিয়ে বলল, 'এখানে! আমরা এ-খা-নে!'

মুসার পাশে এসে দাঁড়াল রবিন আর কিশোর।

আবার আলো পড়ল মুসার গায়ে। তারপরই সরে এসে পড়ল রবিন আর কিশোরের ওপর। এক মুহূর্ত স্থির রইল। চকিতের জন্যে একবার উঠে গেল

আকাশের দিকে। একশো গজ দূরে নৌকার পাল দেখতে পেল তিন গোয়েন্দা।

'দ্বীপের গায়ে ভিড়েছে নৌকা!' বলে উঠল মুসা। 'আমাদেরকে যেতে বলছে...'

আকাশে তারার আলো। আবছা অন্ধকার। হাঁটতে শুরু করল তিন গোয়েন্দা।

আবার জ্বলে উঠল টর্চ।

'দেখ দেখ!' চেঁচিয়ে উঠল রবিন। 'আমাদেরকে পথ দেখাচ্ছে!'

বৃষ্টিতে ভিজে পিচ্ছিল হয়ে আছে মাটি। দৌড়ানো তো দূরের কথা, তাড়াতাড়ি হাঁটাই যাচ্ছে না। তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে একবার আছাড় খেল মুসা। পাথরে ঘষা লেগে ছড়ে গেল হাঁটু।

পানির কিনারে এসে থামল তিন গোয়েন্দা। তীরে ভিড়েছে ছোট একটা পালতোলা নৌকা। পাশে বালিতে দাঁড়িয়ে আছে তাদেরই বয়েসী এক কিশোর। পরনে পানি নিরোধক জ্যাকেট। প্যান্টটা গুটিয়ে হাঁটুর কাছে তুলে নিয়েছে।

তিন গোয়েন্দার মুখে আলো ফেলল ছেলেটা। দেখল। তারপর নিজের মুখে আলো ফেলে দেখাল ওদেরকে। হাসিখুশি একটা মুখ। রোদেপোড়া তামাটে চামড়া। কোঁকড়া কালো চুল। কালো উজ্জ্বল এক জোড়া প্রাণবন্ত চোখ।

'হাল্লো!' ইংরেজিতে বলল ছেলেটা। কথায় বিদেশী টান। 'তোমরা তিন গোয়েন্দা, না?'

অবাক হল তিন কিশোর। তাদের পরিচয় এখানে গোপন নেই কারও কাছেই! ঢোল পিটিয়ে জানানো হয়েছে যেন!

'হ্যাঁ, আমরা তিন গোয়েন্দা,' বলল কিশোর। 'খুঁজে পেলে কি করে?'

'কোথায় খুঁজতে হবে, জানতাম,' বলল ছেলেটা। মুসার সমান লম্বা। হালকা-পাতলা। 'আমি পাপালো হারকুস। পাপু ডাকে বন্ধুরা।'

'তো, পাপু,' বলল মুসা। হাসিখুশি ছেলেটাকে ভালই লাগছে তার। 'কোথায় খুঁজতে হবে, কি করে জানলে?'

'অনেক লম্বা কাহিনী,' বলল পাপালো। 'এসো, নৌকায় ওঠ। সিনেমা কোম্পানির লোকজন খুব ভাবনায় পড়ে গেছে।'

'এসকেপ ছবিতে কোন কাজ করছ তুমি?' নৌকায় উঠতে উঠতে জিজ্ঞেস করল রবিন।

'না না,' ধাক্কা দিয়ে নৌকাটা বালির ওপর থেকে পানিতে ঠেলে দিল পাপালো। লাফ দিয়ে উঠে পড়ল গলুইয়ে। দাঁড় ধরল। পালে হাওয়া লাগতেই তরতর করে ছুটে চলল হালকা নৌকা দূরে দেখা যাচ্ছে ফিশিংপোর্ট গ্রামের আলো।

কথায় কথায় তিন গোয়েন্দার কাছে নিজের পরিচয় দিল পাপালো! বাড়ি গ্রীসের এক ছোট্ট গাঁয়ে। বড় হয়েছে ভূমধ্যসাগর উপকূলে। মা নেই। বাবা স্পঞ্জ

শিকারি জেলে। সাগরের তল থেকে স্পঞ্জ তুলে বিক্রি করত। এই ছিল জীবিকা।

খুব দরিদ্র গ্রীসের স্পঞ্জ শিকারিরা। ডুবুরির সাজ-সরঞ্জাম কেনার পয়সা নেই তাদের। ফলে কোন যন্ত্রপাতি ছাড়াই ডুব দিতে হয়। দু'হাতে একটা ভারি পাথর নিয়ে পানিতে ছেড়ে দেয় শরীর। দ্রুত ডুবে যায় তলায়। পাথর ছেড়ে দিয়ে স্পঞ্জ কুড়িয়ে নিয়ে ভেসে ওঠে ওপরে। পাপালোর বাবাও এই কায়দায় স্পঞ্জ তুলে আনত। হঠাৎ একদিন আক্রান্ত হল স্পঞ্জ-শিকারির অভিশাপ বেণ্ড রোগে। অকেজো হয়ে গেল। বন্ধ হয়ে গেল রোজগার। কিছুদিন চলল সঙ্গী জেলেদের দয়ায়। ওই সময় ফিশিংপোর্টে জেলের কাজ করত পাপালোর চাচা। ভাইয়ের দুরবস্থার খবর পেয়ে কিছু টাকা পাঠিয়ে দিল। ভাই ভাতিজাকে নিয়ে এল নিজের কাছে।

'কয়েক বছর ভালই কাটল,' বলল পাপালো। 'তারপরই দেখা দিল দুর্ভাগ্য। লাল কীট আক্রমণ করল ঝিনুককে। ব্যবসা খতম। নৌকা বেচে দিয়ে নিউ ইয়র্কে চাকরি নিয়ে চলে গেল চাচা। আমি আর বাবা রয়ে গেলাম এখানে। না থেকেই বা কি করব। মাছধরা ছাড়া আর কোন কাজ জানি না। বাবা পঙ্গু। তাকে নিয়ে কোথায় যাব? চাচার ঘাড়ে গিয়ে সওয়ার হতে ইচ্ছে হল না। নিজেরই চলে না, তবু কিছু কিছু করে বাঁচিয়ে মাসে মাসেই টাকা পাঠায় বাবাকে। খুব কষ্টে দিন কাটে আমাদের। একদিন খবর পেলাম, ফিশিংপোর্টে এক সিনেমা কোম্পানি আসছে। দ্বীপে ক্যাম্প করবে ওরা, ছবির শূটিং করবে। ডুবুরির কাজটা খুব ভাল পারি। আশা হল, একটা কাজ পেয়ে যাব সিনেমা কোম্পানিতে। দ্বীপে ক্যাম্প করবে যখন, নিশ্চয় সাগরের তলায় শূটিং করবে। ডুবুরির দরকার হবে। এল ওরা। গেলাম। কিন্তু কাজ দিল না। আমি বিদেশী। বিদেশীকে দেখতে পারে না এখানকার লোকে। তবে, আশা ছাড়িনি আমি এখনও।

এগিয়ে চলেছে নৌকা। কানে আসছে কঠিন কিছুতে ঢেউ আছড়ে পড়ার শব্দ।

'কোথায় আছি এখন?' জানতে চাইল মুসা। 'অন্ধকারে নিশানা ঠিক রাখতে পার?' অন্ধকারে ডুবো পাহাড়ে বাড়ি লেগে যেতে পারে নৌকা!'

'শব্দ শুনেই বুঝতে পারি আমি, কোন্ পথে চলেছি,' বলল পাপালো। 'ওই যে, ঢেউ আছড়ে পড়ছে প্রবাল প্রাচীরে, বাঁয়ে। দ্য বোনস-এর পাশ দিয়ে চলেছি আমরা। সামনে স্কেলিটন আইল্যাণ্ড।'

সামনে তাকাল তিন গোয়েন্দা। অন্ধকারে পরিষ্কার দেখা গেল না কঙ্কাল দ্বীপ। কিন্তু অবয়বটা মনে গাঁথা আছে ওদের। প্লেন থেকে দেখেছে, খুলির আকার। ম্যাপে দেখেছে। মিস্টার ক্রিস্টোফারের দেয়া ম্যাগাজিন পড়ে জেনেছে অনেক খুঁটিনাটি।

আমেরিকার দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে এই দ্বীপ। একে ঘিরে আছে আটলান্টিক

উপসাগর। ১৫৬৫ সালে আবিষ্কার করেছিলেন এক ইংরেজ নাবিক, ক্যাপ্টেন হোয়াইট। দ্বীপে নেমেছিলেন ক্যাপ্টেন। এটা ছিল তখন স্থানীয় ইণ্ডিয়ানদের গোরস্থান। কবর বেশি গভীর করে খুঁড়ত না ইণ্ডিয়ানরা। ফলে পানি আর বাতাসে কবরের ওপরের বালিমাটি সরে গিয়ে বেরিয়ে পড়ত মরার হাড়গোড়। অনেক কঙ্কাল দেখেছিলেন তিনি। দ্বীপের নাম রাখলেন, স্কেলিটন আইল্যাণ্ড। তারপর কাছের আরেকটা দ্বীপে নামলেন। অনেকটা চৌকোণা ওই দ্বীপ, এক প্রান্ত থেকে লম্বা হয়ে বেরিয়ে গেছে সরু সরু পাঁচটা প্রবাল প্রাচীর। ওটার নাম রাখলেন দ্য হ্যাণ্ড। দুটো দ্বীপের মাঝের একসারি প্রবাল-প্রাচীরের নাম রাখলেন দ্য বোনস। তারপর একদিন আবার জাহাজ নিয়ে চলে গেলেন ক্যাপ্টেন।

এর অনেক বছর পর দ্বীপগুলোর খোঁজ পেল জলদস্যুরা। ওগুলোকে শীতকালের ঘাঁটি বানাল ওরা। আশপাশে তখনও শহর ছিল। ডাকাতি করে আনা সোনার মোহর খরচ করতে যেত ওরা ওসব শহরে। দুর্দান্ত জলদস্যু ব্ল্যাকবিয়ার্ডও এক শীতে বেরিয়ে গিয়েছিল এখান থেকে।

উৎপাত বেড়ে গেল জলদস্যুদের। ইংরেজ নৌ-বাহিনী তাদেরকে তাড়া করে আনল এখান পর্যন্ত। দলবল সহ একে একে মেরে শেষ করল দস্যু সর্দারদের। ১৭১৭ সালে মারা পড়ল ব্ল্যাকবিয়ার্ড। এ-অঞ্চলে বাকি রইল শুধু তখন দুর্দান্ত দস্যু ক্যাপ্টেন ওয়ান-ইয়ার (এক কান কাটা বলেই এই নাম) আর তার দল। ঠাঁই নিল এসে কঙ্কাল দ্বীপে।

গোলমাল শুনে এক রাতে ঘুম থেকে হঠাৎ জেগে উঠল দস্যুরা। দেখল, তাদেরকে ঘিরে ফেলেছে নৌ-বাহিনীর লোক।

নির্বিচারে ডাকাত জবাই শুরু করল নৌ-বাহিনীর লোকেরা। ওয়ান-ইয়ার বুঝল, লড়াই করে টিকতে পারবে না। গোলমালের ফাঁকে একটা লংবোটে করে কেটে পড়ল সে। সঙ্গে নিল তার মোহরের সিন্দুক, আর অতি বিশ্বস্ত কয়েকজন সহচর।

দ্বীপে যে ক'জন ডাকাত ছিল, একটাকেও ছাড়ল না নৌ-বাহিনী, সবকটাকে হত্যা করল। এরপর খেয়াল হল ওদের, এক-কান-কাটা মারা পড়েনি। খোঁজ খোঁজ খোঁজ। বুঝে ফেলল ওরা, পালিয়েছে ওয়ান-ইয়ার জাহাজ নিয়ে তাড়া করল পেছনে। বেগতিক দেখে নৌকার মোড় ফেরাল ডাকাত সর্দার। হস্তে এসে লুকানর চেষ্টা করল। শেষরক্ষা করতে পারল না সে। ধরা পড়ল নৌ-বাহিনীর হাতে।

ইংরেজ জাহাজের ক্যাপ্টেন প্রথমেই জানতে চাইল, মোহরগুলো কোথায়?

খিকখিক করে হেসে উঠল এক-কান-কাটা। বলল, 'সাগর দেবতার খাজাঞ্চিখানায়। চাওগে ওর কাছে। হাতে পায়ে ধরলে দিয়েও দিতে পারে।'

অনেক নির্যাতন করা হল এক-কান-কাটা আর তার সহচরদের ওপর। কিন্তু কেউ মুখ খুলল না। ফাঁসির দড়িতে ঝোলার আগেও বলল না কেউ কোথায় আছে

মোহরগুলো। তন্নতন্ন করে খোঁজা হল হস্ত আর তার আশপাশের দ্বীপগুলো। কিন্তু মোহরের চিহ্নও মিলল না। ধরেই নিল ইংরেজ ক্যাপ্টেন, মোহরগুলো সব উপসাগরে ফেলে দিয়েছে এক-কান-কাটা। ওগুলো আর উদ্ধারের কোন আশা নেই। খানিকটা হতাশ হয়েই দেশে ফিরে গেল ক্যাপ্টেন।

'এদিককার সাগর নিশ্চয় তোমার চেনা, তাই না, পাপু?' সামনের অন্ধকারের দিকে চেয়ে বলল কিশোর।

'নিজের হাতের তালুর মত,' জবাব দিল পাপালো। 'সুযোগ পেলেই এদিকে চলে আসি। ডুব দিই সাগরে। মোহর খুঁজি।'

'শুনেছি,' অনেকেই মোহর খোঁজে এখানে, বলল রবিন। 'পায়ও কেউ কেউ।'

'তুমি পাও-টাও?' পাপালোকে জিজ্ঞেস করল মুসা।

দ্বিধা করল পাপালো। তারপর বলল, 'পাই। তবে ওটাকে না পাওয়া বললেও চলে।'

'শেষ কবে পেয়েছ?' জানতে চাইল কিশোর।

'গত হপ্তায়,' বলল পাপালো। 'কোথায় পেয়েছি, বলব না। এটা আমার সিক্রেট। শক্ত হয়ে বস, মোড় ঘোরাব।'

'মোড় ঘোরালে কেন শক্ত হয়ে বসতে হবে,' জিজ্ঞেস করতে গিয়েও থেমে গেল মুসা। জোরে একবার কেঁপে উঠল নৌকা। একপাশে কাত হয়ে গেল পাল, সেই সঙ্গে নৌকাটাও। পাশে আঘাত হানল ঢেউ। ছিটকে পানি এসে লাগল ছেলেদের গায়ে। শক্ত করে দাঁড় ধরে রইল পাপালো।

আরেকবার কেঁপে উঠেই সোজা হয়ে গেল নৌকা। এগিয়ে চলল আবার। সামনে দেখা যাচ্ছে ফিশিংপোর্টের আলো।

'স্কেলিটন আইল্যাণ্ড এখন পিছনে,' বলল পাপালো। 'গাঁয়ের দিকে এগোচ্ছি আমরা।'

পেছনে ফিরে চাইল তিন গোয়েন্দা। দেখা যাচ্ছে না দ্বীপ। শুধু কালো অন্ধকার।

হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল রবিন, 'দেখ দেখ! আলো!'

একসঙ্গে জ্বলে উঠেছে অনেকগুলো আলো, ঘুরছে। শোনা যাচ্ছে অদ্ভুত একটা ধাতব শব্দ। আস্তে আস্তে বাড়ছে ঘোরার বেগ। দেখতে দেখতে আলোর এক বিশাল আংটি তৈরি হয়ে গেল।

'ইয়াল্লা!' ফিসফিস করে বলল মুসা। 'নাগরদোলা! নিশ্চয় ঘোড়ায় চেপে বসেছে স্যালি…'

'পাপু!' মুসার কথা শেষ হবার আগেই বলল কিশোর। 'নৌকা ঘোরাও! দেখব, কিসে ঘোরাচ্ছে নাগরদোলা!'

'আমি পারব না!' মাথা নাড়ল পাপালো। 'স্যালির ভূত! ঝড় থেমেছে একটু

আগে। এখন এসেছে দোলায় চড়তে! ইস্‌স্‌, নৌকাটা আরও জোরে চলছে না কেন! একটা মোটর যদি থাকত…

সোজা ফিশিংপোর্টের দিকে ছুটে চলেছে নৌকা। খুশিই হয়েছে মুসা আর রবিন। হতাশ হয়েছে কিশোর। সত্যিকারের ভূত দেখার ইচ্ছে তার অনেকদিনের। এমন একটা সুযোগ হাত-ছাড়া হয়ে গেল।

অন্ধকারে উজ্জ্বল আলোর রিঙ তৈরি করে ঘুরেই চলেছে নাগরদোলা। বাইশ বছর আগে মরে যাওয়া তরুণীর প্রেতাত্মা…কথাটা ভাবতেই শিউরে উঠল রবিন।

হঠাৎ থেমে গেল ধাতব শব্দ। নিভে গেল আলো। এত তাড়াতাড়ি নাগরদোলা চড়ার শখ মিটে গেল স্যালির প্রেতাত্মার…আশ্চর্য!—ভাবল কিশোর। অন্ধকারের দিকে চেয়ে বসে আছে সে। চিমটি কাটছে নিচের ঠোঁটে।

আরও আধ ঘন্টা পর মিসেস ওয়েলটনের বোর্ডিং হাউসে এসে উঠল তিন গোয়েন্দা। সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোনে সিনেমা কোম্পানিকে জানিয়ে দিল মিসেস।

গরম পানিতে গোসল করল তিন গোয়েন্দা। খাওয়া সারল। গরম বিছানায় উঠল।

কম্বলটা গায়ের ওপর টেনে দিতে দিতে বলল কিশোর, 'ভূতটা দেখতে পারলে ভাল হত!'

'আমার তা মনে হয় না,' ঘুমজড়িত গলায় বলল মুসা। শুয়ে পড়ে কম্বলটা টেনে নিল গায়ের ওপর।

রবিন কিছু বলল না। ঘুমিয়ে পড়েছে।

চার

ঘুম ভাঙল রবিনের। চোখে পড়ল ঢালু হয়ে নেমে যাওয়া চাল। মনে পড়ল, বাড়িতে নেই সে। রকি বীচ থেকে তিন হাজার মাইল দূরে ফিশিংপোর্টের এক বোর্ডিং হাউসে শুয়ে আছে।

উঠে বসে চারদিকে তাকাল রবিন। একটা ডাবল-বাংকের ওপরের তাকে রয়েছে। নিচের তাকে ঘুমাচ্ছে মুসা। কয়েক ফুট দূরে আরেকটা বাংকে কিশোর।

আবার শুয়ে পড়ল রবিন। আগের রাতে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো ছবির মত খেলতে লাগল মনের পর্দায়।

দরজায় টোকা দেবার শব্দ হল। খুলে গেল পাল্লা। ঘরে এসে ঢুকল হাসিখুশি, বেঁটে-মোটা এক প্রৌঢ়া। মিসেস ওয়েলটন, বাড়িওয়ালি। রবিনকে জেগে থাকতে দেখে বলল, 'এই যে, ওঠ, উঠে পড়। নাস্তা তৈরি। নিচে দু'জন লোক দেখা করতে এসেছেন তোমাদের সঙ্গে। পাঁচ মিনিটের মধ্যে এসো।'

বেরিয়ে গেল মিসেস ওয়েলটন।

লাফ দিয়ে বাংক থেকে নেমে এল রবিন। মুসা কিংবা কিশোরকে ডাকতে হল না। বাড়িওয়ালির গলা শুনে জেগে উঠেছে দু'জনেই।

দ্রুত তৈরি হয়ে নিচে নেমে এল ওরা। উজ্জ্বল হলুদ রঙ করা ডাইনিং রুমের দেয়াল, ছাত। সামুদ্রিক জীবজন্তুর খোলস দিয়ে সাজানো হয়েছে। টেবিলে নাস্তা তৈরি। এক ধারে দুটো চেয়ারে বসে কফি খাচ্ছে দু'জন লোক। কথা বলছেন নিচু গলায়।

ছেলেদেরকে ঢুকতে দেখেই উঠে দাঁড়াল একজন। বিশালদেহী! কুচকুচে কালো গায়ের রঙ। কোঁকড়া চুল। হাসলেন। ঝিক করে উঠল ঝকঝকে সাদা দাঁত। 'কেমন আছ তোমরা, মুসা!' ঠিক প্রশ্ন নয়। জবাবের অপেক্ষা না করেই বললেন মিস্টার রাফাত আমান, 'গতরাতেই এসেছিলাম। ঘুমিয়ে পড়েছিলে। আর জাগালাম না। তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে হয়েছে আবার দ্বীপে। উফ্ফ্, যা ভাবনায় পড়েছি না! প্রতিটি মিনিটই পাহারা দিয়ে রাখতে হয় জিনিসপত্র। কাঁহাতক আর পারা যায়!' থামলেন তিনি। তিন কিশোরের ওপর চোখ বুলিয়ে আনলেন একবার। তারপর বললেন, 'তারপর? তোমাদের কাহিনী বল। গতরাতে কি হয়েছিল?'

চেয়ারে বসা দ্বিতীয় লোকটির ওপর চোখ মুসার।

'পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি,' বললেন মিস্টার আমান। 'ইনি মিস্টার হোভারসন। এখানকার পুলিশ-চীফ।'

পরিচয়ের পালা শেষ হল। চেয়ারে এসে বসল তিন গোয়েন্দা। নাস্তার ফাঁকে ফাঁকে জানাল তাদের কাহিনী।

পাইপ দাঁতে কামড়ে ধরে চুপচাপ সব শুনলেন হোভারসন। হান্টের কথা আসতেই হাত তুললেন। 'হান্ট! চেহারা কেমন?'

জানাল ছেলেরা।

'হুম্‌ম্‌!' চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা দোলালেন পুলিশ-চীফ। 'হান্ট গিল্ডার মনে হচ্ছে!'

'চেনেন নাকি?' জিজ্ঞেস করলেন মিস্টার আমান।

'ভালমত। কয়েকবার জেল খেটেছে। টাকার জন্যে পারে না, এমন কোন কাজ নেই। ধরতে পারলে কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করতাম!'

'আমারও কয়েকটা প্রশ্ন ছিল,' গম্ভীর হয়ে বললেন মিস্টার আমান। 'জিজ্ঞেস করতাম, কি করে জানল, ছেলেরা আসছে? কি করে জানল, ওরা গোয়েন্দা? আর গতরাতে কেন নির্জন দ্বীপে ফেলে রেখে এল ওদের? ভাগ্যিস, পাপু খুঁজে পেয়েছিল! নইলে জানতেই পারতাম না আমরা!'

'ঠিক,' সায় দিলেন চীফ। 'প্লেন থেকে নেমেছে ওরা, শুধু এটুকুই জেনে-ছিলাম। এরপর কি হয়েছিল, কিছুই বুঝতে পারিনি। রোড ব্যারিকেড দিয়ে গাড়ি থামিয়ে কত লোককে যে জিজ্ঞেস করেছিলাম⋯।

'পাপু কি করে জানল, তোমরা দ্য হ্যাণ্ডে আছ?' মুসার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন মিস্টার আমান। 'কি বলেছে?'

মুসা জানাল, একবার জিজ্ঞেস করেছিল, উত্তরটা এড়িয়ে গেছে পাপালো। পরে আর জিজ্ঞেস করার কথা মনে ছিল না। তারপর উঠল ভূতের কথা।

'ভূত দেখেছিলে!' ভুরু কোঁচকালেন মিস্টার আমান। 'অসম্ভব! ঝরের রাতে নাগরদোলা চড়তে আসে ভূত, এটা এ এলাকার একটা গুজব।'

'গুজবই বা বলি কি করে?' বললেন হোভারসন। 'গত দু'বছরে অনেকবার দেখা গেছে ওই ভূত। ঝড়ের রাতে। জেলেরা দেখেছে। স্কেলিটন আইল্যাণ্ডের ধারে কাছে যেতে চায় না এখন আর লোকে।' থামলেন চীফ। হাসলেন। 'বিশ্বাস হচ্ছে না আমার কথা? বেরিয়ে জিজ্ঞেস করে দেখুন লোককে। গতরাতেও দেখা গেছে ভূত, খবরটা ছড়িয়ে পড়েছে সারা গাঁয়ে। অনেকেই শুনেছে নাগরদোলা ঘোরার শব্দ। আলো দেখেছে স্পাইগ্লাস লাগানো টেলিস্কোপ দিয়ে, কেউ কেউ ভূতকেও দেখেছে। নাগরদোলার একটা ঘোড়ায় চেপে বসেছিল নাকি একটা সাদা মূর্তি। এই শেষ কথাটা অবশ্য বিশ্বাস করিনি আমি...'

'কুসংস্কারে খুব বেশি বিশ্বাসী এ গাঁয়ের লোক,' বললেন মিস্টার আমান। মাথা দোলালেন। 'বুঝতে পারছি, আজ আর কেউ যাবে না দ্বীপে কাজ করতে। বিপদেই পড়ে গেলাম দেখছি!'

'আগামীকালও কাউকে নিতে পারবেন বলে মনে হয় না,' বললেন হোভারসন। 'তো, মিস্টার আমান, আমি উঠি। দেখি, হান্টকে ধরতে পারি কিনা। কিন্তু একটা প্রশ্ন বেশি খচখচ করছে মনে, পাপু কি করে জানল ছেলেরা দ্য হ্যাণ্ডে আছে?'

'সন্দেহের কথা?' বললেন মিস্টার আমান। 'আমার কাছে চাকরির জন্যে এসেছিল একদিন। এখানকার লোকে ভাল চোখে দেখে না ছেলেটাকে। ও নাকি চোর। এটা জেনে কাজ দিইনি। আমাদের জিনিসপত্র হয়ত ওই চুরি করে, কে জানে!'

'না, বাবা,' জোরে মাথা নাড়ল মুসা, 'পাপু চোর না! গতরাতে অনেক কথা বলেছি। ওকে ভাল ছেলে বলেই মনে হল। অসুস্থ বাপের দেখাশোনা করে। সময় পেলেই উপসাগরে বেরিয়ে পড়ে নৌকা নিয়ে। মোহর খুঁজে বেড়ায়। না, পাপু খারাপ ছেলে না।'

'মুসা ঠিকই বলছে,' সায় দিলেন পুলিশ-চীপ। 'ছেলেটাকে দেখতে পারে না লোকে, সেটা অন্য কারণে। এখানকার লোক বিদেশী পছন্দ করে না। ওদের ধারণা, যত কুকাজ, সব বিদেশীরা করে।'

'যা-ই বলুন, ছেলেটাকে সন্দেহ করি আমি,' বললেন মিস্টার আমান। 'অসুস্থ বাপকে খাওয়ানর জন্যেই হয়ত চুরি করে। একটা সৎ কাজ করতে গিয়ে

আরেকটা অসৎ কাজের সাহায্য নেয়াকে ভাল বলা যায় না।' উঠে দাঁড়ালেন তিনি। 'ছেলেরা, এসো যাই। এতক্ষণে হয়ত দ্বীপে গিয়ে বসে আছেন মিস্টার নেবার। চীফ, পরে আবার দেখা করব আপনার সঙ্গে। আশা করি, হান্টকে ধরে জেলে পুরতে পারবেন।'

কয়েক মিনিট পর। দ্রুতগতি একটা স্পীডবোটে বসে আছে তিন গোয়েন্দা। কঙ্কাল দ্বীপের দিকে ছুটে চলেছে বোট। ফিশিংপোর্টকে গ্রাম বলা হয়, আসলে ছোটখাট শহর ওটা। ঘুরে দেখার ইচ্ছে ছিল ওদের, কিন্তু সময় মেলেনি।

রাতের বেলা অন্ধকারে কিছুই দেখেনি ছেলেরা। এখন দেখল, অসংখ্য ডক আর জেটি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে এদিক ওদিক। সেই তুলনায় নৌকা-জাহাজ অনেক কম। বুঝতে পারল, ওগুলো সব চলে গেছে উপসাগরের দক্ষিণে। ফিশিংপোর্টের সীমানা খুব বেশি বড় না। লোকসংখ্যা আগে অনেক ছিল, ইদানীং নাকি কমে গেছে। ব্যবসা ভাল না, থেকে কি করবে লোকে?

কৌতূহলী চোখে কঙ্কাল দ্বীপের দিকে তাকিয়ে আছে ওরা। মাইলখানেক দূরে আছে এখনও। প্রচুর গাছপালা দ্বীপে। উত্তরপ্রান্তে একটা ছোট পাহাড়।

কঙ্কাল দ্বীপের দক্ষিণে একটা পুরানো জেটির গায়ে এসে ভিড়ল বোট। পাশেই খুঁটিতে বাঁধা আরেকটা মোটরবোট। একপাশ থেকে ঝুলছে বিশেষ সিঁড়ি। স্কুবা ডাইভিঙের সময় খুব কাজে লাগে।

জেটির ধার থেকে পথ চলে গেছে। আগে আগে চললেন মিস্টার আমান। পেছনে তিন কিশোর। শিগগিরই একটা খোলা জায়গায় এসে পৌঁছুল ওরা। ঝোপঝাড় কেটে পরিষ্কার করে ফেলা হয়েছে জায়গাটা। একপাশে দুটো ট্রেলার দাঁড়িয়ে আছে। বড় বড় কয়েকটা তাঁবু খাটানো হয়েছে মাঝখানে।

'ওই যে, মিস্টার জন নেবার, ডিরেক্টর,' বললেন মুসার বাবা। 'গতকাল এসে পৌঁছেছেন ফিলাডেলফিয়া থেকে! জরুরি কাজ সেরে আজই ফিরে যাবেন আবার।'

হর্ন-রিম চশমা পরা একজন লোক এগিয়ে আসছেন। বয়েস চল্লিশের কাছাকাছি। পেছনে তিনজন লোক। একজনের চুল ধূসর। সে-ই পিটার সিমনস, এসকেপের সহকারী পরিচালক, পরে জেনেছে তিন গোয়েন্দা। আরেকজনের চুল সোনালি, নাবিকদের মত ছোট ছোট করে ছাঁটা। যুবক। জোসেফ গ্র্যাহাম। তার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে বিশালদেহী এক লোক। চওড়া বুকের ছাতি। বাঁ হাতটা ঝুলছে বেকায়দা ভঙ্গিতে, বোঝাই যায় অকেজো। কোমরে ঝুলছে রিভলভার। জিম রিভান, গার্ড।

'আমাদের ক্যাম্প,' তাঁবুগুলো দেখিয়ে বললেন মিস্টার আমান। 'বার্জে করে আনা হয়েছে ভারি মালপত্র। আমরা এখন লোক কম। কয়েকদিন পরে শূটিঙের কাজ শুরু হলেই আসবে আরও অনেকে। আসবে দামি যন্ত্রপাতি। তখন আর ওই তাঁবুতে কুলাবে না। আরও কয়েকটা ট্রেলার দরকার পড়বে।'

কাছে এসে গেলেন পরিচালক।

'সরি, মিস্টার নেবার,' বললেন রাফাত আমান, 'দেরিই হয়ে গেল।'

'না না, ঠিক আছে,' হাত তুললেন পরিচালক। ছেলেদের দিকে একবার তাকালেন। আবার ফিরলেন মিস্টার আমানের দিকে। 'কিন্তু এখানকার অবস্থা তো বিশেষ সুবিধের মনে হচ্ছে না। সবই বলেছে পিটার। আর হপ্তাখানেকের ভেতর সাগরদোলাটা ঠিক না করা গেলে, স্কেলিটন আইল্যাণ্ডের আশা বাদই দেব। ক্যালিফোর্নিয়ায় ফিরে গিয়ে স্টুডিওতেই একটা পার্ক সাজিয়ে নেব। সাগরদোলা আনা যাবে ভাড়া করে। তবে এখানে করতে পারলেই ভাল হত। সবকিছু আসল। তাছাড়া দ্বীপের দৃশ্য, উপসাগরের দৃশ্য, খুবই চমৎকার।'

'আশা করছি, ঠিক করে ফেলতে পারব,' বললেন মিস্টার আমান। 'কাঠমিস্ত্রিকে খবর দিয়ে পাঠিয়েছি।'

'তা পাঠিয়েছেন, কিন্তু আসবে কিনা যথেষ্ট সন্দেহ আছে,' গম্ভীর গলায় বললেন পরিচালক। 'সারা শহর জেনে গেছে, গতরাতে ভূত দেখা গিয়েছে। নাগরদোলা ঘুরেছে।'

'ভূত ভূত ভূত! মুঠো হয়ে গেল মিস্টার আমানের হাত। চেহারা কঠোর। 'ওই ভূতের শেষ দেখে ছাড়ব আমি।'

পায়ে পায়ে এসে পরিচালকের পেছনে দাঁড়িয়েছে জিম রিভান। আস্তে করে কেশে উঠল। 'মাফ করবেন, স্যার, গতরাতের ভূতটা বোধহয় আমিই।'

পাঁচ

'গতরাতে,' খুলে বলল সব জিম, 'একা ছিলাম আমি দ্বীপে।' মিস্টার আমানের দিকে চেয়ে বলল, 'আপনারা সব চলে গেলেন ছেলেদেরকে খুঁজতে। পাহারা দিচ্ছিলাম। হঠাৎ কানে এল মোটরবোটের শব্দ। চোরটোর এল মনে করে দেখতে চললাম। পার্কের কাছ দিয়ে চলেছি, হঠাৎ মনে হল নাগরদোলাটার কাছে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে। এগোলাম। দৌড়ে চলে গেল একটা মূর্তি। তাড়া করলাম, কিন্তু ধরতে পারলাম না। কোথায় জানি লুকিয়ে পড়ল। অবাক হলাম! ব্যাটা নাগরদোলার কাছে কি করছিল? নতুন বসানো মোটরটা চুরি করতে আসেনি তো? পরীক্ষা করে দেখলাম মোটরটা। দুটো স্ক্রু খোলা। হ্যাঁ মোটর চুরি করতেই এসেছিল। আবার স্ক্রু টাইট দিয়ে সব ঠিক আছে কিনা দেখার জন্যে সুইচ টিপলাম। চালু হয়ে গেল মোটর, আলো জ্বলে উঠল, ঘুরতে লাগল নাগরদোলা। ঠিক আছে সব। আবার অফ করে দিলাম মোটর। এটাই দেখেছিল লোকে।'

'কিন্তু ভূত!' বলে উঠলেন মিস্টার আমান। 'সাদা পোশাক পরা ভূত দেখেছে লোকে। এর কি ব্যাখ্যা?'

'রেনকোট পরেছিলাম, স্যার,' বলল গার্ড। 'হলুদ রঙের। হুডও ছিল মাথায়।

দূর থেকে অন্ধকারে সাদা ধরে নিয়েছে লোকে।'

'হুঁ!' মাথা ঝোঁকালেন মুসার বাবা। 'বুঝেছি। কিন্তু একটা কাজ ভুল হয়ে গেছে, জিম। সকালেই শহরে যাওয়া উচিত ছিল তোমার। তুমিই গতরাতে নাগরদোলা ঘুরিয়েছ, জানিয়ে এলে ভাল করতে।'

'ঠিকই বলেছেন, স্যার,' মাথা নিচু করে বলল জিম। ভুলই হয়ে গেছে।

'এক কাজ কর,' বললেন মিস্টার আমান। 'আরও দু'জন গার্ড নিয়ে এসো ফিসিংপোর্টে গিয়ে। বুঝতে পারছি, একা কুলাতে পারবে না। চোর আবার আসবে। কয়েকজন যদি আসে, একা পারবে না ওদের সঙ্গে। হ্যাঁ, জেলেফেলেদের কাউকে এন না। ওগুলোকে বিশ্বাস নেই। নিজেরাই চুরি করে বসতে পারে। ভাল লোক আনবে।'

'চেষ্টা করে দেখব, স্যার।'

'চোরের ওপর চোখ রাখার জন্যে এনেছিলাম ছেলেদেরকে,' পরিচালককে বললেন মুসার বাবা। 'কিন্তু হল না। সারা শহর জেনে গেছে, ওরা গোয়েন্দা। কি করে জানল, বুঝতে পারছি না!'

'মনে হয় আমি পারছি , স্যার,' বলল জিম। 'ছোট্ট শহর ফিসিংপোর্ট। ঘটনা খুব বেশি ঘটে না ওখানে। ছোটখাট কিছু ঘটলেই সেটা নিয়ে হৈ-চৈ পড়ে যায় আপনি আর মিস্টার নেবার ফোনে আলাপ করেছেন প্রযোজকের সঙ্গে। শুনেছে অপারেটর। ওই মেয়েগুলো কেমন হয়, জানেনই তো! কোন কথাই পেটে রাখতে পারে না। আর এত বড় একটা খবর, চুরি হচ্ছে সিনেমা কোম্পানির জিনিসপত্র। হলিউড থেকে গোয়েন্দা আসছে তদন্ত করতে। কি করে চেপে রাখবে? আপনারা ফোন ছেড়েছেন একদিকে, অন্যদিকে রঙ চড়িয়ে বন্ধু-বান্ধবদের কাছে খবর পরিবেশন সারা হয়ে গেছে অপারেটরদের। দেখতে দেখতে ছড়িয়ে পড়েছে মুখরোচক খবর।'

প্রায় গুঙিয়ে উঠলেন চীফ টেকনিশিয়ান। 'এসব হতচ্ছাড়া এলাকায় কাজ করাই মুশকিল! শেষ পর্যন্ত হলিউডেই বুঝি ফিরে যেতে হবে!'

'থাকতে পারলেই ভাল হত, রাফাত,' বললেন পরিচালক 'চেষ্টা করে দেখুন, সাগরদোলাটা ঠিক করতে পারেন কিনা। আমাকে এখুনি ফিরে যেতে হচ্ছে। এদিকটা সামলান, যেভাবে পারেন। জোসেফ, প্লীজ, ফিশিংপোর্টে পৌঁছে দেবে আমাকে?'

'চলুন,' বলল সহকারী-পরিচালক। ঘুরে হাঁটতে শুরু করল জেটির দিকে।

ছেলেদের দিকে ফিরলেন মুসার বাবা। 'চল, পার্কটা দেখিয়ে আনি তোমাদের। জোসেফ ফিরে এলে ডাইভিং করাতে নিয়ে যাবে।'

'খুব ভাল হবে, বাবা, চল,' বলল মুসা

খুব বেশি হাঁটতে হল না। ধসে পড়া একটা বেড়া ডিঙিয়ে পার্কে ঢুকল ওরা।

পরিত্যক্ত পার্ক। এককালে সাইনবোর্ডে নাম ছিলঃ প্লেজার পার্ক। এখন আর সাইনবোর্ড নেই, অনেক আগেই নষ্ট হয়ে গেছে! দুটো খুঁটির একটা আছে, তা-ও হেলে রয়েছে। সিমেন্টে তৈরি বিশ্রাম নেবার আসনগুলো বেশিরভাগই ভেঙেচুরে নষ্ট হয়ে গেছে। বেঁকেচুরে মরচে ধরে পড়ে আছে ফেরিস হুইলের লোহার কাঠামো। শরীরের অন্যান্য অংশ খুলে ভেঙে পড়ে আছে কাঠামোর কাছেই। খুব শক্ত করে তৈরি হয়েছিল, তাই বাইশ বছরের ঝড়েও কাত করে ফেলতে পারেনি সাগরদোলাটাকে। দাঁড়িয়ে আছে এখনও, তবে শরীরের বেশিরভাগই ক্ষতবিক্ষত। একই অবস্থা হয়েছিল হয়ত নাগরদোলাটারও, কিন্তু এখন মেরামত হয়েছে। জায়গায় জায়গায় নতুন কাঠ। সিরিষ দিয়ে ঘষে তুলে ফেলা হয়েছে রঙ, নতুন করে লাগানো হবে। কেমন যেন ভূতুড়ে চেহারা। এই দিনের বেলায়ও গা ছমছম করে উঠল মুসার।

এই পার্ক আর এর প্রমোদযন্ত্রগুলো কি কাজে লাগবে, খুলে বললেন মিস্টার আমানঃ 'একটা লোককে ভুল করে খুনের দায়ে দণ্ডিত করা হয়েছে, সে-ই নায়ক আসল খুনী অন্য লোক। পুলিশের হাত থেকে পালিয়ে গেল দণ্ডিত লোকটা খোঁজখবর নিয়ে বের করে ফেলল কে খুনী। পিছু নিল। টের পেয়ে পালাতে চাইল খুনী। কিন্তু পারল না। তার পেছনে লেগে রইল নায়ক। শেষে স্কেলিটর আইল্যাণ্ডে এসে লুকাল খুনী। শেষ দৃশ্যটা এরকমঃ একদল লোক আসবে এই পুরানো পার্কে পিকনিক করতে। তাদের সঙ্গে মিশে গিয়ে গা ঢাকা দিতে চাইবে খুনী। কিন্তু নায়কের চোখ এড়াতে পারবে না। নাগরদোলায় চড়ার সময় ঠিক তাকে চিনে ফেলবে। তাড়া করবে। মারপিট গোলাগুলি শুরু হবে। ভয় পেয়ে হুড়াহুড়ি ছুটাছুটি শুরু করবে পিকনিকে আসা দলটা। কিছুতেই নায়কের সঙ্গে পেরে উঠবে না খুনী। শেষে গিয়ে উঠবে সাগরদোলায়। দোলাটা চলতেই থাকবে, ওই অবস্থায়ই নায়কের সঙ্গে মারপিট হবে তার । দোলা থেকে পড়ে গিয়ে মরবে খুনী।'

'খাইছে! দারুণ কাহিনী!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'ছবিটা দেখতেই হবে!'

'এখানে শূটিং করা গেলে, দৃশ্যটা আরও আগেই দেখতে পারবে,' হেসে বললেন মিস্টার আমান। 'তো আমি যাই। কিছু কাজ করি গিয়ে। তোমরা ঘুরেফিরে দেখ। আধঘন্টার ভেতরেই ফিরে আসবে জোসেফ।' পা বাড়াতে গিয়েও থেমে পড়লেন। 'আর হ্যাঁ, খবরদার, গুপ্তধনের খোঁজখবর বেশি কোরো না! লোকে ঘুণাক্ষরেও যদি ভেবে বসে মোহরের খোঁজ পেয়ে গেছ তোমরা, তাহলে সর্বনাশ হবে! দলে দলে লোক ছুটে আসবে। মোহর খুঁজতে শুরু করবে। বারোটা বাজবে শূটিঙের। গত পঞ্চাশ বছরে খুব একটা খোঁজাখুঁজি হয়নি, মোহর পাওয়া যায়নি সৈকতে। লোকে ভুলেই গেছে ব্যাপারটা। ভুলেই থাকতে দাও।'

'পাহাড়ের ওদিকে গেলে কোন ক্ষতি আছে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর। 'ওতে

নাকি একটা গুহা আছে। কথিত আছে, জলদস্যুরা বন্দীকে ধরে এনে ওখানে পুরে রাখত।'

'আমিও শুনেছি,' বললেন মিস্টার আমান। 'যেতে চাইলে যাও। কিন্তু আধ ঘন্টার ভেতর ফিরবে।' ঘুরে হাঁটতে শুরু করলেন তিনি।

ঘুরে ঘুরে পার্কটা দেখতে লাগল তিন কিশোর।

'জায়গাটা কেমন যেন ভূতুড়ে!' বিড়বিড় করে বলল মুসা। 'গা ছমছম করছে আমার।'

'কিশোর, তুমি চুপ করে আছ কেন?' জিজ্ঞেস করল রবিন। 'কিছু ভাবছ মনে হচ্ছে?'

'অ্যাঁ...হ্যাঁ,' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটা থামাল কিশোর। 'রাফাত চাচার ধারণা, চুরি করছে জেলেরা। সিনেমা কোম্পানির আর সবারও তাই ধারণা, তোমরা দু'জনও হয়ত এটাই ভাবছ।'

'ভাবছি তো। জেলে ব্যাটাদেরই কাজ,' বলল মুসা। 'ব্যবসা খারাপ। খেতে পায় না। সেজন্যেই চুরি করছে।'

'আমার কিন্তু তা মনে হয় না,' বলল কিশোর।

অপেক্ষা করে রইল রবিন আর মুসা।

যন্ত্রপাতি চুরি করার পেছনে অন্য কারণও থাকতে পারে,' বলল গোয়েন্দা প্রধান। 'কঙ্কাল দ্বীপ থেকে সিনেমা কোম্পানিকে তাড়াতে চাইছে হয়ত কেউ। বাইশ বছর ধরে নির্জন পড়ে আছে দ্বীপটা। তা-ই থাকুক, এটাই হয়ত চায় ওই লোক।'

'টেরর ক্যাসলের ওপর জন ফিলবির যেমন মায়া বসে গিয়েছিল,' হাসল মুসা। 'কঙ্কাল দ্বীপের ওপরও তেমনি কারও আকর্ষণ আছে বলতে চাইছ? নইলে সিনেমা কোম্পানিকে তাড়াতে চাইবে কেন?'

'সেটাই রহস্য,' মাথা ঝোঁকাল কিশোর। 'চল, গুহাটা দেখে আসি।'

পার্ক থেকে বেরিয়ে এল ওরা। গাছপালার ভেতর দিয়ে পাহাড়ের দিকে উঠে গেছে একটা পায়ে চলা পথ। আগের রাতের ঝড়ে ভেঙে পড়েছে অনেক গাছপালা। পথের ওপর ডালপাতা বিছিয়ে আছে। ওসবের মধ্যে দিয়ে চলতে অসুবিধে হচ্ছে, বিশেষ করে রবিনের। তার ভাঙা পা সারেনি পুরোপুরি।

দশ মিনিট পর পাহাড়ের মাথার কাছে উঠে এল ওরা। পাহাড় না বলে বড় টিলা বলাই উচিত। কিন্তু নাম পাহাড়, জলদস্যুর পাহাড়। ঠিক চূড়ার কাছে গুহামুখ, খুদে একটা আগ্নেয়গিরি যেন। ভেতরে উঁকি দিল তিন গোয়েন্দা। অন্ধকার।

ভেতরে পা রাখল ওরা। তেরছা হয়ে নেমে গেছে সুড়ঙ্গ। সুড়ঙ্গ পেরিয়ে একটা গুহায় এসে ঢুকল তিন কিশোর। বেশ বড় হলরুমের মত গুহা। লম্বাটে।

শেষ প্রান্তটা সরু। সুড়ঙ্গ দিয়ে আলো এসে পড়ছে, গুহার ভেতরে আবছা অন্ধকার।

গুহার মাটি আলগা, হাঁটতে গেলে পা দেবে যায়। অসংখ্যবার খোঁড়া হয়েছে প্রতিটি ইঞ্চি, তার প্রমাণ।

নিচু হয়ে একমুঠো মাটি তুলে নিল কিশোর। আঙুলের ফাঁক দিয়ে ছাড়তে ছাড়তে বলল, 'গুপ্তধন খুঁজছে লোকে। গত সোয়াশো বছরে কয় সোয়াশো বার খোঁড়া হয়েছে এখানকার মাটি, আল্লাই জানে! সব গাধা! এমন একটা খোলা জায়গায় এনে গুপ্তধন লুকিয়ে রাখবে, জলদস্যুদের এত বোকা ভাবল কি করে!'

'ঠিক,' মাথা ঝাঁকাল মুসা। আঙুল তুলে সরু প্রান্তটা দেখিয়ে বলল, 'ভেতরে আরও গুহা আছে মনে হচ্ছে! টর্চ আনলে ঢুকতে পারতাম।'

গোয়েন্দাগিরি করছ, গুহায় ঢুকতে এসেছ, টর্চ আননি কেন?' হাসল কিশোর রবিনের দিকে ফিরল, 'তুমি এনেছ?'

'গুহায় ঢুকব, ভাবিনি।'

'আমিও ভাবিনি,' বলল রবিন।

'গোয়েন্দাদের জন্যে টর্চ একটা অতি দরকারি জিনিস, সব সময় সঙ্গে রাখা উচিত,' আবার হাসল কিশোর। 'তবে, আমিও রাখতে ভুলে যাই। আজ গুহায় ঢুকব, জানি, তাই মনে করে সঙ্গে নিয়ে এসেছি!'

গুহার সরু প্রান্তে এসে দাঁড়াল ওরা। টর্চ জ্বালল কিশোর। পাথুরে দেয়াল দেয়ালে অসংখ্য তাক, প্রাকৃতিক। মসৃণ। এখানেই ঘুমাত হয়ত জলদস্যুরা, ঘষায় ঘষায় মসৃণ হয়ে গেছে। কে জানে, বন্দিদেরকে হয়ত হাত-পা বেঁধে এখানেই ফেলে রাখা হত! অসংখ্য ফাটল, খাঁজ দেখা গেল দেয়ালের এখানে ওখানে একপাশে, মাটি থেকে ফুট ছয়েক উঁচুতে একটা খাঁজে এসে স্থির হয়ে গেল টর্চের আলো। সাদা একটা বস্তু। ওপরের দিকটা গোল।

'খাইছে রে!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা। ঘুরে দাঁড়িয়েই ছুট লাগাতে গেল। তারপরই ঘটল অদ্ভুত একটা কাণ্ড! চমকে থেমে গেল সে।

তাকের ওপর বসে আছে যেন মানুষের মাথার খুলিটা। চক্ষু কোটর দুটো এদিকে ফেরানো। দাঁতগুলো বীভৎস ভঙ্গিতে হাসছে নীরব হাসি, দুই পাটি দাঁতের মাঝে সামান্য ফাঁক। ওই ফাঁক দিয়েই এল যেন কথাগুলোঃ 'ভাগ, ভেগে যাও জলদি!' দীর্ঘশ্বাস পড়ল। 'আমাকে শান্তিতে একা থাকতে দাও! এখানে কোন গুপ্তধন নেই!'

ছয়

কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই ছুটতে শুরু করল মুসা। ঠিক তার পেছনেই রবিন। প্রায় উড়ে চলে এল যেন সুড়ঙ্গমুখের কাছে। পাথরে হোঁচট খেল মুসা। হুমড়ি

খেয়ে পড়ল। তার গায়ে পা বেধে গিয়ে গোয়েন্দা সহকারীর ওপরই পড়ল নথি। দুই সহকারীর গায়ে হোঁচট খেতে গিয়েও কোনমতে নিজেকে সামলে নিল গোয়েন্দাপ্রধান।

হাঁচড়ে পাঁচড়ে উঠে দাঁড়াচ্ছে দুই সহকারী। ফিরে চাইল একবার কিশোর। না, তাড়া করে আসছে না খুলি। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল আবার। নিচু হয়ে তুলে নিল টর্চটা। ভয়ে হাত থেকে খসে পড়েছিল।

'মড়ার খুলি কথা বলতে পারে না,' সময় পেয়ে সামলে নিয়েছে আবার কিশোর। উঠে দাঁড়িয়েছে দুই সহকারী, পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। তাদের দিকে ফিরে বলল, 'কথা বলতে হলে জিহ্বা দরকার, কণ্ঠনালী দরকার। খুলির ওসব কিছুই নেই।'

হা হা করে হেসে উঠল খুলি। চমকে আবার দৌড় দিতে যাচ্ছিল দুই সহকারী, থেমে গেল খাঁজের পেছনে চোখ পড়তেই। না, খুলি হাসেনি। একটা মাথা দেখা যাচ্ছে। কোঁকড়া চুল। খুলি হাতে নিয়ে লাফিয়ে নেমে এল মাথার মালিক। আবার হাসল জোরে জোরে। নিষ্পাপ কালো দুটো চোখের মণি জ্বলজ্বল করছে টর্চের আলোয়।

'তারপর?' খুলিটা পেছনে ছুঁড়ে ফেলে দিল পাপালো হারকুস। 'চিনতে পার?'

'নিশ্চয়,' জবাব দিল কিশোর। 'প্রথমে দৌড় দিয়েছিলাম, তারপরই মনে হল গলাটা কেমন চেনা চেনা। টর্চ তুলে নিতে আসার সাহস করেছি সেজন্যেই।'

'তারমানে, ভয় পাইয়ে দিতে পেরেছি তোমাদের?' আবার হাসল পাপালো। 'জলদস্যুর ভূত ভেবে কি একখান কাণ্ডই না করলে!' মুসা আর রবিনের গোমড়া মুখের দিকে চেয়ে আবার হা হা করে হেসে উঠল সে।

'আমি ভয় পাইনি,' গম্ভীর গলায় বলল কিশোর। 'শুধু চমকে গিয়েছিলাম। মুসা আর রবিন...' দুই সহকারীর পক্ষে সাফাই গাইতে গিয়ে থমকে গেল সে। ভেড়া বনে গেছে যেন মুসা আর রবিন।

'আমিও ভয় পাইনি,' বিড়বিড় করে বলল রবিন। 'পা দুটো কথা শুনল না, কি করবে! খালি ভাগিয়ে নিয়ে যেতে চাইল...'

'আমারও একই ব্যাপার!' বলল মুসা। 'খুলির ওদিক থেকে কথা শোনা যেতেই পা দুটো চনমন করে উঠল। ছুটিয়ে বের করে নিয়ে যেতে চাইল গুহার বাইরে। তাই, ইচ্ছে করেই তো হোঁচট খেলাম...'

হো হো করে হেসে উঠল পাপালো। 'দারুণ কৌতুক! হাঃ হাঃ হাঃ...

কিশোরও হেসে ফেলল। হাসিটা সংক্রামিত হল মুসা আর রবিনের মাঝেও।

'চল, বাইরে যাই,' হাসি থামিয়ে বলল কিশোর। 'খোলা হাওয়ায় বসে আলাপ করি।'

বাইরে বেরিয়ে এল চার কিশোর। পাহাড়ের গায়ে হেলান দিয়ে হাত-পা

ছড়িয়ে বসল

'এখানে কখন এলে?' পাপালোকে জিজ্ঞেস করল কিশোর। 'কি করে জানলে, আমরা গুহায় ঢুকব?'

'সহজ,' বলল পাপালো। 'নৌকা নিয়ে ঘোরাফেরা করছিলাম। তোমাদের বোট চোখে পড়ল। কোথায় যাবে, বুঝতে পারলাম। দ্বীপের উল্টো দিকে বোট ভিড়িয়ে নেমে পড়লাম। গাছপালার আড়ালে আড়ালে চলে গেলাম ক্যাম্পের কাছে। দেখলাম, পার্কের দিকে যাচ্ছ। নাগরদোলাটার কাছেই একটা ঝোপের ভেতর লুকিয়ে বসে রইলাম। জানলাম, গুহায় ঢুকবে তোমরা। চট করে ঝোপ থেকে বেরিয়ে গাছের আড়ালে আড়ালে চলে এলাম এখানে। লুকিয়ে বসে রইলাম খাঁজের আড়ালে। খুলিটা ছিল অন্য একটা তাকে। খাঁজে নিয়ে গেছি আমিই।'

'কিন্তু লুকিয়ে দ্বীপে নামতে গেলে কেন?' জানতে চাইল রবিন। 'জেটিতে নৌকা বেঁধে এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করলেই পারতে? এতসব লুকোচুরি কেন?'

'গার্ড.' শান্ত গলায় বলল পাপালো। 'জিম রিভানের ভয়ে দেখলেই তাড়া করে এখানকার সবাই তাড়া করে আমাকে।' উজ্জ্বল চোখ দুটোতে বিষণ্নতা।

'কেন?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'লোকের ধারণা, আমি খারাপ,' ধীরে ধীরে বলল পাপালো। 'আমরা গরীব, তারওপর বিদেশী, কাজেই চোর। ফিশিংপোর্টে অনেক লোক আছে, যারা সত্যিই খারাপ। ওরাই চুরি করে, নাম দেয় আমার। বলেঃ ওই গ্রেশান কুত্তাটার কাজ।'

পাপালোর জন্যে দুঃখ হল তিন গোয়েন্দার।

'আমরা তোমাকে অবিশ্বাস করি না, পাপু,' বলল মুসা। 'কত রকমের লোক আছে দুনিয়ায়। মানুষকে কষ্ট দিয়ে মজা পায়। ওদের কথায় কান দিও না···আচ্ছা গতরাতে এত তাড়াতাড়ি আমাদেরকে খুঁজে পেলে কি করে, বল তো?'

'সেটাই সহজ,' উজ্জ্বল হয়ে উঠল আবার কালো চোখজোড়া। 'হাক স্টিভেনের রেস্তোরাঁয় ঝাড়ু দিই আমি। বাসনপেয়ালা মেজে দিই দু'ডলার করে পাই রোজ। খুব ভাল লোক হাক। ও সাহায্য না করলে না খেয়েই মরতে হত···

'দু'ডলারে দু'জন মানুষের খাওয়া হয়!' চোখ কপালে উঠল রবিনের। 'বেঁচে আছ কি করে?'

'আছি, কোনমতে,' সহজ গলায় বলল পাপালো। 'পুরানো ভাঙা একটা কুঁড়ে ঘরে ঘুমাই। এক সময় ঝিনুক রাখত ওখানে জেলেরা। কাজে লাগে না এখন, ফেলে রেখেছে ভাড়া দিতে হয় না আমাকে। সীম আর রুটি কিনতেই খরচ হয়ে যায় দু'ডলার। মাছ ধরতে জানি, তাই বেঁচে আছি। বাবা অসুস্থ। ভাল খাওয়া দরকার। কিন্তু কোথায় পাব? মাঝে মাঝে বাবার কষ্ট দেখলে আর সইতে পারি না। ছুটে বেরিয়ে আসি কুঁড়ে থেকে পাগলের মত ঘুরে বেড়াই উপসাগরে, খুঁজে ফিরি সোনার মোহর মানুষের দয়া আমি চাই না, ঈশ্বর আমাকে সাহায্য করলেই

অনেকক্ষণ কেউ কোন কথা বলতে পারল না আর। নোনাপানি ছুঁয়ে ছুঁয়ে আসছে হাওয়া, শাঁই শাঁই শব্দ, সাগরের দীর্ঘশ্বাস যেন।

কোমরের বেল্টে গোঁজা ছুরি খুলে নিয়ে খামোকাই মাটিতে গাঁথছে পাপালো। থমথমে পরিবেশ হালকা করার জন্যে হাসল। 'নিজের দুঃখের সাতকাহনই গেয়ে চলেছি! আসল কথা থেকে দূরে সরে গেছি অনেক হ্যাঁ কি যেন জিজ্ঞেস করছিলে?'

'গতরাতে এত তাড়াতাড়ি আমাদেরকে খুঁজে পেলে কি করে?' মনে করিয়ে দিল মুসা।

'সকালে হাক স্টিভেনের ওখানে বাসন মাজছিলাম। হঠাৎ কানে এল, হাসাহাসি করছে কয়েকজন লোক। একজন বললঃ গোয়েন্দা, না গোয়েন্দা আনাচ্ছে! আসুক না আগে! হাত দেখিয়ে ছাড়ব ব্যাটাদের!'

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে কাটতে হঠাৎ থেমে গেল কিশোর 'হাত! শব্দটা কোন বিশেষ ভঙ্গিতে উচ্চারণ করেছিল?'

'তুমি কি করে বুঝলে!' ভুরু কোঁচকাল পাপালো জবাবের অপেক্ষা না করেই বলল, 'ওই শব্দটা বলার সময় জোর দেয় সে ঝড়ের সময়ই তোমাদের নিরুদ্দেশের খবর ছড়িয়ে পড়ল। বুঝে গেলাম, কোথায় পাওয়া যাবে তোমাদেরকে।'

'দ্য হ্যাণ্ড···হস্ত···হাত,' বিড়বিড় করল কিশোর। চিমটি কাটছে ঠোঁটে।

পুরানো গলাবন্ধ শার্টের তলায় হাত ঢোকাল পাপালো। 'আমাকে যখন বিশ্বাস কর তোমরা···একটা জিনিস দেখাচ্ছি···' ছুরিটা মাটিতে রেখে চামড়ার তেল চিটচিটে একটা থলে বের করে আনল সে। প্ল্যাস্টিকের সুতোয় বাঁধা মুখ।

বাঁধন খুলল পাপালো। 'চোখ বন্ধ কর সবাই,' হাসি হাসি গলায় বলল। 'হাত বাড়াও।'

হাসল তিন গোয়েন্দা। চোখ বন্ধ করে হাত সামনে বাড়াল।

সবার ডান হাতের তালুতে একটা করে বস্তু রাখল পাপালো। 'এবার চোখ খোল!'

অবাক হয়ে দেখল তিন গোয়েন্দা তিনটে পুরানো সোনার মোহর।

বুড়ো আঙুলের সাহায্যে চকচকে মুদ্রার ধারটা পরীক্ষা করল রবিন। ক্ষয়ে গেছে। লেখা পড়ল। 'ষোলোশো পনেরো!' চোখ বড় বড় হয়ে গেছে তার। 'এত পুরানো!'

'স্প্যানিশ ডাবলুন!' হাতের মোহরটার দিকে চেয়ে আছে কিশোর। 'জলদস্যুদের গুপ্তধন!'

'ইয়াল্লা!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'কোথায়, কোথায় পেয়েছ এগুলো?'

'সাগরের তলায়, বালিতে পড়েছিল,' বলল পাপালো। 'খুঁজলে আরও পাওয়া যেতে পারে। সিন্দুক কোথাও লুকিয়ে রাখেনি ওয়ান-ইয়ার, নৌকা থেকে পানিতে ফেলে দিয়েছিল। অনেক আগের ঘটনা। সিন্দুকটা নিশ্চয় পচে ভেঙে নষ্ট হয়ে গেছে। মোহরগুলো ছড়িয়ে পড়েছে বালিতে। ঢেউয়ের জন্যে এক জায়গায় নেই আর এখন। একটা পেয়েছি স্কেলিটন আইল্যাণ্ডের দক্ষিণে, একটা ডুবে যাওয়া ইয়টের কাছে। সুন্দর ইয়ট ছিল এককালে, ধ্বংস হয়ে গেছে এখন। কয়েকদিন পরেই দুটো মোহর পেয়েছি আরেক জায়গায়। মনে হয় ওখানে আরও...'

জোরে গাল দিয়ে উঠল কেউ, 'এই হারামজাদা, শুয়োরের বাচ্চা, এখানে কি করছিস!'

চমকে ফিরে তাকাল তিন গোয়েন্দা। বিনয়ী জিম রিভানের এ-কি মূর্তি! রাগে কাঁপছে। চোখ মুখ লাল। ছুটে আসছে। বেকায়দা ভঙ্গিতে পাশে ঝুলছে অকেজো হাতটা। 'হারামজাদা!' আবার গাল দিয়ে উঠল সে। 'একবার না বলেছি, এদিক মাড়াবি না! আজ অ্যায়সা ধোলাই দেব...' থেমে গেল সে।

জিমের দৃষ্টি অনুসরণ করে ফিরে তাকাল তিন গোয়েন্দা। তাদের পাশে নেই পাপালো। ছায়ার মত নিঃশব্দে উঠে চলে গেছে ওখান থেকে।

সাত

'চোরটা কি চায়?' ভারি গলায় জিজ্ঞেস করল জিম। 'তোমাদেরকে এখানে নিয়ে এসেছে কেন?'

'কিছুই চায় না,' গম্ভীর হয়ে বলল কিশোর। 'ও আনেনি আমাদেরকে, নিজেরাই এসেছি। গুহাটা দেখতে।'

কিশোরের দিকে চাইল একবার জিম। নরম হল গলার স্বর, 'ছেলেটা ভাল না। পাকা চোর, হাতেনাতে কেউ ধরতে পারেনি আজ পর্যন্ত। ওর কাছ থেকে দূরে থাকার পরামর্শই দেব আমি। এখন এসো। জোসেফ গ্র্যাহাম ফিরে এসেছে। তোমাদেরকে যেতে বলেছে।'

ক্যাম্পের দিকে রওনা হল ওরা। রাগ পড়ে গেছে জিমের, অন্তরঙ্গ হয়ে উঠছে ছেলেদের সঙ্গে।

'গুহায় কেন গিয়েছিলে?' এক সময় জিজ্ঞেস করল জিম। 'গুপ্তধন খুঁজতে? কিচ্ছু নেই। সাগরের তলায় ছড়িয়ে গেছে মোহর। কোনদিনই আর পাওয়া যাবে না। তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে লোকে, পায়নি। কচিত কখনও এক-আধটা মোহর সৈকতে পড়ে থাকতে দেখা যেত আগে। আজকাল আর তা-ও দেখা যায় না।' হাসল গার্ড। 'সাগরদেবতা কোন জিনিস নিলে আর ফেরত দেয় না। এই তো, বছর দুই আগে, দশ লাখ ডলার নিল...'

'দশ লাখ ডলার!' ভুরু কুঁচকে গেছে কিশোরের।

'হ্যাঁ,' অকেজো বাঁ হাত দেখিয়ে বলল জিম। 'ওই টাকার জন্যেই আমার হাতটা গেল...'

কৌতূহলী হয়ে পড়ল তিন গোয়েন্দা। কাহিনীটা শোনাতে অনুরোধ করল জিমকে।

'এক পরিবহন কোম্পানিতে চাকরি করতাম সে সময়,' বলল জিম। 'টাকা-পয়সা কিংবা মূল্যবান জিনিসপত্র এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব নিত কোম্পানি। আমি ছিলাম একটা আর্মার কারের গার্ড। ব্যাংক থেকে টাকা নিয়ে পৌঁছে দিতে হত বিভিন্ন জায়গায়। কিছু নিয়মিত কাজ ছিল। তার মধ্যে একটাঃ প্রাইভেট ব্যাংক থেকে টাকা তুলে নিয়ে মেলভিলের ন্যাশনাল ব্যাংকে জমা দিয়ে আসা। দিয়ে আসতাম। ঠিকঠাকমতই চলছিল সব। নির্দিষ্ট কোন একটা পথে চলাচল করতাম না আমরা। আজ এ পথে গেলে পরের বার অন্য পথে, তারপরের বার আরেক পথে। নির্দিষ্ট কোন সময়ও মেনে চলতাম না। ডাকাত লুটেরাকে ফাঁকি দেবার জন্যেই এই সাবধানতা। কিন্তু তারপরেও একদিন ঘটে গেল অঘটন...'

জিমের কথা থেকে জানা গেল, ঘটনার দিন, ফিশিংপোর্টের এক ব্যাংক থেকে টাকা নিয়ে মেলভিলে চলেছিল আর্মার কার। গাড়িতে দু'জন লোক। ড্রাইভার আর জিম। পথে এক জায়গায় গাড়ি থামিয়ে দুপুরের খাবার খেতে নামল দু'জনে। গাড়িটা পথের পাশে পার্ক করে তালা লাগাল সিন্দুকে। তারপর ঢুকল রেস্টুরেন্টে। বসল গিয়ে জানালার কাছে, ওখান থেকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল গাড়িটা।

খাওয়া শেষ করে বেরোলো দু'জনে। হঠাৎ পাশের একটা পুরানো সিডান গাড়ি থেকে বেরিয়ে এল মুখোসপরা দু'জন লোক। হাতে রিভলভার। ড্রাইভারের পায়ে গুলি করল একজন। আরেকজন বাড়ি মারল জিমের কাঁধে, মাথায়। সঙ্গে সঙ্গে বেহুঁশ হয়ে পড়ল জিম।

গার্ডের পকেট থেকে সিন্দুকের চাবি বের করে নিল ডাকাতেরা। আর্মার কারে উঠে বসল। গুলির শব্দ কানে গিয়েছিল একজন কনস্টেবলের। ছুটে এল সে। গুলি করল দুই ডাকাতকে লক্ষ্য করে। একজনের হাতে গুলি লাগল। গাড়ি নিয়ে পালিয়ে গেল ডাকাতেরা।

পুলিশ স্টেশনে ফোন করে দিল কনস্টেবল। সাড়া পড়ে গেল। রোড ব্লক করে দিল পুলিশ। কড়া পাহারা বসে গেল রাস্তায় রাস্তায়।

সাঁঝের একটু পরে পাওয়া গেল গাড়িটা, রক্তাক্ত। খালি। একটা পরিত্যক্ত বোট হাউসের কয়েক মাইল দূরে। বোঝা গেল, জলপথে পালিয়েছে ডাকাতেরা।

মাঝরাতে কোস্ট গার্ডদের পেট্রল বোট একটা সাধারণ বোটকে ভাসতে দেখল উপসাগরে, কঙ্কাল দ্বীপের কাছাকাছি। বোটের একজন কি যেন ফেলছে পানিতে। তাড়াতাড়ি কাছে চলে এল কোস্ট গার্ডের বোট। দু'জন লোক অন্য বোটটাতে। দুই

ভাই. ডিক এবং বাড ফিশার। দু'জনেই খুব ক্লান্ত, হাল ছেড়ে দিয়েছে। বাডের বাহুতে গুলির ক্ষত, রক্ত ঝরছে! লুট করা টাকার একটি নোটও পাওয়া গেল না বোটে।

'ব্যাপারটা বুঝেছ তো?' বলল জিম। 'নোটের বাণ্ডিল পানিতে ফেলে দিয়েছিল দুই ডাকাত। অনেক খোঁজাখুঁজি করা হয়েছে পরে, কিন্তু একটা নোটও আর পাওয়া যায়নি পানিতে ভিজে নিশ্চয় গলে-ছিঁড়ে গিয়েছিল কাগজের নোট।'

'মহা-হারামী তো ব্যাটারা।' বলে উঠল মুসা। 'ধরা পড়ল বটে, কিন্তু টাকা ফেরত দিল না। তা ব্যাটাদের জেল হয়েছিল তো?'

'হয়েছিল,' জবাব দিল গার্ড। 'হোভারসনের রিভলভারের বুলেটে আহত হয়েছে বাড। কিন্তু বমাল ধরা যায়নি, তাই মাত্র চার বছর করে জেল হয়ে গেল দুই ভাইয়ের। জেলখানায় ভাল ব্যবহারের জন্যে অর্ধেক শাস্তি মওকুফ করে দেয়া হ হ ওদের। ছাড়া পেয়েছে হপ্তা দুয়েক আগে। কিন্তু আমার হাত আর ফিরে পেলাম না ' জিমের কণ্ঠে ক্ষোভ। 'কাজও গেল কোম্পানি থেকে। এরপর আর ভাল কোন কাজ পাইনি আজ পর্যন্ত। ইচ্ছে করে, ব্যাটাদেরও হাত ভেঙে দিই...'

মুসার বাবা দাঁড়িয়ে আছেন জেটিতে মোটর বোটে ডুবুরির পোশাক আর অন্যান্য যন্ত্রপাতি তুলছে জোসেফ গ্র্যাহাম।

'এই যে,' তিনি গোয়েন্দাকে দেখে বলে উঠলেন মিস্টার আমান। 'যাও, বোটে উঠে পড়। চোখ বুজে নির্ভর করতে পার জোসেফের ওপর। খুব ভাল ডুবুরি।'

ছেলেদেরকে বোটে তুলে দিয়ে চলে গেলেন মুসার বাবা।

বোট ছাড়ল জোসেফ গ্র্যাহাম। বেশ বড়সড় বোট। এক জায়গায় স্তূপ করে রাখা ডুবুরির সাজ-সরঞ্জাম। ওগুলো দেখিয়ে বলল জোসেফ, 'আধুনিক জিনিস খুব ভাল। তো, ডুবুরির কাজ কেমন জান-টান?'

মুসা জানাল, প্রাথমিক পরীক্ষায় পাশ করেছে ওরা। সুরকেল ব্যবহার করতে জানে ভালই।

'গুড,' খুশি হয়ে বলল জোসেফ। 'এ-বি-সি-ডি থেকে আর শুরু করতে হল না।'

দ্রুত এগিয়ে চলেছে বোট। হলুদ একটা বয়ার কাছে এসে থামিয়ে দিল জোসেফ। নোঙর ফেলল। বলল, 'আমাদের নিচে একটা ভাঙা জাহাজ আছে। না না, কোন গুপ্তধন নেই। ডুবে যাওয়া বেশ কয়েকটা জাহাজ আছে এদিককার পানিতে। সব ক'টাই তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে ডুবুরিরা। আমাদের নিচে আছে একটা স্প্যানিশ ইয়ট, অনেক বছর আগে ডুবেছে। এখানে মাত্র পঁচিশ ফুট গভীর পানি। নিশ্চিন্তে ডুব দিতে পার। ডিকম্প্রেশনের ভয় নেই।'

ফেস মাস্ক আর ফ্লিপার পরে নিল ছেলেরা। টেনেটুনে পরীক্ষা করে দেখল জোসেফ। ঠিকমতই পরা হয়েছে। একটা আলমারি খুলে গ্যাস ট্যাংক, হোস

কানেকশন আর ভারি ডাইভিং বেল্ট বের করল সে। বলল, 'এখানকার পানি খুব ভাল। পরিষ্কার, গরম। ওয়েটসুট পরার দরকার নেই। রবিন, প্রথমে তুমি চল আমার সঙ্গে। সব সময় কাছাকাছি থাকবে, আলাদা হবে না মুহূর্তের জন্যেও। বুঝেছ?'

মাথা কাত করে সায় দিল রবিন।

গ্যাস ট্যাংক, বেল্ট বাড়িয়ে দিল জোসেফ। 'এগুলো পরে নাও।'

পরে নিতে লাগল রবিন। তীক্ষ্ণ চোখে তার দিকে চেয়ে রইল জোসেফ। নাহ্, পরতে জানে ছেলেটা। ভালই শিক্ষা দিয়েছে ইনস্ট্রাকটর, ভাবল সে।

বোটের পাশ থেকে ঝুলে আছে দড়ির সিঁড়ি। সিঁড়ি বেয়ে পানিতে নামল জোসেফ। সাগরের দিকে পিঠ দিয়ে হাত ছেড়ে দিল সিঁড়ি থেকে। ঝুপ করে পড়ল চিত হয়ে। ডুবে গেল। তার পর পরই একই কায়দায় ডুবল রবিন।

ফ্লিপার নেড়ে দ্রুত ডুবে চলল। জোড়া লেগে গেছে পায়ের ভাঙা হাড়। কোন অসুবিধে হচ্ছে না সাঁতরাতে। কুসুম গরম পানি। স্বচ্ছ। খুব ভাল লাগছে তার।

নতুন এক পৃথিবীতে এসে প্রবেশ করেছে যেন। নিচে একটা বিশাল কালো ছায়া! ডুবে যাওয়া ইয়ট। জোসেফের পাশাপাশি জাহাজটার দিকে নেমে চলল রবিন।

কাত হয়ে পড়ে আছে ইয়ট। সামনের দিকে বিরাট এক ফাটল হাঁ করে আছে। আরও কাছে গিয়ে দেখা গেল, শ্যাওলায় ঢেকে আছে জাহাজের গা। আশপাশে সাঁতরে বেড়াচ্ছে ছোট ছোট মাছ।

রবিনের আগে আগে সাঁতরাচ্ছে এখন জোসেফ। ফ্লিপার নেড়ে চলে গেল জাহাজের ওপর দিয়ে, পেছন দিকে।

দুটো বড় গলদা চিংড়ির ওপর নজর আটকে গেল রবিনের। আরও কাছ থেকে দেখার জন্যে এগিয়ে গেল। হঠাৎ জোরে ঝাঁকুনি লাগল পায়ে। থেমে যেতে হল।

কিছু একটা শক্ত করে চেপে ধরেছে তার ডান পা।

আট

পানির তলায় এই প্রথম বিপদে পড়ল রবিন। আতঙ্কিত হয়ে পড়ল। জোরে লাথি মেরে পা ছাড়ানর চেষ্টা করল। পারল না। চাপ বাড়ল পায়ে। পেছনে টানছে।

পেছন ফিরে চাইতে গেল রবিন। ফেস মাস্কে হাত লেগে গেল নিজের অজান্তেই। সঙ্গে সঙ্গে যেন অন্ধ হয়ে গেল সে, সামনের কিছুই দেখা যাচ্ছে না। পানি ঢুকে পড়েছে মাস্কের ভেতর। উত্তেজনায় ভুলে গেল, কি করে পানি বের করে দিতে হয়।

হঠাৎ কাঁধ চেপে ধরল কেউ। চমকে উঠল রবিন। ধরেই নিল, দানবটা এবার

শেষ করতে এসেছে তাকে। কিন্তু না, পিঠের ট্যাংকে তিন বার আলতো টোকা পড়ল। জোসেফ ফিরে এসেছে তাকে উদ্ধার করতে।

শান্ত হয়ে এল রবিন। উত্তেজনা আর আতঙ্ক চলে গেল। মনে পড়ল, কি করে পানি বের করে দিতে হয়।

মাথা ডানে ঘোরাল রবিন। আস্তে করে এক আঙুলে চাপ দিল মাস্কের বাঁ পাশে। সামান্য ফাঁক হল মাস্ক। জোরে শ্বাস ফেলল সে। বুদবুদ তুলে বেরিয়ে গেল বাতাস, সঙ্গে নিয়ে গেল মাস্কের ভেতরের পানি। আঙুল সরিয়ে আনতেই আবার জায়গামত বসে গেল মাস্ক। অন্ধকার সরে গেল চোখের সামনে থেকে।

প্রথমেই জোসেফের ওপর চোখ পড়ল রবিনের। এদিক ওদিক মাথা নাড়ছে লোকটা। আঙুল তুলে পেছনে দেখাল। ফিরে চাইল রবিন। হায় হায়, এর জন্যেই এত ভয় পেয়েছে সে! জাহাজের একটা দড়ি পেঁচিয়ে গেছে তার পায়ে।

বাঁকা হয়ে দড়ি ধরল রবিন। খুলে ফেলল পা থেকে। নিজের ওপরই রাগ হচ্ছে। অযথা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল। কয়েক ফুট দূরে সরে গেছে জোসেফ। হয়ত এখুনি ওঠার ইঙ্গিত করবে।

কিন্তু না, উঠল না জোসেফ। ডান হাতের বুড়ো আঙুল আর তর্জনীর মাথা এক করে একটা রিং তৈরি করল। দেখাল রবিনকে। তার মানে, সব কিছু ঠিকঠাকই আছে। পাশে চলে এল রবিন। দু'জনে সাঁতরে চলল আবার।

পুরো জাহাজের সামনে থেকে পেছনে একবার সাঁতরাল ওরা। তারপর চারদিকে এক চক্কর দিল। আশপাশে ঘোরাফেরা করছে ছোট ছোট মাছ। ভয় পাচ্ছে না। দু'জন সাঁতারুকে বড় জাতের কোন মাছ মনে করছে হয়ত।

অসংখ্য গলদা চিংড়ি দেখতে পেল রবিন। ইস, একটা স্পীয়ার গান যদি থাকত সঙ্গে! কয়েকটাকে ধরে নিয়ে যাওয়া যেত।'

আরও কিছুক্ষণ সাঁতরাল ওরা। তারপর ওপরে ওঠার ইঙ্গিত করল জোসেফ।

ধীরে ধীরে ওপরের দিকে উঠতে লাগল দু'জনে, কোনরকম তাড়াহুড়ো করল না। মোটর বোটের তলা দেখা যাচ্ছে, অদ্ভুত কোন দানব যেন। ভুস্‌স্‌ করে পানির ওপর মাথা তুলল দু'জনে।

দড়ির সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেল জোসেফ। তাকে অনুসরণ করল রবিন।

'কেমন লাগল?' আগ্রহী গলায় বলল মুসা। হাত ধরে রবিনকে বোটে উঠতে সাহায্য করল।

'ভালই লাগত, কিন্তু গুবলেট করে ফেলেছি,' বলল রবিন। 'দড়ি পেঁচিয়ে গিয়েছিল পায়ে। মাথা ঠিক রাখতে পারিনি।'

জোসেফও জানাল, কিছু কিছু ভুল করেছে রবিন। পানির তলায় কোন কারণেই আতঙ্কিত হয়ে পড়া চলবে না, এর ওপর ছোটখাট এক বক্তৃতা দিল। বলল, এরপর ইয়টের কাছ থেকে দূরে থাকতে হবে।

'মন খারাপ করার কিছু নেই,' হেসে বলল জোসেফ। পানির তলায় হঠাৎ কোন বিপদে পড়ে গেলে মাথা ঠিক রাখা সত্যি কঠিন। রবিনের কপাল ভাল, দড়িতে আটকেছে পা। অক্টোপাসের কবলে পড়েনি। তবে, অক্টোপাস কিংবা হাঙর আক্রমণ করে বসলেও মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে। না না, চমকে ওঠার কিছুই নেই। এদিককার পানিতে ওই দুটো জীব দেখা যায় না খুব একটা। হ্যাঁ, এবার মুসার পালা।'

তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিল মুসা।

দড়ির সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল দুই ডাইভার। পানির তলায় ডুবে গেল মাথা।

কি কি ঘটেছে পানির তলায়, কিশোরকে খুলে বলল রবিন। শেষে বলল, 'পরের বার আর এমন ভুল···

একটা ডাক শুনে থেমে গেল রবিন। চাইল। একশো গজ দূরে ছোট একটা পালের নৌকা। নিঃশব্দে এগিয়ে আসছে। হাত নেড়ে তাদের ডাকছে পাপালো।

দেখতে দেখতে কাছে চলে এল নৌকা। দ্রুত অভ্যস্ত হাতে পাল নামিয়ে ফেলল পাপালো। হাসল। ঝকঝক করে উঠল সাদা দাঁত।

'আমার সম্পর্কে নিশ্চয় অনেক খারাপ কথা বলেছে জিম,' বলল পাপালো। 'বিশ্বাস করেছ তো?'

'না, বলল রবিন। 'বিশ্বাস করিনি। তোমার সম্পর্কে কোনরকম খারাপ ধারণা আমাদের নেই।'

'খুব খুশি হলাম,' হাসল আবার পাপালো। বোটের গায়ে হাত ঠেকিয়ে নৌকা থামাল।

বোটে ফেলে রাখা ডুবুরির-সরঞ্জামগুলোর দিকে চাইল একবার সে, চকচক করছে চোখ। গলার স্বর নির্লিপ্ত রেখে বলল, 'ইয়টটার কাছে যেতে এত সাজসরঞ্জাম লাগে না। পানি খুবই অল্প। কোন যন্ত্রপাতি ছাড়াই যেতে পারি আমি ওখানে।'

'শুনেছি, গ্রীক স্পঞ্জ শিকারিরা যন্ত্রপাতি ছাড়াই একশো ফুটের বেশি পানির তলায় ডুব দিতে পারে,' বলল রবিন।

'ঠিকই শুনেছ,' গর্বিত স্বরে বলল পাপালো। 'আমার বাপ দুশো ফুট নিচে চলে যেতে পারত। কোমরে একটা দড়ি বাঁধা থাকত শুধু, টেনে তোলার জন্যে। দম রাখতে পারত তিন মিনিট।' মেঘ ঘনিয়ে এল তার চেহারায়। 'কিন্তু অসুস্থ হয়ে পড়েছে বাবা। আর কোনদিন ডুব দিতে পারবে না। প্রায়ই বলে, আবার গ্রীসে ফিরে যেতে ইচ্ছে করে তার। কিন্তু টাকা কোথায়? যদি কোনদিন গুপ্তধন পেয়ে যাই, বাবাকে নিয়ে দেশে চলে যাব আমি একটা মোটরবোট কিনব। মাছ ধরব সাগরে। আহা, ওখানকার জেলেদের জীবন কত সুন্দর!' আবার হাসি ফিরল পাপালোর চেহারায়। দ্বিধা করল এক মুহূর্ত। তারপর বলল, 'আগামীকাল গুপ্তধন

খুঁজতে যাব। আমার সঙ্গে যাবে তোমরা?'

'নিশ্চয়!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল রবিন। 'খুব মজা হবে!'

এতক্ষণ চুপচাপ কথা শুনছিল কিশোর। বলল, 'শুধু গুপ্তধন খুঁজলে, আর সাঁতার কেঁটে বেড়ালে তো চলবে না আমাদের। যে কাজে এসেছি, তা-ও কিছু করার দরকার।' তারপর দু'জনকেই অবাক করে দিয়ে জোরে 'হ্যাঁ-চ্-চোহ্!' করে উঠল সে।

'ঠাণ্ডা লাগল নাকি তোমার?' গোয়েন্দাপ্রধানের দিকে চেয়ে বলল রবিন।

কিশোর কোন জবাব দেয়ার আগেই বলে উঠল পাপালো, 'খবরদার, ঠাণ্ডা লাগলে ডুব দিতে যেয়ো না! ভীষণ কানব্যথা করবে। আচ্ছা, চলি এখন। কাজ আছে। কাল দেখা হবে।'

আবার পাল তুলে দিল পাপালো। চলতে শুরু করল নৌকা। রোদে চকচক করছে উপসাগরের পানি। তাতে ভর করে উড়ে চলল যেন হালকা পালের নৌকা।

কয়েক মিনিট পর। পানির ওপর মাথা তুলল মুসা আর জোসেফ। বোটে উঠে এল।

ফেস মাস্ক খুলে ফেলল মুসা। হাসল। 'দারুণ! কিশোর, এবার তোমার পালা।'

খুব একটা আগ্রহী মনে হল না কিশোরকে। শরীর ভাল লাগছে না। পিঠে ট্যাংক বেঁধে মাস্কটা টেনে নামাল মুখের ওপর। জোসেফের পিছু পিছু পানিতে নেমে গেল সিঁড়ি বেয়ে।

'রবিন!' উত্তেজিত মনে হল মুসাকে। 'জান, কি দেখেছি?'

'কি?'

কিছু একটা দেখেছি! ইয়টের ফুট পঞ্চাশেক তফাতে। উঠে আসছি তখন। বালিতে পড়ে আছে, চকচকে! আমার মনে হয় মোহর! আবার যখন ডুব দেব, দেখে আসব ওটা।'

'তুমি শিওর?'

'ঠিক শিওর না। তবে চকচকে কিছু একটা দেখেছি, এটা ভুল নয়। এখানকার লোকে তো বলেই, উপসাগরের তলায় ছড়িয়ে গেছে মোহর মাঝে মধ্যে পাওয়াও যায়।'

কিছু একটা বলতে গিয়েও থেমে গেল রবিন। ভেসে উঠেছে কিশোরের মাথা। তার পাশেই জোসেফ। কিশোরের ফেস মাস্ক সরে গেছে একপাশে। তাকে ধরে রেখেছে জোসেফ। ঠেলে দিচ্ছে বোটের দিকে।

'কি হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'তেমন কিছু না,' অভয় দিয়ে বলল জোসেফ। 'কি করে জানি মাস্ক সরে গেল ওর। ভাগ্য ভাল, গভীর পানিতে ছিল না!'

বোটে উঠে এল দু'জনে।

বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে কিশোরের চেহারা। মাস্ক খুলে রাখতে রাখতে বলল, 'কান ব্যথা করছিল। হাঁচি পেল হঠাৎ। আটকাতে পারলাম না। মাস্ক সরে গেল পানি ঢুকে গেল মুখে। মাস্ক আর জায়গামত সরাতে পারলাম না।'

আবার হাঁচি দিল কিশোর।

'ঠাণ্ডা লেগেছে,' বলল জোসেফ। 'আজ আর ডুব দিতে পারবে না। আগামী তিন-চার দিনেও পারবে বলে মনে হয় না।'

'আমারও তাই মনে হচ্ছে,' সায় দিয়ে বলল কিশোর। 'গতকাল প্লেনে এয়ারকুলারের বাতাস একটু বেশি ঠাণ্ডা ছিল। তার ওপর রাতে বৃষ্টিতে ভিজেছি। ঠাণ্ডা ধরে ফেলেছে।'

'পুরোপুরি সুস্থ না হয়ে আর ডুবতে এসো না,' পরামর্শ দিল জোসেফ। 'হাঁচি কিংবা কাশি থাকলে তো নয়ই। ঠিক আছে, তুমি বস। মুসা আর রবিনকে ঘুরিয়ে আনি কয়েকবার। নাকি তোমরাও আর যেতে চাও না?'

'না না, যেতে চাইব না কেন?' বলে উঠল মুসা।

পালা করে ডুব দিতে লাগল মুসা আর রবিন। প্রথমবারের চেয়ে বেশিক্ষণ ডুবে থাকে এখন। চকচকে জিনিসটা আবার দেখা যায় কিনা, সেদিকে নজর রাখল দু'জনেই। কিন্তু দেখতে পেল না আর।

বিকেল হয়ে গেল। আর কোনরকম বিপদ ঘটল না। সেদিনকার মত ডোবার কাজে ইস্তফা দেবার সিদ্ধান্ত নিল জোসেফ। একা একা একবার ডুব দেবার অনুমতি চাইল মুসা। কি ভেবে রাজি হয়ে গেল তাদের ইনস্ট্রাক্টর।

অনেকক্ষণ পরে, শঙ্কিত হয়ে পড়েছে জোসেফ, এই সময় ভেসে উঠল মুসার মাথা। বোটে এসে উঠল। এক হাতে মুঠো করে রেখেছে কি-যেন

ফেস মাস্ক খুলে ফেলল মুসা। 'দেখ!'

মুসার খোলা মুঠোর দিকে চাইল তিনজনে। একটা উজ্জ্বল বড় মুদ্রা ধারগুলো ক্ষয়ে গেছে।

'এ-কি!' চেঁচিয়ে উঠল জোসেফ। চোখ বড় বড় হয়ে গেছে। 'ভাবলুন!' মুসার হাত থেকে মোহরটা তুলে নিয়ে দেখল ভাল করে। 'সতেরোশো বারো সালের। স্প্যানিশ। মুসা, খবরদার এটার কথা কাউকে বোলো না!'

'কেন?' অবাক হল মুসা। 'ছিনিয়ে নেবে?'

'না, তা নেবে না। তবে শয়ে শয়ে লোক চলে আসবে গুপ্তধন খুঁজতে। বারোটা বাজিয়ে ছাড়বে আমাদের শূটিঙের।'

নয়

সে রাতে সকাল সকাল শুতে যাবার জন্যে তৈরি হল তিন কিশোর।

সারাদিন ডোবাডুবি করেছে, ভীষণ ক্লান্ত মুসা আর রবিন। চোখ জড়িয়ে আসছে ঘুমে।

কিশোরের অসুখ আরও বেড়েছে। নাক দিয়ে পানি গড়াচ্ছে। হাঁচি দিয়ে চলেছে একের পর এক।

মিসেস ওয়েলটনের বোর্ডিং হাউসে ছেলেদের সঙ্গেই রাতের খাবার খেয়েছেন মিস্টার আমান। এখন ফিরে যাবেন কঙ্কাল দ্বীপে। অনেক কাজ পড়ে আছে।

'নাগরদোলার ভুতের গল্প সারা শহরে ছড়িয়ে পড়েছে,' ঝাঁঝালো কণ্ঠে বললেন মুসার বাবা। 'জিম শহরে গিয়ে বলে এসেছে গতরাতে সে-ই নাগরদোলা ঘুরিয়েছিল, কিন্তু কেউ বিশ্বাস করতে চায় না। গার্ড জোগাড় করতে পারেনি। কাজের লোকও আসেনি। দেখি, যাই, যদি কাঠমিস্ত্রি জোগাড় করতে পারি...'

বেরিয়ে গেলেন মিস্টার আমান।

নিজেদের ঘরে এসে ঢুকল ছেলেরা। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কয়েকবার দেখা হয়ে গেছে মোহরটা, আরেকবার বের করল ওটা মুসা। হাতে নিয়ে ওজন আন্দাজ করল, আঙুল দিয়ে ছুঁয়ে ধারগুলো পরীক্ষা করল, লেখাগুলো দেখল। কোথায় রাখবে? জামার পকেটে? না, পড়ে যেতে পারে—ভাবল সে। রেখে দিল নিজের বালিশের তলায়। বিছানায় উঠে শুয়ে পড়ল। রবিন আর কিশোর আগেই শুয়ে পড়েছে।

সকালে মিসেস ওয়েলটনের ডাকে ঘুম ভাঙল তিন গোয়েন্দার।

'ওঠ, ছেলেরা!' দরজার বাইরে থেকে ডাকছে বাড়িওয়ালি। 'নাস্তা তৈরি। মুসা, তোমার বাবা এসেছেন। জলদি এসো!'

তাড়াহুড়ো করে তৈরি হয়ে নিল তিন কিশোর। নেমে এল একতলায়।

মিস্টার আমান বসে আছেন। ছেলেদেরকে দেখে বললেন, 'এই যে, এসেছ। একটা কথা বলতে এসেছি। আজ তোমাদের ব্যবস্থা তোমাদেরকেই করে নিতে হবে। আমি খুব ব্যস্ত থাকব। জোসেফও সঙ্গে যেতে পারবে না। কোথাও যেতে চাইলে, নিজেরাই যাও। কিশোর, তোমার শরীর কেমন এখন?'

'ভাল না,' বলল কিশোর। ভীষণ জোরে হ্যাঁচচো করে উঠল। রুমাল দিয়ে নাক মুছতে মুছতে বলল, 'সরি! চেপে রাখতে পারিনি!'

'হুম্‌ম্‌!' গম্ভীর হয়ে মাথা ঝোঁকালেন মিস্টার আমান। 'সত্যি খারাপ! তুমি ওদের সঙ্গে বেরিও না। ঘরেই থাক দু-এক দিন। ডক্টর রোজারকে ফোন করে দিচ্ছি। খুব ভাল লোক। আমার বন্ধু। স্কেলিটন দ্বীপের মালিক। গিয়ে দেখিয়ে এসো ওকে।'

বসে পড়ল ছেলেরা। নাস্তা দিয়ে গেল মিসেস ওয়েলটন।

ফোনের কাছে উঠে গেলেন মিস্টার আমান। ফিরে এসে জানালেন, দুপুর নাগাদ কয়েক মিনিটের জন্যে সময় দিতে পারবেন ডাক্তার রোজার। একটা কাগজে ডাক্তারের নাম-ঠিকানা লিখে দিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

'ব্যাপারটা খুব খারাপ হয়ে গেল, কিশোর,' বলল মুসা। 'তুমি বেরোতে পারবে না। ভাবছিলাম, মোটর বোটটা নিয়ে আমরা একাই যাব।'

'কি আর করব! যাকগে, ভালই হল, ভাবার সুযোগ পেলাম,' বলল কিশোর। নিজের জন্যে করুণা হচ্ছে তার, কিন্তু প্রকাশ করতে চায় না। 'অনেক কিছু ভাবার আছে। কঙ্কাল দ্বীপের কথাই ধর না, কিছু একটা রহস্য রয়েছে ওটার। কিন্তু কি, বুঝতে পারছি না!'

'কি রহস্যের কথা বলছ?' জিজ্ঞেস করল মিসেস ওয়েলটন। বড় এক প্লেট কেক নিয়ে ফিরে এসেছে।

'স্কেলিটন আইল্যাণ্ড।'

'স্কেলিটন আইল্যাণ্ড? ওই ভয়ানক জায়গাটা! জান, পরশু রাতেও নাগরদোলায় চড়েছে স্যালি ফ্যারিংটনের ভূত?'

'জানি,' শান্ত গলায় জবাব দিল কিশোর। 'আসলে কি ঘটেছিল, তা-ও জানি। ভূত-ফুত কিচ্ছু না।' ব্যাপারটা খুলে বলল মিসেস ওয়েলটনকে।

'তা হতে পারে!' বিশ্বাস করতে পারছে না মিসেস ওয়েলটন। 'তবু, সবাই বলে, ওখানে ভূতের উপদ্রব আছে। এত ধোঁয়া, তলায় নিশ্চয় আগুন আছে!'

আবার বেরিয়ে গেল বাড়িওয়ালি।

নাক দিয়ে অদ্ভুত একটা শব্দ করল কিশোর। 'এতেই বোঝা যায়, লোকের বিশ্বাস ভাঙানো কত কঠিন!'

জানালায় টোকার শব্দ হল। একই সঙ্গে সেদিকে ঘুরে গেল তিন জোড়া চোখ। রোদে পোড়া একটা মুখ। উজ্জ্বল কালো এক জোড়া চোখ চেয়ে আছে ওদের দিকে। পাপালো হারকুস।

'পাপু!' চাপা গলায় বলে উঠল রবিন। উঠে দ্রুত এগিয়ে গেল জানালার দিকে।

'গুপ্তধন খুঁজতে যাচ্ছি,' ফিসফিস করে বলল পাপালো। 'তোমরা যাবে?'

'নিশ্চয়! তবে আমি আর মুসা। কিশোর যেতে পারছে না।'

'ঠাণ্ডা আরও বেড়েছে না? থাকুক, কি আর করা! যাচ্ছি। জেটির পাশে থাকব। ডুবুরির সাজসরঞ্জাম নিয়ে এসো।'

চলে গেল পাপালো।

ফিরে এল রবিন। পাপালোর সঙ্গে কি কথা হয়েছে জানাল দুই বন্ধুকে।

'দারুণ!' উজ্জ্বল হয়ে উঠল মুসার মুখ। 'হয়ত আরেকটা মোহর খুঁজে পাব!

চল, তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়ি।'

'যাচ্ছি,' বলল রবিন। 'কিশোর যেতে পারছে না, সত্যি খুব খারাপ লাগছে।'

কিশোরের চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে, তারও খুব খারাপ লাগছে। কিন্তু মুখে প্রকাশ করল না সেকথা। 'আমি পারছি না, তাতে কি? তোমরা যাও। অসুখের সঙ্গে তো আর কথা নেই।'

'লাঞ্চের সময় ফিরে আসব আমরা,' বেরিয়ে গেল মুসা। পেছনে রবিন। দ্রুত জেটির দিকে এগিয়ে চলেছে দু'জনে।

পুরানো ভাঙাচোরা জেটির পাশে নৌকা নিয়ে অপেক্ষা করছে পাপালো। দুই বন্ধুকে দেখেই হাত তুলে ডাকল।

নৌকায় উঠল দুই গোয়েন্দা। নৌকা ছাড়ল পাপালো। গুপ্তধনের খোঁজে চলল তিন কিশোর।

বন্ধুদেরকে বেরিয়ে যেতে দেখল কিশোর। দীর্ঘশ্বাস ফেলল। চেয়ার ঠেলে সরিয়ে উঠে দাঁড়াল স্কেলিটন আইল্যাণ্ডের ওপর লেখা ফীচারটা আরেকবার খুঁটিয়ে পড়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে শোবার ঘরে এসে ঢুকল।

বিছানা গোছগাছ করছে মিসেস ওয়েলটন। মুসার বালিশটা টান দিয়ে সরিয়েই স্থির হয়ে গেল। চেঁচিয়ে উঠল, 'আরে! সোনার মোহর! এটা এল কোত্থেকে!' ভুরু কুঁচকে তাকাল কিশোরের দিকে। 'তোমরা খুঁজে পেয়েছ, না? স্কেলিটন আইল্যাণ্ডে?'

'মুসা পেয়েছে,' বলল কিশোর। কানে বাজছে জোসেফ গ্র্যাহামের হুঁশিয়ারিঃ খবরদার! কেউ যেন জানতে না পারে! কিন্তু চেপে রাখা গেল না। ফাঁস হয়ে গেল মুসার বোকামির জন্যে।

'স্কেলিটন আইল্যাণ্ডেই পেয়েছে তো?'

'না, উপসাগরে। দ্বীপ থেকে অনেক দূরে।

'তাজ্জব কাণ্ড! প্রথম দিন পানিতে ডুব দিয়েই মোহর পেয়ে গেল!' কিশোরের দিকে তাকাল মিসেস ওয়েলটন চোখে সন্দেহ। লোকের ধারণা, শুটিঙ-ফুটিঙ কিছু না, আসলে মোহর খুঁজতে এসেছে দলটা। ক্যাম্প করেছে দ্বীপে। ক্যাপ্টেন ওয়ান ইয়ারের আসল ম্যাপটা পেয়ে গেছে ওরা কোনভাবে।'

'হুঁ,' চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা ঝোঁকাল কিশোর। সেজন্যেই কি বিরক্ত করা হচ্ছে সিনেমা কোম্পানিকে। কেউ হয়ত চাইছে, কোম্পানি দ্বীপ থেকে চলে যাক।...কিন্তু মিসেস ওয়েলটন, সত্যি বলছি, কোন ম্যাপ নেই কোম্পানির কাছে। ওরা গুপ্তধন খুঁজতে আসেনি। ছবি তুলতেই এসেছে। আপনার এখানে অনেকেই আসে, তাদের ভুল বিশ্বাস ভেঙে দেবার চেষ্টা করবেন।'

'তা করব। কিন্তু আমার কথা বিশ্বাস করবে বলে মনে হয় না। একবার কোন

কথা ওদের মাথায় ঢুকলে আর সহজে বেরোতে চায় না।

'হ্যাঁ,' মাথা ঝোঁকাল কিশোর। 'এই যেমন, নাগরদোলার ভূতের কথাও বেরোতে চাইছে না। আচ্ছা, আপনাকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করব, জবাব দেবেন? সারাজীবন এখানেই বাস আপনার, এখানকার অনেক কিছুই জানেন।'

'নিশ্চয় বলব, যা জানি,' হাসল মহিলা। 'ঘরটা গুছিয়ে নিই। নিচেও কয়েকটা কাজ আছে। তুমিও নিচেই চলে এসো। কফি খেতে খেতে কথা বলব।'

'ঠিক আছে,' বলল কিশোর। রবিনের ব্যাগ থেকে ম্যাগাজিনটা বের করে নিল। 'আমি যাচ্ছি। আপনি আসুন।' ড্রইংরুমে এসে বলল কিশোর। পড়ায় মন দিল।

কাজ সেরে এল মিসেস ওয়েলটন। হাতে দু'কাপ কফি।

ম্যাগাজিনটা বন্ধ করে পাশে রেখে দিল কিশোর। হাত বাড়িয়ে একটা কাপ তুলে নিল।

আরেকটা সোফায় বসে পড়ল মিসেস ওয়েলটন। 'হ্যাঁ, এবার কি বলতে চাও।'

'ওই স্কেলিটন আইল্যাণ্ড,' বলল কিশোর। 'প্রথমেই বলুন, ওটা ভুতুড়ে হল কি করে?' জানা আছে তার, তবু স্থানীয় একজনের মুখে শুনতে চায়।

খুলে বলল সব মিসেস ওয়েলটন। ফীচারে লেখা তথ্যের সঙ্গে তার কথা হুবহু মিলে গেল একটা কথা জানা গেল, যেটা লেখা নেই প্লেজার পার্ক পরিত্যক্ত হবার অনেক বছর পর আবার দেখা দিতে শুরু করেছে স্যালি ফ্যারিংটনের ভূত! বেশ ঘন ঘন দেখা যাচ্ছে ইদানীং

'জেলেরা, যারা দেখেছে,' বলল কিশোর, 'তাদেরকে কতখানি বিশ্বাস করা যায়?'

'তা সঠিক বলা মুশকিল! তিলকে তাল করার অভ্যাস আছে জেলেদের। তবে ওই তিলটা থাকতেই হবে। আরেকটা ব্যাপার, স্কেলিটন আইল্যাণ্ডে ভূত আছে, শুধু শুধু বানিয়ে বলতে যাবে কেন ওরা?'

কেন বলতে যাবে, কোন ধারণা নেই কিশোরের। তবে, জেলেরা পুরোপুরি মিছে কথা বলেছে, এটাও ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না তার।

'ঠিক ক'বছর আগে থেকে দেখা দিতে শুরু করেছে স্যালি ফ্যারিংটনের ভূত?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'সঠিক বলতে পারব না,' বলল মিসেস ওয়েলটন। 'তবে বছর দুই-তিন আগে থেকে।' কিশোরের দিকে তাকাল বাড়িওয়ালি। 'সিনেমা কোম্পানি এল, ক্যাম্প করল দ্বীপে। চুরি যেতে লাগল তাদের জিনিসপত্র, কিন্তু চোর ধরা পড়ল না। ভূতে নিয়ে যায় যেন জিনিসপত্রগুলো! একেবারে গায়েব! নাহ, কিছু একটা রহস্য আছে দ্বীপটায়! কি, বলতে পারব না!'

কিশোরও মিসেস ওয়েলটনের সঙ্গে একমত। কিছু একটা রহস্য আছে কঙ্কাল দ্বীপের। কিন্তু কি সে রহস্য!

দশ

চমৎকার হাওয়া, ফুলে উঠেছে পাল। তরতর করে এগোচ্ছে ছোট নৌকা। আশপাশে কোন নৌকা-জাহাজ নেই। অনেক দূরে দক্ষিণ দিগন্তে কয়েকটা কালো বস্তু, মাছ ধরা নৌকা।

কঙ্কাল দ্বীপের জেটিতে এসে নৌকা বাঁধল পাপ্যালো, রবিন আর মুসার অনুরোধ। ডুবুরির সাজসরঞ্জাম নেবে ওরা। তবে আগে জোসেফ গ্রাহামের কাছ থেকে অনুমতি নিতে হবে।

অনুমতি দিল জোসেফ। তাড়াহুড়ো করে চলে গেল প্লেজার পার্কের দিকে।

মোটর বোটের আলমারি খুলে মুসা বের করল ফ্লিপার, মাস্ক, গ্যাস ট্যাংক। দু'জনের জন্যে। পাপালোর দরকার নেই। ওসব সরঞ্জাম ছাড়াই সাগরে ডুব দিতে অভ্যস্ত সে। কি ভেবে, পানির তলায় ব্যবহারের উপযোগী দুটো টর্চও নিয়ে নিল।

আবার এসে উঠল ওরা নৌকায়। বাঁধন খুলল পাপালো। আবার নৌকা ছাড়ল।

উজ্জ্বল রোদে ঝিকমিক করছে পানি। ছোট ছোট ঢেউয়ে তালে তালে দুলছে নৌকা। চুপ করে বসে থাকতে থাকতে ঝিমুনি এসে গেল দুই গোয়েন্দার।

গান ধরল পাপালো। ভাষাটা বুঝতে পারল না দুই গোয়েন্দা। নিশ্চয় গ্রীক। চোখ মেলে চাইল ওরা। চোখে পড়ল দ্য হ্যাণ্ড, হস্ত। যেখানে দু'রাত আগে রহস্যজনকভাবে আটকা পড়েছিল ওরা।

রাতে ভালমত দেখতে পারেনি, দিনের আলোয় এখন দেখল ওরা দ্বীপটা। সোয়া এক মাইল লম্বা, শ'দুয়েক গজ চওড়া। রুক্ষ, পাথুরে, মানুষ বসবাসের অযোগ্য। ফোয়ারা দেখা যাচ্ছে না এখন, শুধু ঝড়ের সময় দেখা যায়।

ফোয়ারার কথা পাপালোকে জিজ্ঞেস করল রবিন।

'সাগর আজ শান্ত,' বলল পাপালো। 'খুব বেশি অশান্ত হলে তবেই পানি ছিটায় ওই ফোয়ারা।...দ্বীপের তলায় কোন ধরনের সুড়ঙ্গ আছে। ওটা দিয়েই পানি ঢুকে ছিটকে বেরোয় টিলার ওপরের ছিদ্র দিয়ে। তিমির ফোয়ারার মত।'

দ্বীপের মূলভূমির একশো গজ দূরে নৌকা রাখল পাপালো। পাল নামিয়ে নোঙর ফেলল। 'এখন ভাটা। পানি কম এদিকে। পুরো জোয়ারের সময়ই কেবল দ্বীপ পর্যন্ত নৌকা নিয়ে যাওয়া যায়।'

ঢেউয়ে নাচছে নোঙরে-বাঁধা নৌকা। সাজ-সরঞ্জাম পরে নিল রবিন আর মুসা। পাপালোর ওসব দরকার নেই। নিজের ফেস মাস্কটা শুধু পরে নিয়েছে।

আস্তে করে নৌকা থেকে পানিতে পড়ল পাপালো। আগে আগে সাঁতরে

চলল। তাকে অনুসরণ করল দুই গোয়েন্দা।
কয়েক গজ গিয়ে থেমে গেল পাপালো। দাঁড়িয়ে পড়ল। কয়েক ফুট এগিয়েই হাঁটু পানিতে উঠে এল। ফিরে চেয়ে দুই সঙ্গীকে বলল, 'বলেছি না, পানি একেবারে কম। যা চোখা পাথর। খোঁচা লাগলে নৌকা শেষ। এজন্যেই ওখানে রেখে আসতে হয় নৌকা।'
ছপাৎ ছপাৎ আওয়াজ তুলে হেঁটে চলল ওরা। দ্বীপে উঠল। একপাশে একটা ছোট খাঁড়ি। তলায় বালি। বিশ ফুট গভীর। তল দেখা যায়।
'গত হপ্তায় ওই খাঁড়িতেই দুটো মোহর পেয়েছি,' পাপালো বলল। 'কপাল ভাল হলে আজও পেয়ে যেতে পারি কয়েকটা।'
খাঁড়িতে নেমে পড়ল তিন কিশোর। ডুব দিল।
এখানে ওখানে পড়ে আছে ছোটবড় পাথর। পাথর ঘিরে জন্মেছে নানারকম সামুদ্রিক আগাছা। হলদে বালিতে পড়ে আছে উজ্জ্বল রঙের তারা মাছ। আশপাশে ঘুরছে ছোট রঙিন মাছের দল। আর আছে কাঁকড়া। অগুণতি। বিচিত্র ভঙ্গিতে পাশে হেঁটে এগোচ্ছে, তাড়া করলেই সুড়ুৎ করে লুকিয়ে পড়ছে ছোট ছোট গর্তে। অনেক কিছুই দেখল তিন ডুবুরি, কিন্তু একটা মোহরও চোখে পড়ল না।
ওঠার ইশারা করল মুসা। ভুসস করে ভেসে উঠল তিনজনে।
'বেশি গভীর না,' মাউথপিস খুলে নিয়ে বলল মুসা। 'এখানে গ্যাস নষ্ট করে লাভ নেই। এক কাজ করলেই তো পারি। সব কিছু রেখে পাপুর মত শুধু মাস্ক পরে ডুব দিলে অসুবিধে কি? ও পারছে, আমরা পারব না কেন?'
রাজি হল রবিন। তীরে এসে উঠল দু'জনে। মাস্ক ছাড়া আর সব সরঞ্জাম খুলে রাখল পাথরের ওপর। আবার নেমে এল খাঁড়িতে।
পুরো খাঁড়ির কোথাও খোঁজা বাদ রাখল না ওরা। কিন্তু মোহরের চিহ্নও চোখে পড়ল না।
ক্লান্ত হয়ে তীরে এসে উঠল তিনজনে, বিশ্রাম নিতে।
'আজ ভাগ্য বিরূপ,' হতাশ কণ্ঠে বলল পাপালো। 'তবে পেলে কাজ হত। বাবার অসুখ বেড়েছে। চল, আরেক জায়গায় যাই। একটা জায়গা চিনি। অনেক দিন আগে ওখানে একটা মোহর পেয়েছিলাম। ওখানে গিয়ে...' হঠাৎ থেমে গেল সে চেয়ে আছে উপসাগরের দিকে।
কানে ঢুকল ইঞ্জিনের শব্দ। ফিরে চাইল রবিন। ধূসর একটা মোটর বোট। পুরানো। দ্রুত গতিতে ছুটে আসছে।
'এদিকেই আসছে।' বলল পাপালো। 'ওরাও মোহর খুঁজতে আসছে কিনা কে জানে!'
দ্রুত এগিয়ে আসছে বোট। গতি কমছে না মোটেই। লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল পাপালো। 'আরে, পাথরে বাড়ি লাগাবে তো! তলা খসাবে!' চেঁচিয়ে উঠল সে।

'এ-ই-ই! বোট থামাও! বাড়ি লাগবে পাথরে!'

কমল না বোটের গতি। ইঞ্জিনের শব্দে পাপালোর চিৎকার কানে গেল না হয়ত চালকের।

উঠে দাঁড়াল মুসা আর রবিন। তিনজনে হাত নেড়ে নেড়ে চিৎকার করতে লাগল, বোট থামাতে বলল।

আরও এগিয়ে এল বোট। হুইল ধরে রাখা চালককে দেখা যাচ্ছে। মাথার বড় হ্যাটের কাণা টেনে নামানো। চেনা গেল না লোকটাকে। ছেলেদের চিৎকার তার কানে গেল কিনা বোঝা গেল না, তবে হঠাৎ বদলে গেল ইঞ্জিনের শব্দ। গতি কমে গেল বোটের। ব্যাক গীয়ার দিয়েছে হয়ত।

সাঁ করে পাশে ঘুরে গেল বোটের নাক। গতি এখনও অনেক। কাত হয়ে গেল একপাশে, উল্টেই যাবে যেন। সোজা হয়ে গেল আবার। তারপরই ঘটল অঘটন।

বোটের ঠিক সামনেই পাপালোর নৌকা। শেষ মুহূর্তে নৌকাটা দেখতে পেল বোধহয় চালক। সরে যাবার চেষ্টা করল কিনা, বোঝা গেল না। প্রচণ্ড জোরে আঘাত হানল ইস্পাতের তৈরি ভারি বোটের নাক, নৌকার মাঝামাঝি। ঢুকে গেল ভেতরে। একটা মুহূর্ত এক হয়ে রইল দুটো জলযান! জোরে গর্জে উঠল মোটর বোটের ইঞ্জিন। ঝটকা দিয়ে নৌকার ভেতর থেকে বের করে আনল নাক। মোড় ঘুরে সোজা ছুটল খোলা সাগরের দিকে।

বোবা হয়ে গেছে যেন ছেলে তিনটে। হাঁ করে চেয়ে আছে ভাঙা নৌকাটার দিকে। দ্রুত তলিয়ে যাচ্ছে ওটা।

'ইয়াল্লা!' গুঙিয়ে উঠল মুসা। 'কাপড়-চোপড়, ঘড়ি, সব গেল আমাদের!'

'বাড়ি ফেরার পথ বন্ধ!' বিড়বিড় করল রবিন। 'আটকা পড়লাম এই দ্বীপে! দ্বিতীয়বার!'

স্তব্ধ হয়ে গেছে পাপালো। কিছুই বলার নেই তার। মুঠো হয়ে গেছে হাত। বোবা চোখে চেয়ে আছে সাগরের দিকে। তার সব আশা সব ভরসা যেন তলিয়ে গেছে ওই ছোট নৌকাটার সঙ্গে সঙ্গে।

এগারো

পুরো ফীচারটা আরেকবার খুঁটিয়ে পড়ল কিশোর। এতই মগ্ন রইল পড়ায়, সময় কোন্‌দিক দিয়ে বেরিয়ে গেল টেরই পেল না।

দুপুরের খাবার দেবে কিনা জিজ্ঞেস করতে এল মিসেস ওয়েলটন। মুসা আর রবিনকে না দেখে ওরা কোথায় গেছে জানতে চাইল।

চোখ মিটমিট করে তাকাল কিশোর। তাই তো! লাঞ্চের সময় তো ওদের ফিরে আসার কথা! মোহরের খোঁজ করতে করতে খিদেই ভুলে গেল!

'বাইরে গেছে,' মিসেস ওয়েলটনকে বলল কিশোর। এসে যাবে যে-কোন

মুহূর্তে। আমার খাবার দিন। ডাক্তারের কাছে যাবার সময় হয়ে গেছে।'

নাক দিয়ে অনবরত পানি গড়াচ্ছে। রুচি নেই। এক গ্লাস দুধ দিয়ে কোনমতে একটা স্যাণ্ডউইচ গিলে নিল কিশোর। তারপর বেরিয়ে পড়ল।

বোর্ডিং হাউসের কয়েকটা বাড়ি পরেই ডাক্তার রোজারের চেম্বার, মিসেস ওয়েলটনকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিয়েছে কিশোর।,

রাস্তায় লোকজন কম। কলোনি টাইপের কয়েকটা বাড়ি পেরিয়ে এল কিশোর। রঙ চটে গেছে, প্লাস্টার উঠে গেছে জায়গায় জায়গায়। কয়েকটা খালি দোকান পেরোল। দরজায় ঝুলছে 'ভাড়া দেওয়া হইবে' নোটিশ। পরিষ্কার বোঝা যায়, ফিশিংপোর্টের সময় খুব খারাপ যাচ্ছে।

আশপাশের বাড়িগুলোর তুলনায় ডাক্তার রোজারের বাড়িটা নতুন। লাল ইটের তৈরি, ছোটখাট, ছিমছাম। ওয়েটিং রুমে ঢুকল কিশোর। দুটো বাচ্চা নিয়ে বসে আছে এক মহিলা। খানিক দূরে বসেছে দু'জন বৃদ্ধ, শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সামনের দেয়ালের দিকে।

কিশোরের দিকে তাকাল ডেস্কের ওপাশে বসা নার্স। ডাক্তারের চেম্বারের দরজা দেখিয়ে দিল। সোজা ঢুকে যেতে বলল।

মাঝারি আকারের একটা কামরা। এক পাশে একটা ছোট ডেস্ক। কাছেই একটা বিছানা, ওতে শুইয়ে পরীক্ষা করা হয় রোগীকে। দু'পাশের দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটা আলমারি। সাদা রঙ করা। ওষুধের শিশি বোতলে ঠাসা।

ডেস্কের ওপাশে বসে আছেন ডাক্তার রোজার। ধূসর হয়ে এসেছে চুল। একটা স্যাণ্ডউইচ খাচ্ছেন।

'হ্যাল্লো, কিশোর পাশা,' হেসে বললেন ডাক্তার, 'তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছি। এসো, বসো।'

স্যাণ্ডউইচটা খেয়ে নিলেন ডাক্তার। এক ঢোক কফি খেয়ে উঠে দাঁড়ালেন। বিছানায় গিয়ে শুতে ইঙ্গিত করলেন কিশোরকে।

দ্রুত অভ্যস্ত হাতে কিশোরের নাক গলা কান পরীক্ষা করলেন ডাক্তার। গলায় স্টেথো লাগিয়ে হার্টবিট শুনলেন। টোকা দিয়ে পরীক্ষা করলেন বুক। তারপর ব্লাডপ্রেশার দেখলেন।

'হুঁমম,' মাথা ঝোঁকালেন ডাক্তার। 'ঠাণ্ডা লাগিয়েছ ভাল মতই। এখানকার আবহাওয়া সহ্য হয়নি...'

আলমারি খুলে একটা শিশি বের করলেন ডাক্তার। একটা ছোট খামে কয়েকটা বড়ি ঢেলে নিলেন। খামটা কিশোরের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'ভাবনা নেই। চার ঘন্টা পর পর দুটো করে বড়ি খেয়ো। দু'দিনেই সেরে যাবে। তবে হ্যাঁ, নড়াচড়া বেশি করবে না, বিশ্রাম নেবে। সাগরের ধারে কাছে যাবে না।'

'ঠিক আছে,' বলল কিশোর। এক মুহূর্ত দ্বিধা করল। 'আচ্ছা, স্যার, আমাকে

কয়েক মিনিট সময় দিতে পারবেন? কিছু কথা…

'লাঞ্চ টাইম,' কিশোরের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন ডাক্তার। 'খেতে খেতে কথা বলতে পারব। ওইটুকু সময় পাবে।' ঘুরে গিয়ে ডেস্কের ওপাশে চেয়ারে বসে পড়লেন আবার তিনি। 'হ্যাঁ, শুরু কর। কি জানতে চাও?'

'আমি মানে…কিছু তথ্য দরকার,' বলল কিশোর। 'শুনলাম আপনি স্কেলিটন আইল্যাণ্ডের মালিক…'

'স্কেলিটন আইল্যাণ্ড!' হাত তুললেন ডাক্তার। 'ওই হতচ্ছাড়া দ্বীপের কথা রাখ! শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে গেছে। মরার আর জায়গা পেল না হতভাগিটা! মরে নাকি ভূত হয়েছে!'

'তাহলে ভূত মানেন না আপনি? জেলেদের কথা বিশ্বাস করেন না?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'আরে দুত্তোর! ভূত আছে নাকি! সব ব্যাটা জেলেদের কুসংস্কার। স্যালি মারা যাবার পর কোন পাজি লোক ভূত সেজে গিয়ে নাগরদোলায় চড়েছিল হয়ত। মেয়েটার একটা রুমাল জোগাড় করে নিয়ে ফেলে এসেছিল পার্কে। সব সাজানো ব্যাপার। জানি কার কাজ। কিন্তু প্রমাণ করতে পারব না। দ্বীপে যাতে লোকজন না যায়, সেজন্যেই এই শয়তানী।'

মাথা ঝোঁকাল কিশোর। ডাক্তারের কথায় যুক্তি আছে।

'দুর্ঘটনায় মারা গেল একটা মেয়ে,' আবার বললেন ডাক্তার। 'কয়েক রাত পরে দেখা গেল তার ভূত। ব্যস, আর কি যেতে চায় কেউ ওখানে। ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে গেল প্লেজার পার্ক। জাঁকিয়ে উঠল মেলভিলের আরেকটা পার্ক। প্লেজার পার্কের সব কাস্টোমার চলে গেল ওখানে। ব্যাটারা মনে করেছে, আমি কিছু বুঝি না।'

কাপে কফি ঢাললেন ডাক্তার। আরেকটা স্যাণ্ডউইচ তুলে নিলেন সামনের প্লেট থেকে। 'নাও, তুমি খাও।'

মাথা নাড়ল কিশোর। 'না, আপনি খান। আমি খেয়ে এসেছি।'

'পার্কটা চালাত আমার বাবা,' স্যাণ্ডউইচ চিবাতে চিবাতে বলল ডাক্তার। 'আমি তখন ছাত্র। বাবার মৃত্যুর পর দ্বীপের মালিক হলাম আমি। কিন্তু ওই পর্যন্তই। একটা কানাকড়িও এল না ওখান থেকে।…অনেক বছর পর সিনেমা কোম্পানি এসে ভাড়া নিল দ্বীপটা। কিছু পয়সা পাব এবার।' হঠাৎ সামনে ঝুঁকে এলেন তিনি। 'আচ্ছা, সত্যি শূটিঙের জন্যেই এসেছে তো দলটা? গুজব শুনছি, ওয়ান-ইয়ারের ম্যাপ নিয়ে নাকি…'

'ভুল শুনেছেন,' বাধা দিয়ে বলল কিশোর। 'ছবির শূটিং করতেই এসেছে দলটা।'

'হুঁমম! সত্যি হলেই ভাল। দ্বীপটা আমার। ওতে গুপ্তধন থাকলে ওগুলো

আমারই হওয়া উচিত, তাই জিজ্ঞেস করলাম।'

'আমার মনে হয়, নেই। কোন জায়গা তো আর খোঁজা বাদ রাখেনি লোকে। থাকলে, পেয়ে যেতই।'

'তা-ও ঠিক,' আবার স্যাণ্ডউইচে কামড় দিলেন ডাক্তার।

'আচ্ছা, ডক্টর,' বলল কিশোর। 'সিনেমা কোম্পানির জিনিসপত্র চুরি যাচ্ছে, নিশ্চয় শুনেছেন। কারা, কেন চুরি করছে, কিছু অনুমান করতে পারেন?'

অবশিষ্ট স্যাণ্ডউইচটুকু মুখে পুরলেন ডাক্তার। চিবিয়ে গিলে ফেললেন। কফির কাপ টেনে নিতে নিতে বললেন, 'অনুমান তো কত কিছুই করা যায়। এই যেমন, কেউ একজন চায় না, দ্বীপে শূটিং করুক সিনেমা কোম্পানি। মেলভিলের সেই পার্কের মালিকও হতে পারে। দ্বীপটাতে লোক যাতায়াত শুরু করলে হয়ত আবার চালু হতে পারে প্লেজার পার্ক। সেজন্যেই তাড়াতে চাইছে সিনেমা কোম্পানিকে। অন্য কারণেও হতে পারে চুরি। এখানকার লোক বড় গরীব। ঝিনুকে রোগ দেখা দেবার পর থেকে অনেকেরই রুটি জোটে না। ওদের কেউ পেটের দায়ে চুরি করছে হয়ত জিনিসপত্র।'

'কিন্তু ঠিক যেন মিলছে না!' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর।

'রহস্যের সমাধান করতে চাইছ, না?' হাসলেন ডাক্তার। 'গোয়েন্দাগিরি?'

পকেট থেকে একটা কার্ড বের করল কিশোর। ডাক্তারের দিকে বাড়িয়ে ধরল।

কার্ডটা নিয়ে পড়লেন ডাক্তার। হাসলেন আবার। ফিরিয়ে দিতে দিতে বললেন, 'তাহলে সত্যিই তোমরা গোয়েন্দা? বেশ বেশ। আত্মবিশ্বাস থাকা ভাল। তোমাদেরকেই তাহলে দ্য হ্যাণ্ডে ফেলে রেখে এসেছিল হান্ট গিল্ডার। কেন, বল তো?'

'হয়ত ভয় দেখাতে,' বলল কিশোর। 'কেউ একজন হয়ত চায়, আমরা আবার হলিউডে ফিরে যাই। এখানে থাকলে, খোঁজখবর করলে, তার অসুবিধে হবে।'

'হুঁমম!' ভুরু কুঁচকে কিশোরের দিকে চেয়ে আছেন ডাক্তার। 'তোমার কথায় যুক্তি আছে। ফেলে দেয়া যায় না।'

'আচ্ছা, স্যার, আরেকটা কথা,' ডাক্তারের দিকে তাকাল কিশোর। 'ঠিক কবে থেকে আবার দেখা দিতে শুরু করেছে নাগরদোলার ভূত? বলতে পারবেন?'

'কবে থেকে?' নিজের চিবুকে আলতো টোকা দিলেন ডাক্তার। 'দুই…হ্যাঁ, দু'বছরই হবে। হঠাৎ দেখা দিতে শুরু করল ভূতটা। বেশ ঘন ঘন। কেন, একথা জানতে চাইছ কেন?'

'শিওর না হয়ে বলা উচিত না, স্যার। আচ্ছা, উঠি। আপনার অনেক সময় নষ্ট কর দিলাম।'

'না না, ও কিছু না,' উঠে দাঁড়ালেন ডাক্তার। 'ভূত রহস্যের সমাধান করতে

পারলে জানিও আমাকে। আর হ্যাঁ, আবার মনে করিয়ে দিচ্ছি, দ্বীপে গুপ্তধন থাকলে, তার মালিক কিন্তু আমি।'

ডাক্তারকে ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে এল কিশোর। চিন্তিত। বেশ কয়েকটা রহস্য একসঙ্গে এসে জড় হয়েছে। কিছুতেই জট ছাড়ানো যাচ্ছে না। এ-নিয়ে আরও অনেক বেশি ভাবতে হবে।

পথে এসে নামল কিশোর। পাশ কাটিয়ে চলে গেল একটা গাড়ি। ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষার আওয়াজ হল। পিছিয়ে এল গাড়িটা। কিশোরের পাশে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল।

'এই যে, খোকা,' জানালা দিয়ে মুখ বের করে ডাকলেন পুলিশ চীফ হোভারসন, 'কোথায় গিয়েছিলে?'

'ডাক্তারের কাছে,' বলল কিশোর।

'কেন?'

'সর্দি।'

'ও। হ্যাঁ, শুনেছ, হান্টকে ধরতে পারিনি। ব্যাটা পালিয়েছে।'

'পালিয়েছে?'

'একটা মালবাহী জাহাজে কাজ নিয়েছে। আজ সকালে ছেড়ে গেছে জাহাজটা। কয়েক মাসের মধ্যে ফিরবে না। ওর এক বন্ধুকে ধরেছিলাম। ওই ব্যাটা বলল, গোয়েন্দা জেনে তোমাদেরকে নিয়ে একটু মজা করছে হান্ট। আমার কিন্তু বিশ্বাস হচ্ছে না।'

'আমারও না,' বলল কিশোর।

'কিন্তু কি আর করা? ব্যাটাকে তো ধরতে পারলাম না,' বললেন হোভারসন। 'ঠিক আছে, চলি। তোমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখব। নতুন কিছু জানতে পারলে জানাব।'

গাড়ি চালিয়ে চলে গেলেন হোভারসন। আবার বোর্ডিং হাউসের দিকে হাঁটতে লাগল কিশোর। চিমটি কাটছে নিচের ঠোঁটে।

লোকটার ওপর প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল কিশোর। পাশের এক গলি থেকে আচমকা বেরিয়ে এসে পথ রোধ করেছে তার। হালকা-পাতলা। কুৎসিত হাসিতে বিকৃত হয়ে আছে মুখ।

'এই ছেলে, দাঁড়াও,' আঙুল তুলল লোকটা। 'তোমাকে কিছু উপদেশ দেব।'

'নিশ্চয় নিশ্চয়, বলুন কি বলবেন?' চেহারা বোকা বোকা করে রেখেছে কিশোর। ইচ্ছে করলেই চেহারাটাকে এমন হাবাগোবা করে তুলতে পারে সে। এতে কাজ দেয় অনেক সময়, দেখেছে।

'আমার উপদেশ, হাড়গোড় আস্ত রাখতে চাইলে হলিউডে ফিরে যাও। সঙ্গে নিয়ে যাও সিনেমা কোম্পানিকে। ফিশিংপোর্টে তোমাদেরকে কেউ চায় না।'

দু'দিকের কান পর্যন্ত বিস্তৃত হল লোকটার কুৎসিত হাসি। তার হাতের দিকে চোখ পড়ল কিশোরের। বাঁ হাতের উল্টো পিঠে উল্কিতে আঁকা ছবি। স্পষ্ট নয়। তবে বুঝতে অসুবিধে হয় না, ছবিটা জলকুমারীর। ভয়ের ঠাণ্ডা একটা শিহরণ উঠে গেল কিশোরের মেরুদণ্ড বেয়ে।

'ঠিক আছে, স্যার,' ভোঁতা গলায় বলল কিশোর। বলব ওদেরকে। কিন্তু কে যেতে বলছে, কার নাম বলব?'

'বেশি চালাকির চেষ্টা কোরো না, ছেলে,' কর্কশ গলায় বলল লোকটা। 'ভাল চাইলে আজই ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও।'

হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল লোকটা। গট গট করে হেঁটে আবার ঢুকে পড়ল গলিতে।

লোকটা চলে যাবার পরও কয়েক মুহূর্ত তার গমন পথের দিকে চেয়ে রইল কিশোর। চেপে রাখা শ্বাসটা ফেলল শব্দ করে। তারপর আবার হাঁটতে শুরু করল বোর্ডিং হাউসের দিকে।

একটা ব্যাপারে এখন নিশ্চিত কিশোর। দ্বীপে সিনেমা কোম্পানির থাকাটা বরদাস্ত করতে পারছে না কেউ একজন।

বারো

'আমার নৌকা!' বিড়বিড় করে বলল পাপালো। জোর করে ঠেকিয়ে রেখেছে চোখের পানি। 'নৌকা নেই। গুপ্তধন খোঁজার আশা শেষ!'

'তাই তো!' পাপালোর কত বড় ক্ষতি হয়ে গেছে, এতক্ষণে বুঝতে পারল যেন রবিন। 'কিন্তু একাজ করল কেন লোকটা? দুর্ঘটনা, নাকি ইচ্ছে করেই?'

'ইচ্ছে করে!' রাগ প্রকাশ পেল পাপালোর গলায়। 'নইলে থামত ও। এসে জিজ্ঞেস করত, বোটটা কার। দুঃখ প্রকাশ করত।'

'ঠিকই বলেছ,' বলল রবিন। 'কিন্তু কেন? তোমার নৌকা ভেঙে দিল কেন? কার কি লাভ?'

'আমি মোহর খুঁজে বেড়াই, এটা লোকের পছন্দ না,' কাঁদো কাঁদো গলায় বলল পাপালো। 'জেলেরা দেখতে পারে না আমাকে। এই উপসাগর ওদের। এতে বাইরের কারও ভাগ বসানো সইতে পারে না।'

দীর্ঘ এক মুহূর্ত নীরবতা। যতদূর চোখ যায়, কোন নৌকা বা জাহাজের চিহ্নও নেই। আর কতক্ষণ থাকতে হবে এ-দ্বীপে?

'তোমার নৌকা গেল,' অবশেষে বলল রবিন। 'দামি অনেক জিনিসপত্র গেল আমাদেরও।'

'হ্যাঁ,' গম্ভীর হয়ে আছে মুসা। 'অনেক দামি।'

একে অন্যের দিকে চেয়ে আছে দুই গোয়েন্দা। দু'জনের মনে একই ভাবনা। এক সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল দু'জনে, 'ওগুলো তো তুলে আনতে পারি আমরা!'

বিষণ্ণতা ঝেড়ে ফেলল পাপালো। হাসল। 'নিশ্চয় পারি। চল। আমি সাহায্য

করব তোমাদেরকে।'

তাড়াহুড়ো করে ডুবুরির পোশাক পরে নিল আবার রবিন আর মুসা। পানিতে নামল। হেঁটে চলল। ডুব দিল গভীর পানিতে এসে।

পানির ওপরে রোদ। ছোট ছোট ঢেউ। তলার বালিতে শুয়ে থাকা নৌকার গায়ে বিচিত্র ভঙ্গিতে নাচছে সূর্যের আলো। ফ্লিপার নাচিয়ে দ্রুত নেমে চলেছে রবিন আর মুসা। পাপালোর ওসব দরকার নেই। ভারি একটা পাথর ধরে রেখেছে দু'হাতে। দুই সঙ্গীর চেয়ে অনেক দ্রুত নামছে পাথরের ভারে।

নৌকার কাছে পৌঁছে গেল পাপালো। অর্ধেক পথও নামতে পারেনি এখনও অন্য দু'জন। এক পাশে কাত হয়ে আছে নৌকাটা। জিনিসপত্র ভেতরে কিছু কিছু ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে আশপাশে। দু'হাতে যা পারল, নিয়ে রওনা হয়ে গেল আবার ওপরে।

পাশ দিয়ে নামার সময় পাপালোকে হাসতে দেখল দুই গোয়েন্দা। সাগরের শান্ত তলদেশে এসে কেমন এক ধরনের অনুভূতি জাগল। বিপদে পড়েছে, ভুলেই গেল। পাশাপাশি নেমে এল নৌকাটার ধারে। সাপের মত নাচছে পালের দড়ি। দড়ির কাছ থেকে দূরে থাকল রবিন। কি জানি, আবার যদি পায়ে পেঁচিয়ে যায়! নিজের একটা প্যান্ট পড়ে থাকতে দেখে তুলে নিল। পাপালোর জুতোজোড়া তুলে নিল মুসা। আরও জিনিসের জন্যে চাইল এদিক ওদিক।

খুব ধীরে ধীরে এপাশ ওপাশ দোল খাচ্ছে নৌকাটা, ছেঁড়া পালটাও দুলছে তালে তালে। বেশ জোরালো স্রোত বইছে পানির তলায়।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই যা তোলার, তুলে ফেলল ওরা। অগভীর পানিতে এসে দাঁড়াল। তিনজনেরই দু'হাত বোঝাই জিনিসপত্রে।

'মনে হয় আর কিছু নেই,' হেসে বলল পাপালো। 'সবই তুলে এনেছি।'

'তাই তো মনে হচ্ছে,' বলল মুসা।

ছপাৎ ছপাৎ আওয়াজ তুলে হেঁটে চলল ওরা তীরের দিকে।

তীরে পৌঁছে ভেজা জিনিসপত্র নামিয়ে রাখল। বসে পড়ল ওগুলোর পাশে।

হঠাৎ কি মনে পড়তেই কাপড়ের স্তূপে খুঁজতে শুরু করল পাপালো। পেল না। 'আরে! আমার কম্পাস কই! তোমরা তোলনি?'

এদিক ওদিক মাথা নাড়ল দুই গোয়েন্দা।

'তোমরা বস। আমি নিয়ে আসছি।' আবার পানিতে নামল গিয়ে পাপালো।

'কাপড়গুলো চিপে ছড়িয়ে দেয়া দরকার। শুকাক।' বলল মুসা।

মাথা ঝুঁকিয়ে সায় দিল রবিন।

কাপড় শুকাতে দিয়ে এসে আবার আগের জায়গায় বসল ওরা।

'খবর পাঠানর কোন উপায় নেই!' সাগরের দিকে চেয়ে বলল রবিন। 'রাফাত চাচা গাধা ভাববেন আমাদেরকে। বোকার মত আবার আটকা পড়েছি এসে এই দ্বীপে।'

'এটা আমাদের দোষ নয়, পাপালোরও না,' ভারি একটা টর্চের পানি ঝাড়তে ঝাড়তে বলল মুসা। 'এখন না পারলেও অন্ধকার হলে পারব। টর্চের সাহায্যে।'

'কিন্তু অন্ধকার হতে এখনও অনেক দেরি,' আকাশের দিকে তাকাল একবার রবিন। 'খিদেয় পেট জ্বলছে। এতক্ষণ সইব কি করে!'

'কাপড়গুলো শুকাক আগে। খিদের ব্যাপারটা নিয়ে পরে ভাবা যাবে, পাপালো আসুক।'

এই সময় মনে হল ওদের, পাপালো গেছে অনেকক্ষণ। এতক্ষণ ফিরে আসার কথা তার। ফিরে তো এলই না, একবার ভাসেওনি এ-পর্যন্ত। সঙ্গে গ্যাস ট্যাংক নেই। একটানা পনেরো মিনিট দম আটকে রাখতে পারে না কোন মানুষ! সতর্ক হয়ে উঠল ওরা। বিপদের গন্ধ পেল। 'নিশ্চয়,' বিড়বিড় করে বলল রবিন। 'নিশ্চয় কোন বিপদে পড়েছে!'

'কোন কিছুতে আটকে যায়নি তো!' ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মুসার মুখ। 'জলদি চল, দেখি কি ঘটেছে!'

দ্রুত আবার ডুবুরির সরঞ্জাম পরে নিল দু'জনে। পানিতে এসে নামল হেঁটে চলে এল গভীর পানির ধারে। সবুজ পানিতে উজ্জ্বল রোদ। নিচের দিকে তাকাল ওরা একবার পেছন ফিরে চিত হয়ে পড়ল পানিতে। ডুব দিল।

আগের মতই পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে তলার বালি। কিন্তু পাপালো কোথায়? নৌকাটাও নেই! দ্রুত নেমে চলল দু'জনে। ধড়াস ধড়াস করছে বুকের ভেতর।

ওপরের দিকে কয়েক ফুট ঢালু হয়ে নেমেছে পাথরের দেয়াল, তারপর একবারে খাড়া। ছোটবড় অনেক গর্ত দেয়ালে। ওগুলোর কোনটা হয়ত সুড়ঙ্গমুখ, ভেতর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে তীব্র স্রোত, নৌকাসহ পাপালোকে টেনে নিয়েছে, ভাবল রবিন।

না, নৌকাটা আছে। আগের জায়গায় নয়। ওখান থেকে বিশ ফুট দূরে। দেয়ালের গা ঘেঁষে পড়ে আছে। দুলছে ধীরে ধীরে। বাড়ি খাচ্ছে পাথুরে দেয়ালে।

তাড়াতাড়ি নৌকার দিকে সাঁতরে চলল দুই গোয়েন্দা। কাছে চলে এল। কিন্তু কোথায় পাপালো? নৌকার তলায় মরে পড়ে নেই তো?

বালিতে এসে ঠেকল রবিন। ভয়ে ভয়ে উঁকি দিল নৌকার তলায়। না, নেই ওখানে পাপালো। গেল কোথায়! এখানকার পানিতে হাঙর নেই, জানা আছে রবিনের। অক্টোপাস বা ওই ধরনের কোন ভয়াবহ সামুদ্রিক জীবও নেই। তাহলে?

বাহুতে ছোঁয়া লাগতেই প্রায় চমকে উঠল রবিন। ফিরে চাইল। মুসা। দুটো আঙুল জড়ো করে দেখাল গোয়েন্দা সহকারী। ইঙ্গিতটা বুঝল রবিন। পাশাপাশি থাকতে বলছে। আঙুল তুলে একটা গর্ত দেখাল মুসা। তারপর সাঁতরাতে শুরু করল ওদিকে।

পাশাপাশি কয়েকটা গর্ত। উঁকি দিয়ে দেখল দু'জনে। ভেতরটা অন্ধকার। টর্চ আনা উচিত ছিল। গর্তের মুখে পানিতে হাত দিয়ে নাড়া দিয়ে দেখল। কোন

জবাব এল না। বেরিয়ে এল শুধু ছোট মাছের দল।

বড় বড় কিছু গর্তের মুখে ঘন হয়ে জন্মেছে শেওলা। ওপরের দিকে মাথা তুলে দুলছে তালে তালে। দু'হাতে ওগুলো সরিয়ে উঁকি দিতে হচ্ছে ওসব গর্তের ভেতরে। কিন্তু অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ছে না।

পাঁচ মিনিট পেরিয়ে গেল। দেয়ালের ধার ধরে ধরে প্রায় শ'খানেক ফুট চলে এসেছে ওরা নৌকার কাছ থেকে। কিন্তু পাপালোর কোন চিহ্নই নেই।

থেমে গেল ওরা। মুখ কাছাকাছি নিয়ে এল। মাস্কের ভেতরে দু'জনের চোখ দেখতে পাচ্ছে দু'জনে। মুসার চোখ বড় বড় হয়ে গেল, দেখল রবিন। উদ্বেগ প্রকাশ পাচ্ছে। বুড়ো আঙুল তুলে উল্টো দিক দেখাল সে। মাথা ঝোঁকাল মুসা। দু'জনে আবার এগিয়ে চলল নৌকাটার দিকে।

নৌকার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে ওরা। এই সময় দেখতে পেল ওকে। দ্রুত উঠে যাচ্ছে ওপরে। পাপালো। আশ্চর্য! বিশ মিনিট পানির তলায় দম আটকে রাখতে পারল! অবাক হল দুই গোয়েন্দা। ওরাও উঠতে শুরু করল ওপরের দিকে।

ভুসস করে মাথা তুলল দুই গোয়েন্দা। কোমর পানিতে দাঁড়িয়ে আছে পাপালো। হাঁ করে শ্বাস নিচ্ছে জোরে জোরে। অক্ষতই মনে হচ্ছে। ওদেরকে দেখে হাসল।

পাপালোর পাশে চলে এল দুই গোয়েন্দা। ঠেলে মুখের একপাশে সরিয়ে দিল মাস্ক।

'পাপু!' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল মুসা 'ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে আমাদেরকে!'

'কোথায় ছিলে তুমি?' বন্ধুকে সুস্থ দেখে হাসি ফুটেছে রবিনের মুখে। 'কি হয়েছিল?'

হাসল আবার পাপালো। 'একটা জিনিস পেয়েছি। বলত কি?'

'তোমার কম্পাস।'

এদিক ওদিক মাথা নাড়ল গ্রীক কিশোর। জ্বলজ্বল করছে কালো চোখের তারা। 'হয়নি। আবার বল।'

'বুঝেছি! মোহর!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা।

হাসছে পাপালো। ডান হাত বাড়াল। মুঠো খুলল। এক টুকরো সোনা। মুদ্রা ছিল এককালে। বেঁকেচুরে গেছে ধারগুলো।

'মোহরের সিন্দুকটা পেয়েছ নাকি?' জানতে চাইল রবিন।

'না। দেয়ালের একটা গর্ত দিয়ে মাছ ঢুকতে বেরোতে দেখলাম। ভাবলাম, মাছেরা যদি পারে, পাপুও পারবে। ঢুকে পড়লাম ভেতরে।' চুপ করল পাপালো। নাটকীয় ভঙ্গিতে বলল, 'দ্বীপের তলায় এক গুহা আবিষ্কার করেছি। ওখানেই পেয়েছি এই সোনার টুকরো। বাজি ধরে বলতে পারি, আরও অনেক মোহর আছে ওখানে।'

তেরো

পাশাপাশি ভেসে আছে মুসা আর রবিন। তল থেকে পাঁচ ফুট ওপরে। বিচিত্র শব্দ তুলে ব্রীদিং টিউব থেকে বেরিয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছে বুদবুদ। পাশ দিয়ে অলস ভঙ্গিতে ভেসে চলে গেল এক ঝাঁক সাগর-কই, ঢুকে পড়ল সামনের দেয়ালের গর্তে, হারিয়ে গেল অন্ধকারে।

মণি ছাড়া বিশাল এক চোখের মত দেখতে লাগছে সুড়ঙ্গমুখটাকে। এক কোণ থেকে আরেক কোণের দৈর্ঘ্য বারো ফুট। চোখের মাঝামাঝি জায়গায় উচ্চতা ফুট পাঁচেক। ধারগুলো মসৃণ, শেওলা জন্মাতে পারে না স্রোতের জন্যে।

সুড়ঙ্গমুখের বিশ ফুট দূরে পড়ে আছে পাপালোর নৌকাটা। দুলছে। জায়গা বদল করেছে ধীরে ধীরে। এগিয়ে আসছে এদিকেই। সেদিকে একবার চেয়েই চোখ ফিরিয়ে নিল রবিন। নৌকার প্রতি খেয়াল দেবার সময় নেই এখন।

দুই গোয়েন্দার হাতে টর্চ। সুড়ঙ্গে ঢুকতে ইতস্তত করছে।

পাপালোর কথামত, কোন বিপদ নেই গুহায়। কম্পাস খুঁজতে এসেছিল সে। পায়নি। উঠে যাবার সময়ই নজরে পড়েছে সুড়ঙ্গমুখটা। কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে এসেছে ওটার কাছে। ঢুকে পড়েছে।

ভেতরের দিকে প্রথমে সরু হয়ে, তারপর ধীরে ধীরে প্রশস্ত হয়ে গেছে সুড়ঙ্গ। খানিকটা এগিয়ে পেছনে ফিরে চেয়েছে পাপালো। সুড়ঙ্গমুখ দেখা যাচ্ছে, ইচ্ছে করলে ফিরে যাওয়া যায়। কিন্তু ফেরেনি সে। সামনে কি আছে, দেখার ইচ্ছে।

দম ফুরিয়ে আসতেই টনক নড়েছে পাপালোর। সামনে অন্ধকার, কি আছে কে জানে! পেছনে তাকিয়ে দেখেছে, অনেক দূরে আলো। এতদূর যেতে পারবে না, তার আগেই দম ফুরিয়ে যাবে।

'আতঙ্কে ঠাণ্ডা হয়ে আসছিল হাত-পা,' দুই গোয়েন্দাকে বলছে পাপালো। 'কিন্তু মাথা গরম করলাম না। ফিরে-যাবার চেষ্টা করলে মরব। সামনে এগোলে হয়ত বেঁচে যাব। সুড়ঙ্গটা কোন গুহায় গিয়ে শেষ হলে বাতাস পেয়ে যেতে পারি। প্রাণপ্রণে সাঁতরে চললাম। খানিকটা এগোতেই আলো চোখে পড়ল। ভরসা পেলাম। আলোর দিকে উঠতে লাগলাম। ভুসস করে মাথা ভেসে উঠল পানির ওপরে। দম নিয়ে তাকালাম চারদিকে। আবছা অন্ধকার। একটা গুহায় ঢুকেছি আমি। দ্বীপের তলায়। শেওলায় ঢাকা একটা পাথুরে তাকে উঠে বসলাম। জিরিয়ে নিয়ে নামব ভাবছি, এই সময়ই হাতে লাগল শক্ত জিনিসটা। শেওলার ভেতরে আটকে আছে। কৌতূহল হল। তুলে নিলাম। ও মা! সোনা! তালগোল পাকানো মোহর! গুহার তলায় অন্ধকার। দেখা যায় না কিছু। আমার বিশ্বাস, আরও গুপ্তধন আছে ওখানে।'

পানির তলায় গুহা, জলদস্যুর গুপ্তধন, আর কি চাই! সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল দুই গোয়েন্দা, ঢুকবে ওখানে। কোনরকম সরঞ্জাম ছাড়া পাপালো যদি পারে, আধুনিক

ডুবুরির সরঞ্জাম নিয়ে ওরা ঢুকতে পারবে না কেন? তাড়াতাড়ি চলে এসেছে এখানে। কিন্তু সুড়ঙ্গমুখের চেহারা দেখেই ভয় ঢুকে গেছে মনে। ইতস্তত করছে ভেতরে ঢুকতে।

এই সময় ওপর থেকে নেমে এল পাপালো দুই গোয়েন্দার পাশ কাটিয়ে সুড়ুৎ করে ঢুকে পড়ল সুড়ঙ্গে। আর দ্বিধা করার কোন মানে হয় না। যা থাকে কপালে, ভেবে, ঢুকে পড়ল দু'জনে।

দুটো টর্চের জোরালো আলোয় অন্ধকার কেটে গেল পরিষ্কার পানি, স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে সামনের অনেক দূর পর্যন্ত। ধীরে ধীরে প্রশস্ত হচ্ছে সুড়ঙ্গ। পাথুরে দেয়ালের খাঁজে খাঁজে ভারি হয়ে জন্মেছে শেওলা উজ্জ্বল আলোয় চমকে গেল মাছের দল। এদিক ওদিক ছুটে পালাল। অন্ধকার ছোট একটা গুহার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল একটা সবুজ মাথা। হাঁ করা কুৎসিত মুখে খুরের মত ধারালো দাঁতের সারি। কুতকুতে চোখ। বান পরিবারের এক ভয়ানক সদস্য, মোরে ঈল। মাছটার ওপর চোখ রেখে অনেক দূর দিয়ে সরে এল দুই গোয়েন্দা।

পাপালোকে দেখা যাচ্ছে। অনেক সামনে রয়েছে সে। ওর মত তাড়াতাড়ি সাঁতার কাটতে পারছে না দুই গোয়েন্দা। পাথুরে দেয়ালে ঘষা লাগলে ছাল চামড় উঠে যাবে। টিউব কিংবা পিঠের ট্যাংকের ক্ষতি হতে পারে। তাই সতর্ক থাকতে হচ্ছে ওদের।

মাঝে মধ্যে ওপরের দিকে টর্চের আলো ফেলছে ওরা। হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল পাথরের দেয়াল। উঠতে শুরু করল দুই গোয়েন্দা। বিশ ফুট…তিরিশ ফুট… আচমকা মাস্ক বেরিয়ে এল পানির ওপরে।

টর্চের আলো ফেলল দু'জনে। একটা পাথুরে তাকে উঠে বসে আছে পাপালো পা দুটো ঝুলছে পানিতে। মাথার চার পাঁচ ফুট গুহার ওপরে ছাত এবড়োখেবড়ো, রুক্ষ। পিচ্ছিল শেওলায় ঢাকা তাকে পাপালোর পাশে সাবধানে উঠে বসল দুই গোয়েন্দা।

'দ্য হ্যাণ্ডের পেটে এসে ঢুকেছি আমরা,' বলল পাপালো। 'কেমন লাগছে গুহায় ঢুকে?'

'বেশ ভালই তো!' জবাব দিল রবিন। 'আমাদের আগে নিশ্চয় এখানে কেউ ঢোকেনি!'

চারদিকে টর্চের আলো ঘুরিয়ে আনল একবার রবিন। নির্দিষ্ট কোন আকার নেই গুহাটার। পানির সমতল থেকে ছাতের উচ্চতা একেক জায়গায় একেক রকম, চার থেকে ছয় ফুটের মধ্যে। গুহার এক প্রান্তে দু'দিকের দেয়াল অনেক কাছাকাছি, মাঝে পরিসর কম। আলো আসছে ওদিক থেকেই।

টর্চ নিভিয়ে নিল ওরা। আবছা আলো গুহার ভেতরে। পাথরে পাথরে ধাক্কা খেয়ে কুলকুল শব্দ তুলছে পানি। দেয়ালের গা আঁকড়ে ধরে আছে সরু শেওলা জাতীয় উদ্ভিদ। ঢেউয়ের তালে তালে দুলছে, ওঠানামা করছে ভয়াবহ কোন অজানা

দানবের রোম যেন। শিউড়ে উঠল রবিন। 'নিশ্চয় কোন ফাটল আছে গুহার ছাতে। আলো আসছে ওপথেই।' গুহার দূরতম প্রান্তের দিকে চেয়ে বলল সে।

'ফোয়ারা!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল পাপালো। 'এবার বুঝেছি। ওই ফাটল দিয়েই পানি ছিটকে বেরোয় ঝড়ের সময়। কেউ জানে না, তলায় একটা গুহা আছে। লোকের ধারণা, ফাটলটা সাগরের অতলে কোথাও নেমে গেছে।'

'ঠিক ঠিক!' বলে উঠল রবিন। মনে পড়ল, দু'রাত আগে ঝড়ের সময় কি করে পানি ছিটকে উঠেছিল টিলার চূড়ার ছিদ্র দিয়ে। অনেক আগেই ওই ফোয়ারা আবিষ্কার করেছে লোকে। জানত না, কেন শুধু ঝড়ের রাতেই পানি ছিটায় ওটা।

'একটা কথা!' হতাশ কণ্ঠে বলল রবিন। 'আমরাই যদি গুহাটা প্রথম আবিষ্কার করে থাকি, গুপ্তধন আসবে কোথা থেকে এখানে?'

'তাই তো!' গুঙিয়ে উঠল মুসা। 'এটা তো ভাবিনি!'

'আমরাই প্রথম নই, তাই বা জানছি কি করে?' প্রশ্ন রাখল পাপালো। 'এত হতাশ হবার কিছু নেই। একটা মোহর যখন পেয়েছি, আরও পাবার আশা আছে। রবিন, টর্চটা দাও তো, দেখে আসি।'

ওপরে বসে ধীরে ধীরে পানির তলায় আলো নেমে যেতে দেখল দুই গোয়েন্দা।

'মোহর লুকানর জন্যে এরচে ভাল জায়গা আর হয় না,' বলল মুসা। 'কিন্তু রবিন, মনে হয় তোমার কথাই ঠিক। আমাদের আগেও কেউ এসেছিল এখানে।'

তলায় নেমে গেছে পাপালো। এদিক ওদিক আলো নড়তে দেখল মুসা আর রবিন।

সময় কেটে যাচ্ছে। পাপালো আর ওঠে না। নিচে আলো নড়াচড়া করছে। নাহ্, দম রাখতে পারে বটে গ্রীক ডুবুরির ছেলে! ঝাড়া আড়াই মিনিট পরে উঠে এল পাপালো। উঠে বসল দুই গোয়েন্দার পাশে।

'ঠিকই বলেছ, রবিন,' বলল পাপালো। 'গুপ্তধন নেই এখানে। শামুক-গুগলির সঙ্গে কিছু কিছু এ-জিনিস আছে।' মুঠো খুলে দেখাল সে।

অবাক হয়ে দেখল দুই গোয়েন্দা, পাপালোর হাতে দুটো মোহর।

'ইয়াল্লা!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'গুপ্তধন নেই, তাহলে এগুলো কি!'

'আমি বলতে চাইছি, হাজার হাজার মোহর এক জায়গায় স্তূপ করে রাখা নেই। একটা দুটো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে বালিতে।'

হাত থেকে হাতে ঘুরতে লাগল মোহর দুটো। ভারি। ধারগুলো বেশি ক্ষয়ে যায়নি এ-দুটোর।

'মোট তিনটে পেলাম!' বলল পাপালো। 'একেকজনের ভাগে একটা করে।'

'না, তুমি পেয়েছ ওগুলো,' প্রতিবাদ করল রবিন। 'তিনটেই তোমার।'

'এক সঙ্গে এসেছি! যে-ই পাই, সমান ভাগে ভাগ করে নেব,' দৃঢ় গলায় বলল পাপালো। 'চল, তিনজনে যাই এবার। আরও পাওয়া যাবে। হয়ত নতুন আরেকটা নৌকা কিনতে পারব। বাবার চিকিৎসা করাতে পারব। চল চল!'

দ্রুত হাতে ফেস মাস্ক পরে নিল মুসা আর রবিন। পাপালোর সঙ্গে সঙ্গে নেমে পড়ল পানিতে।

তলার বালিতে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য শামুক-গুগলি, ঝিনুক। নামার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পাথুরে দেয়ালের কাছে চকচকে বস্তুটা দেখতে পেল মুসা। কাত হয়ে আছে একটা ডাবলুন, অর্ধেকটা ডুবে আছে বালিতে।

আলতো করে ফ্লিপার নেড়ে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতে লাগল রবিন। শিগগিরই একটা ঝিনুকের তলা থেকে বেরিয়ে থাকা মোহরের অর্ধেকটা চোখে পড়ল। তুলে নিল ওটা।

উত্তেজিত হয়ে পড়ল তিন কিশোর। আরও মোহর আছে এই গুহায়, বুঝতে পারল। সেগুলো খুঁজে বের করতেই হবে।

মোহর খুঁজতে খুঁজতে খিদে ভুলে গেল ওরা। সময়ের হিসেব রাখল না। এক ধার থেকে প্রতিটি ঝিনুক-শামুক উল্টে দেখতে লাগল। ফ্লিপার কিংবা হাতের নাড়া লেগে বালির মেঘ উঠছে মাঝে মাঝে, আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে দৃষ্টি। থেমে, বালি নেমে যাবার অপেক্ষা করতে হচ্ছে তখন। তারপরই আবার শুরু হচ্ছে খোঁজা।

দেখতে দেখতে প্রায় দেড় ডজন মোহর বের করে ফেলল মুসা আর রবিন। একেকজনের ভাগে ছয়টা করে। হাতে আর জায়গা নেই। মুসার গায়ে টোকা দিল রবিন। ওঠার ইঙ্গিত করল। দম ফুরিয়ে যাওয়ায় ওদের আগেই উঠে গেছে পাপালো।

তাকে উঠে এল তিন কিশোর। পানি থেকে দূরে তাকের এক জায়গায় রাখল মোহরগুলো।

'ঠিকই বলেছ, পাপু,' মাস্ক সরিয়ে বলল রবিন। 'মোহর আছে এখানে! আরও আছে!'

'হ্যাঁ, আছে। আরও আছে,' বলল পাপালো। হাসল। হাতের মুঠো খুলে দেখাল। 'শেওলার তলায় এই তিনটে পেয়েছি আমি।'

'মোট হল চব্বিশটা!' বলল রবিন। কিন্তু মোহরগুলো এই গুহায় এল কি করে!'

'সেটা পরে ভাবলেও চলবে,' বলল মুসা। 'চল, আরও কিছু তুলে আনি।'

নেশা বড় ভয়ানক ব্যাপার, বিশেষ করে গুপ্তধনের নেশা। হুঁশ জ্ঞান হারিয়ে ফেলে মানুষ। সেই নেশায় পেয়েছে তিন কিশোরকে। পাগল হয়ে উঠেছে যেন ওরা। পুরো গুহার প্রতি বর্গ ইঞ্চি জায়গা খুঁজে দেখতে লাগল ওরা। কি ভীষণ বিপদে পড়তে যাচ্ছে, জানতেই পারল না।

স্রোতের টানে আস্তে আস্তে কাছে চলে এসেছে পাপালোর ভাঙা নৌকা। ছেলেদের বেরোনর পথ বন্ধ করে দিয়ে বোতলের মুখে কর্কের ছিপির মত আটকে গেছে সুড়ঙ্গমুখে।

চোদ্দ

উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে কিশোর। লাঞ্চের সময় ফেরার কথা, অথচ বিকেল হয়ে গেল, এখনও ফেরেনি রবিন আর মুসা। কোন অঘটন ঘটেনি তো?

ম্যাগাজিনটা টেবিলে রেখে উঠে দাঁড়াল কিশোর। জানালার সামনে এসে দাঁড়াল। উপসাগরের পুরো উত্তর প্রান্তটা চোখে পড়ে এখান থেকে। কিন্তু কই, কোন ছোট পালের নৌকা তো চোখে পড়ছে না!

ঘরে এসে ঢুকল মিসেস ওয়েলটন। হাতে দুধের গ্লাস আর কিছু বিস্কুট। টেবিলে নামিয়ে রাখল।

'নিশ্চয় খিদে পেয়েছে তোমার, কিশোর,' পেছন থেকে বলল বাড়িওয়ালি। 'নাও, এগুলো খেয়ে নাও। রবিন আর মুসা ফেরেনি এখনও?'

'না,' ঘুরে দাঁড়াল কিশোর। 'লাঞ্চের সময়ই ফেরার কথা, এখনও ফিরছে না! কোন বিপদেই পড়েছে মনে হয়!'

'এত ভাবছ কেন?' বলল মিসেস ওয়েলটন। 'হয়ত বড়শি ফেলে মাছ ধরছে। ভুলেই গেছে ফেরার কথা।'

বেরিয়ে গেল বাড়িওয়ালি।

নিশ্চিন্ত হতে পারল না কিশোর। বসে পড়ল টেবিলের সামনে। বিস্কুট চিবোতে চিবোতে ম্যাগাজিনটা টেনে নিল আবার। কঙ্কাল দ্বীপ নিয়ে লেখা ফীচারের জায়গায় জায়গায় পেন্সিল দিয়ে দাগ দিয়েছে। আবার দেখতে লাগল ওগুলো। ভাবনা চলেছে মাথায়।

বাইশ বছর আগে বজ্রপাতে মারা গেছে স্যালি ফ্যারিংটন। সুযোগটা নিয়েছে মেলভিলের পার্কের মালিক। গুজব ছড়িয়ে দিয়েছে স্যালির ভূত দেখা গেছে প্লেজার পার্কে। তারপর? প্রায় বিশ বছর আর ভূতের দেখা নেই। হঠাৎ করেই দেখা দিতে শুরু করেছে আবার বছর দুই আগে থেকে। দেখেছে অশিক্ষিত, কুসংস্কারে ঘোর বিশ্বাসী জেলেরা। তাদের কথায় বিশ্বাস করে কঙ্কাল দ্বীপে লোক যাতায়াত বন্ধ হয়ে গেছে।

এল সিনেমা কোম্পানি। প্লেজার পার্কে কয়েকটা দৃশ্য শূটিং করবে। তাদেরকে উত্যক্ত করা শুরু হল। কেন? দ্বীপে ক্যাম্প করে তারা কার কি ক্ষতি করছে? মালিক বিরূপ নয় তাদের ওপর, তাহলে ভাড়াই দিত না। তাহলে কে?

ঝটকা দিয়ে খুলে গেল দরজা। ভাবনার জগৎ থেকে ফিরে এল কিশোর। ঘরে এসে ঢুকল জোসেফ গ্র্যাহাম। উত্তেজিত।

'কিশোর,' বলল জোসেফ। 'পাপালো হারকুসকে দেখেছ?'

'সকালে দেখেছি,' জবাব দিল কিশোর। 'ওর নৌকায় করে সাঁতার কাটতে গেছে রবিন আর মুসা। ফেরেনি এখনও।'

'সারাদিন পাপালোর সঙ্গে!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল জোসেফ 'ওরা দু'সেট একোয়ালঙ নিয়ে গেছে! প্র্যাকটিস করবে বলল, দিয়ে দিলাম!' কালো হয়ে গেছে তার মুখ। 'ওই হারামী গ্রেসানটার সঙ্গে গুপ্তধন খুঁজছে না-তো ওরা?'

জবাব দিল না কিশোর। চেয়ে আছে জোসেফের মুখের দিকে। সতর্ক হয়ে উঠেছে।

'ওদেরকে খুঁজতে যাওয়া দরকার।' আবার বলল জোসেফ, 'ওই গ্রেসানের বাচ্চা এমনিতেই যা করেছে, তার ওপর আরও কিছু···' থেমে গেল সে! কিশোরের দিকে তাকাল। 'আমি চললাম খুঁজতে।'

'আমিও যাব,' সর্দি লেগেছে, ভুলে গেল কিশোর। তার এখন ভাবনা, তিন বন্ধুকে খুঁজে বের করা।

'এসো,' বলেই ঘুরে দাঁড়াল জোসেফ।

জেটিতে বাঁধা আছে ছোট একটা মোটর বোট। উঠে বসল জোসেফ আর কিশোর। ইঞ্জিন গর্জে উঠল। ছুটে চলল বোট।

এমনিতেই যা করেছে···কথাটার মানে কি, জানার কৌতূহল হচ্ছে কিশোরের। কিন্তু জিজ্ঞেস করতে পারল না। কথা বলার মেজাজে নেই জোসেফ। থমথমে গম্ভীর মুখ। হুইলে চেপে বসেছে আঙুল।

কঙ্কাল দ্বীপের জেটিতে এসে বোট রাখল জোসেফ। একটা খুঁটির সঙ্গে বেঁধে ফেলল।

'পাঁচজনের জায়গা হবে না এই বোটে,' বলল জোসেফ। 'তাছাড়া সব সরঞ্জাম নিয়ে তৈরি হয়ে যেতে চাই। ডুব দেবার দরকার পড়বে কিনা কে জানে!'

কি ব্যাপার? এত দুশ্চিন্তা কেন জোসেফের?—ভাবল কিশোর। পাপালোর সঙ্গে ডুব দিতে গেছে রবিন আর মুসা, কি হয়েছে তাতে? কোন অঘটন আশা করছে জোসেফ?

পাশের বড় বোটটায় উঠে গেল জোসেফ। কিশোরও উঠল।

গর্জে উঠল বোটের শক্তিশালী ইঞ্জিন। নাক ঘুরিয়ে তীব্র গতিতে ছুটল উপসাগরের পানি কেটে।

প্রথমে পুরো কঙ্কাল দ্বীপের চারপাশে একবার চক্কর দিল জোসেফ। পাপালোর বোটের চিহ্নও নেই। দ্য হ্যাণ্ডের দিকে রওনা দিল সে।

শিগগিরই পৌঁছে গেল দ্য হ্যাণ্ডে। দ্বীপের চারপাশে দু'বার চক্কর দিল।

'নেই,' ইঞ্জিন নিউট্রাল করে বলল জোসেফ। 'কঙ্কাল দ্বীপে নেই, দ্য হ্যাণ্ডে নেই। তারমানে, একটা দিকেই গেছে নৌকাটা। উপসাগরের পুবে। ঠিক, ওদিকেই গেছে।'

চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা ঝোঁকাল কিশোর।

আবার গিয়ার দিল জোসেফ। চলতে শুরু করল বোট। নাক ঘুরে গেল পূর্ব দিকে।

তাকে উঠে বসে আছে রবিন, মুসা আর পাপালো। কোমরের কাছে উঠে এসেছে পানি। আগের চেয়ে দু'ফুট বেড়েছে। পাথুরে দেয়ালে বাড়ি মারছে ছলাৎ-ছল-ছলা ছলাৎ- ছল-ছলা। ধীরে ধীরে কমে আসছে গুহার ভেতরে আলো।

মোহরের নেশায় আর কোন দিকেই খেয়াল নেই তিনজনের। গোটা পঞ্চাশেক মোহর খুঁজে পেয়েছে। কোমরের থলেতে ঢুকিয়ে রেখেছে ওগুলো পাপালো।

জোয়ার এসেছে, প্রথম খেয়াল করল পাপালো। 'চল, বেরিয়ে পড়ি। আর মোহর নেই এখানে।'

'ঠিক,' সায় দিয়ে বলল মুসা। 'গত আধ ঘন্টায় আর একটাও পাইনি। খিদেও লেগেছে। চল, যাই।'

আগে আগে চলল মুসা। সুড়ঙ্গমুখে আটকে থাকা নৌকাটা প্রথম দেখতে পেল সে-ই। ওপরের দিকটা এপাশে। সুড়ঙ্গের ছাতের একটা খাঁজে ঢুকে গেছে মাস্তুলের আগা। বাইরে থেকে ধাক্কা দিচ্ছে স্রোত। শক্ত হয়ে আটকে গেছে নৌকা।

টর্চের আলোয় সব পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে মুসা। নৌকার চারপাশে ফাঁক নেই বললেই চলে। আটকে গেছে ওরা, বুঝতে অসুবিধে হল না তার।

মুসার পাশে চলে এসেছে রবিন। সামনের দৃশ্য সে-ও দেখল। এগিয়ে গেল দু'জনে। ধাক্কা দিল নৌকার গায়ে। নড়াতে পারল না। পারবেও না, বুঝে গেল।

ঠিক এই সময় ওদের পাশে এসে থামল পাপালো। এক মুহূর্ত চেয়ে রইল নৌকাটার দিকে। বুঝে গেল যা বোঝার। ডিগবাজি খেয়ে ঘুরল। তীরের মত ছুটে চলে গেল গুহার দিকে। তার দম ফুরিয়ে গেছে। গুহায় ফিরে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই।

মুসা আর রবিনও খেয়াল করল এতক্ষণে, ট্যাংকে গ্যাস ফুরিয়ে এসেছে। আরেকবার প্রাণপণ চেষ্টা করল নৌকাটা সরানর। ব্যর্থ হয়ে পাপালোর পথ অনুসরণ করল।

মিনিট দুয়েক পর। তাকে বসে আছে তিন কিশোর। কোমর ছাড়িয়ে উঠে এসেছে এখন পানি।

'ভালমত ফাঁদে আটকেছি আমরা!' বলল পাপালো। 'জোয়ার যতই বাড়বে, নৌকাটা আরও শক্ত হয়ে আটকাবে।'

'হ্যাঁ,' বিষণ্ন কণ্ঠে বলল মুসা। 'এমন কাণ্ড ঘটবে, কে জানত?'

'আমি কিন্তু আগেই খেয়াল করেছিলাম,' বলল রবিন। 'স্রোতের টানে ধীরে ধীরে সরে আসছে নৌকাটা। গুরুত্ব দিইনি তখন ব্যাপারটাকে। যা হবার তা-তো হল; এখন কি করব?'

দীর্ঘ নীরবতা। কেউ কোন পরামর্শ দিতে পারল না।

'জোয়ার নামার সময় হয়ত টানের চোটে নেমে যাবে নৌকাটা,' বলল

পাপালো।

'কিন্তু কয়েক ঘন্টা থাকবে জোয়ার!' গুঙিয়ে উঠল মুসা। 'তারপরও যদি নৌকা না নামে?'

'ততক্ষণ আমরা বাঁচব কিনা তাই বা কে জানে!' রবিনের গলায় আতঙ্ক। 'আরও বড় সমস্যা আসছে!'

'কি বললে?' ঝট করে রবিনের দিকে ফিরল পাপালো।

'দেখ!' বলল রবিন। হাতের টর্চের আলো পড়েছে ছাতে। 'ভেজা ভেজা। শেওলা লেগে আছে।'

'তাতে কি?' মুসার প্রশ্ন।

'জোয়ারের সময় ওখানে উঠে যায় পানি,' রবিনের গলা কাঁপছে। 'খাঁচায় ভরে ইঁদুরকে পানিতে চুবিয়ে রাখলে যা হয়, আমাদেরও সেই অবস্থা হবে!'

কারও মুখে কথা নেই আর। গুহার দেয়াল ছলাৎ-ছলাৎ বাড়ি মারছে পানি। ধীরে ধীরে উঠে আসছে ওপরে।

দ্বীপের দিকে চেয়ে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল কিশোর, 'মিস্টার গ্র্যাহাম! বোট ফেরান! কি যেন দেখা যাচ্ছে!'

ভুরু কোঁচকাল জোসেফ। কিন্তু বোট ফেরাল।

এক মিনিট পরেই দ্বীপের এক পাশে খুদে সৈকতের ধারে এসে থামল বোট লাফ দিয়ে নেমে এল কিশোর। ছুটল। চলে এল অন্য পাশে, যেখানে জিনিসগুলো দেখেছিল।

আছে। পাথরের ওপর বিছিয়ে আছে কাপড়। শুকিয়ে এসেছে।

পায়ের আওয়াজ শুনে ফিরে চাইল কিশোর। জোসেফ গ্র্যাহাম আসছে।

'ওদের কাপড়,' বলল কিশোর। 'কাছেপিঠেই নিশ্চয় কোথাও আছে ওরা দেখি, টিলাটায় চড়ে দেখে আসি আমি।'

ছেলেদের কাপড়গুলোর দিকে চেয়ে আছে জোসেফ। হতবুদ্ধি হয়ে গেছে যেন! কিশোরের দিকে ফিরে চেঁচিয়ে বলল, 'নৌকাটা নেই, আমি শিওর! এখানে কাপড়চোপড় খুলে রেখে কোন কারণে...'

জোসেফের কথা শোনার অপেক্ষা করছে না কিশোর। ছুটে যাচ্ছে টিলার দিকে।

চূড়ায় উঠে এল কিশোর। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না। কোথাও দেখা যাচ্ছে না নৌকাটা। ধপ করে একটা পাথরের ওপর বসে পড়ল হতাস ভঙ্গিতে।

পাশে এসে দাঁড়াল জোসেফ। 'পুরো দ্বীপটা দু'বার চক্কর দিয়েছি। দেখিনি ওদের। তারমানে এখানে নেই!' লাথি মারল একটা ছোট পাথরে। ক্ষোভ চাপা দিতে পারছে না।

গড়াতে গড়াতে গিয়ে ছোট একটা গর্তে পড়ল পাথরটা। এক মুহূর্ত পরেই পানিতে পড়ার চাপা শব্দ কানে এল। ব্যাপারটা খেয়াল করল কিনা ওরা, বোঝা গেল না।

'ঠিকই বলেছেন,' উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল কিশোর। 'পুব উপকূলেই খুঁজতে হবে। কিন্তু কাপড় এখানে ফেলে গেল কেন ওরা!'

'চল,' বলল জোসেফ। 'আগে কোস্ট গার্ডকে খবর দিতে হবে। সাঁঝের বেশি বাকি নেই। অন্ধকার নামার আগেই খুঁজে বের করতে হবে ওদের।'

বোটের দিকে এগিয়ে চলল জোসেফ। অনুসরণ করল কিশোর। চিমটি কাটছে নিচের ঠোঁটে।

'পেয়েছি!' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল কিশোর। পাঁই করে ঘুরেই ছুটল টিলার দিকে। ছোট গর্তটার ওপর গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

গর্তের মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে চেঁচিয়ে ডাকল, 'মু-সা! রবি-ই-ন! তোমরা আছ ওখানে?' বলেই কান রাখল গর্তের ওপর।

এক মুহূর্ত নীরবতা। বুকের ভেতর ধড়াস ধড়াস করছে কিশোরের। তবে কি ভুল করেছে সে? অনুমান ঠিক হয়নি?

হঠাৎ শোনা গেল জবাব। চাপা, কিন্তু পরিষ্কার। মুসার গলা। 'কিশোর! ফাঁদে আটকে গেছি! তাড়াতাড়ি বের কর আমাদের! জোয়ার এসেছে! পানি আরও বেড়ে গেলে ডুবে মরব। জলদি, জলদি কর! কি-শো-ও-র-র-র...'

পনেরো

দ্রুত বাড়ছে পানি।

গুহার দেয়ালে জন্মে থাকা জলজ আগাছা আঁকড়ে ধরে আছে ওরা। ঝাঁপাঝাঁপি করছে পানি দেয়ালে দেয়ালে। ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিতে চাইছে ওদেরকে তাক থেকে। আর বেশি বাকি নেই, ছাতে গিয়ে ঠেকবে পানি।

'এত দেরি করছে কেন!' বিড়বিড় করল মুসা। কাঁপছে ঠাণ্ডায়, ভয়ে। তার মনে হচ্ছে, এক যুগ আগে গড়িয়ে পড়েছিল ছোট পাথরটা।

চমকে উঠেছিল ওরা। খানিক পরেই ডাক শোনা গিয়েছিল কিশোরের। বিপদে আছে, জানিয়েছে মুসা। তার মানে সাহায্য আসবেই। কিন্তু আর কত দেরি?

অপেক্ষা ছাড়া করার আর কিছুই নেই। কাজেই অপেক্ষা করতে লাগল ওরা। মাঝে মাঝে টর্চ জ্বেলে দেখে নিচ্ছে, ছাতে পানি ঠেকতে আর কত বাকি! ব্যাটারিও ফুরিয়ে এসেছে। আলোর উজ্জ্বলতা নেই। তবু, অন্ধকারে ম্লান ওই আভাটুকুই সাহায্য করছে অনেক।

'শোন!' হঠাৎ বলল পাপালো। 'মোহর পেয়েছি, এটা ফাঁস করব না আমরা।'

'কেন?' জানতে চাইল রবিন। 'এখানে কি করতে এসেছি, বলতে হবে না?'

'বলব ডুবে ডুবে সাঁতার কাটছিলাম। হঠাৎ নজরে পড়ে গেল গর্তটা! বুঝলাম, সুড়ঙ্গ। ভেতরে কি আছে দেখার জন্যে ঢুকে পড়লাম,' বলল পাপালো। 'মোহর পেয়েছি বললে ফিরে এসে আবার খোঁজার সুযোগ হারাব।'

'হারালে হারাব,' বলল রবিন। 'এখানে দ্বিতীয়বার আর ঢুকতে চাই না আমি। মোহরের বস্তা পড়ে থাকলেও না। যার খুশি এসে নিয়ে যাক।'

'আমারও একই কথা,' সায় দিয়ে বলল মুসা। পাপালোকে বলল, এত ভাবছ কেন? যা মোহর ছিল, সব তুলে নিয়েছি আমরা। আর নেই। জোয়ারের সময় কোনভাবে এসে পড়েছিল হয়ত। ভেব না, সিন্দুক-ফিন্দুক নেই এখানে।'

'তা হয়ত নেই, কিন্তু বালির তলায় আরও মোহর থাকতে পারে,' বোঝানর চেষ্টা করল পাপালো। 'এটাই আমার শেষ সুযোগ। আরেকটা নৌকা কিনতে হবে, বাপকে বাঁচাতে হবে। ক'টা মোহর পেয়েছি? চল্লিশ? পঞ্চাশ? তিন ভাগের এক ভাগ ক'টা হবে? নৌকাই তো কিনতে পারব না।'

'ঠিক আছে,' পাপালোর কথা মেনে নিল রবিন। 'আপাতত ব্যাপারটা ফাঁস করব না আমরা। আরেকবার খুঁজে দেখার সযোগ...'

'মুসা আমান আর আসছে না এই গুহায়!' বাধা দিয়ে বলল গোয়েন্দা সহকারী। 'তুমি আসতে চাইলে আসতে পার, পাপু। কোথায় মোহর পেয়েছি কাউকে না বললেই তো হল।'

'মোহর পেয়েছি, এই কথাটাও গোপন রাখতে চাই এখন,' থলেতে আঙুলের চাপ শক্ত হল পাপালোর। 'একবার কেন, আরও দশবার আসতেও ভয় পাব না আমি। কপাল খারাপ তাই বিপদে পড়ে গেছি। কে ভাবতে পেরেছিল, সুড়ঙ্গমুখে এসে নৌকা আটকাবে? এমন ঘটনা সব সময় ঘটে না।'

'জোসেফ আর কিশোর কতখানি কি করছে, কে জানে!' গুঙিয়ে উঠল মুসা। 'কোস্ট গার্ডকে খবর দিতে গিয়ে থাকলেই সেরেছে। ফিরে এসে আর পাবে না আমাদেরকে।'

'নৌকাটাকে সরাতে শক্তি দরকার,' বলল রবিন। 'ভেঙে ফেলতে হবে, কিংবা শাবল দিয়ে চাড় মেরে বের করে নিতে হবে।'

'অনেক সময় লেগে যাবে তাতে,' ঢেউয়ের ধাক্কায় কাত হয়ে গেল মুসা। আগাছা আঁকড়ে ধরে সামলে নিল। 'তাক থেকেই ফেলে দেবে দেখছি!...হ্যাঁ, যা বলছিলাম। কমসে কম দু'ঘন্টা তো লাগবেই। ততক্ষণে আমরা শেষ!'

'কিশোর জেনেছে আমরা এখানে আছি,' নিরাশ হচ্ছে না রবিন। 'কিছু একটা ব্যবস্থা করে ফেলবেই ও। ঠিক বের করে নিয়ে যাবে আমাদের, দেখ।'

'সেই প্রার্থনাই কর,' নিচু গলায় বলল পাপালো।

*

মুসার কাছ থেকে সাড়া পাবার পর মাত্র পনেরো মিনিট পেরিয়েছে।

তীর থেকে শ'খানেক ফুট দূরে ভাসছে এখন মোটর বোট। ইঞ্জিন নিউট্রাল। হাল ধরেছে কিশোর। জোসেফ ডুবুরির পোশাক পরছে।

'পাগলামির সীমা থাকা উচিত!' আপনমনেই বিড়বিড় করল জোসেফ। ওয়েট বেল্ট আঁটল কোমরে। বোটের কিনারে গিয়ে দাঁড়াল। ফিরে চাইল। 'এখানেই থাক। পরিস্থিতি দেখে আসি আমি। কোস্ট গার্ডকে খবর দেয়ার সময় আছে কিনা কে জানে!' ফেস মাস্ক টেনে দিল সে। একটা আণ্ডারওয়াটার টর্চ হাতে নিয়ে নেমে গেল পানিতে।

বড় একা একা লাগছে কিশোরের। দক্ষিণে অনেক দূরে এক সারি নৌকা, মাছ ধরা শেষ করে ফিরে চলেছে ফিশিংপোর্টে। এদিকে কেউ আসবে না। গুহায় আটকা পড়ে মরতে বসেছে তিন বন্ধু। ওদেরকে কি উদ্ধার করতে পারবে শেষ পর্যন্ত? মুসা যা বলল, সুড়ঙ্গমুখে বেশ শক্ত করেই আটকেছে ভাঙা নৌকা।

অতি ধীরে গড়িয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে যেন সময়। কিশোরের মনে হল এক ঘন্টা পেরিয়ে গেছে। ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখল, জোসেফ গেছে মাত্র পাঁচ মিনিট আগে। আরও পাঁচ মিনিট পরে ভেসে উঠল জোসেফের মাস্কে ঢাকা মুখ। দ্রুত উঠে এল সে বোটে। মাস্ক সরাল মুখ থেকে। চেহারা ফ্যাকাসে, উদ্বিগ্ন।

'সাংঘাতিক শক্ত হয়ে আটকেছে!' বলল জোসেফ। 'কোথাও ধরে যে টান দেব, সে জায়গাই নেই। কোস্ট গার্ডকেই খবর দিতে হবে। শাবল কিংবা ক্রো-বার ছাড়া হবে না।'

জোসেফের মুখের দিকে চেয়ে আছে কিশোর। 'তাতে তো অনেক সময় লাগবে! কমপক্ষে দু'ঘন্টা!'

আস্তে মাথা ঝোঁকাল জোসেফ। 'তা-তো লাগবেই। কিন্তু আর কি করার আছে? বড় কোন গর্ত নেই টিলার। থাকলে ও পথে দড়ি নামিয়ে দিয়ে টেনে তোলা যেত।'

জোসেফের কথা কানে ঢুকছে কিনা কিশোরের, বোঝা গেল না। নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে সে।

'মিস্টার গ্র্যাহাম!' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল কিশোর। 'নৌকাটাকে টেনে বের করে আনলেই হয়!'

'টেনে বের করব!' ভুরু কুঁচকে গেল জোসেফের। 'কি করে?'

'মোটর বোটের সাহায্যে,' বলল কিশোর। 'খুব শক্তিশালী ইঞ্জিন এই বোটটার। নোঙরের দড়িও অনেক লম্বা। নোঙরের একটা আঁকশি নৌকায় গেঁথে...'

'কিশোর, তুমি একটা জিনিয়াস!' চেঁচিয়ে উঠল জোসেফ। 'ঠিক বলছ! এখুনি যাচ্ছি আমি!'

দ্রুত হাত চালাল জোসেফ। ক্যাপস্ট্যান থেকে খুলে আনল দড়িসহ নোঙর। দড়ির অন্য মাথা বাঁধল বোটের পেছনের একটা রিঙবোল্টে। পানিতে ছুঁড়ে ফেলে

দিল নোঙর।

'আমি যাচ্ছি,' বলল জোসেফ। 'দড়ি ধরে তিনবার টানব। ফার্স্টগিয়ারে দিয়ে আস্তে আস্তে জোর বাড়াবে। নৌকাটা সুড়ঙ্গমুখ থেকে খসে এলে বুঝতেই পারবে। থেমে যাবে তখন। গুহায় ঢুকে ওদেরকে বের করে আনব আমি।...আর হ্যাঁ, টানতে টানতে হঠাৎ যদি সামনে লাফ দিয়ে ছুটতে শুরু করে বোট, বুঝবে, নৌকা থেকে নোঙর খসে গেছে। এখানে নিয়ে আসবে আবার বোট। আমার ওঠার অপেক্ষা করবে। ঠিক আাছে?'

মাথা ঝোঁকাল কিশোর।

নেমে গেল জোসেফ।

আবার অপেক্ষার পালা। দড়ি ধরে বসে রইল কিশোর। দুরুদুরু করছে বুকের ভেতর। একবার টান পড়ল দড়িতে। নোঙর গাঁথছে হয়ত জোসেফ। এক মিনিট কাটল...দুই মিনিট...হঠাৎ টান পড়ল দড়িতে। জোরে জোরে, তিন বার।

লাফ দিয়ে উঠে এল কিশোর। ড্রাইভিং সিটে বসেই গিয়ার দিল। ধীরে ধীরে চলতে শুরু করল বোট। তারপর থেমে গেল হঠাৎ করেই। টান টান হয়ে গেছে দড়ি।

এক্সিলেটরে চাপ বাড়াচ্ছে কিশোর। হুইলে হাতের আঙুল চেপে বসেছে। নোঙর বাঁধা দড়ির মতই টান টান হয়ে গেছে তার স্নায়ু। গর্জন বাড়ছে শক্তিশালী ইঞ্জিনের।

প্রথম কয়েক মুহূর্ত কিছুই ঘটল না। তারপর সামনে বাড়তে লাগল বোট, ধীরে, অতি ধীরে। এক ইঞ্চি দু'ইঞ্চি করে। বিশাল মরা তিমিকে টেনে নিয়ে যেতে চাইছে যেন টাগবোট। হঠাৎ সামনে লাফ দিল বোট। সেরেছে!—ভাবল কিশোর। গেছে হয়ত ছুটে। কিন্তু না, যতখানি জোরে ছোটা উচিত তত জোরে এগোচ্ছে না তো বোট! তারমানে নৌকাটা আটকে আছে নোঙরে। ওটাকে টেনে নিয়ে চলেছে বোট। বিশ ফুট...পঞ্চাশ ফুট একশো ফুট দূরে গিয়ে ইঞ্জিন নিউট্রাল করে দিল কিশোর। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই থেমে দাঁড়াল বোটটা।

সিট থেকে উঠে পেছনে চলে এল কিশোর। কোমরের বেল্ট থেকে ছুরি খুলে নিয়ে কেটে নিল দড়ি। ফিরে এসে বসল আবার ড্রাইভিং সিটে।

আবার আগের জায়গায় বোট ফিরিয়ে নিয়ে এল কিশোর। অপেক্ষা করতে লাগল। এক মিনিট...দুই মিনিট...ভুসস করে বোটের পাশেই ভেসে উঠল একটা মাথা। জোরে শব্দ করে শ্বাস নিল পাপালো হারকুস। বোটের গা ঘেঁষে এল। থলেটা ছুঁড়ে দিল ভেতরে। চেঁচিয়ে বলল, 'জলদি লুকাও ওটা! ভেতরে মোহর! কারও কাছে ফাঁস করা চলবে না এখন!'

হাত ধরে আগে পাপালোকে বোটে উঠতে সাহায্য করল কিশোর। তারপর ভেজা থলেটা তুলে নিয়ে সিটে রেখে ওটার ওপরেই বসে পড়ল। লুকানর এর চেয়ে ভাল জায়গা আর নেই বোটে।

কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল পাপালো, এই সময় ভেসে উঠল রবিন। পরক্ষণেই মুসা। দু'জনকে উঠতে সাহায্য করল কিশোর আর পাপালো।

'যাক, উদ্ধার করলে শেষ পর্যন্ত!' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল মুসা। 'বাঁচার আশা ছিলই না!'

'জোসেফের ভাবভঙ্গিতে মনে হল, খুব খেপে গেছে,' বলল রবিন।

'সব শুনলে বাবাও খেপবে!' কথার ধরনেই বোঝা গেল, ভয় পাচ্ছে মুসা। 'তবে যা-ই হোক, কিছু মোহর পেয়েছি। পাপু বলেনি?'

'থলেটার ওপরই বসে আছি,' বলল কিশোর। 'এখন মোহরের কথা থাক। পরে সব শুনব।'

'কাজটা খুব খারাপ হয়ে গেছে,' পিঠে বাঁধা গ্যাস ট্যাংক খুলতে খুলতে বলল রবিন। 'কিন্তু দোষ আমাদের নয়। পাপুর নৌকাটাকে ধাক্কা দিয়ে ভেঙে...'

'চুপ! রবিনকে থামিয়ে দিল কিশোর। 'জোসেফ। সব জানানর দরকার নেই ওকে। রেখেঢেকে বলবে।'

বোটের পাশে ভেসে উঠেছে জোসেফ। এক হাতে দড়ির কাটা প্রান্ত। বাড়িয়ে দিল ওটা। ধরল কিশোর। বেঁধে দিল ক্যাপস্টানের সঙ্গে। তাড়াতাড়ি এসে বসল আবার সিটে।

বোটে উঠে এল জোসেফ। ধীরে সুস্থে খুলে নিল ফেস মাস্ক, ফ্লিপার, গ্যাস ট্যাংক।

নীরবে অপেক্ষা করছে ছেলেরা। ওদের দিকে তাকাল জোসেফ। 'তারপর? খুব তো দেখালে!'

'আমরা...' শুরু করেও থেমে গেল রবিন।

হাত তুলেছে জোসেফ। 'আর সাফাই গাইতে হবে না,' বলল সে। 'যা করার করেছ। তবে তোমাদের ড্রাইভিং এখানেই শেষ। গোয়েন্দাগিরিও। মিস্টার আমানও তাই বললেন। শুরু থেকেই আমার মত ছিল না। বাচ্চাকাচ্চা দিয়ে কাজ হবে না কিছুই। শুধু শুধু বাড়তি ঝামেলা!'

নীরব রইল ছেলেরা।

পাপালোর দিকে ফিরল জোসেফ। 'তারপর? চোরের কি খবর? অনেক হারামীপনা করেছ, এবার জেল খাটগে।'

জোসেফ কি বলছে, কিছুই বুঝতে পারল না ছেলেরা।

'হাঁ করে আছ কেন?' পাপালোর দিকে চেয়ে বলল জোসেফ। 'গতরাতে একটা ট্রেলারের জানালা ভাঙা হয়েছে। ছোট ফোকর। বড় মানুষ ঢুকতে পারবে না ওই ফোকর দিয়ে, গোটা দুয়েক দামি লেন্স চুরি গেছে। কম করে হলেও হাজার ডলার দাম। ভুল করে একটা ছুরি ফেলে গেছে চোর।' স্থির চোখে পাপালোর দিকে তাকিয়ে আছে সে। 'ছুরিটা কার, জান? তোমার! আর জানালার ওই ফোকর দিয়ে তোমার পক্ষেই ঢোকা সম্ভব।'

বোবা হয়ে গেছে যেন চার কিশোর। হাঁ করে চেয়ে আছে জোসেফের দিকে।

'তোমার শয়তানী খতম,' বলল জোসেফ। 'হোভারসনকে খবর দেয়া হয়েছে। ফিশিংপোর্টে ফিরে গিয়েই তার দেখা পাবে। কপালে তোমার অনেক দুঃখ আছে, পাপালো হারকুস, এই বলে দিলাম।'

ষোলো

'পাপুকে পুলিশে দিল ওরা!' বিষণ্ন কণ্ঠে বলল রবিন। 'কাজটা উচিত হয়নি।'

'হ্যাঁ,' আস্তে মাথা দোলাল মুসা। 'আমার কিন্তু এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না, লেন্সগুলো ও চুরি করেছে। কিশোর, তুমি কি বল?'

কোন জবাব দিল না গোয়েন্দাপ্রধান, যেন শুনতেই পায়নি। দুই বন্ধুর কাছ থেকে দূরে, লিভিং রুমের আরেক প্রান্তে সোফায় বসে আছে। গভীর চিন্তায় মগ্ন।

বিকেলের মাঝামাঝি। বাইরে ঝমাঝম বৃষ্টি। সারাদিন বাইরে বেরুতে পারেনি ওরা। বৃষ্টি না থাকলেও অবশ্য পারত না। মিস্টার আমানের কড়া নির্দেশঃ একা কোথাও যেতে পারবে না ওরা। যেতে হলে তাঁকে জানাতে হবে। লোক সঙ্গে দিয়ে দেবেন। গতকাল বিকেলে ছেলেদের অবাধ্যতার ওপর এক কড়া বক্তৃতা দিয়েছেন তিনি। আন্তরিক দুঃখিত হয়েছেন ওদের কাজে, সেটাও জানিয়েছেন বার বার।

'কিশোর!' গলা চড়িয়ে ডাকল মুসা। 'কি বলছি, শুনছ? আমার ধারণা, লেন্স পাপু চুরি করেনি। তুমি কি বল?'

কেশে উঠল কিশোর। এখনও পুরোপুরি যায়নি সর্দি।

'না,' বলল গোয়েন্দাপ্রধান, 'পাপু চুরি করেনি। সাক্ষী প্রমাণ সব ওর বিরুদ্ধেই যাচ্ছে যদিও। ওর ছুরি পাওয়া গেছে ট্রেলারের ভেতর, তাজ্জব কাণ্ড!'

'দুই দিন আগে হারিয়েছিল ওটা,' বলল রবিন। 'ও তাই বলেছে।'

'এখন কেউ বিশ্বাস করবে না একথা,' বলেই আবার কাশতে লাগল কিশোর। কাশি থামলে বলল, 'ধরেই নিয়েছে সিনেমা কোম্পানি, তাদের সমস্যা শেষ। চোর ধরা পড়েছে, আর কি?'

'কঙ্কাল দ্বীপের রহস্যটা আসলে কি?' জিজ্ঞেস করল রবিন। 'অনুমান করেছ কিছু?'

'কেউ একজন চায় না, কঙ্কাল দ্বীপে লোক যাতায়াত করুক, কিংবা বাস করুক,' বলল কিশোর। 'এ-ব্যাপারে আমি শিওর। কিন্তু কেন চায় না, বুঝতে পারছি না এখনও।'

দরজায় টোকা পড়ল। সাড়া দিল মিসেস ওয়েলটন। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল। পেছনে পুলিশ চীফ হোভারসন। রেনকোট থেকে পানি ঝরছে।

'এই যে, ছেলেরা,' বলল বাড়িওয়ালি, 'চীফ কথা বলতে চান তোমাদের

সঙ্গে।'

'মিসেস ওয়েলটন,' বলল হোভারসন, 'ওদের সঙ্গে একটু একা কথা বলতে চাই, প্লীজ...'

'ওহ্, শিওর শিওর,' দরজা ভেজিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল মিসেস ওয়েলটন।

রেনকোটটা খুলে দরজার পাশের হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে রাখলেন চীফ। সোফায় বসলেন। সিগারেট বের করে ধরালেন ধীরেসুস্থে।

'তারপর, ছেলেরা,' কথা শুরু করলেন হোভারসন, 'পাপুর পজিশন খুব খারাপ। লেন্স দুটো পাওয়া গেছে। ওর বিছানার তলায়।'

'কিন্তু পাপু চুরি করেনি।' রাগ প্রকাশ পেল রবিনের গলায়। 'আমরা জানি, ও করেনি!'

'হয়ত করেনি,' মাথা ঝোঁকালেন হোভারসন। 'কিন্তু সব সাক্ষী-প্রমাণ ওর বিরুদ্ধে যাচ্ছে। সবাই জানে, বাবার চিকিৎসার জন্যে গ্রীসে ফিরে যাবার জন্যে, পাগল হয়ে উঠেছে ও।'

'উঠেছে, ঠিক,' বলল মুসা। 'কিন্তু সেজন্যে চুরি করবে না সে। তাছাড়া টাকা তার আছে। এবং আরও পাবার সম্ভাবনা আছে।'

'তাই!' তিনজনের দিকেই একবার করে তাকালেন হোভারসন। 'ওর টাকা আছে? আরও পাবার সম্ভাবনা আছে! কি করে?'

মুখ ফসকে কথা বেশি বলে ফেলেছে, এখন আর ফেরার পথ নেই। মোহরের কথা বলতেই হবে চীফকে। তবু চুপ করে রইল মুসা।

'ছেলেরা,' আবার বললেন হোভারসন, 'পাপুকে আমি পছন্দ করি, তার ভাল চাই। এখন বলত, সত্যি সত্যি কি ঘটেছিল গতকাল। বিপদে পড়েছ, এবং উদ্ধার করে আনা হয়েছে, ঠিকই। কিন্তু কেন পড়েছ বিপদে? কেন গিয়ে ঢুকেছ ওই সুড়ঙ্গে। শুধুই কৌতূহল? নিশ্চয় না। হয়ত তোমাদের ভয়, গুপ্তধনের কথা ফাঁস হয়ে গেলে দলে দলে ছুটে আসবে লোক। শুটিঙে বিঘ্ন ঘটাবে। কিন্তু পাপুর দিকটাও তো ভেবে দেখতে হবে তোমাদের। ওকে হাজত থেকে বের করে আনতে চাও না?'

দ্বিধা করছে তিন গোয়েন্দা। শেষে মন স্থির করে নিল কিশোর। 'হ্যাঁ, স্যার, চাই।' মুসার দিকে ফিরল। 'থলেটা নিয়ে এসো।'

দোতলায় চলে গেল মুসা। পাপালোর থলেটা নিয়ে ফিরে এল। থলের মুখ খুলে হোভারসনের পাশে ঢেলে দিল মোহরগুলো। মৃদু টুংটাং আওয়াজ তুলে সোফায় পড়ল পঁয়তাল্লিশটা স্প্যানিশ ডাবলুন।

বড় বড় হয়ে গেল হোভারসনের চোখ। 'মাই গড! জলদস্যুর গুপ্তধন। পাপু পেয়েছে?'

'পাপু, মুসা আর রবিন,' বলল কিশোর। 'দ্য হ্যাণ্ডের গুহায়। ফিরে গিয়ে আরও খোঁজার ইচ্ছে আছে পাপালোর। সেজন্যেই গোপন রেখেছি ব্যাপারটা।'

'হুঁমম!' ঝট করে চোখ তুললেন হোভারসন। 'আমিও তোমাদের দলে। মোহর পেয়েছ, কাউকে বলব না।'

'তাহলে বুঝতেই পারছেন, স্যার,' আগের কথার খেই ধরল রবিন, 'টাকার জন্যে চুরি করার দরকার নেই পাপুর।'

'কিন্তু,' বললেন হোভারসন, 'তাতে প্রমাণ হয় না, পাপু চুরি করেনি। মোহরগুলো পাওয়া গেছে লেন্স চুরি যাবার পর। পাপালো তখন জানত না, মোহর পাবে।'

ঠিকই বলেছেন পুলিশ চীফ। মুখ কালো করে ফেলল আবার রবিন। সজোরে পকেটে হাত ঢোকাল মুসা।

রুমাল বের করে নাক মুছল কিশোর। তারপর বলল, 'রাফাত চাচা, মিস্টার সিমনস আর মিস্টার গ্র্যাহামের ধারণা স্কেলিটন আইল্যাণ্ডের রহস্যের সমাধান হয়ে গেছে। তাঁরা মনে করছেন, যত নষ্টের মূলে ছিল ওই পাপু। কিন্তু, তাঁরা ভুল করছেন। সমস্ত শয়তানীর পেছনে রয়েছে অন্য কেউ। ঘটনাগুলো সব খতিয়ে দেখলেই অনেক কিছু পরিষ্কার হয়ে যায়। গোড়া থেকেই শুরু করছি...' কেশে উঠল সে।

'আপনি সবই জানেন,' কাশি থামলে বলল কিশোর, 'তবু গোড়া থেকেই শুরু করছি। মাঝে অনেক দিন বিরতি দিয়ে, হঠাৎ করে আবার স্কেলিটন আইল্যাণ্ডে ভূতের উপদ্রব শুরু হল কেন? সিনেমা কোম্পানির ওপর ওই বিশেষ নজর কেন চোরের? প্লেন থেকে নামতে না নামতে কার কি এমন ক্ষতি করে ফেললাম, যে ঝড়ের রাতে দ্য হ্যাণ্ডে নির্বাসন দিয়ে আসা হল আমাদেরকে? সবগুলো প্রশ্নের একটাই সহজ উত্তরঃ কেউ একজন চায় না, স্কেলিটন আইল্যাণ্ডে লোক যাতায়ত করুক, কিংবা বাস করুক, কিংবা ওটার ব্যাপারে খোঁজখবর করুক। এবং সেটার প্রমাণও পেয়েছি গতকাল বিকেলে। ডাক্তার রোজারের চেম্বার থেকে ফিরছিলাম, হঠাৎ পাশের গলি থেকে বেরিয়ে এল একজন লোক। ঢেঙা, রোগাটে, হাতে উল্কি দিয়ে আঁকা জলকুমারীর ছবি...'

'ডিক।' চোয়ালে হাত ঘষছেন চীফ। 'ডিক ফিশার! মাত্র জেল থেকে বেরোল ব্যাটা, এরই মাঝে শুরু করে দিল!...ঠিক আছে, বলে যাও।'

'দ্বীপগুলোর আশপাশে খুব বেশি ঘোরাফেরা করে পাপু, তাই তার নৌকা ভেঙে দেয়া হল,' বলল কিশোর। 'শুধু তাই না, চক্রান্ত করে তাকে জেলে পাঠানর ব্যবস্থা করল।'

'কিন্তু কেন?' প্রশ্ন করল রবিন।

'সেটাই বুঝতে পারছি না,' বলল কিশোর। 'তাহলে সব রহস্যেরই সমাধান হয়ে যেত।'

'হুঁ-হ্!' চিন্তিত দেখাচ্ছে হোভারসনকে। 'ব্যাপারটা ভাল করে ভেবে দেখব। এখন আমি উঠি। দেখি, পাপুর কোন ব্যবস্থা করা যায় কিনা। হাক স্টিভেন ওর

জামিন হতে রাজি আছে। কাগজপত্র তৈরি করতেও দেরি হবে না। জজ সাহেব একটা কাজে বাইরে গেছেন। তিনি ফিরে এলেই সই করিয়ে নেয়া যায়। হ্যাঁ, আমাকে না জানিয়ে কোন কিছু করে বোসো না। বিপদে পড়ে যেতে পার। চলি, গুড বাই।'

বেরিয়ে গেলেন হোভারসন।

তাড়াতাড়ি আবার মোহরগুলো থলেতে ভরে নিল মুসা। মুখ বেঁধে নিয়ে গিয়ে রেখে এল দোতলায়, নিজেদের ঘরে, সুটকেসে। ফিরে এল নিচের ঘরে।

ঘরে ঢুকল মিসেস ওয়েলটন। খাবার দেবে কিনা জানতে চাইল। দিতে বলল ছেলেরা।

টেবিলে খাবার দেয়া হল। খেতে বসল ছেলেরা। কাছেই একটা চেয়ারে বসে এটা ওটা বাড়িয়ে দিচ্ছে মিসেস ওয়েলটন। বলি বলি করছে কি যেন। শেষ পর্যন্ত চুপ থাকতে না পেরে বলেই ফেলল, 'গুপ্তধন খোঁজার জন্যেই তাহলে এসেছ তোমরা। দেখলাম...'

ঝট করে মাথা তুলল কিশোর। 'কি দেখেছেন?'

'সত্যি বলছি, চুরি করে কারও কিছু দেখার অভ্যেস নেই আমার। দেখতে এসেছিলাম, চীফ চলে গিয়েছে কিনা। দেখলাম, বসে আছে, পাশে একগাদা ডাবলুন। ভাবলাম, খুব জরুরী কোন কথা আলোচনা করছ তোমরা। বিরক্ত না করে চলে গেলাম।'

একে অন্যের দিকে চাওয়া-চাওয়ি করল তিন গোয়েন্দা। খাওয়া বন্ধ।

'কাউকে বলেছেন একথা?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'কোন্ কথা?'

'আমরা গুপ্তধন খুঁজে পেয়েছি...

'নাহ্,' এদিক ওদিক মাথা নাড়ল মিসেস ওয়েলটন, 'তেমন কাউকে না। ফোনে শুধু আমার ঘনিষ্ঠ তিন বান্ধবীকে জানিয়েছে। আমারই মত কম কথা বলে। পেটে বোমা মারলেও আমারই মত মুখে তালা লাগিয়ে রাখবে। কাউকে কিচ্ছু বলবে না...'

'হুঁ,' চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা ঝোঁকাল কিশোর। 'কয়েকটা মোহর পেয়েছে মুসা আর রবিন। তবে স্কেলিটন আইল্যাণ্ডে নয়।'

'আমাকে বোকা বানাতে পারবে না, ইয়ং ম্যান,' নিজের বুদ্ধির ওপর খুব বেশি ভক্তি মিসেস ওয়েলটনের। 'আগামী কাল ভোর থেকেই লোক যেতে শুরু করবে স্কেলিটন আইল্যাণ্ডে। গুপ্তধন খুঁজতে...' বলতে গিয়েই থেমে গেল। মনে পড়ে গেছে, একটু আগে বান্ধবীদের প্রশংসা করে বলেছে, মুখে তালা লাগিয়ে রাখবে ওরা। কথা ঘোরানর চেষ্টা করল, 'মানে, আমি বলতে চাইছি, যদি আর কেউ শুনে ফেলে আর কি! চীফ হোভারসনও তো জেনে গেল...'

'তিনি কাউকে বলবেন না, কথা দিয়েছেন,' বলল কিশোর।

'ওহ্, আমি যাই!' তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল মিসেস ওয়েলটন। 'দুধ পুড়ে যাচ্ছে...'

'কাম সারছে!' কিশোরের মুখে শোনা বাঙালি বুলি ঝাড়ল মুসা। 'এতক্ষণে জেনে গেছে হয়ত আদ্দেক শহর! আগামী কাল ভোর হতে না হতেই ভিড় লেগে যাবে কঙ্কাল দ্বীপে। শূটিঙের বারোটা বাজল! সব দোষ আমাদের!'

'এরপর রাফাত চাচাকে মুখ দেখাব কি করে আমরা!' বলল রবিন।

'লোক ঠেকাতে না পারলে সর্বনাশ হয়ে যাবে ফিল্ম কোম্পানির!' বলল মুসা। 'কিশোর, তুমি কিছু বল।'

চুপচাপ খেয়ে যাচ্ছে কিশোর। নির্লিপ্ত। মুখ তুলল, 'একটা বুদ্ধি এসেছে আমার মাথায়। আগে খেয়ে নিই, তারপর বলছি। তোমরাও খেয়ে নাও।'

শেষ হল খাওয়া। হাতমুখ ধুয়ে এসে বসল আবার আগের জায়গায়।

'কি বুদ্ধি, বল,' জানতে চাইল মুসা।

খুলে গেল দরজা। ঘরে এসে ঢুকলেন মিস্টার আমান, পেছনে পিটার সিমনস।

মিস্টার আমান জানালেন, আগামী সকালেই এসে পৌঁছুবেন পরিচালক জন নেবার। এসকেপ ছবির শূটিং শুরু হবে।

আঁতকে উঠল মুসা আর রবিন।

কিশোর নির্লিপ্ত। ধীরে ধীরে জানাল, কি ঘটেছে। আগামী কাল সকালে কি ঝামেলায় পড়তে যাচ্ছে সিনেমা কোম্পানি।

মুখ কালো হয়ে গেল পিটার সিমনসের।

'গেল, সব সর্বনাশ হয়ে গেল!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন মিস্টার আমান 'পঙ্গপালের মত ঝাঁপিয়ে পড়বে গুপ্তধন শিকারির দল! বলে কাউকে বোঝাতে পারব না, মোহর নেই কঙ্কাল দ্বীপে।'

'বলে বোঝানর দরকার কি?' বলল কিশোর।

ভুরু কুঁচকে গেছে, হাঁ করে কিশোরের দিকে তাকিয়ে আছেন মিস্টার আমান। 'কি বলছ তুমি!'

'একটা বুদ্ধি এসেছে মাথায়,' বলল কিশোর। 'এক কাজ করলেই তো হয়। গুপ্তধন শিকারিদের ছবি তুলে নিন। কোথায় খুঁজছে, কি করছে না করছে, সব। ট্রেজার হান্টার নাম দিয়ে কম দৈর্ঘ্যের একটা ছবি বানিয়ে ফেলুন। ভাড়া করে লোক এনে গুপ্তধন খোঁজার ছবি বানানো সম্ভব, কিন্তু এত নিখুঁত, এত জ্যান্ত হবে না।'

কি যেন ভাবল সিমনস। বলল, 'ঠিকই বলেছ। শুধু এভাবেই গুপ্তধন শিকারিদের হাত থেকে নিস্তার পাব আমরা। ডাক্তার রোজারকে বলে পাঠাব, স্থানীয় রেডিওতে গিয়ে ঘোষণা করুক, আগামী কাল গুপ্তধন খোঁজা চলবে ব্যাপক হারে। 'যে গুপ্তধন খুঁজে পাবে, পাঁচশো ডলার পুরস্কার পাবে সে আমাদের

কোম্পানির কাছ থেকে। তবে, একটা শর্ত থাকবে, নাগরদোলা সাগরদোলার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। খুঁজেপেতে কিছুই না পেয়ে চলে যাবে ওরা। বুঝে যাবে, কোন গোপন ম্যাপ পাইনি আমরা, গুপ্তধন খুঁজতে আসিনি। তাহলে এভাবে লোককে আমন্ত্রিত করতাম না। আর কখনও আমাদের বিরক্ত করতে আসবে না ওরা। নিরাপদে এসকেপ ছবির শূটিং চালিয়ে যেতে পারব। মাঝে থেকে গুপ্তধন শিকারের ওপর চমৎকার একটা ছবিও তৈরি হয়ে যাবে। খুব ভাল বুদ্ধি!'

'হুঁ-উঁ!' ধীরে মাথা ঝোঁকালেন মিস্টার আমান! 'ঠিকই। তাহলে এখুনি ফোন করে সব কথা জানানো উচিত মিস্টার নেবারকে। তিনি গোয়েন্দার দিকে ফিরলেন। 'রাত অনেক হয়েছে। আর জেগে থেক না। শুতে যাও। সকালে উঠে দেখতে পাবে খেলা...'

'কিন্তু বাবা, পাপু...' বলতে গিয়ে বাধা পেল মুসা।

'ওই চোরটার কিছু শিক্ষা হওয়া দরকার,' উঠে দাঁড়ালেন মিস্টার আমান। 'পিটার, চল যাই। ডাক্তার রোজারকেও খবর পাঠাতে হবে...'

তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে গেল দু'জনে।

'উফ্‌ফ! বাঁচলাম!' আরাম করে হেলান দিয়ে বসল মুসা। 'কি ঘাবড়েই না গিয়েছিলাম! কিন্তু পাপুর ব্যাপারটা কি হবে? কানই দিল না বাবা!'

বড়রা ছোটদের কথায় কান দেয় না, এটাই নিয়ম,' ক্ষোভ প্রকাশ পেল রবিনের কথায়। 'তারা যা ভাবে, সেটাই ঠিক, আমাদের কথা কিছু না...। যাকগে, কিশোরের কথায় কান দিয়েছে ওরা, এটাই বাঁচোয়া আমি তো কোন উপায়ই দেখছিলাম না...তুমি আবার কি ভাবতে শুরু করেছ, কিশোর...'

'অত বেশি ভেব না,' হাসল মুসা। 'মগজটাকে একটু বিশ্রাম দাও। নইলে বেয়ারিং জ্বলে যাবে...'

কেশে উঠল কিশোর। থামল। স্বস্তি ফুটেছে চেহারায়।

'কি, কিশোর?' জিজ্ঞেস করল রবিন। 'প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেছ মনে হচ্ছে?'

'হস্তে মোহরগুলো কি করে গেল, মনে হয় বুঝতে পারছি,' শান্ত কণ্ঠে বলল কিশোর।

'পারছ!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'বলে ফেল! জলদি!'

'চল, ওপরে চলে যাই,' বলল কিশোর।

কিশোরের পিছু পিছু দোতলায় শোবার ঘরে এসে ঢুকল দুই সহকারী গোয়েন্দা। উত্তেজিত।

'বল এবার,' ঘরে ঢুকেই বলে উঠল রবিন।

নিজের বিছানায় গিয়ে বসল কিশোর। 'ক্যাপ্টেন এক কান-কাটা কোথায় ধরা পড়েছিল, মনে আছে? হস্তে। মোহরগুলো রেখে খালি সিন্দুকটা উপসাগরে ফেলে দিয়েছিল সে। দ্বীপে গিয়ে উঠেছিল। তারপর টিলার ওপরের গর্ত দিয়ে সব মোহর ফেলে দিয়েছিল নিচের গুহায়। এজন্যেই একটা মোহরও খুঁজে পায়নি

ব্রিটিশ যুদ্ধ-জাহাজের ক্যাপ্টেন।'

'তাহলে আরও অনেক মোহর আছে গুহায়!' উত্তেজনায় কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে মুসার। 'পাপুর কথাই ঠিক!'

'মনে হয় না,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'তিনশো বছর ধরে জোয়ার আসছে গুহায়। নিশ্চয় বেশির ভাগ মোহরই বের করে নিয়ে গেছে খোলা সাগরে। ওপরে যা ছিল, পেয়ে গেছ। আর কিছু থাকলেও, বালির অনেক গভীরে ঢুকে গেছে ওগুলো। খুঁজে পাওয়া কঠিন।

'চেপে রাখা শ্বাসটা ফেলল মুসা। 'ঠিকই বলেছ। তবে আরও কিছু পাওয়া গেলে খুব ভাল হত, উপকার হত পাপুর। ওর বাবাকে গ্রীসে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারত।'

পাপালোর কথা উঠতেই আবার চুপ হয়ে গেল ওরা। বন্ধুকে সাহায্য করার কোন উপায় ঠিক করতে পারল না। বিষণ্ন মুখে শুতে গেল।

শোবার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়ল মুসা আর রবিন। কিশোরের চোখে ঘুম এল না। ভাবনার ঝড় বইছে মাথায়। অনেক দিন পরে হঠাৎ আবার দেখা দিল কেন স্যালি ফ্যারিংটনের ভূত? কঙ্কাল দ্বীপে লোক যাতায়াত করলে কার কি অসুবিধে? তাদেরকে হস্তে ফেলে রেখে এসেছিল কেন হান্ট গিল্ডার? কেন হুমকি দিল ডিক…ডিক…তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বসল কিশোর। বুঝে গেছে!

'মুসা, রবিন, জলদি ওঠ!' চেঁচিয়ে ডাকল কিশোর। 'রহস্যের সমাধান করে ফেলেছি!'

চোখ মেলল দুই সহকারী গোয়েন্দা। হাই তুলতে তুলতে তাকাল কিশোরের দিকে।

'কি হয়েছে?' ঘুমজড়িত গলায় জানতে চাইল মুসা। 'দুঃস্বপ্ন দেখেছ?'

'না!' উত্তেজিত কণ্ঠ কিশোরের। 'জলদি কাপড় পর! কঙ্কাল দ্বীপে যেতে হবে! রহস্যের সমাধান করে ফেলেছি!'

লাফ দিয়ে বিছানায় উঠে বসল মুসা আর রবিন।

'ইয়াল্লা!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'বল বল…'

বলল কিশোর।

'কিশোর, তোমার তুলনা নেই!' বন্ধুর প্রশংসা না করে পারল না রবিন। 'ঠিক ঠিক বলেছ! একেবারে খাপে খাপে মিলে যাচ্ছে সব কিছু!'

'ইস্‌স্‌, একটা গাধা আমি!' রবিনের কথায় কান দিল না কিশোর। 'আরও আগেই বোঝা উচিত ছিল! জলদি যাও। আমিই যেতাম, কিন্তু সারা শরীরে প্রচণ্ড ব্যথা…'

'না না, তোমার যাবার দরকার নেই,' হাত নেড়ে বলল মুসা। 'তুমি শুয়ে থাক। আমরাই পারব। কিন্তু বাবাকে জানালেই তো পারি। জিমকে নিয়ে তারাও আমাদের সঙ্গে গেলে…'

'না,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'আমার অনুমান ভুলও হতে পারে। তাহলে খেপে যাবেন রাফাত চাচা। তোমরা দু'জনেই খুঁজে বের করগে আগে। পেলে, সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে জানাবে তাদেরকে।'

পাঁচ মিনিটেই কাপড় পরে তৈরি হয়ে গেল রবিন আর মুসা। টর্চ নিল দু'জনেই। দরজা খুলে বেরিয়ে গেল নিঃশব্দে।

শুয়ে পড়ল আবার কিশোর। ঘুম এল না। ক্ষোভে-দুঃখে ছটফট করছে। কেন লাগল ঠাণ্ডা? কেন এই হতচ্ছাড়া সর্দি ধরে বসল তাকে! নইলে তো রবিন আর মুসার সঙ্গে সে-ও যেতে পারত। রাতটা দ্বীপেই থেকে যেত। তারপর ভোর না হতেই গুপ্তধন শিকারিদের খেলা…গুপ্তধন শিকারি! আবার লাফিয়ে উঠে বসল কিশোর। ভুল হয়ে গেছে, মস্ত ভুল! ভয়ানক বিপদে ঠেলে পাঠানো হয়েছে রবিন আর মুসাকে! খুন হয়ে যেতে পারে ওরা, খুন…

সতেরো

গায়ের জোরে দাঁড় টানছে মুসা। প্রায় উড়ে চলেছে ছোট্ট নৌকা। এক জেলের কাছ থেকে নৌকাটা ভাড়া নিয়েছে সে। সামনের গলুইয়ের কাছে বসে আছে রবিন। চেয়ে আছে সামনের দিকে। তারার আলোয় অদ্ভুত দেখাচ্ছে কঙ্কাল দ্বীপকে।

'এসে গেছি!' বলে উঠল রবিন।

মোড় ফেরাল মুসা। জেটির কাছে গেল না। প্লেজার পার্কের দিকে এগিয়ে চলল।

ঘ্যাচ করে বালিতে এসে ঠেকল নৌকার সামনের অংশ। লাফিয়ে নেমে পড়ল রবিন। মুসাও নামল। দু'জনে টেনে নৌকাটাকে তুলে আনল ডাঙায়।

'চল, পার্কের ভেতর দিয়ে এগোই,' নিচু গলায় বলল মুসা। 'পার্ক পেরিয়ে পথে নামব, সেদিন যেপথে গুহায় গিয়েছিলাম। খুব সাবধান। জিম টের পেলে চেঁচামেচি শুরু করবে।'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝোঁকাল রবিন। 'তবে সঙ্গে ও গেলে ভালই হত।…অন্ধকারে গুহাটা খুঁজে পাবে তো?'

'মনে হচ্ছে পাব,' জবাব দিল মুসা। দ্বিধা করল এক মুহূর্ত। গাঢ় অন্ধকার। নীরব-নিস্তব্ধ। সৈকতে ঢেউ আছড়ে পড়ার একটানা মৃদু ছল-ছলাৎ শব্দ নীরবতাকে আরও গভীর করে তুলেছে যেন। 'চল, এগোই।'

আগে আগে চলেছে মুসা। মাঝে মাঝে টর্চ জ্বেলে দেখে নিচ্ছে সামনের পথ। এসে ঢুকল পার্কে।

কালো আকাশের পটভূমিতে কিম্ভূত এক দানবের মত দেখাচ্ছে সাগরদোলাটাকে। পাশ কাটিয়ে নাগরদোলার কাছে চলে এল দু'জনে। মোড় ঘুরে এগোল। পেছনের ভাঙা বেড়ার কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল।

'নাহ্, একা যাব না!' ফিসফিস করে বলল মুসা। 'বাবাকে জাগাব গিয়ে। ভয় পাচ্ছি, তা নয়। আমাদেরকে বোর্ডিং হাউস থেকে বেরোতে নিষেধ করেছে, তবু বেরিয়েছি। কোন বিপদে পড়ার আগেই তাকে জানিয়ে রাখা ভাল।'

'ঠিকই বলেছ,' সায় দিল রবিন। 'চল যাই। তাঁকে জানিয়ে গেলে আর কোন ভয় থাকবে না আমাদের।'

ক্যাম্পের দিকে পা বাড়াতে গিয়েই থমকে গেল দু'জনে। ধড়াস করে উঠল বুকের ভেতর।

কেউ এসে দাঁড়িয়েছে পেছনে। বিশালদেহী কেউ। 'খবরদার! যেখানে আছ, দাঁড়িয়ে থাক!' শোনা গেল গর্জন।

বরফের মত জমে গেল যেন দুই গোয়েন্দা।

আলো জ্বলে উঠল। সামনে চলে এল টর্চের মালিক। দুই কিশোরের মুখে আলো ফেলেই স্থির হয়ে গেল। অবাক কণ্ঠে বলে উঠল, 'আরে একি! তোমরা! এত রাতে চোরের মত এখানে কি করছ?'

দু'জনের চোখের ওপর থেকে আলো সরাল জিম, নিচের দিকে ফেলল। 'ভাগ্যিস, মেরে বসিনি! এতরাতে এখানে কি করছ তোমরা?'

'দ্বীপের রহস্য ভেদ করে ফেলেছে কিশোর,' বলল রবিন। 'তার অনুমান ঠিক কিনা দেখতে এসেছি।'

'দ্বীপের রহস্য!' অবাক কণ্ঠ জিমের। 'কি বলতে চাইছ?'

'সত্যিই গুপ্তধন লুকানো আছে এখানে,' বলল মুসা। 'কিশোরের তাই ধারণা।'

'গুপ্তধন!' ছেলেদের কথা বিশ্বাস করতে পারছে না যেন গার্ড। 'কিসের গুপ্তধন?'

'ওই যে...থেমে গেল মুসা। তার আগেই কথা বলতে শুরু করেছে রবিন। 'আপনার কথা থেকেই সূত্র খুঁজে পেয়েছে কিশোর।'

'আমার কথা থেকে।' বিড়বিড় করল জিম। 'কিছুই বুঝতে পারছি না!'

'সেদিন সকালে বললেন না,' বলল রবিন, 'দুই বছর আগে আর্মার্ড কার লুট করেছিল দুই ভাই? ডিক আর বাড ফিশার? যারা বাঁ হাত নষ্ট করে দিয়েছে আপনার।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ। কিন্তু তাতে কি?'

'আপনি আরও বলেছেন,' রবিনের কথার খেই ধরল মুসা। 'কোস্ট গার্ডেরা দু'জনকে ধরে ফেলে। উপসাগরে একটা বোটে ছিল দুই ভাই। কিছু ফেলছিল পানিতে। চোরাই টাকা ফেলেছিল ওরা, লোকের ধারণা।'

'তাই তো করেছিল।'

'এবং,' মুসার কথার খেই ধরল রবিন। 'ঠিক দুই বছর আগে থেকেই কঙ্কাল দ্বীপে আবার ভুতের উপদ্রব শুরু হল। টাকা লুট হল দু'বছর আগে, স্কেলিটন আইল্যাণ্ডের পাশে ধরা পড়ল দুই ডাকাত, দীর্ঘ বিশ বছর পর আবার গোলমাল

শুরু করল দ্বীপের ভূত। ভয় দেখাতে লাগল লোককে। ঘটনাগুলো একটার সঙ্গে আরেকটার মিল যেন খুব বেশি। সন্দেহ জাগল কিশোরের।'

'এত ভনিতা না করে আসল কথা বলে ফেল তো!' অধৈর্য হয়ে উঠছে জিম।

'বুঝতে পারছেন না এখনও?' বলল মুসা। 'বোটে করে পালাতে গেল দুই ডাকাত, ইঞ্জিন খারাপ হয়ে গেল হঠাৎ। ওরা তখন স্কেলিটন আইল্যাণ্ডের কাছাকাছি। এত ঝুঁকি নিয়ে এতগুলো টাকা লুট করেছে, পানিতে ফেলে দেবে সহজে? মোটেই না। কোনভাবে বোটটা তীরে ভিড়িয়ে দ্বীপে উঠেছিল ওরা। টাকাগুলো লুকিয়ে রেখেছিল। তারপর বোট নিয়ে ভেসে পড়েছিল আবার। কোস্টগার্ডের বোট আসতে দেখে টাকা পানিতে ফেলার ভান করেছিল, ফেলেছিল আসলে অন্যকিছু। ভারি কিছু, যা সঙ্গে সঙ্গে তলিয়ে গিয়েছিল। বমাল ধরা না পড়লে খুব বেশি দিন জেল হবে না, ঠিকই বুঝতে পেরেছিল ওরা। জেল থেকে বেরোলে আর কোন ভয় নেই। দ্বীপে এসে টাকাটা নিয়ে দূর কোন দেশে চলে যাবে। কেউ কিছু সন্দেহ করবে না। মাত্র হপ্তাদুয়েক হল ছাড়া পেয়েছে ওরা। সেদিন কিংবা তার পরের দিনই এসে টাকা নিয়ে যেতে পারত, কিন্তু মুশকিল করেছে সিনেমা কোম্পানি। এদিকে এলে ওদের চোখে পড়ে যাবার সম্ভাবনা আছে। ডিক আর বাডকে ঘোরাফেরা করতে দেখলে পুলিশের সন্দেহ জাগতে পারে। সে ঝুঁকি ওরা নেয়নি।'

'সর্বনাশ!' বলে উঠল জিম। 'কি গল্প শোনাচ্ছ! এখানেই টাকা লুকিয়ে রেখেছে ডিক আর বাড! কোথায়, কিছু বলেছে কিশোর?'

'কিশোরের ধারণা,' বলল রবিন, 'শুকনো উঁচু কোন জায়গায় লুকানো হয়েছে। কাপড়ের ব্যাগে ভরা কাগজের টাকা, মাটির তলায় পুঁতে রাখলে পচে যাবে। শুকনো উঁচু সবচেয়ে ভাল জায়গা দ্বীপে...'

'গুহা!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল জিম। 'সেই পুরানো গুহার ভেতরে! কোন তাকের পেছনের খাঁজে! খাঁজের ভেতরে থলেগুলো ঢুকিয়ে সামনে কয়েকটা পাথর ফেলে রাখলেই কেউ দেখতে পাবে না! সন্দেহও করবে না কিছু!'

'কিশোরেরও তাই ধারণা,' বলল মুসা। 'টাকাগুলো একমাত্র ওখানেই নিরাপদে থাকবে।'

'ইস্‌স্‌,' অস্থির হয়ে উঠেছে জিম, 'দুটো বছর ধরে টাকাগুলো ওখানে রয়েছে! ঘুণাক্ষরেও মাথায় এল না ব্যাপারটা! যদি কোনভাবে বুঝতে পারতাম...ইস্‌স্‌! চল চল, দেখি, সত্যিই আছে নাকি...'

'আগে রাফাত চাচাকে ডেকে নিয়ে আসি,' বলল রবিন।

'দরকার নেই,' মাথা নাড়ল জিম। 'ওঁরা ঘুমোক। আমরা বের করে নিয়ে আসি আগে। টাকার বস্তা দেখিয়ে চমকে দেব ওঁদেরকে।'

'কিন্তু...' বলতে গিয়েও থেমে গেল মুসা।

ঘুরে হাঁটতে শুরু করেছে জিম। ফিরে চেয়ে বলল, 'এসো আমার সঙ্গে।'

অন্ধকারে দু'পাশের গাছপালাগুলোকে অদ্ভুত দেখাচ্ছে। জিমের পিছু এগিয়ে চলেছে দুই গোয়েন্দা। কেন যেন খচখচ করছে দু'জনের মন। এভাবে যাওয়া ঠিক হচ্ছে না।

'উফ্ফ্!' হঠাৎ শোনা গেল রবিনের চিৎকার। গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে জোরে কাঁধ খামচে ধরেছে কেউ। 'মিস্টার রিভান! কে জানি…' মুখ চেপে ধরল কঠিন একটা থাবা।

পেছনে আরেকটা চাপা শব্দ শুনতে পেল রবিন। মুসার মুখও আটকে দেয়া হয়েছে, অনুমান করল।

ফিরে দাঁড়াল জিম। এগিয়ে এল কাছে। কিন্তু এ-কি! সামান্যতম অবাক হল না তো! কোমরের খাপ থেকে রিভলভারও বের করল না! 'চমৎকার!' বলে উঠল গার্ড। 'চেঁচামেচি করতে পারেনি!'

'আমরা করতে দিইনি বলে,' বলে উঠল রবিনকে ধরে রাখা লোকটা। 'নৌকা দ্বীপে ভেড়াবে, এটাই তো বিশ্বাস হচ্ছিল না তোমার। আরেকটু হলেই তো দিয়েছিল! ক্যাম্পে নিয়ে ওদেরকে জাগালেই…'

'কিন্তু যেতে তো পারেনি,' অস্বস্তি বোধ করছে জিম। 'এখন আর কোন ভয় নেই…'

'কে বলল তোমাকে?' বলল মুসাকে ধরে রাখা লোকটা। 'টাকাগুলো নিয়ে কেটে পড়ার আগে নিরাপদ নই। যে-কোন মুহূর্তে যা খুশি ঘটে যেতে পারে! এই বিচ্ছু দুটোর ব্যবস্থা করা দরকার। চল, বেঁধে নৌকায় ফেলে রাখি। পরে দেখব, কি করা যায়।'

'ঠিক আছে,' রাজি হল জিম। 'আচ্ছা, ডিক, টাকাগুলো কোথায়? গুহায় রেখেছ?'

'ওসব জেনে কাজ নেই তোমার,' ভারি গলায় বলল ডিক। 'সেটা আমাদের ব্যাপার।'

'আমারও!' গম্ভীর কণ্ঠ জিমের। 'তিন ভাগের এক ভাগ আমার। তোমাদের মতই দুটো বছর অপেক্ষা করেছি আমিও। বাঁ হাতটার কথা বাদই দিলাম। যদিও, এটা হারিয়েছি তোমাদের দোষে।'

'থাম! বড় বেশি কথা বল তুমি!' বলল রবিনকে ধরে রাখা লোকটা। 'তোমার ভাগ তুমি পাবে। এখন এক কাজ কর। গায়ের শার্টটা খুলে ছিঁড়ে ফেল। এ-দুটোকে বাঁধতে হবে।'

'কিন্তু…'

'জলদি কর!' ধমকে উঠল লোকটা।

শার্ট খুলে নিল জিম। ছিঁড়ে লম্বা লম্বা ফালি করতে লাগল।

ভাবছে রবিন। ডাকাতদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে জিম। আর্মার কার লুট করতে সাহায্য করেছিল ডিক আর বাডকে। ওকে সন্দেহমুক্ত রাখতে পিস্তল দিয়ে

বাড়ি মেরেছিল ডিক। আঘাতটা একটু জোরেই হয়ে গিয়েছিল। কাঁধের হাড় ভেঙে গিয়েছিল জিমের। ফলে অকেজো হয়ে গেছে বাঁ-হাতটা…'

মুখের ওপর থেকে হাত সরে যেতেই চেঁচিয়ে উঠতে গেল রবিন। কিন্তু তার আগেই কাপড় গুঁজে দেয়া হল। মুখের ওপর দিয়ে পেঁচিয়ে নিয়ে গিয়ে মাথার পেছনে বেঁধে দেয়া হল একটা ফালি। জিভ দিয়ে ঠেলে আর গোঁজটা খুলতে পারবে না সে। দু'হাত পিছমোড়া করে বেঁধে দেয়া হল এরপর।

একইভাবে মুসাকেও বাঁধা হল। পেছন থেকে দুই গোয়েন্দার জ্যাকেটের কলার চেপে ধরল দুই ভাই।

'এবার, বিচ্ছুরা,' বলল ডিক, 'হাঁট। কোনরকম চালাকির চেষ্টা করবে না। দুঃখ পাবে তাহলে।'

জোর ধাক্কায় প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ার উপক্রম হল, কিন্তু কলার ধরে আছে ডিক, পড়ল না রবিন। পাশে চেয়ে দেখল, একই ভাবে ধাক্কা খেয়ে এগোচ্ছে মুসা।

দ্বীপের অন্য প্রান্তে নিয়ে আসা হল ওদেরকে। সৈকতে বিছিয়ে আছে পাথর। তীরের কাছে নোঙর করা একটা বড় মোটর বোট।

'ওঠ!' রবিনের কাঁধে ধাক্কা মারল ডিক।

উঠে পড়ল দুই গোয়েন্দা। ইঞ্জিনের সামনের খোলা জায়গাটুকুতে নিয়ে আসা হল ওদেরকে।

'বস, বসে পড়!' কাঁধে চাপ পড়ল রবিনের। 'বাড, দড়ি বের কর তো। শক্ত করে বাঁধতে হবে, যেন পালাতে না পারে।'

কাছেই পড়ে আছে বোট বাঁধার দড়ি। অনেক লম্বা। হ্যাঁচকা টান দিয়ে মুসাকে চিত করে শুইয়ে ফেলল বাড। দড়ি তুলে নিয়ে পেঁচিয়ে বেঁধে ফেলল মুসার পা। বাড়তি অংশটুকু দিয়ে রবিনের পা বাঁধল। আরেক টুকরো দড়ি এনে দু'জনের বুকে বুক লাগিয়ে পেঁচিয়ে বাঁধল।

'ব্যস ব্যস,' বলল ডিক ফিশার। 'আর ছুটতে পারবে না। চল, তাড়াতাড়ি করতে হবে। এমনিতেই অনেক সময় নষ্ট করে ফেলেছি। গুপ্তধন, হুঁহ! খোঁজার জন্যে যে-কোন সময় চলে আসতে পারে ব্যাটারা!'

বোট থেকে নেমে গেল দুই ফিশার।

'তুমি এখানেই থাক, জিম,' শোনা গেল ডিকের কথা। 'চোখ রাখ চারদিকে। সন্দেহজনক কিছু দেখলে প্যাঁচার ডাক ডাকবে।'

'ছেলে দুটোকে কি করবে?' জিমের গলা। 'ওরা বলে দেবে সব। আমি…

'বলবে না,' কেমন অদ্ভুত শোনাল ডিকের গলা। 'খানিক পরেই ফিরে আসছি আমরা। বোট নিয়ে চলে যাব। তখন ওদের নৌকাটা উল্টো করে ভাসিয়ে দেবে। আগামী কাল ওভাবেই পাওয়া যাবে ওটা। লোকে ধরে নেবে কোন কারণে সাগরে ডুবে মরেছে…'

'বুঝেছি বুঝেছি,' বলে উঠল জিম।

পায়ের শব্দ কানে এল, দু'জোড়া। চলে যাচ্ছে। তারপর নীরবতা।

কথা বলার চেষ্টা করল রবিন। পারল না। অদ্ভুত একটা চাপা আওয়াজ বেরোল শুধু। বাঁধন খোলা যাবে না। বাঁচার কোন উপায় নেই।

আঠারো

কি ভীষণ বিপদে পড়েছে, বুঝতে অসুবিধে হল না দুই গোয়েন্দার।

ভাবছে রবিন, ঠিকই অনুমান করেছে কিশোর। কঙ্কাল দ্বীপের ওই পুরানো গুহাতেই লুকানো আছে টাকাগুলো। কিন্তু দুই ফিশারের সঙ্গে জিমেরও যোগসাজশ আছে, একথা কিশোরও কল্পনা করেনি। আজ রাতেই টাকা নিতে আসবে দুই ডাকাত, এটাও ভাবেনি। আগামী কাল ভোর থেকেই শুরু হবে গুপ্তধন খোঁজা, নিশ্চয় ঘোষণা করা হয়েছে রেডিওতে। দ্বীপের কোন জায়গা খোঁজা বাদ রাখবে না ওরা। কেউ না কেউ আবিষ্কার করে ফেলবে টাকার থলেগুলো। তাই, ঝুঁকি নিয়েও চলে এসেছে ওরা। টাকাগুলো বের করে নিয়ে যাবার জন্যে। যাবার আগে ওকে আর মুসাকে…'

আর ভাবতে চাইল না রবিন। চারদিক নীরব নিঃশব্দ। কাছে আসছে শুধু নৌকার গায়ে ঢেউয়ের বাড়ি লাগার মৃদু ছলছলাৎ।

হঠাৎ আরেকটা শব্দ কানে এল রবিনের। খুবই মৃদু। বোটের সঙ্গে কিছুর ঘষা লেগেছে, আলতো করে একবার দুলে উঠল। চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেল সে, বোটের ধারে একটা মাথা। আবছা।

অতি সাবধানে উঠতে লাগল মাথাটা। গলা দেখা গেল…কাঁধ…বোটের ভেতরে চলে এল সে। হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে এল। উঁকি দিয়ে তাকাল একবার তীরের দিকে। আবার মাথা নামাল। রবিন আর মুসার পাশে এসে থামল।

এক মুহূর্ত ঘন ঘন শ্বাস ফেলার শব্দ কানে এল রবিনের। কানের কাছে ফিসফিস করে উঠল একটা কণ্ঠ, 'চুপ! আমি পাপালো!'

পাপালো! ও কি করে এল এখানে! অবাক হয়ে গেল দুই গোয়েন্দা। ওর তো এখন জেলে থাকার কথা!

কিছু একটা বলতে চেষ্টা করল রবিন, গোঙানীর শব্দ হল।

'চুপ!' আবার বলল পাপালো। 'কোন কথা নয়!'

ছুরি দিয়ে বাঁধন কাটতে লাগল পাপালো। মাত্র কয়েক সেকেণ্ড, কিন্তু রবিনের মনে হল কয়েক যুগ পেরিয়ে যাচ্ছে।

কাটা হয়ে গেল বাঁধন। মাথা তুলতে গেল মুসা। হাত দিয়ে চেপে নামিয়ে দিল পাপালো। ফিসফিস করে বলল, 'খবরদার, দেখে ফেলবে! পেছনের দিকে এগোও। পানিতে নামতে হবে।'

হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গেল মুসা। তার পেছনে রবিন। সবার পেছনে

পাপালো।

'নেমে পড়!' বলল পাপালো। 'খুব সাবধান! কোন শব্দ যেন না হয়! হালের দণ্ডটা ধরে থাকবে। আমি আসছি।'

হাজারো প্রশ্ন উঁকি দিচ্ছে মনে, পরে জিজ্ঞেস করবে পাপালোকে। আস্তে করে নেমে এল রবিন। শব্দ হল অতি সামান্য, ঢেউয়ের ছলছলাৎ ঢেকে দিল সে শব্দ।

রবিনের পর পরই নামল মুসা। চলে এল পেছনে। রবিন ধরে রেখেছে হালের দণ্ড। সে-ও এসে ধরল।

'খাইছে!' রবিনের কাছে মুখ এনে বলল মুসা। 'ও এল কি করে!'

'জানি না! তবে এসে পড়ায় বেঁচে গেলাম বোধহয়!' ফিস ফিস করে বলল রবিন।

বান মাছের মত পিছলে পানিতে নামল পাপালো। নিঃশব্দে। দুই গোয়েন্দার কাছে চলে এল। 'এসো আমার সঙ্গে। খুব সাবধানে সাঁতরাবে! কোন আওয়াজ যেন না হয়!'

তীরের ধার ধরে সাঁতরে চলল পাপালো, নিঃশব্দে। তাকে অনুসরণ করল দুই গোয়েন্দা। রবিন ভাবছে, জ্যাকেট আর প্যান্ট খুলে নিতে পারলে ভাল হত!

কালো পানি। আবছা কালো তিনটে মাথা, ভাল করে খেয়াল না করলে দেখাই যায় না। কোনরকম শব্দও করল না ওরা। মিনিট দশেক পরে একটা জায়গায় এসে পৌঁছুল। সাগরের দিকে সামান্য ঠেলে বেরিয়ে আছে এখানে সৈকত। ওটা ঘুরে আরেক পাশে চলে এল। বোটটা আর দেখা যাচ্ছে না। জিম রিভানের দৃষ্টির বাইরে চলে এসেছে ওরা।

তীরের দিকে ফিরে সাঁতরাতে শুরু করল পাপালো। অনুসরণ করল দুই গোয়েন্দা।

বালিতে ঢাকা সৈকত নেই এখানে। পানির ওপর নেমে এসেছে ঝোপ ঝাড় আর ছোট ছোট গাছ। একটা শেকড় ধরে উঠে গেল পাপালো। এগিয়ে গিয়ে থামল দুটো বড় পাথরের মাঝে। মুখ বের করে উঁকি দিল। তার পাশে এসে বসেছে দুই গোয়েন্দা। ওরাও উঁকি দিল।

প্রায় তিনশো ফুট দূরে মোটর বোটটা। তারার আলোয় আবছা। জিম রিভানের মুর্তিটা আরও কাছে।

'এবার কথা বলতে পারি,' নিচু গলায় বলল পাপালো। 'আমাদেরকে দেখতে পাবে না ওরা।'

'এখানে এলে কি করে?' একই সঙ্গে প্রশ্ন করল দুই গোয়েন্দা।

মুখ টিপে হাসল পাপালো। 'তোমাদের সঙ্গে কথা বলে শিওর হয়ে এসেছেন হোভারসন, আমি চোর নই। কাজ শেষ করে ফিরে এসেছেন তখন জজ সাহেব। নিজের পকেট থেকে জামিনের পঞ্চাশ ডলার দিয়ে দিয়েছেন চীফ। জামিন হয়েছে হাক স্টিভেন। হাজত থেকে বাড়ি নিয়ে গেলেন আমাকে হোভারসন। খাওয়ালেন।

তারপর ছাড়লেন।'

'কিন্তু এখানে এলে কি করে? কি করে জানলে আমরা এখানে এসেছি?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'সোজা বাসায় চলে গেলাম,' বলল পাপালো। 'বাবাকে যতটা খারাপ অবস্থায় দেখব ভেবেছিলাম, তত খারাপ নয়। পরশী এক মহিলা দেখাশোনা করেছেন। বেরিয়ে এলাম বাইরে। সাগরের দিকে চেয়ে বসে ভাবতে লাগলাম। ছুরিটা ট্রেলারে গেল কি করে? আমাকে চোর বানানর জন্যে কেউ একজন ফেলে রেখেছিল ওখানে ছুরিটা, কে? ছুরিটা হারিয়েছি পরশু, যেদিন গুহায় ঢুকেছিলাম। জিম রিভান তাড়া করল, পালালাম। তার পর থেকেই আর পাইনি ছুরিটা। তারমানে তাড়াহুড়োয় খেয়াল করিনি, ওটা রেখেই পালিয়েছিলাম। এরপর একটা মাত্র লোকের হাতেই পড়তে পারে জিনিসটা, জিম রিভান। তার পক্ষেই ট্রেলারে ঢোকা সহজ, অবশ্যই দরজা দিয়ে। লেন্স চুরি করা সহজ। ট্রেলারের জানালা ওই ভেঙেছে, ছুরিটা ফেলে রেখেছে মেঝেতে। ব্যাটার ওপর চোখ রাখা দরকার মনে করলাম। ঘাটে বাঁধা একটা নৌকা চুরি করে নিয়ে চলে এলাম দ্বীপে।' থামল সে। তারপর বলল, 'নৌকাটা একটা ঝোপের ধারে বেঁধে রেখে চলে গেলাম ক্যাম্পের কাছে। পার্কের দিকে এগোতে দেখলাম জিমকে। পিছু নিলাম। পার্কের পরে ছোট একটা জংলা পেরিয়ে সৈকতে বেরোল সে। দূরে একটা মোটর বোট দেখলাম। হাতের টর্চ সেদিকে করে তিনবার জ্বালাল-নেভাল জিম। তীরে এসে ভিড়ল বোট। তাজ্জব হয়ে দেখলাম, নামল দুই ভাই, ডিক আর বাড ফিশার।'

মুসার দিকে ফিরল পাপালো। হাসল। 'দাঁড় খুব ভাল টানতে পার না তুমি, মুসা। ছপাৎ ছপাৎ শব্দ হচ্ছিল। লুকিয়ে পড়ল তিনজনে। তোমাদের তীরে ওঠার অপেক্ষায় রইল। তারপর আর কি? বোকার মত ধরা পড়লে...'

'সত্যি, তুমি না এলে প্রাণেই মারা পড়তাম আজ।' পাপালোর কাঁধে হাত রাখল রবিন।

'শ্ শ্ শ্!' ঠোঁটে আঙুল রাখল পাপালো। 'ফিশার ব্যাটারা আসছে!'

দুটো মূর্তি এগিয়ে এসে দাঁড়াল জিমের কাছে। দু'জনের হাতে দুটো বড় প্যাকেট, দশ লক্ষ ডলার।

'সব ঠিক আছে?' স্পষ্ট ভেসে এল ডিকের গলা। 'কোন গোলমাল নেই তো?'

'না, গোলমাল নেই,' জবাব দিল জিম। 'শোন, আমার ভাগের টাকাটা দিয়ে দাও।'

'পরে,' বলল বাড ফিশার 'বোটে উঠে দেব। ডিক, জলদি কর। চল উঠে পড়ি।'

পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে জিম। ধাক্কা দিয়ে তাকে সরিয়ে দিল বাড। এগিয়ে গেল বোটের দিকে।

বোটে উঠে পড়ল দুই ভাই।

'আরে!' চেঁচিয়ে উঠল বাড। 'বিচ্ছু দুটো কোথায়! জিম, তুমি ছেড়ে দিয়েছ ওদেরকে!'

'আমি ছাড়িনি!' রেগে গিয়ে বলল জিম। 'যাবে কোথায়? আছে, দেখ!'

'নেই!' কর্কশ গলা বাডের।

'কই, দেখি,' বলতে বলতে এগিয়ে এল জিম। আলো ফেলল বোটে। 'আরে, সত্যিই নেই দেখছি! গেল কোথায়! এক চুল নড়িনি আমি জায়গা ছেড়ে!'

'দেখি, প্যাকেটটা দাও,' হাত বাড়াল ডিক। 'জলদি নেমে গিয়ে ধাক্কা দাও। এখুনি পালাতে হবে।'

'কিন্তু আমার ভাগ?' বলল জিম। 'দুটো বছর অপেক্ষা করছি। পুরো দশ লাখ পেলেও আমার হাতের দাম হবে না। সেটা না হয় না-ই বললাম। তোমরা তো পালাবে, আমি যাব কোথায়? ছেলে দুটো পালিয়েছে। গিয়ে বলে দেবে সব। জেলে যাব তো!'

'সেটা তোমার ব্যাপার,' হাত নেড়ে বলল ডিক। 'বাড, ধাক্কা দাও।' স্টার্টারে চাপ দিল সে।

ধাক্কা দিতে গিয়েও থেমে গেল বাড। গায়ের ওপর ঘেঁষে এসেছে জিম। 'খবরদার! প্যাকেট দুটো দিতে বল ডিককে। নইলে···'

'বাড!' শোনা গেল ডিকের আতঙ্কিত চিৎকার। 'বাড, স্টার্ট নিচ্ছে না! জিম, ইঞ্জিনের কি করেছ?'

'আমি কিচ্ছু করিনি,' জবাব দিল গার্ড।

'ইঞ্জিন তো স্টার্ট নিচ্ছে না, এখন কি করব?'

'সেটা তোমাদের ব্যাপার। প্যাকেট দুটো দাও, জলদি!'

আবার চেষ্টা করল ডিক, আবার, কিন্তু স্টার্ট হল না ইঞ্জিন।

অবাক হয়ে দেখল দুই গোয়েন্দা, নীরব হাসিতে ফেটে পড়ছে পাপালো।

'কি হল!' ফিসফিস করে বলল রবিন।

'স্পার্কিং প্লাগের তার ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছি,' বলল পাপালো। 'হারামজাদারা! এবার যাও, পালাও! ওই হারামীর বাচ্চা ডিকই আমার নৌকা ভেঙেছে। ওই বোট দিয়েই। এইবার পেয়েছি কায়দায়। চল, ক্যাম্পে গিয়ে লোক ডেকে আনি।'

উঠতে যাবে, এই সময় কানে এল ইঞ্জিনের শব্দ। বসে পড়ল আবার পাপালো, দ্বীপের দিকেই এগিয়ে আসছে একটা বড় মোটর লঞ্চ।

কাছে এসে গেল লঞ্চ। আলো জ্বলে উঠল, সার্চ লাইট। সোজা এসে পড়ল ফিশারদের বোটের ওপর।

এক লাফে বোট থেকে নেমে এল ডিক। ছুটল। হকচকিয়ে গেল জিম। এই সুযোগে থাবা মেরে তার হাতের রিভলভার ফেলে দিল বাড। ভাইয়ের পেছনে ছুটল সে-ও।

'আরে!' বলে উঠল পাপালো। 'ব্যাটারা এদিকেই আসছে। দাঁড়াও, দেখাচ্ছি

মজা!' দ্রুত হামাগুড়ি দিয়ে সামনে এগোল সে।

কাছে এসে গেল ডিক। আর দু'কদম ফেললেই ঝোপ পেরিয়ে যাবে। ঠিক তার পেছনেই রয়েছে বাড।

দাঁড়িয়ে উঠে হঠাৎ সামনে পা বাড়িয়ে দিল পাপালো। হোঁচট খেল ডিক। হুমড়ি খেয়ে পড়ল মাটিতে। ভাইয়ের গায়ে হোঁচট খেল বাড। পড়ে গেল সে-ও।

ডিকের ওপর গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল পাপালো। একনাগাড়ে কিল ঘুষি মারতে লাগল। চেঁচাতে লাগল, 'হারামজাদা! আমাকে হাজতে পাঠিয়েছিলি! ডাকাতের বাচ্চা ডাকাত! চোর বানিয়েছিলি আমাকে...'

উঠে দাঁড়াল বাড। পাপালোর চুল ধরে হ্যাঁচকা টানে সরিয়ে আনল ভাইয়ের ওপর থেকে। চিত করে শুইয়ে ফেলল। পাথরে জোরে ঠুকে দিল মাথা। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পা তুলল পাপালো বুক সই করে।

মাথা নুইয়ে খ্যাপা ষাঁড়ের মত ছুটে গেল মুসা। নিগ্রোর খুলি কতখানি শক্ত, তলপেট অনুভব করল বাড। হুঁক্‌ক্‌ করে একটা শব্দ বেরোল মুখ থেকে। চিত হয়ে পড়ে গেল। তার ওপর পড়ল মুসা।

চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে উঠতে গেল ডিক, পারল না। পিঠের ওপর লাফিয়ে এসে বসেছে রবিন। আবার হাত-পা ছড়িয়ে উপুড় হয়ে পড়ে গেল সে।

ঝাড়া দিয়ে গায়ের ওপর থেকে মুসাকে ফেলে দিল বাড। উঠে দাঁড়াল হাঁচড়ে-পাঁচড়ে। এই সময় এসে পড়ল জিম। জ্যাকেটের কলার চেপে ধরে সোজা করল বাডকে। ঠেলে নিয়ে চলল সামনের দিকে। ষাঁড়ের জোর তার গায়ে। ওর এক হাতের সঙ্গেই পেরে উঠল না বাড।

ঠেলে বাডকে পানির ধারে নিয়ে চলল জিম। 'আমার সঙ্গে চালাকি! দেখাচ্ছি মজা!'

বাডকে নিয়ে পানিতে পড়ল জিম। কোমর পানি। উঠে দাঁড়াল আবার। মাথা তুলল বাড। জ্যাকেটের কলার এখনও জিমের হাতে।

বাডকে ঠিকমত দম নিতে দিল না জিম। চুবাতে লাগল একনাগাড়ে। রাগে পাগল হয়ে উঠেছে সে। হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে।

রবিনকে গায়ের ওপর থেকে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াতে গেল ডিক। এবারেও পারল না। প্রায় এক সঙ্গে এসে হাজির হয়েছে মুসা আর পাপালো। দু'হাতে ডিকের দু'পা ধরে উঁচু করে ফেলল মুসা। টান দিল। হাত বাড়িয়ে একটা ছোট গাছের গোড়া ধরে ফেলল ডিক। লাথি মেরে হাতটা সরিয়ে দিল পাপালো। 'এ-হারামজাদাকেও পানিতে ফেল!'

তিন কিশোরের সঙ্গে পেরে উঠলো না ডিক। হিড়হিড় করে টেনে তাকে পানির ধারে নিয়ে এল ওরা।

বাডকে ছাড়ছে না জিম। চোবাচ্ছে এখনও। মেরেই ফেলবে যেন। তার পাশেই ডিককে নিয়ে এসে পড়ল তিন কিশোর।

বাডকে ছেড়ে দিয়েই ডিকের ঘাড় চেপে ধরল জিম। তাকে চুবাতে শুরু করল।

'হয়েছে! ছাড়!' শোনা গেল একটা গম্ভীর আদেশ। 'মেরে ফেলবে তো!'

চমকে ফিরে চাইল তিন কিশোর। তাদের পেছনে কয়েক হাত দূরে এসে গেছে দুটো নৌকা। একটা নৌকায় দাঁড়িয়ে আছেন পুলিশ চীফ হোভারসন। এক হাতে রিভলভার, আরেক হাতে টর্চ।

'ছাড়!' আবার আদেশ দিলেন হোভারসন। 'এই জিম শুনতে পাচ্ছ।'

ডিককে ছেড়ে দিল জিম। সরে যাবার তাল করছিল বাড, তাকে চেপে ধরল। দিল আরেক চুবানি।

'হয়েছে হয়েছে! মেরে ফেলবে, ছেড়ে দাও!' বললেন পুলিশ চীফ।

দুই ডাকাত আর জিমকে টেনে ডাঙায় তুলল কয়েকজন পুলিশ। হাতকড়া পরিয়ে দিল।

ধপাস করে মাটিতে বসে পড়ল দুই ফিশার। প্রচুর মার খেয়েছে। দাঁড়িয়ে থাকার শক্তি নেই।

তিন কিশোরের ওপর আলো ফেললেন হোভারসন। 'একটা কাজের কাজ করেছ তোমরা। পাপু, তুমি এখানে এলে কি করে?'

'প্রশংসা সব ওরই পাওয়া উচিত, চীফ,' পাপালো কিছু বলার আগেই বলে উঠল রবিন। 'ও না এলে আমাকে আর মুসাকে মেরে পানিতে ফেলে দিত ডাকাতগুলো। কিন্তু আপনি এলেন কেন? আজ রাতেই ব্যাটারা টাকা নিতে আসবে জানতেন?'

'না,' মাথা নাড়লেন হোভারসন। 'ব্যাটারা স্কেলিটন আইল্যাণ্ডে টাকা লুকিয়ে রেখেছে, কল্পনাই করিনি কখনও! কিশোর, তোমাদের বন্ধু কিশোর পাশা···মিনিট চল্লিশেক আগে ঝড়ের বেগে এসে ঢুকল থানায়। অদ্ভুত এক গল্প শোনাল। বলল, ফিশার ব্যাটাদের বমাল ধরতে হলে এখুনি যান। এমনভাবে বলল, ওর কথা বিশ্বাস না করে পারলাম না। তাড়াতাড়ি লঞ্চ নিয়ে ছুটে এলাম।'

'কিশোর কোথায়?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'লঞ্চে,' বললেন চীফ। 'জোর করে রেখে এসেছি। গোলাগুলি চলতে পারে, তাই আনিনি।'

উনিশ

বিশাল টেবিলে পড়ে থাকা মোহরের ছোট স্তূপের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে আছেন মিস্টার ডেভিস ক্রিস্টোফার।

'গুপ্তধন তাহলে পেলে!' অবশেষে বললেন পরিচালক। 'সব পাওনি, ঠিক, তবে কিছু তো পেয়েছ!'

'মোট পঁয়তাল্লিশটা,' বলল কিশোর। 'এখানে আছে তিরিশটা, মুসা আর

রবিনের ভাগের। ক্যাপ্টেন ওয়ান-ইয়ারের ধনরাশির তুলনায় কিছুই না।'

'তবু তো ধন, সোনার ডাবলুন,' বললেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। 'এখন বল, কেন মনে হল, লুটের টাকা স্কেলিটন আইল্যাণ্ডে লুকানো আছে?'

'সন্দেহটা ঢোকাল স্কেলিটন আইল্যাণ্ডের ভূত,' বলল কিশোর। 'ওসব কুসংস্কারে বিশ্বাস করি না। শুনেই বুঝলাম, দ্বীপে ভূত দেখা যাওয়ার পেছনে মানুষের কারসাজী রয়েছে। কেউ একজন চায় না, ওই দ্বীপে মানুষ যাতায়াত করুক। তখনই প্রশ্ন জাগল মনে, কেন? মূল্যবান কিছু রয়েছে? ক্যাপ্টেন ওয়ান-ইয়ানের গুপ্তধন? ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি। এই সময় দ্য হ্যাণ্ডের নিচের গুহা আবিষ্কার করে বসল পাপালো। মোহর পেল ওখানে। বুঝে গেলাম, স্কেলিটন আইল্যাণ্ডে ওয়ান-ইয়ানের গুপ্তধন নেই। তাহলে? একসঙ্গে তিনটে কথা এল মনে। প্রায় বিশ বছর পরে হঠাৎ দেখা যেতে শুরু করেছে স্যালি ফ্যারিংটনের ভূত, বছর দুই আগে থেকে। ঠিক দুই বছর আগে লুট হয়েছে দশ লক্ষ ডলার। স্কেলিটন আইল্যাণ্ডের পাশে উপসাগরে ধরা পড়েছে দুই ভাই, ডিক আর বাড ফিশার। ক্যাপ্টেন ওয়ান-ইয়ারের ধরা পড়ার সঙ্গে কোথায় যেন মিল রয়েছে। একটু ভাবতেই বুঝে ফেললাম ব্যাপারটা। ক্যাপ্টেন ওয়ান-ইয়ার মোহর সাগরে ফেলে দেয়নি, লুকিয়ে ফেলেছিল হ্যাণ্ডের গুহায়। ফিশাররাও টাকা পানিতে ফেলে দেয়নি, লুকিয়ে ফেলেছে স্কেলিটন আইল্যাণ্ডের গুহায়। ব্রিটিশ জাহাজের ক্যাপ্টেনকে ফাঁকি দিয়েছিল ওয়ান-ইয়ার, একই কায়দায় পুলিশকে ফাঁকি দিয়েছে ফিশাররা।'

'চমৎকার!' বললেন পরিচালক। 'আরেকটা প্রশ্ন। ডিক আর বাড তো জেলে, ভূত সাজল কে?'

'হান্ট গিল্ডার, এটা আমার অনুমান,' বলল কিশোর, 'জেলে দুই ফিশারের সঙ্গে দেখা করত সে। কোনভাবে ওকে নিয়মিত টাকা দেবার বন্দোবস্ত করেছিল দুই ভাই। বিনিময়ে মাঝে মাঝেই দ্বীপে গিয়ে ভূত সেজে জেলেদেরকে দেখা দিত হান্ট। আসল কারণটা নিশ্চয় জানত না, তাহলে টাকাগুলো খুঁজে বের করে নিয়ে চলে যেত।'

'যেমন যেত গার্ড জিম রিভান,' বললেন মিস্টার ক্রিস্টোফার।

'হ্যাঁ,' মাথা ঝোঁকাল কিশোর। 'জিম জানত না, দ্বীপেই লুকানো আছে টাকাগুলো। শুধু এটুকু জানত, কোথাও লুকিয়ে রেখেছে দুই ভাই। জেল থেকে বেরিয়ে এসে বের করবে। তার ভাগ তাকে দিয়ে দেবে।'

'যখন জানল, তার নাকের ডগায়ই রয়েছে টাকাগুলো,' হেসে বলল রবিন, 'কি আফসোসই না করল!'

'হ্যাঁ,' কিশোরের গলায় ক্ষোভ। 'নিশ্চয় দেখার মত হয়েছিল তার মুখের ভাব! সর্দির জন্যে তো যেতে পারলাম না...'

'সিনেমা কোম্পানির জিনিসপত্র চুরি করল কে?' জিজ্ঞেস করলেন পরিচালক। 'জিম আসার আগেই তো শুরু হয়েছিল চুরি!'

'নিশ্চয় হান্ট,' বলল কিশোর। 'চোর হিসেবে বদনাম আছে ওর এমনিতেই।

চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়লে, ব্যাপারটাকে সাধারণ চুরি হিসেবেই নিত পুলিশ অন্য কিছু সন্দেহ করত না।'

'কাজটা অন্যকে দিয়ে করানর কি দরকার?' বললেন পরিচালক। 'জেল থেকে তো বেরিয়েছে তখন দু'ভাই। ওরা করলেই পারত? আর এত সব ঝামেলার মধ্যে গেল কেন? চুপচাপ এক রাতে গিয়ে টাকাগুলো বের করে নিয়ে চলে আসতে পারত।'

'পারত না,' বলল কিশোর। 'আমার ধারণা, হান্ট টাকার গন্ধ পেয়ে গিয়েছিল। দু'বছর ভূত সেজেছে সে। অনেক টাকা পেয়েছে দুই ভাইয়ের কাছ থেকে। এত টাকা খামোকা ব্যয় করেনি ডিক আর বাড, এটা বুঝবে না, অত বোকা নয় সে। দুই ফিশারের ভয় ছিল, টাকা আনতে গেলে পিছু নেবেই হান্ট, দেখে ফেলবে। তখন তাকে একটা ভাগ দিতে হবে। হান্টের ব্ল্যাকমেলের শিকার হবারও ভয় ছিল ওদের। তাই তো কৌশলে সরাল ওকে।'

'কি কৌশল?' জানতে চাইলেন পরিচালক।

'আমরা যাব, কথাটা ছড়িয়ে পড়ল শহরে। জেনে গেল ডিক আর বাড। বুঝল, হান্টকে সরানর এই সুযোগ। আমাদেরকে কিডন্যাপ করে দ্য হ্যাণ্ডে রেখে আসতে ওকে পাঠাল ওরা। নিশ্চয় অনেক টাকা পেয়েছে, বোকার মত কাজটা করে বসল হান্ট। ফিরে এসে সব কথা জানালাম আমরা পুলিশকে। পিছু লাগল পুলিশ। শহর ছেড়ে পালাতে বাধ্য হল হান্ট।' থামল কিশোর। তারপর আবার বলে চলল, 'হান্ট চলে গেল। সিনেমা কোম্পানি থেকেই গেল দ্বীপে। চুরি বন্ধ করা চলবে না। জিমকে ধরল দুই ভাই। সুন্দর সুযোগ। কোম্পানি একজন গার্ড চায়। জিম হলে খুব ভাল হবে। নিজেই চাকরির দরখাস্ত নিয়ে গেল জিম। হয়ে গেল চাকরি। ঘরের ইঁদুর বেড়া কাটতে লাগল। দ্বীপটার আশেপাশে খুব বেশি ঘোরাফেরা করে পাপালো। গুপ্তধন খুঁজে বেড়ায়। যদি কখনও গুহায় ঢুকে টাকার বাণ্ডিল দেখে ফেলে, এই ভয়ে তার ওদিকে যাওয়া বন্ধ করতে চাইল দুই ফিশার গুজব রটিয়ে দিল, পাপালো চোর। সিনেমা কোম্পানির জিনিসপত্র সে-ই চুরি করে। তাকে দেখলেই লাঠি নিয়ে তাড়া করে জিম। এই সময় আমরা গিয়ে হাজির হলাম। জোর পেল পাপালো। শুধু গুজব রটিয়ে ওকে আর ঠেকানো যাবে না, বুঝতে পারল দুই ভাই। সময় মত জিম পেয়ে গেল পাপালোর ছুরিটা। জানাল দুই ডাকাতকে। সুযোগটা লুফে নিল ওরা। লেন্স চুরি করাল জিমকে দিয়ে, ট্রেলারের জানালা ভাঙল, মেঝেতে ছুরিটা ফেলে রাখা হল, লেন্সগুলো নিয়ে গিয়ে পাপালোর বিছানার নিচে রেখে দিয়ে এল ডিক কিংবা বাড। পরের দিন আরেকটা সুযোগ পেয়ে গেল ডিক। দ্য হ্যাণ্ডের দিকে গিয়েছে পাপালো, জানল কোনভাবে। পিছু নিল। ভেঙে দিয়ে এল নৌকাটা। ব্যস, একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে গেল। কোন কারণে যদি পাপালোকে ছেড়েও দেয় পুলিশ, ও আর গুপ্তধন খুঁজতে যেতে পারবে না। কিন্তু বড় একরোখা পাপালো হারকুস, ওকে শেষ অবধি ঠেকাতে পারল না দুই

ফিশার। ওরই জন্যে ধরা পড়েছে ওরা, প্রাণে বেঁচেছে মুসা আর রবিন।'

'হুঁ!' আস্তে মাথা ঝাঁকালেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। 'আচ্ছা, কিছু করে এসেছ ওর জন্যে? সাহায্যের কথা বলছি।'

'আমাদের কিছু করতে হয়নি,' কথা বলল মুসা। 'নিজের ব্যবস্থা নিজেই করে নিয়েছে পাপু।'

'কি?'

'গুপ্তধন শিকারের ওপর যে ছবিটা করা হয়েছে, তাতে মূল ভূমিকা তার দেখানো হয়েছে। দ্য হ্যাণ্ডের গুহা থেকে ডুবে ডুবে মোহর তুলে আনছে সে, এই দৃশ্যের ছবিও তোলা হয়েছে। মিস্টার জন নেবারের সঙ্গে আলোচনা করে বেশ মোটা অংকের পারিশ্রমিক দিয়েছে তাকে বাবা। ট্রেজার-হান্টার ছবিতে অভিনয়ের জন্যে।'

'খুব ভাল, খুব ভাল,' খুশি হলেন পরিচালক। 'আর কিছু?'

'পরিবহন কোম্পানির দশ লাখ ডলার ফিরে পাওয়ার ব্যাপারে পাপালোর কৃতিত্বই বেশি,' বলল কিশোর। 'তাকে একটা পুরস্কার দিয়েছে কোম্পানি। পঁচিশ হাজার ডলার।'

'বাহ্, বেশ বড় পুরস্কার তো!' বললেন পরিচালক।

বাবাকে নিয়ে দেশে ফিরে যাবে পাপালো,' বলল কিশোর। 'ভালভাবে চিকিৎসা করাবে। একটা বোট কিনে মাছের ব্যবসা শুরু করবে। আশা পূরণ হয়েছে তার।'

'হুম্‌ম্‌,' মাথা ঝোঁকালেন পরিচালক। 'তোমাদের এই অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী নিয়ে খুব ভাল একটা ছবি হবে। ভাবছি, পুরোটাই শূটিং করব স্কেলিটন আইল্যাণ্ড আর আশপাশের দ্বীপগুলোতে। যেখানে যা যা যেভাবে ঘটেছে, ঠিক তেমনি ভাবে। পাপালোর চরিত্রটা তাকে দিয়েই অভিনয় করালে কেমন হয়?'

'খুব ভাল হয়!' একই সঙ্গে বলে উঠল তিন গোয়েন্দা।

ঘড়ি দেখলেন পরিচালক। 'ঠিক আছে। নতুন কোন রহস্যের খোঁজ পেলে জানাব।'

ইঙ্গিতটা বুঝল তিন কিশোর। উঠে দাঁড়াল। মোহরগুলো টেনে নিল মুসা। বেছে বেছে একটা ভাল মোহর—যেটা কম ক্ষয় হয়েছে, তুলে নিয়ে বাড়িয়ে ধরল। 'এটা আপনাকে দিলাম, স্যার। আপনার সংগ্রহে রেখে দেবেন।

'থ্যাংক ইউ, মাই বয়,' মোহরটা নিতে নিতে বললেন পরিচালক।

ঘর থেকে বেরিয়ে গেল তিন গোয়েন্দা।

হাতের তালুতে নিয়ে মোহরটার দিকে চেয়ে রইলেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। বিড়বিড় করলেন, 'সত্যিকারের জলদস্যুর গুপ্তধন!' হাসলেন আপন মনেই। 'দারুণ ছেলেগুলো! কী সুন্দর সুন্দর কাহিনীর জন্ম দিচ্ছে! ভাবছি, এরপর কি অ্যাসাইনমেন্ট দেয়া যায় তিন গোয়েন্দাকে!'

-০-

রূপালী মাকড়সা

প্রথম প্রকাশঃ নভেম্বর, ১৯৮৫

'আরে, আরে! হ্যানসন!' চেঁচিয়ে উঠল রবিন মিলফোর্ড।

'আরে লাগল...লেগে গেল তো...!' প্রায় একই সঙ্গে বলে উঠল মুসা আমান।

বনবন স্টিয়ারিং ঘোরাল হ্যানসন, ব্রেক কষল ঘ্যাঁচ করে। পেছনের সিটে উল্টে পড়ল তিন গোয়েন্দা। টায়ারের কর্কশ আওয়াজ তুলে চকচকে একটা লিমোসিনের কয়েক ইঞ্চি দূরে দাঁড়িয়ে পড়ল বিশাল রোলস রয়েস।

চোখের পলকে লিমোসিন থেকে বেরিয়ে এল কয়েকজন লোক। ড্রাইভিং সিট থেকে সবে নামছে হ্যানসন। তাকে এসে ঘিরে ফেলল। আঙুল তুলে শাসানর ভঙ্গি করছে, উত্তেজিত। কথা বলছে অদ্ভুত ভাষায়।

লোকগুলোকে পাশ কাটিয়ে গেল হ্যানসন। গাড়িতেই বসে আছে লিমোসিনের শোফার। লাল পোশাক, কাঁধ আর হাতার কাছে সোনালি কাজ করা।

'এই যে মিস্টার,' বলল হ্যানসন, 'এটা কি করলে? দিয়েছিলে তো মেরে!'

'আমি ঠিকই চালাচ্ছিলাম!' উদ্ধত কণ্ঠ লোকটার। 'দোষ তোমার! সামনে পড়লে কেন? প্রিন্স দিমিত্রির গাড়ি দেখেছ, সরে যেতে পারনি?'

ইতিমধ্যে সামলে নিয়েছে তিন গোয়েন্দা। অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে লোকগুলোর দিকে। উত্তেজিত হয়ে প্রায় আস্ফালন শুরু করেছে হ্যানসনকে ঘিরে। ওদের মাঝে সবচেয়ে লম্বা লোকটা ইংরেজিতে বলে উঠল, 'বুদ্ধু কোথাকার! দিয়েছিলে তো প্রিন্সকে শেষ করে! সর্বনাশ করে দিয়েছিলে আরেকটু হলেই! তোমার শাস্তি হওয়া দরকার!'

'আমি ঠিকই মেনেছি, আপনাদের ড্রাইভারই ট্রাফিক আইন মানেনি,' দৃঢ় গলায় বলল হ্যানসন। 'পুরোপুরি ওর দোষ।'

'কি প্রিন্স প্রিন্স করছে ওরা!' ববের কানের কাছে বিড়বিড় করল মুসা। দু'জনেই হুমড়ি খেয়ে পড়েছে এক জানালার ওপর।

'খবরের কাগজ পড় নাকি?' নিচু গলায় বলে উঠল রবিন। 'ইউরোপের ভ্যারানিয়া থেকে এসেছে। পৃথিবীর সব চেয়ে ছোট সাতটা দেশের একটা। আমেরিকা দেখতে এসেছে।'

'খাইছে!' কিশোরের মুখে শোনা বাঙালী বুলি ঝাড়ল মুসা। 'আরেকটু হলেই

তো গেছিল।'

'দোষটা হ্যানসনের নয়!' এই প্রথম কথা বলল কিশোর পাশা। 'চল নামি। সত্যিই কার দোষ, ওদেরকে বুঝিয়ে দেয়া দরকার।'

তাড়াহুড়া করে নেমে এল তিন গোয়েন্দা। তাদের পর পরই লিমোসিনের পেছনের সিট থেকে নেমে এল আরেক কিশোর। রবিনের চেয়ে সামান্য লম্বা। কুচকুচে কালো চুল, লম্বা করে ইউরোপিয়ান ছাঁদে কাটা। বছর দুয়েকের বড় হবে চেহারায় আভিজাত্যের ছাপ।

'থাম তোমরা!' নিজের লোকদের ধমক লাগাল সে। সঙ্গে সঙ্গেই চুপ হয়ে গেল লোকগুলো। হাত নাড়তেই ঝটপট পেছনে সরে গেল ওরা। হ্যানসনের কাছে এগিয়ে এল ছেলেটা। 'ওদের হয়ে আমি ক্ষমা চাইছি,' চমৎকার শুদ্ধ ইংরেজি। 'আমার শোফারেরই দোষ।'

'কিন্তু, ইয়োর হাইনেস···' বলতে গিয়েও বাধা পেয়ে থেমে গেল লম্বা লোকটা। হাত নেড়ে থামিয়ে দিয়েছে তাকে প্রিন্স দিমিত্রি। ফিরে চাইল তিন গোয়েন্দার দিকে।

'কাজটা খুব খারাপ হয়ে গেছে,' বলল প্রিন্স। 'দুঃখিত। তোমাদের ড্রাইভার খুব ভাল, তাই রক্ষে। নইলে মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটে যেত!···বাহ্, গাড়িটা তো খুব সুন্দর!' রোলস রয়েসটা দেখিয়ে বলল। কিশোরের দিকে তাকাল। 'মালিক কে? তুমি?'

'ঠিক মালিক নই,' বলল কিশোর। 'তবে মাঝেমধ্যে মালিকের মতই ব্যবহার করি।' রোলস রয়েস কি করে পেয়েছে ওরা, কতদিনের জন্য, সব কিছু ব্যাখ্যা করে বলার সময় এটা নয়।

কঙ্কাল দ্বীপ অভিযানের রিপোর্ট দিতে গিয়েছিল তিন গোয়েন্দা মিস্টার ডেভিস ক্রিস্টোফারের অফিসে। ওখান থেকে ফেরার পথেই এই অঘটন।

'আমি দিমিত্রি দামিয়ানি, ভ্যারানিয়া থেকে এসেছি,' নিজের পরিচয় দিল রাজকুমার। 'এখনও প্রিন্স পদবী পাইনি। তবে আগামী মাসেই অভিষেক অনুষ্ঠান হবে। আমার লোকেরা জানে, আগে হোক পরে হোক, প্রিন্স আমিই হব, তাই ছোটবেলা থেকেই ওই নামে ডাকে। তোমরা কি পুরোদস্তুর আমেরিকান?'

'পুরোদস্তুর' বলে কি বোঝাতে চাইছে দিমিত্রি, বুঝতে পারল না রবিন আর মুসা। চুপ করে রইল।

জবাব দিল কিশোর। 'ওরা দু'জন আমেরিকান,' দুই বন্ধুকে দেখিয়ে বলল সে। 'এখন আমিও তাই। বাবা এখানকার ন্যাশন্যালিটি পেয়ে গিয়েছিল। তবে, আসলে আমি বাঙালী, বাংলাদেশী।'

পরস্পরের দিকে চেয়ে হাসল রবিন আর মুসা। জীবনে কখনও চোখেও দেখেনি, তবু বাংলাদেশকে কতখানি ভালবাসে কিশোর পাশা, জানা আছে

তাদের। তাই তার কথায় আহত হল না। আর তাছাড়া তেমন আহত হবার কোন কারণও নেই। ওরাও পুরোপুরি আমেরিকান নয়। একজনের রক্তে রয়েছে আইরিশ রক্তের মিশ্রণ, আরেকজনের দাদার বাবা ছিল খাঁটি আফ্রিকান।

পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে বাড়িয়ে ধরল কিশোর। 'আমাদের পরিচয়।'

কার্ডটা নিল দিমিত্রি!

'তিন গোয়েন্দা'
???
প্রধানঃ কিশোর পাশা
সহকারীঃ মুসা আমান
নথি, গবেষকঃ রবিন মিলফোর্ড

অপেক্ষা করে রইল তিন গোয়েন্দা। কার্ড দেখে নতুন সবাই যা করে, তাই হয়ত করবে দিমিত্রি। প্রথমেই প্রশ্ন করবে, প্রশ্নবোধকগুলোর মানে কি।

'ব্রোজাস!' বলে উঠল দিমিত্রি। হাসল। সুন্দর করে হাসে রাজকুমার। ঝকঝকে সাদা দাঁত, মুসার মত। তবে মাড়ি বাদামী নয়, টুকটুকে লাল, ঠোঁটও তাই। 'ও, শব্দটার মানে বোঝনি? ভ্যারানিয়ান ভাষায় এর মানে, চমৎকার। তা, এই প্রশ্নবোধকগুলো নিশ্চয় তোমাদের প্রতীক চিহ্ন?'

নতুন চোখে রাজকুমারের দিকে তাকাল তিন গোয়েন্দা। না, যা ভেবেছিল, তা নয়। অনেক বেশি বুদ্ধিমান। দিমিত্রির প্রতি শ্রদ্ধা বাড়ল ওদের।

পকেট থেকে কার্ড বের করল দিমিত্রি। বাড়িয়ে দিল তিন গোয়েন্দার দিকে। 'এটা আমার কার্ড।'

কার্ডটা নিল কিশোর। দু'পাশ থেকে তার গা ঘেঁষে এল রবিন আর মুসা, দেখার জন্যে। ধবধবে সাদা, চকচকে মসৃণ কার্ডটায় কালো কালিতে ছাপাঃ দিমিত্রি দামিয়ানি। নামের ওপরে একটা ছবি, উজ্জ্বল রঙে ছাপা। সোনালি জালের মাঝখানে বসে আছে একটা রূপালী মাকড়সা, এক পায়ে ধরে রেখেছে তলোয়ার। ছোট্ট ছবিতে এতগুলো ব্যাপার নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তোলা খুব মুশকিল, তবু যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে শিল্পী।

'রূপালী মাকড়সা,' বলল রাজকুমার। 'আমার, মানে ভ্যারানিয়ান রাজবংশেরই প্রতীক চিহ্ন এটা। নিশ্চয় অবাক হচ্ছ, একটা মাকড়সা কি করে এত সম্মান পায়? সে অনেক লম্বা চওড়া কাহিনী, এখন বলার সময় নেই।' একে একে তিন গোয়েন্দার সঙ্গে হাত মেলাল দিমিত্রি। 'তোমাদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুব খুশি হয়েছি।'

লিমোসিনের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে একটা কালো গাড়ি, প্রায় নিঃশব্দে উত্তেজনা আর গোলমালে খেয়ালই করেনি তিন গোয়েন্দা। ওটা থেকে নামল এক

তরুণ। হালকা-পাতলা, সুন্দর চেহারা। চোখে সদাসতর্কতা। ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল সে। এতক্ষণে দেখতে পেল তিন গোয়েন্দা, আমেরিকান যুবককে।

'মাফ করবেন, ইয়োর হাইনেস,' বলল যুবক। 'দেরি হয়ে যাচ্ছে আমাদের। এখনও অনেক কিছুই দেখা বাকি।'

'হোক বাকি,' বলল দিমিত্রি। 'এদের সঙ্গে কথা বলতেই বেশি ভাল লাগছে আমার। এই প্রথম আমেরিকান ছেলেদের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেয়েছি।'

তিন গোয়েন্দার দিকে ফিরল আবার রাজকুমার। 'আচ্ছা, শুনেছি, ডিজনিল্যাণ্ড নাকি এক আজব জায়গা! দেখার অনেক কিছু আছে। ওখানে যাবার খুব ইচ্ছে আমার। তোমরা কি বল?'

ডিজনিল্যাণ্ড সত্যিই একটা দেখার মত জায়গা, একবাক্যে স্বীকার করল তিন গোয়েন্দা। ওটা না দেখলে মস্ত ভুল করবে দিমিত্রি এটাও জানাল।

'বডিগার্ডেরা সারাক্ষণ ঘিরে আছে, মোটেই ভাল লাগে না আমার,' বলল রাজকুমার। 'খুব বেশি বাড়াবাড়ি করে ডিউক রোজার, আমার গার্জেন, ভ্যারানিয়ার রিজেন্ট এখন। আমাকে চোখে চোখে রাখার নির্দেশ দিয়ে দিয়েছে গার্ডদের। যেন, অন্য কেউ আমার কাছে ঘেঁষলেই সর্দি লেগে মরে যাব! যত্তসব!...লোকের যেন আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই, খালি আমাকে মারার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে! ভ্যারানিয়ার কোন শত্রু নেই, তারমানে আমারও নেই। কে আমাকে মারতে আসবে? খামোকা ঝামেলা!'

ক্ষোভ প্রকাশ করতে গিয়ে অনেক কথা বলে ফেলল দিমিত্রি। চুপ করে গেল হঠাৎ। নীরবে দেখল তিন গোয়েন্দাকে। এক মুহূর্ত ভাবল কি যেন! তারপর বলল, 'তোমরা, ডিজনিল্যাণ্ড যাবে আমার সঙ্গে? তোমাদের তো সব চেনা, দেখাবে আমাকে? খুব খুশি হব। বডিগার্ডের বদলে বন্ধুরা সঙ্গে থাকলে দেখেও মজা পাব অনেক বেশি। চল না!'

দিমিত্রির হঠাৎ এই অনুরোধে অবাক হল তিন গোয়েন্দা। দ্রুত আলোচনা করে নিল নিজেদের মাঝে। সারাটা দিন পড়ে আছে সামনে, কিছুই করার নেই তেমন। দিমিত্রির অনুরোধ রক্ষা করা যায় সহজেই। বরং ভালই লাগবে ওদের।

রোলস রয়েসে টেলিফোন রয়েছে। স্যালভেজ ইয়ার্ডে মেরি চাচীকে ফোন করল কিশোর। জানাল, ওর ফিরতে দেরি হবে। সোনালি রিসিভারটা ক্রেডলে রেখে ফিরে চাইল। অবাক চোখে তাকিয়ে আছে দিমিত্রি।

লিমোসিনে গিয়ে উঠে বসল দিমিত্রি। বন্ধুদের ডাকল।

রাজকুমারের গাড়িতেই যেতে পারবে তিন গোয়েন্দা। হ্যানসনকে রোলস রয়েস নিয়ে চলে যেতে বলল কিশোর। তারপর গিয়ে উঠে বসল লিমোসিনে। মুসা আর রবিনও উঠল। সামনে শোফারের পাশে বসেছে লম্বা লোকটা।

কালো গাড়িটায় উঠল অন্যরা। গাদাগাদি ঠাসাঠাসি করে বসতে হল। গাড়িটা

আমেরিকান সরকারের। প্রিন্সের গাড়িকে পাহারা দিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে সঙ্গে দেয়া হয়েছে।

'খুব রাগ করবেন, ডিউক রোজার,' মুখ গোমড়া করে রেখেছে লম্বা লোকটা। 'ঝুঁকি নিতে নিষেধ করেছেন তিনি।'

'কোন ঝুঁকি নিইনি, লুথার,' কড়া গলায় বলল দিমিত্রি। 'তাছাড়া ডিউক রোজারের আদেশ মানতে আমি বাধ্য নই। আমার আদেশ মেনে চলার সময় এসে গেছে তার। আর মাস দুয়েক পরই রাজ্য শাসন করব আমি। আমার কথাই তখন আইন, তার নয়।' শোফারকে বলল, 'রিগো, খুব সাবধানে চালাবে। এটা তোমার ভ্যারানিয়া নয়, যে প্রিন্সের গাড়ি দেখলেই রাস্তা ছেড়ে দেবে লোকে। ট্রাফিক আইন মেনে চলবে পুরোপুরি। আর কোনরকম অঘটন চাই না আমি।'

বিদেশী ভাষায় একনাগাড়ে কথা বলে গেল ডিউক লুথার। মুখচোখ কালো। মাথা ঝোঁকাল শোফার। গাড়ি ছেড়ে দিল।

মসৃণ গতিতে এগিয়ে চলেছে লিমোসিন, গতি মাঝারি। কোনরকম গোলমাল করল না আর শোফার। ঠিকঠাক মেনে চলল সব ট্রাফিক আইন। খুব সর্তক।

পঁয়তাল্লিশ মিনিট লাগল ডিজনিল্যাণ্ডে পৌঁছাতে। সারাটা পথ তিন গোয়েন্দাকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে এসেছে দিমিত্রি। আমেরিকা, বিশেষ করে ক্যালিফোর্নিয়া সম্পর্কে জেনেছে অনেক কিছু। কখনও বাংলাদেশে আসেনি রাজকুমার। প্রায় কিছুই জানে না দেশটা সম্পর্কে। কিশোরের কাছে জানল অনেক কিছু। মুগ্ধ হয়ে গেল রাজকুমার। বলল, সুযোগ আর সময় পেলেই বাংলাদেশে ঘুরে যাবে সে। দেখবে ধানের খেত, মেঘনার চর, পদ্মার ঢেউ…শুনবে সন্ধ্যায় চৈতী শালিকের কিচির মিচির, বাঁশ বনের ছায়ায় দোয়েলের শিস, চাঁদনী রাতে শেয়ালের হুক্কাহুয়া…

গাড়ি পার্ক করল শোফার। নেমে পড়ল ছেলেরা। কালো গাড়ি থেকে প্রহরীরা নেমে পড়েছে আগেই।

ছেলেদের সঙ্গে সঙ্গে চলল ডিউক আর তার দলবল।

একটা জায়গায় এসে একটু পিছিয়ে পড়ল ডিউক, কিশোরের একেবারে গা ঘেঁষে এল দিমিত্রি। ফিসফিস করে বলল, 'ওদের ফাঁকি দিতে হবে। গায়ের ওপর থেকে খসাতে হবে।'

আস্তে করে মাথা ঝোঁকাল কিশোর।

পুরো পার্ক চক্কর দিচ্ছে ছোট ট্রেন, বিচিত্র রঙের ইঞ্জিন, কামরা। খুদে স্টেশনে লোকের ভিড়। ওখানে এসে দাঁড়াল চার কিশোর। স্টেশনে এসে থামল একটা ট্রেন। পিলপিল করে নেমে এল যাত্রীরা, বেশির ভাগই বাচ্চা ছেলেমেয়ে। ওদের ভিড়ে মিশে গেল চারজনে। নতুন যাত্রী উঠল ট্রেনে। হুইসেল বাজিয়ে ছেড়ে দেবার আগের মুহূর্তে লাফিয়ে একটা বগিতে উঠে বসল চার কিশোর। ডিউককে

দেখতে পেল ওরা। প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে চোখ বড় বড় করে ছেলেমেয়েদের মাঝে খুঁজছে দিমিত্রিকে। সরে চলে এল ট্রেন।

ট্রেনে বসেই পার্কের অনেক কিছু চোখে পড়ে। দেখল দিমিত্রি। কোনটা কি, বুঝিয়ে দিল তিন গোয়েন্দা। বেশ আনন্দেই কাটল সময়টা। পুরো পার্ক একবার চক্কর দিয়ে আবার স্টেশনে এসে থামল গাড়ি। দাঁড়িয়ে আছে ডিউক লুথার। তাকে ঘিরে রয়েছে দেহরক্ষীরা। মুখচোখ কালো। নিশ্চয় প্রচুর বকাঝকা খেতে হয়েছে ডিউকের কাছে।

ট্রেন থামতেই চার কিশোরকে দেখে ফেলল ওরা। ছুটে এসে দাঁড়াল বগির সামনে।

মুখ গোমড়া করে ট্রেন থেকে নামল দিমিত্রি। ঝাঁঝাল কণ্ঠে বলল, 'আমার সঙ্গে থাকনি তোমরা! ডিউটি ফাঁকি দিয়েছ। রিপোর্ট করব আমি ডিউক রোজারের কাছে।'

'কিন্তু··· আ-আমি···,' তোতলাতে শুরু করল লুথার।

'থাম!' ধমকে উঠল দিমিত্রি। তিন গোয়েন্দার দিকে ফিরে বলল, 'চল, যাই। ইস্‌স্‌, আরও সময় হাতে নিয়ে আসা উচিত ছিল! কত কিছু দেখার আছে আমেরিকায়!'

তিন বন্ধুকে নিয়ে গাড়িতে উঠে বসল দিমিত্রি। পেছনের প্রহরী-গাড়িতে করে আসার আদেশ দিল ডিউক লুথারকে। শোফার ইংরেজি জানে না। রকি বীচে ফেরার পথে মন খুলে কথা বলতে পারল চারজনে।

অনেক কিছু জানতে চাইল রাজকুমার। খুলে বলল সব তিন গোয়েন্দা। কি করে একসঙ্গে হয়েছে ওরা, কি করে গোয়েন্দা হওয়ার শখ জেগেছে, কি করে দেখা করেছে বিখ্যাত চিত্রপরিচালক মিস্টার ডেভিস ক্রিস্টোফারের সঙ্গে, সব জানাল। সংক্ষেপে বলল 'ভূতুড়ে দুর্গ' আর 'কঙ্কাল দ্বীপ' অভিযানের কাহিনী।

'ব্রোজাস!' শুনতে শুনতে এক সময় চেঁচিয়ে উঠল দিমিত্রি। 'কি আনন্দ! একেই বলে জীবন! আহা, আমেরিকান ছেলেরা কত স্বাধীন! ইস্‌স্‌, কেন যে রাজকুমার হয়ে জন্মালাম! আর ক'দিন পরেই কাঁধে চাপবে মস্ত দায়িত্ব। রাজ্য শাসন···আরিব্বাপরে! ভাবলেই হাত-পা হিম হয়ে আসে!···স্বাধীন হব, হুঁহ্‌! বাড়ি থেকেই বেরোতে দেয়া হয় না আমাকে! জীবনে কোনদিন স্কুলের মুখ দেখিনি! বাড়িতে শিক্ষক রেখে পড়াশোনা করিয়েছে! হাতে গোনা কয়েকজন বন্ধু আছে আমার, দেশে।···সত্যি বলছি, জীবনে এই প্রথম কয়েক ঘন্টা আনন্দে কাটালাম! আজকের দিনটা স্মরণীয় হয়ে থাকবে আমার জীবনে!'

খানিকক্ষণ নীরবতা। 'তোমরা আমার বন্ধু হবে?' অযাচিত ভাবে হঠাৎ জিজ্ঞেস করল দিমিত্রি। 'খুব খুশি হব!'

'আমরাও খুব খুশি হব,' বলল মুসা।

'থ্যাংক ইউ!' হাসল রাজকুমার। 'তোমরা জান না, জীবনে আজই প্রথম তর্ক করেছি ডিউক লুথারের সঙ্গে। তোমাদের সঙ্গে মিশেছি, এটা মোটেই ভাল লাগছে না তার। জানি, ফিরে গিয়ে সব লাগাবে রিজেন্টের কাছে। ব্যাপারটা মোটেই ভাল ভাবে নেবে না রোজার। না নিক। আর মাত্র দু'য়েকটা মাস। তারপর ওদের পরোয়া কে করে!'

'প্রিন্সের কথা নিশ্চয় না মেনে পারবে না ডিউক রোজার,' বলল রবিন।

'না, পারবে না,' বলল দিমিত্রি। 'সময় আসুক। বেশ কয়েকটা আঘাত অপেক্ষা করছে তার জন্যে!' রহস্যময় শোনাল রাজকুমারের গলা।

রকি বীচে পৌঁছে গেল গাড়ি। দিমিত্রিকে বলে গেল কিশোর, কোন পথে যেতে হবে। দিমিত্রি তার ভাষায় বলল শোফারকে।

পাশা স্যালভেজ ইয়ার্ডের বিশাল লোহার গেটের সামনে পৌঁছে গেল গাড়ি।

দিমিত্রিকে নামতে অনুরোধ করল কিশোর। ওদের হেডকোয়ার্টার দেখাবে।

বিষণ্ণ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল দিমিত্রি। 'না রে, ভাই, সময় নেই। আজ রাতে এক জায়গায় ডিনারের দাওয়াত আছে। আগামীকাল সকালেই ফিরে যাব ভ্যারানিয়ায়।'

'রাজধানীতেই থাক নিশ্চয়?' জানতে চাইল কিশোর। 'নাম কি?'

'হ্যাঁ। ডেনজো। কখনও গেলে দেখবে, কত বড় বাড়িতে থাকি! কয়েকশো বছর আগে তৈরি হয়েছিল বিশাল দুর্গের মত বাড়িটা। তিনশো কামরা। বেশির ভাগই নষ্ট হয়ে গেছে। ছোট রাজ্য। আয় খুবই কম। বাড়ি মেরামত করারও পয়সা নেই আমাদের। অথচ রাজা!…নাহ্ আর দেরি করতে পারছি না। চলি। আবার হয়ত কখনও দেখা হবে, মাই ফ্রেণ্ডস!'

বন্ধুদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে গিয়ে লিমোসিনে উঠল দিমিত্রি। রাজকুমারের গা ঘেঁষে বসল লুথার। দেহরক্ষীরা উঠল।

ছেড়ে দিল গাড়ি। প্রতিটি জানালায় শুধু দেহরক্ষীর মুখ। লিমোসিনের পেছনে কালো এস্কর্ট কার।

গাড়ি দুটো মোড় ঘুরে অদৃশ্য হয়ে যাবার পরেও অনেকক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়ে রইল তিন গোয়েন্দা।

'একজন রাজকুমার এত ভাল হতে পারে, জানতাম না!' কথা বলল মুসা। 'কিশোর, কি ভাবছ? নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে শুরু করেছ…'

চোখ মিটমিট করে তাকাল কিশোর। ঠোঁট থেকে সরিয়ে নিল আঙুল। 'ভাবছি…নাহ্, সত্যি আশ্চর্য।'

'কি?'

'সকালের ব্যাপারটা! অ্যাক্সিডেন্ট হয়েই যাচ্ছিল! হ্যানসন ঠিক সময়ে গাড়ি না থামলে…কেন, আশ্চর্য লাগেনি তোমাদের কাছে? কোনরকম খটকা লাগেনি?'

'আশ্চর্য! খটকা!' মুসার মতই বিস্মিত হল রবিন। 'কপাল ভাল, অ্যাক্সিডেন্ট হয়নি! এতে আশ্চর্যের কি আছে?'

'আসলে কি বলতে চাইছ, বলে ফেল তো!' বলল মুসা।

'রিগো, মানে দিমিত্রির শোফার,' বলল কিশোর। 'পাশের রাস্তা থেকে বেরিয়ে এসে সামনে পড়ল। রোলস রয়েসটাকে দেখতে পায়নি, বললে মোটেই বিশ্বাস করব না। নিশ্চয় দেখেছে। ইচ্ছে করলেই গতি বাড়িয়ে আমাদের সামনে দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারত। বরং ব্রেক কষেছে ঘ্যাঁচ করে। সময় মত হ্যানসন পাশ কাটাতে না পারলে সোজা গিয়ে লিমোসিনের গায়ে বাড়ি মারত রোলস রয়েস। দিমিত্রি যেখানে বসেছিল ঠিক সেখানে। মারাই যেত সে!'

'দুর্ঘটনার আগে হুঁশজ্ঞান হারিয়ে ফেলে মানুষ,' বলল মুসা। 'রিগোরও সে-রকম কিছু হয়েছিল!'

'বিশ্বাস করতে পারছি না।' এদিক ওদিক মাথা নাড়ল কিশোর 'কেন যেন মনে হচ্ছে, কোথাও কিছু একটা ঘাপলা রয়েছে।...যাকগে, এস যাই। চাচী হয়ত ভাবছে...

দুই

দিন কয়েক পর।

হেডকোয়ার্টারে বসে আছে তিন গোয়েন্দা।

পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ডের ভেতর আবর্জনার স্তূপের তলায় চাপা পড়ে আছে একটা ট্রেলার—মোবাইল হোম ভাঙাচোরা। ওটাকে মেরামত করে নিয়ে নিজেদের গোপন আস্তানা বানিয়েছে তিন গোয়েন্দা। কয়েকটা গোপন পথ আছে, ওরা তিনজন ছাড়া আর কেউ জানে না।

কয়েক মিনিট আগে পিয়ন নিয়ে এসেছে সকালের ডাক। ইতিমধ্যেই মোটামুটি নাম ছড়িয়ে পড়েছে তিন গোয়েন্দার, অভিনেতা জন ফিলবি আর তার 'টেরর ক্যাসলের' সৌজন্যে। অনেকেই চিঠি লেখে এখন ওদের কাছে। বেশির ভাগই বাচ্চা ছেলেমেয়ে, কিংবা ধনী বিধবা। কারও হয়ত বল হারিয়ে গেছে, কেউ এক বাক্স চিউইং গাম খুঁজে পাচ্ছে না, কিংবা কোন বিধবার আদরের বিড়ালটা হয়ত কয়েকদিন আগে বাড়ি থেকে বেরিয়েছে, আর ফেরেনি। খুঁজে বের করে দেবার ডাক আসে। গ্রাহ্য করে না কিশোর। এসব সাধারণ কাজ হাতে নেবার কোন ইচ্ছেই নেই তার—যদিও মুসার খুবই আগ্রহ, চিঠিগুলো সোজা ময়লা ফেলার ঝুড়িতে নিক্ষেপ করে গোয়েন্দাপ্রধান।

হারিয়ে যাওয়া প্রিয় কুকুরটা খুঁজে দেবার অনুরোধ করে চিঠি পাঠিয়েছে এক বিধবা। এটাই পড়ছে রবিন, এই সময় বাজল টেলিফোন।

তিন গোয়েন্দার ব্যক্তিগত টেলিফোন। ইয়ার্ডের কাজে চাচা-চাচীকে সাহায্য করে ওরা অবসর সময়ে। পারিশ্রমিক হিসেবে মেরিচাচীর হাতে তৈরি আইসক্রীম-কেক আর হট-চকলেট ছাড়াও নগদ কিছু টাকা পায় রাশেদ চাচার কাছ থেকে। ওখান থেকেই টেলিফোনের বিল দেয় ওরা। গোয়েন্দাগিরি করে স্রেফ শখে, এর জন্যে টাকাপয়সা নেয় না মক্কেলের কাছ থেকে।

ছোঁ মেরে রিসিভার তুলে নিল কিশোর।

'হ্যালো,' বলল গোয়েন্দাপ্রধান। 'তিন গোয়েন্দা। কিশোর পাশা বলছি।'

'গুড মর্নিং কিশোর,' স্পীকারে গমগম করে উঠল ভারি কণ্ঠস্বর। আগের মত মাইক্রোফোনের সামনে আর রিসিভার ধরতে হয় না, নতুন ব্যবস্থা করে নিয়েছে কিশোর। টেলিফোন লাইনের সঙ্গে কায়দা করে স্পীকারের যোগাযোগ ঘটিয়ে দিয়েছে। ওপাশ থেকে কেউ কথা বললেই বেজে উঠে স্পীকার। হেডকোয়ার্টারে বসা সবাই একসঙ্গে শুনতে পায় কথা।

রিসিভারে চেপে বসল কিশোরের আঙুল। চোখ বড় বড় হয়ে গেছে মুসা আর রবিনের। কান খাড়া হয়ে গেছে। মিস্টার ডেভিস ক্রিস্টোফার!

'কিশোর, তোমাকে পেয়ে যাওয়ায় ভালই হল,' আবার বললেন চিত্রপরিচালক, 'শিগগিরই একজন দেখা করতে যাচ্ছে তোমাদের সঙ্গে।'

'দেখা করতে আসছে? কোন কেস, স্যার?'

'টেলিফোনে কিছুই বলা যাবে না,' জবাব দিলেন চিত্রপরিচালক। 'খুব গোপন ব্যাপার। তার সঙ্গে দীর্ঘ সময় কথা বলেছি আমি। অনেক কিছু জেনেছি, বুঝেছি। তোমাদের পক্ষেই সুপারিশ করেছি আমি আশা করি, নিরাশ করবে না। হ্যাঁ, বিস্ময়কর এক প্রস্তাব আসছে তোমাদের কাছে আগে থেকেই হুঁশিয়ার করে রাখছি। ভেবেচিন্তে কাজ কর।...রাখলাম।'

লাইন কেটে গেল ওপাশে। রিসিভারের দিকে এক মুহূর্ত চেয়ে রইল কিশোর ধীরে ধীরে নামিয়ে রাখল ক্রেডলে। স্তব্ধ নীরবতা ট্রেলারের ভেতর।

'কি মনে হয়? আরেকটা কেস?' অনেকক্ষণ পর কথা বলল রবিন।

কিশোর কিংবা মুসা। কিছু বলার আগেই বাইরে শোনা গেল মেরিচাচীর ডাক। ট্রেলারের স্কাইলাইটের খোলা জায়গা দিয়ে বাতাস ঢোকে, ওখান দিয়েই আসছে।

'কিশোর! বেরিয়ে আয় তো! একজন লোক দেখা করতে এসেছে তোর সঙ্গে।'

কয়েক মুহূর্ত পর। দুই সুড়ঙ্গের মস্ত পাইপের ভেতর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে চলেছে তিন গোয়েন্দা। একজনের পেছনে আরেকজন। চল্লিশ ফুট লম্বা পাইপ, হাঁটুতে খুব ব্যথা পেত আগে। তাই পুরানো কার্পেট কেটে পেতে দিয়েছে ওরা ভেতরে।

লোহার পাতটা সরাল কিশোর। বেরিয়ে এল তাদের ওয়ার্কশপে। তার পেছনে বেরোল মুসা, তারপর রবিন। পাতটা আবার পাইপের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বেরিয়ে এল ওরা জঞ্জালের বেড়ার অন্য পাশে।

মেরিচাচীর কাচঘেরা অফিসের পাশে একটা ছোট্ট গাড়ি। বনেটে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এক তরুণ।

দেখামাত্রই তাকে চিনল তিন গোয়েন্দা। দিমিত্রির সঙ্গে কালো এসকর্ট কারে ছিল ওই যুবক।

'হাল্লো!' তিন গোয়েন্দাকে দেখেই সোজা হয়ে দাঁড়াল যুবক। হেসে এগিয়ে এল। 'আবার আমার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে, নিশ্চয় ভাবনি? সেদিন তো পরিচয় হয়নি, আজ হয়ে যাক। আমি বব ব্রাউন।...এই যে, আমার আইডেনটিটি।'

পরিচয়পত্র দেখাল যুবক। সরকারী সিল-ছাপ্পর মারা।

'আমি সরকারী লোক,' কার্ডটা আবার পকেটে রাখতে রাখতে বলল যুবক। 'জরুরি কিছু কথা আছে। নিরাপদে বলা যাবে কোথায়?'

'আসুন!' ভাবনা চলছে কিশোরের মাথায়। সরকারী লোক, তিন গোয়েন্দার কাছে এসেছে! জরুরি কথা! মিস্টার ডেভিস ক্রিস্টোফারও বার বার হুঁশিয়ার করেছেন। নাহ্, কিছু বুঝতে পারছে না সে।

তিন গোয়েন্দার ওয়ার্কশপে ববকে নিয়ে এল কিশোর। পুরানো দুটো চেয়ারের একটাতে বসতে দিল অতিথিকে। নিজে বসল আরেকটায়। মুসা আর রবিন বসল দুটো বাক্সের ওপর।

'হয়ত বুঝতে পারছ, কেন এসেছি?' কথা শুরু করল বব। তাকাল তিন গোয়েন্দার দিকে।

কেউ কোন কথা বলল না।

'ব্যাপারটা ভ্যারানিয়ার প্রিন্স দিমিত্রিকে নিয়ে,' বলল আবার বব।

'প্রিন্স দিমিত্রি!' ভুরু কুঁচকে গেছে মুসার। 'কেমন আছে সে?'

'ভাল। তোমাদেরকে তার শুভেচ্ছা জানিয়েছে।' কিশোরের দিকে তাকাল বব। 'দু'দিন আগে ওর সঙ্গে কথা হয়েছে আমার। আগামী দু'হপ্তার মধ্যেই অভিষেক অনুষ্ঠান শুরু হবে। তোমাদেরকে দাওয়াত পাঠিয়েছে সে।'

'ইয়াল্লা!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'ইয়োরোপে যাব! সত্যি বলছেন তো?'

'সত্যিই বলছি,' হাসল বব। 'তোমরা তার বন্ধু। আমেরিকার আর কোন ছেলেকেই সে চেনে না। দেশেও বন্ধুবান্ধব নেই খুব একটা তাছাড়া, ভ্যারানিয়ায় কে যে তার বন্ধু, আর কে নয়, বোঝা খুবই মুশকিল। রাজকুমারের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করবে সবাই, তাকে তোয়াজ করে খুশি রাখতে চাইবে, এটাই স্বাভাবিক। এতে আর যাই হোক, বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে না তাই, সত্যিকারের কয়েকজন বন্ধুকে কাছে রাখতে চায় অভিষেকের সময়।...আসল কথা কি জান, আইডিয়াটা আমিই

ঢুকিয়েছি তার মাথায়।'

'আপনি?' বব কথা বলল। 'কেন?'

'কারণ, আমাদের, মানে আমেরিকানদের কিছু স্বার্থ জড়িত রয়েছে,' বলল বব। 'শান্তির দেশ ভ্যারানিয়া, অন্তত এতদিন তাই ছিল। কোন শত্রু নেই, সুইজারল্যাণ্ডের মত। ওভাবেই থাকুক, এটাই চায় আমেরিকান সরকার। কোন শত্রুদেশ ওখানে আস্তানা গেড়ে আমাদের অসুবিধে করুক, এটা মোটেই কাম্য নয়।'

'কিন্তু,' এতক্ষণে কথা বলল কিশোর। 'ভ্যারানিয়ার মত ছোট দরিদ্র একটা দেশ কি এমন দিতে পারে আমেরিকাকে?'

'পারে, পারে। ছোট বলে ইঁদুরকে উপেক্ষা করা উচিত না সিংহের। ভ্যারানিয়া একটা স্পাই বেস, দুনিয়ার সব দেশের গুপ্তচরদের স্বর্গ। যাকগে, ওসব বলার দরকার নেই এখন। তো, তোমরা যাবে?'

চোখ মিটমিট করছে তিন কিশোরই। যাবার জন্যে ওরা এক পায়ে খাড়া। কিন্তু কিছু সমস্যা আছে। যেমন, এতদূরে অজানা অচেনা জায়গায় যেতে মত দেবেন কিনা অভিভাবকেরা, খরচ দেবেন কিনা ইত্যাদি। বব ব্রাউনকে জানাল ওরা সে কথা।

'ওসব কোন সমস্যাই না,' বলল বব। 'রবিন আর মুসার বাবাকে ফোন করবেন মিস্টার ক্রিস্টোফার তোমাদের সব দায়িত্ব আমার ওপর, সেকথা বলে দেবেন। কিশোরের চাচীর সঙ্গে আমি কথা বলব। মনে হয় না অরাজী হবেন। আর টাকা পয়সার কোন ভাবনা নেই। সব খরচ বহন করবে আমাদের সরকার। দেশের একটা সম্মান আছে, সেটা বজায় রাখতে হবে। যত খুশি খরচ কর ভ্যারানিয়ায়, পুরোদস্তুর আমেরিকান সেজে থেক, কোন বাধা নেই।'

হাসি একান-ওকান হয়ে গেল মুসার। রবিনের চোখও চকচক করছে। কিন্তু কিশোরের চেহারা দেখে বোঝা গেল না খুশি হয়েছে কি না।

'কিন্তু,' ভ্রূকুটি করল কিশোর, 'আমেরিকান সরকারের এত গরজ কেন? টাকা পয়সা খরচের ব্যাপারে কোন দেশের কোন সরকারই দরাজহস্ত নয়। আমাদের সরকারও এর বাইরে নন।'

'মিস্টার ক্রিস্টোফার বলেছেন, তোমরা খুব বুদ্ধিমান,' হাসল বব। 'বুঝতে পারছি, ঠিকই বলেছেন। ঠিক আছে, বলেই ফেলছি। জুনিয়র এজেন্ট হিসেবে তোমাদেরকে ভ্যারানিয়ায় পাঠাতে চাইছেন ইউ এস সরকার।'

'তারমানে...তারমানে প্রিন্স দিমিত্রির ওপর গুপ্তচরগিরি করতে...' হতবুদ্ধি হয়ে গেছে যেন মুসা।

জোরে জোরে মাথা নাড়ল বব। 'মোটেই না। তবে চোখ খোলা রাখবে। সন্দেহজনক যে-কোন ঘটনা চোখে পড়ুক, কিংবা কথা কানে আসুক, সঙ্গে সঙ্গে

রিপোর্ট করবে। ভেতরে ভেতরে সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটছে ভ্যারানিয়ায়। শিগ্‌গিরই হয়ত বিস্ফোরণ ঘটবে। কি হচ্ছে বা হবে, কিছু জানি না আমরা। সেটা জানতে আমাদেরকে সাহায্য করবে তোমরা।'

'আশ্চর্য!' ভুরু কুঁচকে আছে কিশোর। 'আমি জানতাম, গোপন খবর জানার অনেক উৎস আছে সরকারের...'

'মানুষ নিয়েই গঠিত হয়েছে সরকার,' বাধা দিয়ে বলল বব। 'তাছাড়া, ভ্যারানিয়ায় কোন গোপন খবর খুবই শক্ত ব্যাপার। ছোট্ট দেশ ওটা, কিন্তু এমন কিছু মানুষের জন্ম দিয়েছে, দেশের জন্যে বিনা দ্বিধায় যারা প্রাণ দিয়ে দিতে পারে দরিদ্র, তবু লোভী নয় ওদেশের মানুষ। বাইরের কোন সাহায্য ছাড়াই চালিয়ে নিয়েছে এতদিন। ওদের ভাঙা হয়ত সহজ, কিন্তু মচকানো প্রায় অসম্ভব। না খেয়ে থাকতে রাজি, তবু কারও কাছে হাত পাতবে না। যেচে পড়ে কেউ সাহায্য দিতে গেলেও নেবে না। দেশের স্বাধীনতাকে বড় বেশি মর্যাদা দেয় ওরা!' থামল সে। তারপর বলল, 'তবে মক্কায়ও খারাপ লোক আছে। ভ্যারানিয়ার বর্তমান রিজেন্ট, ডিউক রোজার বুরবন, তেমনি এক লোক। এটা অবশ্যই আমাদের সন্দেহ'। তা না-ও হতে পারে। আমাদের সন্দেহ, দিমিত্রিকে প্রিন্স হতে দেবে না সে কিছুতেই। অভিষেক অনুষ্ঠানই হতে দেবে না। রাজ্য শাসন করছে অনেক দিন থেকে, এই লোভ সে ছাড়তে পারবে বলে মনে হয় না। যদি কোন অঘটন ঘটে ভ্যারানিয়ায়, সেই হবে এর হোতা।'

'নীরব রইল তিন কিশোর। খুশি খুশি ভাবটা চলে গেছে মুসা আর রবিনের চেহারা থেকেও।

'নিরপেক্ষ একটা দেশ, এর ঘরোয়া ব্যাপারে বাইরের কারও নাক গলানো উচিত না,' আবার বলল বব। 'কিন্তু গুজব ছড়িয়ে পড়েছে, শিগগিরই সাংঘাতিক কিছু একটা করতে যাচ্ছে ডিউক রোজার, তখন আর ঘরোয়া থাকবে না ব্যাপারটা। বুঝতেই পারছ, আমাদের অস্বস্তির যথেষ্ট কারণ রয়েছে। আমরা জানতে চাই, কি ঘটাতে যাচ্ছে রোজার। আমরা, বড়রা প্যালেসের ধারেকাছে ঘেঁষতে পারব না। দিমিত্রিও আমাদের কাছে মুখ খুলবে না কিছুতেই। তবে, তোমরা সহজেই ঢুকতে পারবে প্যালেসে, ওখানেই থাকতে পারবে, তোমাদের কাছে মনের কথা বলেও ফেলতে পারে প্রিন্স। গোলমালটা কি ঘটতে যাচ্ছে, আগেভাগে একমাত্র তোমাদের পক্ষেই জানা সম্ভব। তাছাড়া, ক্ষমতায় যারা রয়েছে, তোমাদেরকে সন্দেহ করবে না। অসতর্ক হয়ে কিছু একটা করে বসতে পারে তোমাদের সামনেই, যাতে অনেক কিছুই ফাঁস হয়ে যাবে।'

এবারও কেউ কিছু বলল না শ্রোতারা।

'তো, আসল কথায় আসা যাক,' বলল বব। 'কাজটা নিচ্ছ তোমরা?'

কিশোরের দিকে চেয়ে অপেক্ষা করে রইল মুসা আর রবিন। সিদ্ধান্তের ভার

গোয়েন্দাপ্রধানের ওপরই ছেড়ে দিল ওরা নীরবে।

গভীর চিন্তায় ডুবে আছে কিশোর, নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে একনাগাড়ে।

'রাজনীতিতে জড়ানর কোন ইচ্ছেই আমার নেই,' হঠাৎ বলে উঠল কিশোর। 'তাছাড়া ওসব করার বয়েসও হয়নি এখনও, কিছুই বুঝি না। দেশের জন্যে আমানর অনেক বড় বড় মাথা রয়েছে। আমাদের কাজ ওসব নয়। তবে হ্যাঁ, আমাদের অভিভাবকদের খুলে বলতে হবে সব কথা। তাঁরা যদি মত দেন, যাব। সে-ও শুধু প্রিন্স দিমিত্রিকে সাহায্য করতেই, আর কোন কারণে নয়।'

'ব্যস ব্যস, ওতেই চলবে,' হাত তুলল বব। 'বন্ধুকেই সাহায্য কর তোমরা। তবে একটা কথা। নিজে থেকে ঘুণাক্ষরেও বিপদের আভাস দেবে না দিমিত্রিকে। সে যদি বলে, বলুক। তোমরা কি কারণে গেছ, এটাও যেন কেউ না জানে। প্যালেসের সবাই জানবে, তোমরা বেড়াতে গেছ। খবরদার, অপরিচিত কারও কাছে প্রিন্স দিমিত্রি সম্পর্কে কোনরকম আলোচনা করবে না। জানিয়ে রাখছি, আট বছর আগে এক মোটর দুর্ঘটনায় মারা গেছেন তার বাবা। তখন থেকেই কোন কারণে ডিউকের উপর খেপে আছে ভ্যারানিয়ার জনসাধারণ। ওকে দেখতে পারে না তারা। যদি জানে, তোমরা স্পাই, বারুদে জ্বলন্ত ম্যাচের কাঠি পড়বে। কাজেই চোখ খোলা রাখবে, কান সজাগ রাখবে, মুখ বন্ধ রাখবে।'

'তাহলে এবার অভিভাবকদের...' বলতে গিয়ে বাধা পেল রবিন।

'বলেছিই তো, সে ভার আমার,' বলে উঠল বব। 'তাহলে উঠি। তোমরা যাবার জন্যে তৈরি হওগে। কালই ফ্লাইট।'

তিন

ভ্যারানিয়া! রাজধানী ডেনজো!

পাথরের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে আছে রবিন। দৃষ্টি সামনে প্রসারিত। দেখছে প্রাচীন শহরটাকে। ভোরের সোনালি রোদ ছড়িয়ে পড়েছে পুরানো বাড়িগুলোর টালির ছাতে, গাছের মাথায়। সরকারী ভবনগুলোর উঁচু টাওয়ারের চূড়াগুলোকে মনে হচ্ছে সোনার পাতে মোড়া। ঝিরঝিরে বাতাসে দুলছে গাছের ডাল, প্যালেসের দিকে মাথা নুইয়ে বার বার অভিবাদন জানাচ্ছে যেন। প্রায় আধ মাইল দূরে ছোট একটা পাহাড় চূড়ায় দাঁড়িয়ে আছে এক বিশাল গির্জার সোনালি গম্বুজ।

নিচে তাকাল রবিন। রাজপ্রাসাদের পাথর মোড়ানো আঙিনায় কয়েকটা মেয়ে। হাতে ঝাড়ু আর বালতি। ঘষেমেজে পরিষ্কার করছে প্রতিটি চৌকোণা পাথর।

পাঁচতলা পাথরের প্রাসাদের পেছনে বইছে ডেনজো নদী। চওড়া, খরস্রোতা। পুরো শহরটাকে পাক দিয়ে ঘিরে রেখেছে যেন রূপকথার বিশাল কোন রাক্ষুসে

অজগর। নদীতে ছোট ছোট নৌকা, দাঁড় বেয়ে উজানভাটি করছে ধীরেসুস্থে অপরূপ দৃশ্য। তিনতলার কোণের দিকে এই ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে সবই চোখে পড়ছে রবিনের।

'ক্যালিফোর্নিয়ার সঙ্গে কোন মিল নেই।' বিশাল জানালা টপকে এসে ব্যালকনিতে নেমেছে মুসা। রবিনের পাশে এসে দাঁড়াল। 'অনেক পুরানো শহর! দেখেই বোঝা যায়।'

'তেরোশো পঁয়তিরিশ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল,' বলল রবিন। নতুন কোথাও যাবার আগে পড়াশোনা করে জায়গাটা সম্পর্কে ভালমত জেনে নেয় তার স্বভাব বাড়ি থেকে একটা বই নিয়ে নিয়েছিল সঙ্গে, প্লেনে বসে পড়েছে। 'বার বার আক্রমণ করেছে হানাদাররা, ধ্বংস করে দিয়েছে; প্রতিবারেই আবার নতুন করে গড়া হয়েছে শহর। তবে, সে-সবই ষোলোশো পঁচাত্তরের আগে। তারপর ঘটল বিদ্রোহ রাজ পরিবারের বিরুদ্ধে। সেই বিদ্রোহ দমন করেন প্রিন্স পল, রাতারাতি জাতীয় হীরো বনে গেলেন তিনি। আমাদের জর্জ ওয়াশিংটনের মত। আবার গড়া হল শহর। সে-ই শেষ। এখন যা কিছু দেখছ, বেশির ভাগই তৈরি হয়েছে সেই তিনশো বছর আগে। নতুন শহর একটা গড়ে উঠছে অবশ্য, তবে এখান থেকে সেটা দেখা যায় না।'

'পুরানোটাই ভাল লাগছে আমার,' বলল মুসা। 'আচ্ছা, দেশটা কত বড়, বলতে পার?'

'মাত্র পঞ্চাশ বর্গ মাইল,' বলল রবিন 'খুদে একটা দেশ। ওই যে দূরে পাহাড়গুলো দেখা যাচ্ছে, ওটা ভ্যারানিয়ার সীমান্ত পাহাড়ের পাশটা পড়েছে এদেশের ভেতরে, ওপাশটা অন্য দেশ। ডেনজো নদীর উজান বেয়ে গেলে মাইল সাতেক হবে। প্রচুর আঙুরের ফলন হয়, এর ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে অনেক মদ চোলাইয়ের কারখানা। মসলিন জাতের মিহি কাপড় তৈরির কারখানা আছে বেশ কিছু। তবে, বেশির ভাগ বিদেশী টাকা আসে টুরিস্টদের কাছ থেকে দেশটার অপরূপ সুন্দর দৃশ্য দেখার জন্যে আসে তারা, ভিড় করে থাকে সারা বছরই। শুধু এ কারণেই, বেশির ভাগ দোকানদার আজও পুরানো ফ্যাশন জিইয়ে রেখেছে। পুরানো ধাঁচের পোশাক পরে, আচার ব্যবহার, কথাবার্তার ধরনও তিনশো বছরের পুরানো...'

'বাব্বাহ্! পুরোপুরি ভূগোলের ক্লাস!' ব্যালকনিতে নেমে এসেছে কিশোর। পরনে স্পোর্টস শার্ট, বোতাম আঁটছে। সামনের দৃশ্য একবার দেখেই সমঝদারের মত মাথা নাড়ল। 'নাহে, সুন্দর বলতেই হবে! সিনেমার সেটের জন্যে তৈরি করে রাখা হয়েছে যেন! মাস্টার সাব, বলতে পার গির্জাটার নাম কি? ওই যে পাহাড়ের চূড়ায় ...'

'সেইন্ট ডোমিনিকস,' সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দিল রবিন। 'দেশের সবচেয়ে বড়

গির্জা, একমাত্র সোনালি গম্বুজ। দুটো বেলটাওয়ার। বাঁয়েরটাতে মোট আটটা ঘন্টা গির্জার কাজে আর জাতীয় ছুটির দিনগুলোতে বাজানো হয়। ডানের টাওয়ারে আছে মাত্র একটা। অনেক পুরানো, বি-শা-ল! নাম, প্রিন্স পলের ঘন্টা। ইতিহাস আছে ওটার। ষোলোশো পঁচাত্তরে বিদ্রোহের সময় ওই ঘন্টা বাজিয়ে ভক্তদের সাহায্য চেয়েছিলেন পল। জানিয়েছিলেন, বেঁচে আছেন তিনি। সাহায্য করতে ছুটে এসেছিল ক্রুদ্ধ জনতা, ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছিল বিদ্রোহীদের। এরপর থেকে, রাজপরিবারের কাজেই শুধু ব্যবহার করা হয় ঘন্টাটা।'

'যেমন?' আগ্রহী হয়ে উঠেছে কিশোর

'যখন কোন প্রিন্সের অভিষেক অনুষ্ঠান হয়, মানে মুকুট পরানো হয়, তখন একশো বার বাজানো হয় ওই ঘন্টা, ধীরে ধীরে; যখন কোন রাজকুমার জন্ম নেয়, বাজানো হয় পঞ্চাশ বার, রাজকুমারী হলে পঁচিশ। রাজ-পরিবারে কারও বিয়ের সময় বাজে পঁচাত্তর বার। ঘন্টাটার শব্দ বেশ গুরুগম্ভীর, তিন মাইল দূর থেকে শোনা যায় আওয়াজ!'

'মাস্টারি লাইনে গেলেই ভাল করতে, নথি,' হাসল মুসা। 'খামোকা গোয়েন্দাগিরি করতে এসেছ।'

'চল, তৈরি হয়ে নিই,' বলল কিশোর। 'দিমিত্রির সঙ্গে দেখা করতে যেতে হবে। রয়্যাল চেম্বারলেন* খবর দিয়ে গেছে, আমাদের সঙ্গে নাস্তা করবে প্রিন্স।'

'তাই তো! খাবার কথা তো ভুলেই গিয়েছিলাম,' বলে উঠল মুসা। 'পেটের ভেতর ছুঁচোর কেত্তন শুরু হয়ে গেছে।'

'তাড়াহুড়া করে লাভ হবে না,' বলল কিশোর। 'এ তোমার নিজের বাড়ি নয় যে যা খুশি করতে পারবে। এটা রাজবাড়ি, এখানে কিছু নিয়ম-কানুন আছে। ওগুলো মেনে চলতে হবে। খিদে লাগলেই খেতে বসে যেতে পারবে না। ওদের সময় হলে ডাকবে।' মুষড়ে পড়া মুসার দিকে চেয়ে হাসল। 'এস, বসে না থেকে যন্ত্রপাতিগুলো ঠিকঠাক করে রাখি। দেখতে হবে, সত্যিই কাজ করে কিনা ওগুলো। ভুলে যেয়ো না মস্ত দায়িত্ব নিয়ে এসেছি আমরা।'

কিশোরের পেছন পেছন ঘরে এসে ঢুকল ওরা আবার। মস্ত একটা ঘর উঁচু ছাত। পাথরের দেয়াল কাঠের তক্তায় ঢাকা। হাত পিছলে যায়, এত মসৃণ। ছয় ফুট চওড়া বিশাল এক পালঙ্ক, একটাতেই তিনজনে ঘুমিয়েছে ওরা। ওটার মাথার দিকে দেয়ালের গায়ে একটা খোদাই কাজ, রাজপরিবারের প্রতীক চিহ্ন।

একটা টেবিলের ওপর রয়েছে ওদের ব্যাগ। গত রাতে শুধু পাজামা আর টুথব্রাশ বের করেছিল।

---

* রাজ পরিবারের লোকজন আর বাড়িঘর দেখাশোনার ভার থাকে যার ওপর। আগের দিনে আমাদের দেশে জমিদারদের যেমন 'সরকার' থাকত অনেকটা তেমনি।

অনেক রাতে রাজপ্রাসাদে পৌঁছেছে ওরা গতকাল। নিউ ইয়র্ক থেকে জেট প্লেনে প্যারিস, সেখান থেকে বিরাট এক হেলিকপ্টারে চেপে এসে নেমেছে ভেনজোর খুদে বিমান-বন্দরে। বাইরে অপেক্ষা করছিল গাড়ি, ওদেরকে অভ্যর্থনা করে গাড়িতে তুলেছে রয়্যাল চেম্বারলেন। বিশেষ মীটিঙে ছিল তখন দিমিত্রি বন্ধুদের সঙ্গে রাতে দেখা করতে অসংখ্য থাম আর অনেক গলিঘুঁজি পেরিয়ে (মুসার মনে হয়েছে কয়েক মাইল পথ) এই বেডরুমে পৌঁছে দিয়ে গেছে ওদেরকে চেম্বারলেন। এতই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল ওরা, কোনমতে পোশাক ছেড়ে, পাজামা পরে, দাঁত মেজেছে। তারপরই এসে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়েছে বিছানায়।

ব্যাগ খুলে জামাকাপড় বের করল ওরা। গোছগাছ করল। প্রায় পাঁচশো বছরের পুরানো একটা দেয়াল আলমারিতে তুলে রাখল ওগুলো। অন্যান্য জিনিসপত্রও সব তুলে রাখল আলমারির তাকে, তিনটে জিনিস ছাড়া।

তিনটে ক্যামেরা। দেখতে আর সব ক্যামেরার মতই, তবে ছবি তোলা ছাড়াও আরও কিছু কাজ করে ওগুলো। বেশ বড়সড়, দামি জিনিস। চাঁদিতে বিচিত্র ফ্ল্যাশার। রেডিও হিসেবেও ব্যবহার করা যায় ক্যামেরাগুলোকে। ভেতরে বসানো আছে আধুনিক সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি, শক্তিশালী একটা ওয়্যারলেস সেট ফ্ল্যাশারটা অ্যান্টেনারও কাজ করে। ছবি তোলার ভঙ্গিতে ওই ক্যামেরা চোখের সামনে তুলে খুব নিচু গলায় কথা বললেও সেটা পৌঁছে যাবে মাইল দশেক দূরের গ্রাহকযন্ত্রে। শুধু পাঠানই না, মেসেজ ধরতেও পারে পরিষ্কার। বন্ধ ঘরের ভেতর থেকেও এর সীমানা দুই মাইল।

মাত্র দুই ব্যাণ্ডের কমুনিকেশন, নির্দিষ্ট একটা চ্যানেলে যাতায়াত করে এর শব্দ, ঠিক ওই চ্যানেলেই টিউন করা না থাকলে কোন রেডিও বা গ্রাহকযন্ত্রই ধরতে পারবে না মেসেজ। অসাধারণ একটা যন্ত্র। ওদের জানামতে এমন আর একটা মাত্র যন্ত্র আছে সারা ভ্যারানিয়ায়, সেটা আমেরিকান এমব্যাসিতে, বব ব্রাউনের কাছে।

লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে একই প্লেনে তিন গোয়েন্দার সঙ্গে নিউ ইয়র্কে পৌঁছেছে বব। সেখানে একটা বিশেষ অফিসে নিয়ে গেছে তিন কিশোরকে। যন্ত্রপাতিগুলো দিয়েছে, কি করে ব্যবহার করতে হয় শিখিয়েছে। বলেছে, ওদের কাছাকাছিই থাকবে সে সব সময়, তবে এমন ভান করবে, যেন চেনে না। যোগাযোগ করতে হলে, কোন কিছুর দরকার পড়লে, রেডিওতে জানাতে হবে। এছাড়াও রোজ রাতে নিয়মিত একবার যোগাযোগ করে খবরাখবর জানাতে হবে তাকে।

বিপদ আর পরিস্থিতির গুরুত্ব সম্পর্কে বার বার হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেছে, 'হয়ত, সব কিছুই খুব সহজে হয়ে যাবে। কোনরকম বিপদ ঘটবে না। অভিষেক হয়ে যাবে, মাথায় মুকুট পড়বে নতুন প্রিন্স দিমিত্রি। তবে, সে আশা খুবই কম।...না না কোন প্রশ্ন নয়। যা বলছি, শুনে যাও চুপচাপ। নিজেদের ব্যাপারে

বাইরের কারোর নাক গলানো মোটেই পছন্দ করে না ভ্যারানিয়ানরা। ক্যামেরা সঙ্গে নিয়ে ঘুরবে তোমরা, ছবি তুলবে। সতর্ক থাকবে সব সময়। আমেরিকান এমব্যাসিতে থাকব আমি। যখন খুশি যোগাযোগ করতে পারবে। এখানেই আমার সঙ্গে তোমাদের হয়ত শেষ দেখা। আলাদা প্লেনে প্যারিসে যাব আমি, তোমাদের সঙ্গে নয়। ওখান থেকে আলাদা প্লেনে ভ্যারানিয়া। নতুন কোন কিছু জানানর দরকার পড়লে রেডিওতে জানাব, ওখানে পৌঁছে। তোমাদের সাঙ্কেতিক নাম, ফার্স্ট, সেকেণ্ড এবং রেকর্ড, ঠিক আছে?' কপালের ঘাম মুছেছে বব।

মাথা ঝোঁকানর সময় কিশোরও ঘাম মুছেছে। এয়ারকণ্ডিশন ঘরেও ঘেমে উঠেছিল ওরা। ববের ভাবসাব দেখে ভয়ই পেয়ে গিয়েছিল তিন গোয়েন্দা। ফিসফিস করে রকি বীচে ফিরে যাবার কথাও কিশোরকে বলেছিল মুসা একবার। স্পাইদের বিপজ্জনক কাজকারবার ছবিতে অনেক দেখেছে। নিজেরাও স্পাইয়ের কাজ করবে একদিন, কল্পনাই করেনি তখন। ভাবছে এসব কথা এখন কিশোর।

তার ক্যামেরা তুলে নিয়ে চামড়ার খাপ খুলল মুসা। খাপের ভেতরে তলায় কায়দা করে বসানো ছোট আরেকটা খাপ। ওতে একটা খুদে টেপ-রেকর্ডার। বেশ শক্তিশালী। হাতে নিয়ে ওটা একবার দেখেই রেখে দিল আবার জায়গামত।

'দিমিত্রির সঙ্গে দেখা করার আগে,' নীরবতা ভাঙল মুসা, 'একবার বব ব্রাউনের সঙ্গে কথা বললে কেমন হয়? যন্ত্রপাতিগুলো সত্যি কাজ করছে কিনা, শিওর হওয়া যায়।'

'ভাল বলেছ,' সায় দিল কিশোর। 'ব্যালকনিতে গিয়ে ঘড়বাড়িগুলোর একটা ছবি তুলে আনি।'

ক্যামেরা হাতে ব্যালকনিতে এসে নামল কিশোর। চামড়ার খাপ খুলে বের করল যন্ত্রটা। চোখের সামনে ধরে তাকাল দূরের সেইন্ট ডোমিনিক গির্জার দিকে। টিপে দিল রেডিওর বোতাম।

'ফার্স্ট বলছি,' ভিউ ফাইণ্ডারের দিকে চেয়ে নিচু গলায় বলল কিশোর। 'ফার্স্ট রিপোর্টিং, শুনতে পাচ্ছেন?'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জবাব এল। মাত্র তিন হাত দূরে দাঁড়িয়ে আছে যেন কণ্ঠস্বরের মালিক। 'শুনতে পাচ্ছি,' বব ব্রাউনের গলা, ঠিক চেনা যাচ্ছে। 'কোন কথা আছে?'

'যন্ত্রটা পরীক্ষা করছি। প্রিন্স দিমিত্রির সঙ্গে দেখা হয়নি এখনও। একসঙ্গে নাস্তা করব।'

'ভাল। সতর্ক থাকবে। আমাকে সব সময়ই পাবে। ওভার অ্যাণ্ড আউট।'

'চমৎকার!' আপন মনেই বলল কিশোর। আবার এসে ঢুকল ঘরে। ঠিক এই সময় দরজায় টোকার শব্দ হল।

দরজা খুলে দিল মুসা। দাঁড়িয়ে আছে প্রিন্স দিমিত্রি দামিয়ানি। হাসি ছড়িয়ে

পড়েছে সারা মুখে।

দু'হাত বাড়িয়ে প্রায় ছুটে এসে ঘরে ঢুকল, দিমিত্রি। খাঁটি ইউরোপীয় কায়দায় জড়িয়ে ধরল তিনজনকে। 'তোমরা এসেছ, কি যে খুশি হয়েছি!'

অভ্যর্থনার পালা শেষ হল। জিজ্ঞেস করল দিমিত্রি, 'ব্যালকনি থেকে কেমন লাগল আমার দেশ?'

'দারুণ!' বলে উঠল মুসা।

'এখনও তো কিছুই দেখনি,' বলল দিমিত্রি। 'তবে এসে যখন পড়েছ, সবই দেখতে পাবে একে একে। চল, আগে নাস্তা সেরে নিই।'

দরজা দিয়ে বাইরে উঁকি দিল দিমিত্রি। 'নিয়ে এস। জানালার ধারে বসাও।'

ঘরে এসে ঢুকল আটজন চাকর। টকটকে লাল পোশাকে সোনালি কাজ করা। বয়ে আনল একটা টেবিল, কয়েকটা চেয়ার আর রূপার ঢাকনা দেয়া কিছু প্লেট। জানালার দিকে এগিয়ে গেল।

বন্ধুদের সঙ্গে অনর্গল কথা বলে গেল দিমিত্রি।

তুষার শুভ্র লিনেনের টেবিলক্লথ বিছাল চাকররা। তার ওপর রাখল রূপার ভারি বাসনগুলো। ঢাকনা তুলতেই ঘরের বাতাসে ভুরভুর করে ছড়িয়ে পড়ল সুগন্ধ। আড়চোখে একবার টেবিলের দিকে না তাকিয়ে পারল না মুসা। ডিম আর মাংস ভাজা, টোস্ট মাখন, ভ্যারানিয়ান কেক! বড় জগে দুধ।

'খাইছে! কত খাবার!' ঢোক গিলল মুসা। 'দাদাভাইরা, আমি আর পারছি না। নাড়িভুঁড়ি সুদ্ধ হজম হয়ে যাচ্ছে খিদেয়!'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, এস,' তাড়াতাড়ি বলল দিমিত্রি। 'দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খালি বকর বকর করছি! এস, বসে পড়ি।...আরে, রবিন, তুমি কি দেখছ!'

বেশ ছড়ানো একটা মাকড়সার জালের দিকে চেয়ে আছে রবিন। তার কাছ থেকে ফুট দুয়েক দূরে, খাটের মাথার কাছে, ঘরের এক কোণে। দেয়ালে ঝুলছে জালটা। দেয়ালে বসানো তক্তা আর মেঝের মাঝখানের ফাঁকে উঁকি দিয়ে আছে একটা বড়সড় মাকড়সা। রবিন ভাবছে, দিমিত্রির অনেক চাকর-চাকরাণী আছে, অনেক কাজেই ওরা বিশেষ দক্ষ। তবে ঘর পরিষ্কারের কাজে ওরা ফাঁকি দেয়।

'ওই যে, মাকড়সার জাল,' বলল রবিন। 'দাঁড়াও, পরিষ্কার করে ফেলছি!' পা বাড়াল সে।

তিন কিশোরকে অবাক করে লাফ দিল দিমিত্রি। প্রায় উড়ে এসে পড়ল রবিনের ওপর। এক ধাক্কায় ফেলে দিল মেঝেতে, জালটা ছিঁড়ে ফেলার আগেই।

স্তব্ধ হয়ে গেছে মুসা আর কিশোর। রবিনকে টেনে তুলল দিমিত্রি । বিড়বিড় করে বলছে কি যেন, ভ্যারানিয়ান ভাষায়!

'আগেই তোমাকে সাবধান করা উচিত ছিল, আমারই ভুল হয়ে গেছে,' লজ্জিত কণ্ঠে ইংরেজিতে বলল দিমিত্রি। 'তাহলে আর এটা ঘটত না! ঈশ্বরকে

ধন্যবাদ, তোমাকে সময়মত রুখতে পেরেছি! নইলে সর্বনাশ হয়ে যেত! এখুনি তোমাকে ফেরত পাঠাতে হত আমেরিকায়।' রবিনের কাঁধে হাত রাখল সে। হঠাৎ গলার স্বর খাদে নেমে গেল। 'তবে, শুভলক্ষণ দেখা যাচ্ছে। তোমরা আমাকে সাহায্য করতে পারবে!'

ব্যথা পায়নি রবিন কোথাও। হাঁ করে চেয়ে আছে দিমিত্রির দিকে।

দরজার দিকে ঘুরল রাজকুমার। চেয়ে রইল এক মুহূর্ত। তারপর লম্বা লম্বা পায়ে নিঃশব্দে এগিয়ে গিয়ে থামল দরজার সামনে। হাতল ধরে হ্যাঁচকা টানে খুলে ফেলল। দরজায় দাঁড়িয়ে আছে লাল পোশাক পরা এক চাকর, চাকরদের সর্দার। কুচকুচে কালো চুল কালো পাকানো গোঁফ।

'রুকা, এখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন?' কড়া গলায় বলল দিমিত্রি।

'ইয়ে, মানে…ইয়োর হাইনেসের যদি কিছু দরকার হয়…'

'কিচ্ছু দরকার নেই। যাও। ঠিক আধ ঘন্টা পর এসে প্লেটগুলো নিয়ে যাবে,' খেঁকিয়ে উঠল দিমিত্রি।

মাথা নুইয়ে কুর্নিশ করল লোকটা, তারপর চলে গেল দ্রুতপায়ে।

দরজা বন্ধ করে দিল দিমিত্রি। ফিরে এল আবার তিন গোয়েন্দার কাছে। গলার স্বর খাদে নামিয়ে বলল, 'ডিউক রোজারের লোক। দরজায় কান পেতেছিল। কিছু জরুরি কথা আছে তোমাদের সঙ্গে। তোমাদের সাহায্য চাই।'

চুপ করে রইল তিন গোয়েন্দা।

'অনেক কিছুই বলার আছে,' আবার বলল রাজকুমার। 'আগে খেয়ে নিই, তারপর বলব। শুধু এটুকু জেনে রাখ, চুরি গেছে রূপালী মাকড়সা!'

চার

প্রায় নীরবে খাওয়া সারল ওরা।

ঠিক আধ ঘন্টা পর এল চাকরের দল। টেবিল-চেয়ার, প্লেট নিয়ে চলে গেল।

বাইরে একবার উঁকি দিয়ে নিশ্চিত হয়ে এল দিমিত্রি। না, করিডরে ঘোরাফেরা করছে না আর রুকা। চলে গেছে।

ঘরে চেয়ার আছে। জানালার কাছে টেনে নিয়ে গিয়ে বসল চারজনে।

'ভ্যারানিয়ার পুরানো ইতিহাস কিছু বলা দরকার আগে,' শুরু করল দিমিত্রি। 'উনিশশো পঁচাত্তর সালে, প্রিন্স পলের অভিষেকের সময় বিদ্রোহ করে বসে কিছু উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী। পালিয়ে যেতে বাধ্য হন প্রিন্স। তাঁকে ঠাই দেয় এক

---

* মধ্যযুগীয় পেশাদার গায়ক। পয়সার বিনিময়ে রাস্তায় রাস্তায় গান গেয়ে লোকের মনোরঞ্জন করত।

মমিনস্ট্রেল *পরিবার। প্রাণের তোয়াক্কা না করে প্রিন্সকে লুকিয়ে রাখে নিজেদের বাড়ির চিলেকোঠায়। সারা শহর তন্ন তন্ন করে খুঁজল বিদ্রোহীরা। মিনস্ট্রেলের বাড়িতেও খুঁজল। পেয়ে যেত, যদি না চিলেকোঠার দরজায় জাল বুনত একটা মাকড়সা! আমাদের এখানকার চিলেকোঠা আর দরজা কেমন, বলে নিই। বাড়ির ছাতে ছোট একটা বাক্সের মত তৈরি হয় এই কোঠা, জিনিসপত্র রাখার জন্যে। নিচের দিকে একটা ডালামত থাকে, ওটাই দরজা। যাই হোক, ওই ডালার নিচে বড় করে জাল বুনেছিল মাকড়সাটা! দেখে মনে হয়েছে, অনেকদিন চিলেকোঠার ডালা খোলা হয়নি। ফলে ওখানে আর খুঁজে দেখেনি বিদ্রোহীরা।

'তিনটে দিন আর রাত ওই চিলেকোঠায় বন্দি হয়ে রইলেন প্রিন্স। খাওয়া নেই, পানি নেই, কিচ্ছু নেই। জাল ছিঁড়ে যাবার ভয়ে ডালা খোলেনি মিনস্ট্রেলরা, খাবার দিতে পারেনি। অবশেষে সুযোগ বুঝে চিলেকোঠা থেকে বেরিয়ে এলেন প্রিন্স। কোনমতে গিয়ে পৌঁছুলেন গির্জায়। ঘন্টা বাজিয়ে ডাকলেন ভক্তদের, জানালেন তিনি বেঁচে আছেন। দমন হয়ে গেল বিদ্রোহ।

'সিংহাসনে বসে প্রথমেই স্বর্ণকারকে ডাকালেন প্রিন্স। একটা রূপার মাকড়সা বানিয়ে দিতে বললেন। সোনার চেনে আটকে লকেটের মত ঝুলিয়ে রাখবেন গলায়। ভ্যারানিয়ার রাজ পরিবারের সীলমোহরে ব্যবহার হতে লাগল মাকড়সার প্রতীক। জাতীয় প্রাণী হিসেবে মর্যাদা পেল মাকড়সা। ধরে নেয়া হল, ওই বিশেষ জাতের মাকড়সা ভ্যারানিয়ার সৌভাগ্য বহন করছে। ওদের মারা নিষিদ্ধ করে দেয়া হল। শুধু তাই না, যারা একে মারবে, রাজদ্রোহী হিসেবে গণ্য করা হবে তাদের। এরপর থেকেই বাড়িতে রূপালী মাকড়সার জাল ছেঁড়া বন্ধ করে দিল গৃহবধূরা। যত ময়লাই করে রাখুক, প্রাণীটাকে মারে না তারা।'

'আমার মা ভ্যারানিয়ায় থাকলে কবে ফাঁসি হয়ে যেত,' বলে উঠল মুসা। 'কোন আইন করেই মাকড়সার জাল ছেঁড়া বন্ধ করানো যেত না তাকে দিয়ে। মার ধারণা, মাকড়সা একটা অতি নোংরা জীব, বিষাক্ত।'

'অথচ, ওরা ঠিক এর উল্টো,' মুসার কথার পিঠে কথা বলল কিশোর! 'খুবই পরিষ্কার প্রাণী। সব সময় নিজেদেরকে পরিচ্ছন্ন রাখে। সব মাকড়সাই বিষাক্ত নয়। ব্ল্যাক উইডো স্পাইডারের কথা বলতে পার, তবে ওরা শুধু শুধু কামড়ায় না। বেশি বিরক্ত করলে তো তুমিও কামড়াতে আসবে, উইডোর আর কি দোষ? টারান্টুলার এত কুখ্যাতি, কিন্তু আসলে ওরাও তত বিপজ্জনক নয়। মানুষকে এড়িয়ে চলতেই ভালবাসে। ইউরোপের বেশির ভাগ মাকড়সাই কোন ক্ষতি করে না মানুষের। বরং পোকামাকড় খেয়ে উপকারই করে।'

'ঠিক,' একমত হল দিমিত্রি। 'মানুষের ক্ষতি করে এমন কোন মাকড়সা নেই ভ্যারানিয়ায়। এখানে প্রিন্স পলের মাকড়সাই সবচেয়ে বড়, খুব সুন্দর। কালোর ওপর সোনালি দাগ। বাইরে থাকতেই পছন্দ করে, তবে মাঝেসাঝে এসে ঘরের

ভেতর জাল পাতে। যে জালটা তুমি ছিঁড়ে ফেলতে যাচ্ছিলে, রবিন, ওটা প্রিন্স পলের মাকড়সার। তোমাদের ঘরের ভেতর এসেছে, তারমানে শুভলক্ষণ বয়ে এনেছ তোমরা আমার জন্যে।'

'আমাকে বাধা দিয়ে ভালই করেছ,' বলল রবিন। 'কিন্তু তোমার অসুবিধেটা কি?'

ইতস্তত করল দিমিত্রি। তারপর মাথা নাড়ল। 'ভ্যারানিয়ায় কোন প্রিন্সের অভিষেকের সময় অবশ্যই ওই রূপালী মাকড়সা গলায় ঝোলাতে হবে তাকে। নইলে মুকুটই পরানো হবে না। আর দু'হপ্তা পরে অনুষ্ঠান, কিন্তু হবে না। আমি জানি।'

'কেন?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'কারণ মাকড়সাটা চুরি গেছে,' দিমিত্রির হয়ে বলল কিশোর। 'ওটা গলায় না ঝোলাতে পারলে অভিষেক হবে না।'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝোঁকাল দিমিত্রি। 'আসলটা নিয়ে তার জায়গায় একটা নকল মাকড়সা রেখে গেছে চোর। নকল দিয়ে চলবে না। কাজেই, দু'হপ্তার আগেই আসলটা খুঁজে পেতে হবে আমাকে। চুরি গেছে, এটা কাউকে জানাতে পারব না। আমাকে অলক্ষুণে ধরে নেবে দেশের লোক। এবং তাহলেই সর্বনাশ। কোনদিনই আর প্রিন্স হতে পারব না আমি,' থামল সে। এক মুহূর্ত কি ভাবল। তারপর বলল, 'হয়ত ভাবছ, সামান্য একটা রূপার মাকড়সা নিয়ে এত বাড়াবাড়ি কেন? দেশটা আমাদের পুরানো, প্রাচীন রীতিনীতি এখনও মেনে চলি আমরা। ছাড়তে পারব না কিছুতেই,' একে একে তিনজনের দিকেই তাকাল রাজকুমার। 'তোমরা আমার বন্ধু। মাকড়সাটা খুঁজতে সাহায্য করবে আমাকে?'

কেউ কোন জবাব দিল না।

নিচের ঠোঁটে একনাগাড়ে চিমটি কাটছে কিশোর।

'দিমিত্রি,' অবশেষে কথা বলল গোয়েন্দাপ্রধান। 'জিনিসটা কি জ্যান্ত মাকড়সার সমান?'

মাথা ঝোঁকাল দিমিত্রি। 'হ্যাঁ।'

'তারমানে খুবই ছোট। লুকিয়ে রাখা সহজ। নষ্টও করে ফেলে থাকতে পারে।'

'তা মনে হয় না,' বলল দিমিত্রি। 'যে-ই নিয়েছে, বুঝেশুনেই নিয়েছে। ওটা তার দরকার। আমার মনে হয় লুকিয়েই রেখেছে। তবে, মস্ত বড় ঝুঁকি নিয়েছে চোর। ধরা পড়লে, এর একমাত্র শাস্তি, মৃত্যুদণ্ড। ডিউক রোজার হলেও মাফ নেই।'

চুপ করে রইল তিন গোয়েন্দা।

জোরে একবার শ্বাস নিল দিমিত্রি। 'আমার সমস্যার কথা বললাম। কি করে

সাহায্য করবে, বলতে পারব না। একটা লোক প্রস্তাব দিয়েছিল, অভিষেক অনুষ্ঠানে তোমাদেরকে দাওয়াত দিতে। প্রস্তাবটা লুফে নিয়েছি আমি তোমাদের সাহায্য পাব বলেই। এখানে কেউ জানে না, তোমরা গোয়েন্দা। কাউকে জানানোও হবে না।' কিশোরের দিকে তাকাল রাজকুমার। 'তো, করবে সাহায্য?'

'জানি না!' অনিশ্চিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল গোয়েন্দাপ্রধান। 'ছোট্ট একটা রূপার মাকড়সা, যেখানে খুশি লুকিয়ে রাখা যায়। খুঁজে বের করা প্রায় অসম্ভব। তবে, চেষ্টা করতে পারি আমরা। প্রথমে দেখতে হবে, জিনিসটা কেমন, কোন্ জায়গা থেকে চুরি হয়েছে। নকলটা দেখে চেহারা বোঝা যাবে আসলটার?'

'যাবে। নকল করা হয়েছে নিখুঁতভাবে। এস, দেখাব।'

ক্যামেরা তুলে নিল তিন গোয়েন্দা। দিমিত্রির পিছু পিছু বেরিয়ে এল করিডরে।

ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে চওড়া আরেকটা করিডরে নেমে এল ওরা। মেঝে, ছাত, দু'পাশের দেয়াল, সব পাথরের।

'তিনশো বছর আগে তৈরি হয়েছে এই প্যালেস,' হাঁটতে হাঁটতে বলল দিমিত্রি। তারও আগে একটা দুর্গ ছিল এখানে। ভেঙে পড়েছিল। ওটাকেই মেরামত করে, সংস্কার করে, তার সঙ্গে আরও কিছু ঘর যোগ করে হয়েছে এই প্যালেস। ডজন ডজন খালি ঘর পড়ে আছে এখনও। বিশেষ করে, ওপরের দুটো তলায় যায়ই না কেউ। এতবড় বাড়ি ঠিকঠাক রাখতে হলে অনেক চাকর-বাকরের দরকার। ওদের পেছনে খরচ করার মত টাকা রাজপরিবারের নেই। তাছাড়া, ওই ঘরগুলো ভীষণ ঠাণ্ডা। আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে গরমের ব্যবস্থা করতে অনেক টাকা দরকার।'

আগস্টের এই উত্তপ্ত সকালেও বাড়িটার ভেতরে খুব ঠাণ্ডা। শীতকালে কি ভীষণ অবস্থা হবে, অনুমান করতে অসুবিধে হল না তিন গোয়েন্দার।

'দুর্গের ডানজন আর মাটির তলার ঘরগুলো আজও আগের মতই রয়েছে,' আরেক সারি সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে বলল দিমিত্রি। 'অসংখ্য গোপন পথ, দরজা, সিঁড়ি রয়েছে ওগুলোতে যাবার। আমিই চিনি না সবগুলো। ঢুকলে সহজেই হারিয়ে যাব, বেরিয়ে আসতে পারব না আর।' হাসল রাজকুমার 'হরর ছবি শূটিঙের চমৎকার জায়গা। গোপন দরজা আর সুড়ঙ্গ দিয়ে ভূত আসবে-যাবে খুব বিশ্বাসযোগ্য মনে হবে। না না, ওরকম চমকে উঠ না,' মুসার দিকে চেয়ে বলল সে। ভূত নেই প্যালেসে…ওই যে, ডিউক রোজার আসছে।'

আরেকটা করিডরে এসে শেষ হয়েছে সিঁড়ি। লম্বা একজন লোককে তাড়াহুড়া করে আসতে দেখা গেল। সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল লোকটা, মাথা সামান্য নুইয়ে অভিবাদন করল দিমিত্রিকে।

'গুডমর্নিং, দিমিত্রি,' বলল ডিউক রোজার। 'এটাই আপনার আমেরিকান

বন্ধু?' শীতল কণ্ঠস্বর। তার সঙ্গে মানিয়ে গেছে তার একহারা দীর্ঘ গড়ন, আর ঈগলের ঠোঁটের মত বাঁকানো নাকের নিচে ঝুলে পড়া কালো একজোড়া গোঁফ।

'গুড মর্নিং, ডিউক রোজার,' বলল দিমিত্রি। 'ঠিকই ধরেছেন। ওরাই আমার বন্ধু।' পরিচয় করিয়ে দিল, 'কিশোর পাশা…মুসা আমান…রবিন মিলফোর্ড। সবাই এসেছে ক্যালিফোর্নিয়া থেকে।'

তিনজনের দিকে চেয়ে প্রতিবারে ইঞ্চিখানেক করে মাথা নোয়াল রোজার। তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে আছে।

'ভ্যারানিয়ায় স্বাগতম! বলল ডিউক রোজার। একেবারে মাপজোক করা কথাবার্তা। 'বন্ধুদেরকে দুর্গ দেখাতে নিয়ে যাচ্ছেন?'

'মিউজিয়মে নিয়ে যাচ্ছি,' বলল দিমিত্রি। 'আমাদের দেশের ইতিহাস জানতে খুব আগ্রহী ওরা।' বন্ধুদের দিকে ফিরে বলল, 'ডিউক রোজার বুরবন, ভ্যারানিয়ার বর্তমান রিজেন্ট। শিকারে গিয়ে মারা পড়েছিল আমার বাবা। তারপর থেকেই প্রিন্সের প্রতিনিধি হয়ে রাজ্যশাসন করে আসছে…'

'প্রিন্স,' বলে উঠল রোজার, 'আমি সঙ্গে আসব? মেহমানদের প্রতি একটা সৌজন্যবোধ আছে আমাদের। আপনি একা গেলে, ভাল দেখায় না।'

'ঠিক আছে,' রাজি হল দিমিত্রি। কিন্তু বুঝতে অসুবিধে হল না তিন গোয়েন্দার, রোজারকে সঙ্গে নেবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই রাজকুমারের। 'কিন্তু বেশিক্ষণ আমাদের সঙ্গে থাকার দরকার নেই আপনার। কাজের ক্ষতি হবে। তাছাড়া একটু পরেই কাউন্সিল মীটিঙে বসতে হবে।'

'হ্যাঁ,' পেছনে পেছনে আসছে রোজার। 'অভিষেক অনুষ্ঠানে কি কি করতে হবে না হবে, সব ঠিক করতে হবে আজই। তা হলেও, কিছুটা সময় দিতে পারব এখন।'

আর কিছু বলল না দিমিত্রি। বন্ধুদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। করিডরের একপাশে একটা দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। তাদেরকে নিয়ে ঢুকে পড়ল বিশাল এক ঘরে।

অনেক উঁচু ছাত, দোতলার সমান। দেয়ালে দেয়ালে ঝুলছে ছবি। কাচের বাক্সে বোঝাই হয়ে আছে পুরো ঘরটা। প্রাচীন সব ঐতিহাসিক জিনিস রক্ষিত রয়েছে ওগুলোতে। পতাকা, শীল্ড, মেডাল, বই এবং অন্যান্য আরও অনেক জিনিস। প্রতিটি বাক্সের গায়ে একটা করে সাদা কার্ড সাঁটা, তাতে ইংরেজিতে টাইপ করে লেখা রয়েছে, ভেতরের জিনিসগুলোর নাম এবং সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

একটা বাক্সে একটা ভাঙা তলোয়ার। ওটার ওপর ঝুঁকে দাঁড়াল তিন গোয়েন্দা। কার্ডের লেখা পড়ে জানল, ওটা প্রিন্স পলের তলোয়ার। ১৬৭৫-এ ওটা দিয়েই যুদ্ধ করেছিলেন তিনি।

'এই যে, এই ঘরটাতেই রয়েছে আমাদের জাতির পুরো ইতিহাস,' পেছন

থেকে বলে উঠল ডিউক রোজার। 'ছোট্ট দেশ, ক্ষুদ্র একটা জাতি আমরা, ইতিহাস তেমন কিছুই থাকার কথা না। নেইও। বিশাল এক দেশ থেকে এসেছেন, এসব নিশ্চয় ভাল লাগবে না। মনে হবে, অনেক বেশি প্রাচীন।'

'না না,' মোলায়েম গলায় বলল কিশোর। 'মহান এক জাতি বলেই মনে হচ্ছে ভ্যারানিয়ানরা। বেশ ভাল লাগছে আমার।'

'আপনার দেশের অনেকের কাছেই আমাদের রীতিনীতি পছন্দ না,' বলল রোজার। 'মধ্যযুগীয় বর্বর বলে হাসাহাসি করে। এখন ভাল বলছেন বটে, তবে শিগগিরই বিরক্ত হয়ে যাবেন।...ও হ্যাঁ, আমার এখুনি যেতে হবে। মীটিঙের দেরি হয়ে যাবে নইলে।'

কারও কিছু বলার অপেক্ষা করল না ডিউক। ঘুরে হাঁটতে শুরু করল।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল রবিন। 'শিওর, ও আমাদেরকে পছন্দ করেনি!' নিচু গলায় বলল।

'কারণ, তোমরা আমার বন্ধু,' যোগ করল দিমিত্রি। 'আমার কোন বন্ধু থাকুক, চায় না সে। ওর ইচ্ছের বিরুদ্ধে চলি, কিংবা কথা বলি, এটাও অপছন্দ। বাদ দাও ওর কথা। এস, প্রিন্স পলের ছবি দেখাচ্ছি।'

দেয়ালে ঝোলানো লাইফ-সাইজ একটা ছবির সামনে নিয়ে এল ওদেরকে দিমিত্রি। দক্ষ শিল্পীর হাতে আঁকা। উজ্জ্বল লাল পোশাকে সোনালি বোতাম, হাতের তলোয়ারের মাথা মেঝের দিকে। সম্ভ্রান্ত চেহারা, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। অন্য হাতটা সামনের দিকে বাড়ানো। তাতে বসে আছে একটা মাকড়সা। সত্যিই সুন্দর, কালোর ওপর সোনালি ছোপ ছোপ।

'আমার পূর্বপুরুষ,' গর্বিত কণ্ঠে বলল দিমিত্রি। 'অপরাজেয় প্রিন্স পল। হাতে যেটা দেখছ, ওরকম একটা মাকড়সা প্রাণ বাঁচিয়েছিল তাঁর।'

ছবিটা দেখছে তিন গোয়েন্দা। পেছনে কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে।

ঘরে এসে ঢুকেছে দর্শকরা। বিভিন্ন ভাষায় কথা হচ্ছে, তারমাঝে ইংরেজিও আছে। বেশির ভাগই টুরিস্ট। কাঁধে ঝোলানো ক্যামেরা, হাতে গাইড বুক। দরজায় দাঁড়িয়েছে এসে দু'জন প্রহরী। হাতে বল্লম। পরনে তিনশো বছর আগের ছাঁটের ইউনিফর্ম। সেই পুরানো কায়দায় ক্রস বানিয়ে ধরে রেখেছে দুটো বল্লম, কেউ ঢুকতে কিংবা বেরোতে গেলেই সালাম ঠুকে সরিয়ে নিচ্ছে। পেছনে ফিরে একবার দেখল মুসা, তারপর আবার তাকালেন ছবির দিকে।

চার কিশোরের ঠিক পেছনে এসে দাঁড়াল এক আমেরিকান দম্পতি।

'বিচ্ছিরি!' কানের কাছে কথা শোনা গেল মহিলার। 'দেখছ কি জঘন্য একটা মাকড়সা হাতে নিয়েছে!'

'শ্‌শ্‌শ্‌!' চাপা পুরুষ-কণ্ঠ। 'আস্তে বল! কেউ শুনে ফেলবে! ওটা ওদের জাতীয় জীব, সৌভাগ্য বয়ে আনে। বাজে মন্তব্য কোরো না!'

'আমি ওসব কেয়ার করি না,' উদ্ধত কণ্ঠ মহিলার। 'সামনে পড়লে সেফ জুতো দিয়ে মাড়িয়ে।'

মুচকে হাসল মুসা আর রবিন। চোখ জ্বলে উঠল একবার দিমিত্রির। চারজনেই সরে এল ওখান থেকে।

ঘরের প্রায় প্রতিটি জিনিসই দেখল ওরা একনজর। একটা দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। বল্লম হাতে দাঁড়িয়ে আছে একজন প্রহরী।

'ভেতরে ঢুকব, সার্জেন্ট,' গম্ভীর হয়ে বলল দিমিত্রি।

জোরে বুট ঠুকে স্যালুট করল প্রহরী। 'ইয়েস, স্যার!' জায়গা ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়াল এক পাশে।

চাবি বের করল দিমিত্রি। ঢুকিয়ে দিল তালায়।

ঠেলা দিতেই খুলে গেল পেতলের ফ্রেমে আটকানো ভারি কাঠের দরজা। ছোট আরেকটা ঘরে এসে দাঁড়াল চারজনে। ওপাশে আরেকটা দরজা। কম্বিনেশন লক। খুলল ওটা দিমিত্রি। আরেকটা ঘর, উল্টো পাশে আরেকটা দরজা, লোহার গ্রিলের। ওটাও খুলল সে।

ছোট, আট বাই আট ফুট একটা ঘরে এসে দাঁড়াল ওরা। ব্যাংকে মাটির তলায় টাকা রাখার একটা গুদাম যেন। ভল্ট।

একপাশে দেয়াল ঘেঁষে রাখা কাচের আলমারি। তাতে রাজপরিবারের গহনাপাতি, মুকুট, রাজদণ্ড, বেশ কিছু নেকলেস এবং আঙটি।

'রানীর জন্যে,' আঙটি আর নেকলেসগুলো দেখিয়ে বলল দিমিত্রি। 'আগেই বলেছি, আমরা ধনী নই। খুব সামান্যই গহনা আছে। ওগুলোকেই ভালমত পাহারা দিয়ে রাখার ব্যবস্থা করেছি আমরা। চল, আসল জিনিস দেখাই।'

ঘরের ঠিক মাঝখানে রাখা একটা কাচের দেরাজ। ভেতরে সুন্দর একটা স্ট্যাণ্ড। তাতে রূপার চেনে ঝুলছে মাকড়সাটা। চোখে বিস্ময় তিন কিশোরের। একেবারে জ্যান্ত মনে হচ্ছে জিনিসটাকে।

'রূপার ওপর এনামেল,' বলল দিমিত্রি। 'কালো এনামেলের ওপর সোনালি ছোপ দেয়া হয়েছে। আসলটা এরচেয়ে অনেক সুন্দর।'

নকলটা দেখেই অবাক হয়ে গেছে তিন গোয়েন্দা। আসলটা কত সুন্দর? এপাশ থেকে ওপাশ থেকে, ওপর থেকে নিচ থেকে, সব দিক থেকেই জিনিসটাকে খুঁটিয়ে দেখল ওরা। যাতে দেখামাত্র চিনতে পারে আসলটা, অবশ্য যদি কপাল গুণে পায় ওরা!

'গত হপ্তায় চুরি হয়েছে জিনিসটা,' তিক্ত কণ্ঠে বলল দিমিত্রি। 'আমার সন্দেহ ডিউক রোজারকে। একমাত্র ওর পক্ষেই অকাজটা করা সম্ভব। কিন্তু প্রমাণ ছাড়া কিছু বলতে পারব না। ভ্যারানিয়ার রাজনৈতিক অবস্থা এমনিতেই খুব নাজুক। সুপ্রীম কাউন্সিলের সব মেম্বারই রোজারের লোক। ধরতে গেলে কোন ক্ষমতাই নেই

এখন আমার। ওরা চায় না, আমি প্রিন্স হই। সবরকমে বাঁধা দেবার জন্যে তৈরি হচ্ছে। তার প্রথম ধাপ, এই চুরি। সরিয়ে ফেলা হল রূপালী মাকড়সা,' জোরে একবার শ্বাস টানল সে। 'আর বেশিক্ষণ থাকতে পারব না। একটা মীটিঙ আছে আমার। বাইরে বোরোতে পারব না তোমাদের সঙ্গে। শহর দেখতে চাইলে, তোমাদেরকে একা যেতে হবে। রাতে, ডিনারের পর দেখা হবে আবার।'

ভল্ট থেকে বেরিয়ে এল ওরা। প্রতিটি দরজায় তালা লাগাল দিমিত্রি। মিউজিয়মে বেরিয়ে এল বন্ধুদের নিয়ে। করিডরে বেরিয়ে হাত মেলাল। কোন পথে বেরোতে হবে প্রাসাদ থেকে বলে দিল। বলে দিল, কোথায় গাড়ি অপেক্ষা করবে।

'ড্রাইভারের নাম মরিডো,' বলল দিমিত্রি। 'আমার খুব বিশ্বাসী। ওর সঙ্গে যেতে পার তোমরা নিশ্চিন্তে।' একটু থেমে বলল, 'রাজকুমার হয়ে জন্মানো খুবই বিরক্তির ব্যাপার। জীবনের কোন স্বাদ নেই। তবু চিরদিন তাই থাকতে হবে আমাকে। যাকগে, ঘুরে এস। রাতে দেখা হবে।'

ঘুরে করিডর ধরে হাঁটতে শুরু করল দিমিত্রি। লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে গেল দ্রুত।

মাথা চুলকাল রবিন। 'কিশোর, কি মনে হয়? মাকড়সাটা খুঁজে বের করতে পারব?'

ঠোঁট বাঁকাল কিশোর, কাঁধ ঝাঁকাল। জোরে একবার শ্বাস টেনে বলল, 'জানি না! কোন উপায় দেখছি না আমি!'

পাঁচ

শহরের ভেতর দিয়ে ছুটে চলেছে গাড়ি।

দু'ধারের দৃশ্য বেশ লাগছে ছেলেদের কাছে। ক্যালিফোর্নিয়ায়, সব কিছুই নতুন। এখানে ঠিক তার উল্টো। সব কিছুই অবিশ্বাস্য রকমের পুরানো। পাথরের তৈরি বাড়িঘর, কোথাও কোথাও হলুদ ইটের। বেশির ভাগ ছাত লাল টালির। প্রতিটি ব্লকের পর একটা করে ফোয়ারা। ঝাঁকে ঝাঁকে কবুতর দেখা যাচ্ছে এদিক ওদিক। সেইন্ট ডোমিনিকের সামনের আঙিনাতেই রয়েছে কয়েকশো।

পুরানো একটা ছাতখোলা বেড়ানর-গাড়ি। ড্রাইভার এক তরুণ, সবে কৈশোর পেরিয়েছে। চমৎকার ইংরেজি বলে। নাম, মরিডো। গাড়িতে ওঠার পর পরই নিচু গলায় জানিয়েছে, তাকে নিশ্চিন্তে বিশ্বাস করতে পারে তিন কিশোর। প্রিন্স দিমিত্রিও তাকে খুবই বিশ্বাস করেন। ফিটফাট পোশাক পরনে।

ডেনজোর বাইরে পাহাড়ের কাছে চলে এল গাড়ি। পাহাড়ী পথ ধরে উঠে গেল ওপরে। গাড়ি থেকে নেমে চূড়ায় গিয়ে উঠল তিন গোয়েন্দা। ওখান থেকে ডেনজো নদী আর শহরের বেশ কয়েকটা ছবি তুলল। ফিরে এসে গাড়িতে উঠল

আবার। চলতে শুরু করল গাড়ি।

'আমাদেরকে অনুসরণ করা হচ্ছে,' নিচু গলায় বলল মরিডো। 'প্যালেস থেকে রেরোনর পর পরই পিছু নিয়েছে। পার্কে নিয়ে যাচ্ছি আপনাদের। ঘোরাফেরা করবেন, বিভিন্ন জিনিস দেখবেন। অনেক মজার জিনিস আছে। সাবধান, পেছনে ফিরে তাকাবেন না একবারও। ওদেরকে দেখে ফেলেছি, ঘুণাক্ষরেও বুঝতে দেবেন না।'

খুব কঠিন নির্দেশ! অনুসরণ করছে জানা সত্ত্বেও পেছনে ফিরে চাইতে পারবে না। কিন্তু কারা অনুসরণ করছে? কেন?

'কি ঘটছে, জানতে পারলে ভাল হত,' পথের দিকে চেয়ে আছে মুসা। 'কেন আমাদেরকে অনুসরণ করছে? আমরা তো তেমন কিছুই জানি না!'

'কেউ একজন হয়ত ভাবছে, জানি,' বলল কিশোর।

'এবং জানলে সত্যি ভাল হত,' যোগ করল রবিন।

গাড়ি দাঁড় করিয়ে দিল মরিডো। বেশ বড় একটা জায়গায় পৌঁছে গেছে ওরা। প্রচুর গাছপালা। লোকের ভিড়। বাজনায় মৃদু শব্দ ভেসে আসছে।

'এটা আমাদের প্রধান পার্ক,' গাড়ির দরজা খুলতে খুলতে বলল মরিডো। 'ধীরে ধীরে হেঁটে মাঝখানে চলে যান। পেরিয়ে যাবেন ব্যাণ্ডস্ট্যাণ্ড। দড়াবাজ আর ভাঁড়দের কাছে গিয়ে দাঁড়াবেন। ছবি তুলবেন। তারপর গিয়ে দাঁড়াবেন বেলুন বিক্রি করছে যে মেয়েটা, তার কাছে। ছবি তোলার প্রস্তাব দেবেন। আমি এখানেই অপেক্ষা করছি। আবার বলছি পেছনে তাকাবেন না। কোনরকম দুশ্চিন্তা করবেন না, অন্তত এখনও না।

'এখনও না!' মরিডোর কথার প্রতিধ্বনি করল যেন মুসা। গাছপালার ভেতর দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে। জোরাল হচ্ছে বাজনার শব্দ। 'পেছনে ফিরে তাকাব না। কত আর সামনে তাকিয়ে থাকা যায়!'

'দিমিত্রিকে কি করে সাহায্য করতে পারি আমরা?' নিচু গলায় বলল রবিন। 'অন্ধকারে হাতড়ে মরছি! শূন্য, কিছুই ঠেকছে না হাতে!'

'অপেক্ষা করতে হবে,' শান্ত কণ্ঠে বলল কিশোর।"আমার ধারণা, কারও সঙ্গে যোগাযোগ করছি কি না, দেখার জন্যেই অনুসরণ করা হচ্ছে।'

আরও খানিকটা হেঁটে একটা খোলা জায়গায় এসে দাঁড়াল ওরা। ঘাসের ওপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে আছে অনেক লোক। খুদে একটা ব্যাণ্ডস্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে আছে আটজন বাদক, হাতে নানারকম বাদ্যযন্ত্র। পরনে বিচিত্র উজ্জ্বল রঙের পোশাক। বাদকদলের নেতা মরিডোর বয়েসী এক তরুণ। একটা নরম সুর বাজিয়ে থামল ওরা। প্রচুর হাততালি আর বাহবা পেল। মাথা নুইয়ে শ্রোতাদের অভিবাদন জানিয়ে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আরেকটা সুর ধরল। চড়া, দ্রুত লয়।

ব্যাণ্ডস্ট্যাণ্ডের পাশ কাটিয়ে চলে এল তিন গোয়েন্দা। সামনে পেছনে অনেক

লোক। একবার পেছনে তাকিয়ে ফেলল মুসা। কিন্তু কে অনুসরণ করছে, আদৌ করছে কিনা, বুঝতে পারল না।

শান-বাঁধানো একটা জায়গায় এসে দাঁড়াল ওরা। ট্র্যাম্পোলিন বসানো হয়েছে। বিভিন্ন ধরনের বিপজ্জক উপভোগ্য খেলা দেখাচ্ছে দু'জন দড়াবাজ। মাটিতে ডিগবাজি খাচ্ছে, বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি করে লোক হাসাচ্ছে দু'জন ভাঁড়। মাঝেমধ্যেই এগিয়ে এসে একটা ভাঙা পুরানো ছোট ঝুড়ি বাড়িয়ে ধরছে সামনে। চেহারাটাকে হাস্যকর করে তুলে পয়সা চাইছে। কেউ মানা করছে না। হেসে দু'একটা মুদ্রা ফেলে দিচ্ছে ঝুড়িতে।

সার্কাসের জায়গার পরেই মেয়েটাকে দেখতে পেল ওরা। সুন্দর দেশীয় পোশাক পরনে। হাতে সুতোয় বাঁধা এক গুচ্ছ বড় বড় বেলুন। সুললিত গলায় গান ধরেছে ইংরেজিতে। কথাগুলো বড় সুন্দর। একটা করে বেলুন কিনে নেবার আমন্ত্রণ। কোন একটা ইচ্ছে মনে নিয়ে সেই বেলুন ছেড়ে দিতে হবে। ইচ্ছেটা আকাশের দূরতম প্রান্তে নিয়ে গিয়ে তারার দেশের কোন মনের মানুষের কাছে পৌঁছে দেবে বেলুন।

অনেকেই কিনছে। ছেড়ে দিচ্ছে সুতো, শাঁ করে শূন্যে উঠে পড়ছে গ্যাস ভরা বেলুন, যার যার ইচ্ছে নিয়ে উড়ে যাচ্ছে নীল আকাশে। ছোট হতে হতে একটা বিন্দুতে পরিণত হচ্ছে। তারপর টুক করে মিলিয়ে যাচ্ছে এক সময়।

'ভাঁড়ের ছবি তোলা, মুসা,' ফিসফিস করে বলল কিশোর। 'দড়াবাজদের ছবি তুলছি আমি। রবিন, চারদিকে চোখ রাখ। দেখ, আমাদেরকে লক্ষ্য করছে কিনা সন্দেহজনক কেউ।'

'ঠিক আছে,' বলে ঘুরল মুসা। হাতের তালুতে মাথা রেখে উল্টো হয়ে দাঁড়িয়েছে এখন দুই ভাঁড়। সেদিকে এগিয়ে গেল।

রবিনের পাশে দাঁড়িয়ে ক্যামেরার খাপ খুলল কিশোর। পরক্ষণেই বিরক্তিতে ছেয়ে গেল চোখ মুখ। ভাল অভিনেতা সে। দেখলে যে কেউ ধরে নেবে সত্যিই বুঝি ক্যামেরা খারাপ হয়ে গেছে তার। বিড়বিড় করে বিরক্তি প্রকাশ করতে লাগল গোয়েন্দাপ্রধান।

রেডিওর বোতাম টিপে দিল কিশোর। নিচু গলায় বলল, 'ফার্স্ট বলছি। শুনতে পাচ্ছেন?'

'স্পষ্ট,' প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জবাব এল। ভলিউম কমিয়ে রেখেছে কিশোর, কাজেই একেবারে কাছাকাছি না থাকলে কেউই শুনতে পাবে না কথা। 'কি অবস্থা?'

'কেউ লেগেছে পেছনে,' বলল কিশোর। 'প্রিন্স দিমিত্রি সাহায্যের অনুরোধ জানিয়েছে। চুরি গেছে জাতীয় রূপালী মাকড়সা। নকল একটা ফেলে রেখে গেছে চোর।'

'তা-ই!' অবাক মনে হল বব ব্রাউনের গলা। 'যা ভেবেছি, পরিস্থিতি তারচেয়ে খারাপ! সাহায্য করবে ওকে?'

'কি করে?'

'জানি না,' স্বীকার করল বব। 'চোখ খোলা রাখ। কিছু না কিছু নজরে পড়বেই। ভেবেচিন্তে এগোতে পারবে তখন। আর কিছু?'

'পার্কে রয়েছি। কারা অনুসরণ করছে জানি না।'

'জানার চেষ্টা কর। পরে জানাবে আমাকে। ছেড়ে দাও। বেশিক্ষণ কথা বললে সন্দেহ করে বসতে পারে।'

কেটে গেল যোগাযোগ।

ক্যামেরা ঠিক হয়ে গেছে যেন কিশোরের। চোখের সামনে তুলে ধরল। ছবি তুলে গেল একের পর এক।

চারদিকে নজর ফেলল রবিন। অনেকেই চাইছে ওদের দিকে। পরক্ষণেই চোখ সরিয়ে নিচ্ছে। কাউকেই সন্দেহ করতে পারল না সে। একজন ভাঁড় এসে দাঁড়াল সামনে। ঝুড়ি বাড়িয়ে দিল। পকেট থেকে একটা মুদ্রা বের করে তাতে ফেলে দিল রবিন।

নতুন একটা আকর্ষণীয় খেলা শুরু করল দুই ভাঁড়। অন্যদিক থেকে সরে এসে তাদেরকে ঘিরে ধরল দর্শকরা। মেয়েটার কাছে একজনও নেই এখন।

'এবার ওর ছবি তুলব,' বিড়বিড় করে বলল কিশোর। মুসাকে ডাকল। তিনজনে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল মেয়েটার সামনে।

ছবি তোলার প্রস্তাব দিল কিশোর। মাথা কাত করল মেয়েটা। ছবি উঠে গেল কিশোরের ক্যামেরায়।

হাসল মেয়েটা। গুচ্ছ থেকে একটা বেলুন বের করে বাড়িয়ে ধরল। 'একটা বেলুন কিনুন। মনে কোন ইচ্ছে নিয়ে ছেড়ে দিন আকাশে। ঠিক পৌঁছে দেবে মেঘের দেশের কারও কাছে।'

পকেট থেকে একটা আমেরিকান ডলার বের করল মুসা। দিল মেয়েটাকে। তিনজনের হাতেই একটা করে বেলুন ধরিয়ে দিল মেয়েটা। ডলারটা ছোট থলেতে রেখে খুচরো বের করল। বেলুনের দাম রেখে বাকি মুদ্রাগুলো এক এক করে ফেলতে লাগল মুসার হাতে। যেন গুনে গুনে দিচ্ছে, এমনি ভাবভঙ্গি। নিচু গলায় বলল, চর লেগেছে। একজন পুরুষ একজন মহিলা। লোক সুবিধের মনে হচ্ছে না। আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে পারে হয়ত। একটা টেবিলে বসে পড়ুন। আইসক্রীম কিংবা অন্য কিছু খান। কথা বলার সুযোগ দিন ওদের।'

পয়সা দিয়ে পিছিয়ে গেল মেয়েটা।

'দিমিত্রিকে সাহায্য করতে চাই,' তিনজনের মনেই এক ইচ্ছে। সুতো ছেড়ে দিল। শাঁ করে শূন্যে উঠে পড়ল বেলুন। লাল, হলুদ, সবুজ। অনেক ওপরে তিনটি

কালো বিন্দুতে পরিণত হল। মিলিয়ে গেল পরক্ষণেই।

খানিক দূরেই ঘাসে ঢাকা একটা খোলা জায়গা। তাতে টেবিল-চেয়ার পাতা। মোটা কাপড়ের টেবিলক্লথ, লাল-সাদা চেক। একটা টেবিল বেছে নিয়ে চেয়ার টেনে বসে পড়ল তিন কিশোর। এগিয়ে এল একজন ওয়েটার। মোটা গোঁফ। 'আসক্রীম? হট-চকোলেট? স্যাণ্ডউইচ?'

অর্ডার দিল কিশোর। চলে গেল ওয়েটার।

চারপাশে তাকাল তিন গোয়েন্দা। ঠিক পেছনেই ওদেরকে দেখতে পেল রবিন। সেই আমেরিকান দম্পতি। সকালে প্রিন্স পলের ছবি দেখার সময় যারা পেছনে দাঁড়িয়েছিল। হুঁম্‌ম্‌! তাহলে এরাই!

ধীরে সুস্থে এগিয়ে এল দম্পতি। একটা টেবিল পছন্দ করল। তিন গোয়েন্দার ঠিক পাশেরটা। কফির অর্ডার দিয়ে হেলান দিল চেয়ারে। তিন গোয়েন্দার দিকে ফিরে হাসল।

'তোমরা আমেরিকান, না?' হেসে জিজ্ঞেস করল মহিলা। স্বর কেমন খসখসে।

'হ্যাঁ, ম্যাডাম,' জবাব দিল কিশোর। 'আপনারাও আমেরিকান?'

'নিশ্চয়। ক্যালিফোর্নিয়া থেকে এসেছি। তোমাদের মতই।'

স্থির হয়ে গেল কিশোর। ওরা ক্যালিফোর্নিয়া থেকে এসেছে, কি করে জানল দম্পতি?

মহিলা ভুল করে বসেছে, বুঝে গেল পুরুষটি। ধামাচাপা দেবার জন্যে সঙ্গে সঙ্গে উঠল, 'ক্যালিফোর্নিয়া থেকেই তো এসেছ তোমরা, না-কি? ক্যালিফোর্নিয়ান ছেলেদের মতই কাপড়-চোপড় পরেছ।'

'হ্যাঁ,' বলল কিশোর। 'ক্যালিফোর্নিয়া থেকেই। গতরাতে এসেছি।'

'সকালে মিউজিয়মে দেখেছি তোমাদের,' বলল মহিলা। 'আচ্ছা, তোমাদের সঙ্গে ছিল, ও প্রিন্স দিমিত্রি না?'

মাথা ঝোঁকাল কিশোর। 'হ্যাঁ।' বন্ধুদের দিকে ফিরল। 'আইসক্রীম আসতে দেরি আছে। চল, হাত মুখ ধুয়ে আসি। ধুলোবালি লেগেছে। ওই যে, ওপাশে "ওয়াশরুম" লেখা রয়েছে। চল।'

পাশের টেবিলের দম্পতির দিকে তাকাল কিশোর। 'আমরা হাতমুখ ধুতে যাচ্ছি। ক্যামেরাগুলো রইল টেবিলে। একটু দেখবেন? এই যাব আর আসব আমরা।'

'নিশ্চয় খোকা,' হাসল লোকটা। 'নিশ্চিন্তে যাও। ক্যামেরা চুরি যাবে না।'

'থ্যাংক ইউ স্যার,' উঠে দাঁড়াল কিশোর।

রবিন আর মুসাকে নিয়ে সার্কাসের অন্য পাশে চলে এল গোয়েন্দাপ্রধান। খানিক দূরেই ওয়াশরুম।

'কি ব্যাপার?' পাশে হাঁটতে হাঁটতে ফিসফিস করে বলল মুসা। 'ক্যামেরাগুলো ফেলে এলে কেন?'

'শ্‌শ্‌শ্‌।' হুঁশিয়ার করল কিশোর। 'এখন কোন কথা নয়!'

আগের জায়গায়ই দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটা। কাছাকাছি কেউ নেই। অনেক কমে এসেছে হাতের বেলুনের সংখ্যা। তার পাশ দিয়ে যেতে যেতে নিচু গলায় বলল কিশোর, 'দম্পতির দিকে চোখ রাখুন। ক্যামেরাগুলো ধরলেই আমাদের জানাবেন। মিনিটখানেক পরেই আসছি।'

চুপচাপ রইল মেয়েটা, যেন শোনেইনি কথাগুলো।

কয়েকটা বড় বড় গাছের তলায় একটা পাথরের বাড়ি, ওয়াশরুম। ভেতরে ঢুকে পড়ল তিন গোয়েন্দা।

'উদ্দেশ্যটা কি তোমার?' ঢুকেই জিজ্ঞেস করল মুসা।

এগিয়ে গিয়ে একটা বেসিনের ওপরের কল খুলে দিল কিশোর। নিচু গলায় বলল, 'ওরা দু'জন কথা বলবেই। বেফাঁস কিছু বলেও ফেলতে পারে।'

'তাতে আমাদের কি লাভ?' ফস করে বলল রবিন। কলের তলায় হাত পেতে দিয়েছে।

টেপ রেকর্ডারটা চালু করে দিয়ে এসেছি,' বলল কিশোর। 'ওদের কথাবার্তা টেপ হয়ে যাবে। আর কোন কথা নয় এখন। কাছাকাছি লোক আছে। কে যে কি, বলা যায় না!'

নীরবে হাতমুখ ধোয়া সারল ওরা। বেরিয়ে এল বাইরে। ধীর পায়ে এগোল। মেয়েটার পাশ দিয়ে যাবার সময় একবার তাকাল কিশোর। আধ ইঞ্চি মত মাথা নাড়ল মেয়েটা।

যেমন রেখে গিয়েছিল, তেমনি রয়েছে ক্যামেরা তিনটে। ছোঁয়নি কেউ। কফির কাপে চুমুক দিচ্ছে দম্পতি।

'ক্যামেরার ধারেকাছেও আসেনি কেউ,' হেসে বলল লোকটা। 'সৎলোকের দেশ। তোমাদের আইসক্রীম নিয়ে এসেছিল ওয়েটার, পরে আসতে বলে দিয়েছি। ওই যে, আসছে।'

ট্রে-তে খাবার নিয়ে এসে দাঁড়াল ওয়েটার। নামিয়ে রাখল স্যাণ্ডউইচ, হট-চকোলেট আর আইসক্রীমের পাত্র।

দুপুর হয়ে এসেছে। একবারে লাঞ্চ সেরে ফেলার সিদ্ধান্ত নিল তিনজনে। আরও কিছু খাবারের অর্ডার দিয়ে খেতে শুরু করল।

আর কয়েক মিনিট পরেই খাওয়া শেষ হয়ে গেল দম্পতির। তিন গোয়েন্দাকে 'গুড বাই' জানিয়ে উঠে চলে গেল।

'আমাদের সঙ্গে বিশেষ কিছুই বলল না,' বলল মুসা। 'নিশ্চয় মত বদলেছে।'

'ওরা নিজেরা নিজেরা কথা বলে থাকলেই আমি খুশি ' বলল কিশোর। সব

ক'টা টেবিল খালি। এখনও খাওয়ার জন্যে আসতে শুরু করেনি লোকে। নিজের ক্যামেরাটা টেনে নিল। নিচের দিকের একটা বোতাম টিপে রি-উইণ্ড করে নিল ক্যাসেটের ফিতে। ভলিউম কমিয়ে রেখে 'প্লে' বোতামটা টিপে দিল। প্রথমে ফিসফাস শব্দ, তারপরেই স্পষ্ট কথা। আমেরিকান লোকটার গলা।

উত্তেজিত হয়ে পড়ল রবিন। চাপা গলায় বলে উঠল, 'হয়েছে! কাজ হয়েছে...'

'শ্‌শ্‌শ্‌!' রবিনকে থামিয়ে দিল কিশোর। 'শুনি, কি বলে! খাওয়া বন্ধ কোরো না। ক্যামেরার দিকে তাকিও না।'

আবার টেপ রি-উইণ্ড করে নিল কিশোর। প্রথম থেকে চালু করল। আরও কমিয়ে দিল ভলিউম। পাশের টেবিল থেকেও কেউ শুনতে পাবে না এখন।

নিজেদের মধ্যে কথা বলেছে দম্পতিঃ

পুরুষঃ খামোকাই পাঠিয়েছে আমাদেরকে, টেরা। ওই ছেলে তিনটে গোয়েন্দা হলে আমার নাম পাল্টে রাখব।

মহিলা ঃ ভুল খুব একটা করে না টেরা। ও বলেছে, ছেলে তিনটে খুবই চালাক-চতুর। তিন গোয়েন্দা বলে নিজেদেরকে।

পুরুষ ঃ ওই বলা পর্যন্তই। গোয়েন্দাগিরির গ-ও জানে না ওরা। বড় মাথা যে ছেলেটার,ওটা তো একটা বুদ্ধু। চেহারা দেখেই বোঝা যায়। হাবাগোবা, একটা গরু!

চাওয়া-চাওয়ি করল মুসা আর রবিন। মুখ টিপে হাসল। গ্রাহ্য করল না কিশোর। কোনরকম ভাবান্তর নেই চেহারায়। ওকে বোকা ভাবুক, এইই চেয়েছিল।

মহিলাঃ টেরার ধারণা, ওরা কারও সঙ্গে যোগাযোগ করবে। সি.আই. এ.-র হয়ে কাজ করছে ছেলে তিনটে।

পুরুষঃ আরে দুত্তোর! সারাক্ষণই তো পেছনে লেগেছিলাম। কারও সঙ্গে যোগাযোগ করতে দেখেছ? কথা বলেছে? বড়লোকের বাচ্চা। স্রেফ টাকা ওড়াতে এসেছে এখানে।

মহিলাঃ কোন কথাই তো বললে না ওদের সঙ্গে। ডিউক রোজারের কথা তোলা উচিত ছিল, নয় কি?

পুরুষঃ মোটেই না। ভুল করেছে টেরা। ওরা গোয়েন্দা হতেই পারে না।

মহিলাঃ আচ্ছা, ডিউক রোজারের পরিকল্পনা সম্পর্কে কিছু বলেছে নাকি টেরা? আমার সঙ্গে বিশেষ কথা হয়নি। তুমি তো অনেকক্ষণ ছিলে? কিছু বলেছে?

সতর্ক হয়ে উঠল তিন গোয়েন্দা। কান খাড়া করল।

পুরুষঃ বলেছে। দিমিত্রিকে সিংহাসনে বসতে দেবে না রোজার। সরিয়ে দেবে

কোনভাবে। নিজে স্থায়ী রিজেন্ট হয়ে বসবে। তখন আমাদের আর ব্রায়ানের দলই হবে দেশের হর্তকর্তা-বিধাতা।

মহিলাঃ গলা নামাও! কেউ শুনে ফেলবে।

পুরুষঃ কাছেপিঠে কেউ নেই, কে শুনবে? রিলটা, কি সাংঘাতিক ব্যাপার হবে ভেবে দেখেছ! এমনি একটা কিছুরই স্বপ্ন দেখছিলাম এতদিন। ডিউক রোজার একবার ক্ষমতায় আসতে পারলেই আর আমাদের পায় কে? ছোট হোক, কিন্তু একটা দেশের মালিক হয়ে যাব, ভাবতে পার!

মহিলাঃ মন্টি কার্লোর মতই আরেকটা কিছু গড়ে তুলব আমরা!

পুরুষঃ তার চেয়ে ভাল ব্যাংকিং সুবিধে দেব লোককে। যত খুশি কালো টাকা এনে জমাক, কোন কৈফিয়ত দিতে হবে না। তাদের দেশের সরকারের কাছ থেকে পুরোপুরি গোপন রাখা হবে কথাটা। বড় বড় অপরাধীরা এসে এখানে লুকিয়ে থাকতে পারবে। ওদেরকে বরং ঠাঁই দেব আমরা। অবশ্যই অনেক টাকার বিনিময়ে। যে-কোন দেশ থেকে যা খুশি করে আসুক যে-কোন লোক, এখানে এসে পড়তে পারলে সে নিরাপদ। ধনী অপরাধীদের স্বর্গ হয়ে উঠবে ভ্যারানিয়া।

মহিলাঃ শুনতে তো ভালই লাগছে। কিন্তু যদি ডিউক রোজার রাজি না হয় এসব করতে?

পুরুষঃ ধ্বংস করে দেব। ক্ষমতায় থাকতে হলে আমাদের কথা মানতেই হবে। রিটা, রসাল একটা আপেলে পরিণত হবে এই ভ্যারানিয়া। আমরা সবাই খুঁটে খাব।

মহিলাঃ চুপ! আসছে ওরা...

চুপ হয়ে গেল স্পীকার। বোতাম টিপে সেট অফ করে দিল কিশোর।

'খাইছে!' বলে উঠল মুসা। 'বব ব্রাউন যা অনুমান করেছে, তার চেয়েও খারাপ অবস্থা! অপরাধীদের স্বর্গ!'

'তাকে এখুনি জানানো দরকার।' বলে উঠল রবিন।

'হ্যাঁ,' ধীরে ধীরে মাথা ঝোঁকাল কিশোর। 'পুরো টেপটাই শোনানো দরকার তাকে। তবে এখন নয়। তাতে অনেক সময় লাগবে। সন্দেহ করে বসতে পারে কেউ। মূল ব্যাপারটা শুধু জানানো যায় এখন।'

ক্যামেরা তুলে নিল কিশোর। ফিল্ম বদলাচ্ছে যেন, এমনি ভাবসাব। টিপে দিল রেডিওর বোতাম।

'ফার্স্ট বলছি। শুনতে পাচ্ছেন?'

'পাচ্ছি,' বলল বব ব্রাউন। 'নতুন কিছু?'

টেপে কি কি শুনেছে, সংক্ষেপে জানাল কিশোর।

'খুব খারাপ!' বলল বব। 'মহিলা আর লোকটার চেহারা কেমন?'

বর্ণনা দিল কিশোর।

'মনে হচ্ছে, পিটার জোনস আর তার স্ত্রী। জুয়ারী। নেভাডায় বাস। ভয়ানক এক অপরাধী সংস্থার সদস্য। আর যে দু'জন লোকের কথা বলল, নিশ্চয় আলবার্ট ট্যাঙ্গোরা, ওরফে টেরা, এবং ব্রায়ান বেরেট। সাংঘাতিক দুই খুনে। ওই সংস্থার সদস্য। যা ভেবিছিলাম তারচেয়ে অনেক অনেক বেশি মারাত্মক ষড়যন্ত্র!'

'আমাদের এখন কি করণীয়?' জানতে চাইল কিশোর।

'প্রথম সুযোগেই হুঁশিয়ার করে দেবে প্রিন্স দিমিত্রিকে। সব কথা জানাবে। আগামীকাল সকালে চলে আসবে আমেরিকান এমব্যাসিতে। প্যালেসে থাকা এখন নিরাপদ নয় তোমাদের জন্যে। দিমিত্রিকে সাহায্য করতে একপায়ে খাড়া আছি আমরা, তবে আমাদের সাহায্য চাইতে হবে তাকে। গায়ে পড়ে কিছু করতে যাব না।' থামল বব। তারপর বলল, 'অনেক বেশি খবর জোগাড় করে ফেলেছ তোমরা। এতটা আশা করিনি। তবে, এখন থেকে খুব সাবধান! সব সময় সতর্ক থাকবে! ওভার অ্যাণ্ড আউট!'

ছয়

সারাটা বিকেল শহর আর তার আশপাশের মনোরম দৃশ্য দেখে কাটাল তিন গোয়েন্দা। প্রাচীন কিছু দোকানপাট দেখল, একটা মিউজিয়মে দেখল পাঁচ-ছ'শো বছর আগের অনেক ঐতিহাসিক জিনিসপত্র। একটা প্রমোদতরীতে করে ডেনজো নদীতে কাটিয়ে এল কিছুক্ষণ। চলে গিয়েছিল নদীর একেবারে উৎসের কাছাকাছি।

গাড়িতে চড়ার খানিক পরেই মরিডো জানিয়েছে, আবার চর লেগেছে পেছনে। তবে এবার আর আমেরিকান দম্পতি নয়। ভ্যারানিয়ান সিক্রেট সার্ভিস, ডিউক রোজার বুরবনের নিজের পছন্দ করা লোক।

'হয়ত মেহমান বলেই নজর রাখছে,' বলেছে মুসা।

'যথেষ্ট সন্দেহ আছে আমার!' মুখ কালো করে বলেছে মরিডো। 'আপনাদের প্রতি ওদের আগ্রহ দেখা যাচ্ছে। কেন, জানতে পারলে ভাল হত।'

তিন গোয়েন্দাও ভাবছে, জানতে পারলে ভাল হত। সিক্রেট সার্ভিস কেন আগ্রহ দেখাবে তাদের প্রতি? এখনও তেমন কিছুই করেনি ওরা। প্রিন্স দিমিত্রিকে সাহায্য করছে, এটা ডিউক রোজারের জানার কথা নয়। তাহলে?

রাস্তার মোড়ে মোড়ে গায়কদের ছোট ছোট দল দেখা গেল। সবার হাতে একটা না একটা বাদ্যযন্ত্র আছেই। বাজিয়ে গান গেয়ে পথচারীদের মনোরঞ্জন করছে।

'মিনস্ট্রেলস,' মরিডো জানাল। 'তিনশো বছর আগে যে পরিবারটা প্রিন্স পলকে লুকিয়ে রেখেছিল, তাদেরই বংশধর। আমিও মিনস্ট্রেলদের ছেলে। বাবা ছিল প্রধানমন্ত্রী, তাকে বের করে দিয়েছে ডিউক রোজার। আমাদেরকে, মানে মিনস্ট্রেলদেরকে সবচেয়ে বেশি বিশ্বাস করেন প্রিন্স দিমিত্রি। সেই প্রিন্স পলের আমল থেকেই আমাদেরকে কোনরকম ট্যাক্স দিতে হয় না। ডিউক রোজার আর তার সাঙ্গোপাঙ্গোরা দু'চোখে দেখতে পারে না আমাদের। আমরা সব মিনস্ট্রেলরা মিলে একটা গোপন দল করেছি। নাম, মিনস্ট্রেল পার্টি। অনেক ভক্ত জুটেছে আমাদের। দেশের লোক দেখতে পারে না রোজারকে।'

মিনস্ট্রেলদের প্রতিটি দলের সামনে গতি কমাচ্ছে মরিডো। তাকাচ্ছে আগ্রহী চোখে। দলের কেউ একজন সামান্য একটু মাথা ঝোঁকালেই আবার ছুটছে সামনে।

'ওদেরকে চোখে চোখে রাখছি আমরা,' বলল মরিডো। 'আপনাদের ওপরও সারাক্ষণ চোখ রয়েছে আমাদের। প্যালেসে আছে আমাদের লোক, এমনকি রয়্যাল গার্ডেও আছে। অনেক কিছুই জেনে গেছি আমরা। কিন্তু এই একটা ব্যাপার জানতে পারছি না, আপনাদের ওপর রোজারের এত আগ্রহ কেন! সাংঘাতিক কোন প্ল্যান নিশ্চয় করেছে ব্যাটা!'

দু'পাশে নতুন নতুন দৃশ্য। দেখতে দেখতে কিছুক্ষণের জন্যে সিক্রেট সার্ভিসের কথা ভুলে গেল ছেলেরা।

আরেকটা পার্কে বিশাল এক নাগরদোলায় চেপে কিছুক্ষণ দোল খেল তিন কিশোর। তারপর রাতের খাওয়া সেরে নিল এক রেস্টুরেন্টে। ডেনজো নদীর মাছ, সুস্বাদু। রান্নাও হয়েছে খুব ভাল।

ক্লান্ত হয়ে প্যালেসে ফিরে এল ওরা। তবে মন আনন্দে ভরা। একটা খুব সফল দিন কাটিয়ে এসেছে।

ওদেরকে অভ্যর্থনা করে গাড়ি থেকে নামাল রয়্যাল চেম্বারলেন। এখন আরেকজন। ডিউটি বদলেছে। ছোট্টখাট্ট একজন লোক। টকটকে লাল আলখেল্লা পরনে।

গুড ইভনিং, ইয়ং জেন্টেলম্যান,' বলল চেম্বারলেন। 'আজ রাতে দেখা করতে পারবেন না প্রিন্স দিমিত্রি। দুঃখ প্রকাশ করেছেন তিনি। কাল সকালে নাস্তার সময় দেখা হবে। চলুন, আপনাদের ঘরে পৌঁছে দিই। নইলে পথ চিনে যেতে পারবেন না।'

অসংখ্য সিঁড়ি, করিডর হলঘর পেরিয়ে এল ওরা চেম্বারলেনের পিছু পিছু। প্রতিটি সিঁড়ির গোড়ায় করিডরের প্রান্তে প্রহরী। অবাকই হল ওরা। সকালে, কিংবা গতরাতে এত কড়াকড়ি দেখেনি। তিনতলার ঘরে পৌঁছে দিয়ে তাড়াহুড়া করে চলে গেল চেম্বারলেন। যেন জরুরি কোন কাজ ফেলে এসেছে।

ভারি ওক কাঠের দরজাটা বন্ধ করে দিল কিশোর। ঘরের ভেতরে তাকাল।

গোছগাছ সাভসুতরো করা হয়েছে। বিছানায় নতুন চাদর। তবে সুটকেসগুলো যেখানে ফেলে রেখে গিয়েছিল, সেখানেই রয়েছে। মাকড়সার জালটাও রয়েছে আগের মতই। ওটার ধারেকাছেও যায়নি কেউ। সেদিকে এগোল সে। সুতো বেয়ে নেমে গেল বড় একটা মাকড়সা, কালোর ওপর সোনালি ছোপ। তক্তা আর মেঝের মাঝখানের ফাঁকে গিয়ে ঢুকে পড়ল সুড়ুৎ করে। মাথা বের করে দিল পরমুহূর্তেই।

হাসল রবিন। সকালেই যথেষ্ট শিক্ষা হয়ে গেছে। মাকড়সার জাল আর ছিঁড়তে যাবে না ভ্যারানিয়ায় থাকতে।

'মনে হচ্ছে, জিনিসপত্র কেউ হাতায়নি,' বলল কিশোর। 'বব ব্রাউনের সঙ্গে যোগাযোগ করা দরকার। নতুন কোন নির্দেশ দিতে পারে। মুসা, দরজার তালা আটকে দাও।'

তালা আটকে দিল মুসা।

খাপ থেকে ক্যামেরা খুলল কিশোর। বোতাম টিপে দিল। 'ফার্স্ট বলছি। শুনতে পাচ্ছেন?'

'স্পষ্ট,' ভেসে এল বব ব্রাউনের গলা। 'নতুন কিছু?'

'তেমন কিছু না,' জানাল কিশোর। 'সারা বিকেলই গাড়িতে করে ঘুরেছি। শহর দেখেছি। নতুন চর লেগেছিল পেছনে। ডিউক রোজারের লোক, সিক্রেট সার্ভিস।'

'দিমিত্রির সঙ্গে কথা বলেছ?' কণ্ঠ শুনে মনে হল ভাবনায় পড়ে গেছে বব। 'খবরটা কি ভাবে নিয়েছে সে?'

'দেখা হয়নি। চেম্বারলেন জানিয়েছে, সকালের আগে দেখা হবে না। প্রিন্স খুব ব্যস্ত।'

'হুমম!' দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছে বব, তার কণ্ঠ শুনেই বোঝা যাচ্ছে। 'আটকে ফেলেনি তো! ওর সঙ্গে দেখা করা খুবই জরুরি। সকালে যেভাবেই হোক, দেখা কোরো। হ্যাঁ, এক কাজ কর, ক্যামেরা থেকে টেপটা বের করে নিয়ে পকেটে রেখে ও। আগামীকাল এমব্যাসিতে নিয়ে আসবে। এমন ভাব দেখাবে, যেন শহর দেখতে বেরোচ্ছ। গরম হয়ে উঠছে পরিস্থিতি। বুঝেছ?'

'বুঝেছি,' বলল কিশোর। 'ওভার অ্যাণ্ড আউট।'

ট্রান্সমিটারের সুইচ অফ করে দিল কিশোর। টেপরেকর্ডার থেকে বের করে নিল খুদে ক্যাসেটটা। বাড়িয়ে দিল মুসার দিকে, 'এটা তোমার কাছে রাখ। কেউ যেন নিয়ে যেতে না পারে।'

'পারবে না,' দৃঢ়কণ্ঠ মুসার। ভেতরের পকেটে রেখে দিল ক্যাসেটটা।

ড্রয়ার হাতাচ্ছে রবিন। রুমাল খুঁজছে। কোন্ ড্রয়ারটায় রেখেছিল, ঠিক মনে করতে পারছে না। অবশেষে একটা ড্রয়ারে পাওয়া গেল ওটা। টান দিয়ে বের করে আনল রুমাল। ভাঁজের ভেতর থেকে মেঝেতে ছিটকে পড়ল কিছু একটা.

মৃদু টুং শব্দ হল। আশ্চর্য ! কি ওটা! ঝুঁকে আলমারির তলায় তাকাল। চকচক করছে জিনিসটা। বের করে হাতে নিল।

একবার দেখেই চেঁচিয়ে উঠল রবিন, 'কিশোর! মুসা! দেখ দেখ!'

অবাক হয়ে তাকাল দুজনেই।

'মাকড়সা!' ঢোক গিলল মুসা। 'ফেল, ফেল!'

'কোন ক্ষতি করে না,' বলল কিশোর। 'প্রিন্স পলের মাকড়সা। রবিন, আস্তে নামিয়ে রাখ মেঝেতে।'

'চিনতে পারছ না!' ভুরু কুঁচকে গেছে রবিনের। 'প্রিন্স পলের মাকড়সাই। রূপালী মাকড়সা!'

'রূপালী মাকড়সা!' রবিনের কথার প্রতিধ্বনি করল যেন মুসা। 'কি বলছ?'

'এটা ভ্যারানিয়ার রূপালী মাকড়সা,' বলল রবিন। 'ভল্ট থেকে যেটা চুরি গিয়েছিল। আমি শিওর। এত কাছে থেকেও চিনতে পারনি?'

প্রায় লাফ দিয়ে কাছে চলে এল কিশোর আর মুসা।

ছুঁয়ে দেখল কিশোর। 'ঠিকই বলেছ! এটা একটা মাস্টারপিস! কোথায় পেলে?'

'রুমালের ভাঁজে! কেউ একজন রেখে দিয়েছে। সকালে ছিল না।'

ভুরু কুঁচকে গেল কিশোরের। নিজের অজান্তেই হাত উঠে গেল নিচের ঠোঁটে। 'কে রাখল? কেন?' বিড়বিড় করতে লাগল। 'আমাদেরকে চোর বলে চিহ্নিত করতে চায় না-তো। তাহলে…'

'কি করব আমরা এখন, কিশোর?' বলে উঠল মুসা। 'ওটা চুরির একমাত্র শাস্তি মৃত্যুদণ্ড! যদি ধরা পড়ি…'

'আমার মনে হয়…' বলতে গিয়েও থেমে যেতে হল কিশোরকে। বাইরে ভারি জুতোর শব্দ। অনেকগুলো।

মুহূর্ত পরেই দরজায় চাপড়ের শব্দ হল। নবটা ঘোরানর চেষ্টা করল কেউ। ভেতর থেকে তালা দেয়া, খুলল না। শোনা গেল ক্রুদ্ধ গলা, 'দরজা খোল। রিজেন্টের আদেশ!'

স্তব্ধ একটা সেকেণ্ড। তারপরই লাফ দিল মুসা আর কিশোর, একই সঙ্গে। লোহার দুটো ভারি ছিটকিনি তুলে দিল দুজনে।

ঠিকমত ভাবতে পারছে না রবিন, এতই অবাক হয়েছে। হাতে ভ্যারানিয়ার রূপালী মাকড়সা নিয়ে স্থির দাঁড়িয়ে আছে। কি করবে এখন?

সাত

জোরে জোরে কিল মারার শব্দ হচ্ছে দরজায় বাইরে থেকে।

'খোল! রিজেন্টের আদেশ! আমরা আইনের লোক!' আবার চেঁচিয়ে উঠল

ক্রুদ্ধকণ্ঠ।

দরজায় পিঠ দিয়ে চেপে দাঁড়িয়েছে কিশোর আর মুসা। নিজেদের দেহের ভার দিয়ে দরজা আটকে রাখতে চাইছে যেন।

হাতের অপূর্ব সুন্দর জিনিসটার দিকে চেয়ে আছে রবিন। মাথায় চিন্তার ঝড়। কোথাও লুকিয়ে ফেলা দরকার এটাকে। কিন্তু কোথায়?

হঠাৎ সচল হয়ে উঠল রবিন। ছুটোছুটি শুরু করল সারা ঘরময়। চোখ জায়গা খুঁজছে। কোথায় লুকিয়ে রাখবে মাকড়সাটাকে! কার্পেটের তলায়? না। বিছানার গদি? তাও না। তাহলে, তাহলে কোথায়? কোথায় রাখলে খুঁজে পাবে না অন্য কেউ?

জোরে ধাক্কা দেয়া হচ্ছে দরজায়। ভেঙে ফেলার চেষ্টা চালাচ্ছে। এই সময়ই ঘটল আরেক ঘটনা। ভীষণভাবে দুলে উঠল জানালার পর্দা। লাফিয়ে এসে ঘরের ভেতরে পড়ল দুজন তরুণ! চমকে উঠল কিশোর আর মুসা! ওদিক থেকেও আক্রমণ এল।

'না না, চমকাবার কিছু নেই।' কাছে এগিয়ে এসেছে এক তরুণ। ফিসফিস করে বলল, 'আমি। মরিডো। আর, ও আমার ছোট বোন, মেরিনা।'

'মেরিনা…ও আপনার বোন,' ফিসফিস করেই বলল কিশোর।

সেই মেয়েটা। পার্কে বেলুন বিক্রি করছিল যে। পরনে মরিডোর মতই প্যান্ট, জ্যাকেট। দেখে প্রথমে তাই তাকে ছেলে বলে ভুল করেছে ওরা।

মাথা ঝোঁকাল মরিডো। 'জলদি আসুন, পালাতে হবে। আপনাদেরকে অ্যারেস্ট করতে এসেছে ওরা! ধরতে পারলে ফাঁসি দিয়ে দেবে!'

আওয়াজ পাল্টে গেছে আঘাতের। দরজা ভাঙার জন্যে কুড়াল ব্যবহার করা হচ্ছে। কিন্তু তিন ইঞ্চি পুরু ভারি ওক কাঠের দরজা। এত সহজে ভাঙবে না। কয়েক মিনিট সময় নেবেই।

ঘরে বসে টেলিভিশনে সিনেমা দেখছে যেন ওরা! খুব দ্রুত ঘটে যাচ্ছে ঘটনা। তাল পাচ্ছে না তিন গোয়েন্দা। বেরিয়ে যেতেই হবে এঘর থেকে, এটা ঠিক, কিন্তু কি করে, বুঝতে পারছে না।

'জলদি এস মুসা!' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল কিশোর। কাজ করতে শুরু করেছে আবার তার মগজ। 'রবিন, এস। মাকড়সাটা পকেটে ঢোকাও।'

ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে আছে রবিন। হঠাৎ সোজা হল। দ্বিধা করল এক মুহূর্ত। তারপর ঘুরে ছুটে এল।

জানালার দিকে ছুটল মেরিনা। ফিরে সবাইকে একবার ইশারা করেই টপকে ব্যালকনিতে চলে গেল। ওর পিছু পিছু ব্যালকনিতে এসে নামল কিশোর, মুসা, রবিন।

ঠাণ্ডা অন্ধকারে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়াল ওরা। নিচে জ্বলছে শহরের আলো।

দালানের গা থেকে বেরিয়ে আছে চওড়া কার্নিস। সেটা দেখিয়ে বলল, 'প্যালেসের পেছনেও আছে। এতখানিই চওড়া। হাঁটা যাবে। আসুন আমি পথ দেখাচ্ছি।'

ব্যালকনির রেলিঙে উঠে বসল মেরিনা। নিঃশব্দে লাফিয়ে নামল কার্নিসে।

দ্বিধা করছে কিশোর। 'আমার ক্যামেরা!' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল সে। 'ফেলে রেখে এসেছি!'

'আর আনার সময় নেই!' পেছন থেকে বলল মরিডো। 'দু'মিনিট টিকবে আর দরজা, বড় জোর তিন। একটা সেকেণ্ডও নষ্ট করা যাবে না।'

খুব খারাপ লাগল ক্যামেরাটার জন্যে। কিন্তু আনার উপায় নেই। মুসা নেমে পড়েছে ততক্ষণে কার্নিসে। তাকে অনুসরণ করল কিশোর। দেয়ালের দিকে মুখ, পা ফাঁক করে পাশে হেঁটে সরছে মেরিনা।

গায়ে গা ঠেকিয়ে মেরিনার মত করেই সরতে লাগল মুসা আর কিশোর। বেড়ালের মত নিঃশব্দে।

ভয় পাবার সময়ই নেই। ঘরের ভেতরে দরজায় আঘাতের শব্দ হচ্ছে একনাগাড়ে। প্রাসাদের এক কোণে পৌঁছে গেল ওরা। ঠাণ্ডা হাওয়া ঝাপটা দিয়ে গেল চোখেমুখে।

ক্ষণিকের জন্যে কেঁপে উঠল রবিন, দুলে উঠল দেহ। অনেক নিচে ডেনজো নদী, রাতের মতই অন্ধকার। প্যাক খেয়ে খেয়ে ঘূর্ণি সৃষ্টি করেছে পানি, শব্দ শোনা যাচ্ছে। কাঁধ খামচে ধরল মরিডোর শক্তিশালী হাত, পতন রোধ করল রবিনের। আবার ভারসাম্য ফিরে পেল সে।

'জলদি!' রবিনের কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বলল মরিডো।

চমকে উঠল একজোড়া পায়রা। এ-কি জ্বালাতন! এত রাতে ঘুম নষ্ট করতে এল কে! পাখার ঝটপট শব্দ তুলে দালানের খোপ থেকে বেরিয়ে এল পাখি দুটো, অনধিকার-চর্চাকারীদের মাথার ওপর চক্কর দিয়ে দিয়ে উড়তে লাগল। হঠাৎ বসে পড়তে যাচ্ছিল রবিন, আবার তার কাঁধ খামচে ধরল মরিডো।

মোড় ঘুরে আরেকটা ব্যালকনির কাছে চলে এল ওরা। রেলিঙে উঠে বসল মেরিনা। নামল।

ব্যালকনিতে এসে দাঁড়িয়েছে পাঁচজনে।

'এবার ওপরে উঠতে হবে,' ফিসফিসিয়ে বলল মেরিনা 'এই যে দড়ি। গিঁট দেয়া আছে একটু পর পরই। উঠতে অসুবিধে হবে না!'

'এটা কেন?' রেলিঙে বাঁধা আরেকটা দড়ি নেমে গেছে নিচে, সেটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'ওদের বোকা বানাতে,' জবাব দিল মেরিনা। 'ধরে নেবে আমরা নিচে নেমে গেছি।'

ওপর থেকে ঝুলছে যে দড়িটা, সেটা ধরে উঠতে শুরু করল মেরিনা। তাকে অনুসরণ করল মুসা। তারপর দড়ি ধরল কিশোর।

ওদেরকে কয়েক ফুট ওঠার সময় দিল রবিন। তারপর দড়ি ধরে ঝুলে পড়ল সে-ও। উঠতে শুরু করল ধীরে ধীরে।

আবার কার্নিসে নেমেছে মরিডো। মারাত্মক ঝুঁকি নিয়ে এগিয়ে গেল কোনায়। উঁকি দিল। দেখতে চাইছে, ওদিকে কতদূর কি করল শত্রুরা।

ফিরে এল মরিডো। ফিসফিস করে বলল, 'এখনও দরজা নিয়েই আছে। তবে এসে পড়ল বলে!'

'কি?' মরিডোর দিকে তাকাতে গেল রবিন। ঘামে ভেজা হাত, পিছলে গেল হঠাৎ। গিটও আটকাতে পারল না, সড়সড় করে নিচে নেমে চলে এল সে। ঘষা লেগে ছিলে গেল হাতের চামড়া। তার মনে হল, আগুন লাগিয়ে দিয়েছে কেউ। মাত্র একটা মুহূর্ত। পরক্ষণেই এসে পড়ল নিচে দাঁড়ানো মরিডোর ওপর। পড়ল তাকে নিয়েই। জোরে কঠিন কিছুতে ঠুকে গেল মাথা। দপ করে চোখের সামনে জ্বলে উঠল কয়েক হাজার লাল-হলুদ ফুল। তারপরেই অন্ধকার!

'রবিন!' কানের কাছে ডাক শুনে চোখ মেলল সে।

'রবিন! শুনতে পাচ্ছেন! লেগেছে কোথাও!' শঙ্কিত গলা মরিডোর।

চোখ মিটমিট করল রবিন। ওপরে তারাজ্বলা আকাশ। মুখের ওপর ঝুঁকে আছে মরিডো। চিত হয়ে পড়ে আছে সে। প্রচণ্ড যন্ত্রণা মাথায়।

'রবিন, কোথাও লাগেনি তো!' আবার জিজ্ঞেস করল মরিডো। উদ্বিগ্ন।

'মাথা ব্যথা করছে,' অবশেষে বলল রবিন। কোলা ব্যাঙের আওয়াজ বেরোল গলা থেকে। 'ভালই আছি।' ধীরে ধীরে উঠে বসল সে। চারদিকে তাকাল। একটা ব্যালকনিতে বসে আছে। পাশে, প্যালেসের পাথরের কালো বিশাল দেয়াল উঠে গেছে ওপরে। অনেক নিচে ডেনজো নদীতে মিটমিট করছে নৌকার আলো।

'আমি এখানে কেন!' বলে উঠল রবিন। 'জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকলেন আপনারা···তারপরই আমি এখানে!···মাথায় যন্ত্রণা।···কিছুই তো বুঝতে পারছি না!'

'প্রিন্স পল রক্ষা করুন আমাদের,' বিড়বিড় করল মরিডো। 'কথা বলার সময় নেই! দড়ি ধরে উঠতে পারবেন? এই যে, দড়ি।' রবিনের হাতে দড়িটা গুঁজে দিল সে। 'উঠতে পারবেন?'

অবাক হয়ে দড়িটা ধরে আছে রবিন। এটা কোথা থেকে এল? এর আগে কখনও দেখেছে বলে তো মনে পড়ছে না। ভীষণ দুর্বল লাগছে। মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা।

'জানি না!' ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল রবিন। 'চেষ্টা করব।'

'হবে না!' আপনমনেই বিড়বিড় করল মরিডো। 'বুঝেছি, পারবেন না। টেনে তুলতে হবে। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকুন। দড়ি বেঁধে টেনে তুলব।'

দড়ির মাথা রবিনের দুই বগলের তলা দিয়ে এনে বুকে শক্ত করে পেঁচাল মরিডো, গিঁট দিল। 'চুপ করে থাকুন। আমি উঠে যাই। তারপর টেনে তুলব। দেয়ালে অনেক ফাটল আছে। ওগুলোতে পা বাধিয়ে ওপরে ঠেলে দেবার চেষ্টা করবেন নিজেকে। আমাদের সাহায্য হবে। তা যদি না পারেন, চুপচাপ ঝুলে থাকবেন। ভয় নেই, ফেলে দেব না।'

দড়িতে টান পড়তেই ওপরের দিকে চেয়ে বলল, 'আসছে! অঘটন ঘটেছে এখানে!'

দড়ি ধরে রেলিঙে উঠে দাঁড়াল মরিডো। ঝুলে পড়ল অন্ধকারে।

নিঃশব্দে উঠে যাচ্ছে মরিডো। সেদিকে তাকিয়ে রইল রবিন। হাত চলে গেছে মাথার পেছনে, আহত জায়গা। এখনও বুঝতে পারছে না সে, কি করে এখানে এল! সঙ্গীরা কোথায় কি করছে, বুঝতে পারছে না। মনে পড়ছে, ওরা ঘরের ভেতরে দাঁড়িয়ে ছিল। দরজায় কুড়াল দিয়ে কোপানর শব্দ। জানালা দিয়ে ঘরের ভেতর এসে লাফিয়ে নেমেছে দুই তরুণ....

বড় একটা জানালার চৌকাঠে বসল মরিডো। লাফ দিয়ে নামল ভেতরে। ওরা তিনজন দাঁড়িয়ে আছে। সবাই উদ্বিগ্ন।

'পড়ে গিয়েছিল রবিন,' বলল মরিডো। 'খুব নাড়া খেয়েছে। চোট লেগেছে মাথায়। টেনে তুলতে হবে, নিজে নিজে উঠতে পারবে না। আসুন, দড়ি ধরতে হবে।'

চারজনেই চেপে ধরল দড়ি। টান দিল। ওঠার সময় সাহায্য করেছে গিঁটগুলো, এখন অসুবিধে সৃষ্টি করল। প্রতিটি গিঁট বেধে যাচ্ছে চৌকাঠের কিনারে, আটকে যাচ্ছে। হ্যাঁচকা টান দেয়া যাচ্ছে না। গিঁটের তলায় হাত ঢুকিয়ে দিয়ে সরিয়ে আনতে হচ্ছে অনেক কষ্টে।

ওজন বেশি না রবিনের। তাছাড়া ওরা চারজন। অসুবিধা সত্ত্বেও শিগগিরই দেখা গেল তার মাথা, কাঁধ। হাত বাড়িয়ে চৌকাঠ চেপে ধরল রবিন। দু'হাত ধরে তাকে তুলে আনল মুসা আর মরিডো।

'এলাম!' কাঁপছে রবিনের গলা। 'কিচ্ছু ভেব না, আমি ঠিকই আছি। মাথা ব্যথা করছে অবশ্য, ওটা এমন কিছু না। হাঁটতে পারব। কিন্তু ব্যালকনিতে কি করে এলাম, সেটাই মনে করতে পারছি না!'

'পারবেন,' মোলায়েম গলায় বলল মেরিনা। 'ওসব নিয়ে বেশি ভাবার দরকার নেই এখন। আর কোন অসুবিধে নেই তো?'

'না,' বলল রবিন।

আরেকটা শোবার ঘরে এসে ঢুকেছে ওরা। ভাপসা গন্ধ। অনুভবেই বুঝতে পারছে, বালি গিজগিজ করছে। তারার আবছা আলো জানালা দিয়ে ঢুকছে ভেতরে। কোন আসবাবপত্র দেখা গেল না।

পা টিপে টিপে দরজার কাছে এগিয়ে গেল মরিডো আর মেরিনা। নিঃশব্দে দরজা খুলল মরিডো, গলা বাড়িয়ে উঁকি দিল বাইরে। ফিরে এল আবার।

'কেউ নেই,' বলল মরিডো। 'লুকানর জন্যে একটা জায়গা বের করতে হবে এবার মেরিনা, তোমার কি মনে হয়? মাটির তলার কোন একটা ঘরে নিয়ে যাব?'

'ন্‌নাহ,' জোরে মাথা নাড়ল মেরিনা। 'দড়ি দেখে ভাববে, নিচে নেমে গেছেন ওঁরা। নিচের কোন ঘরেই খোঁজা বাদ রাখবে না ব্যাটারা। দেখ!'

জানালায় দাঁড়িয়ে নিচে উঁকি দিল সবাই। নিচে, আঙিনায় আলো, নড়াচড়া করছে। টর্চ হাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে প্রহরীরা।

'ইতিমধ্যেই পাহারা শুরু হয়ে গেছে আঙিনায়,' বলল মেরিনা 'ওপরেই যেতে হবে আমাদের দিনটা কোথাও লুকিয়ে রাখতে হবে। আগামী রাতে দেখব, অন্য কোথাও সরিয়ে নিতে পারি কিনা। কোন একটা ডানজনের ভেতর দিয়ে পানি সরার ড্রেনে নিয়ে যাব। তারপর হয়ত নিয়ে চলে যেতে পারব আমেরিকান এমব্যাসিতে।'

'ভাল বলেছ,' সায় দিয়ে বলল মরিডো 'প্যালেসের এদিকটায় লোকজন আসে না। দড়ি নিচে নেমে গেছে, এদিকে ওঠার কথা ভাববে না কেউ।...সঙ্গে রুমাল আছে আপনাদের?'

'আছে,' পকেট থেকে সাদা রুমাল বের করে দিল কিশোর।

'নিচে আঙিনায় ফেলে দেব সুযোগমত,' বলে রুমালটা পকেটে রাখল মরিডো। জানালার ফ্রেমের মাঝখানের দণ্ডে বাঁধা দড়িটা, ওটা বেয়েই উঠে এসেছে। খুলে নিয়ে হাতে পেঁচাল সে। 'আসুন, যাই। মেরি, পেছনে থাক।'

একে একে করিডরে বেরিয়ে এল ওরা। দু'পাশে ঘর। ওপরে ছাত। অন্ধকার। মরিডোর হাত ধরেছে কিশোর। তার হাত মুসা, মুসার হাত রবিন। তার হাত মেরিনা। পাঁচজনের একটা শেকল যেন, নিঃশব্দ কিন্তু দ্রুতপায়ে এগিয়ে চলল।

টর্চ জ্বেলে দেখে নিল মরিডো। দেয়ালের গায়ে একটা দরজার সামনে এসে থামল। ধাক্কা দিল। খুলল না। আরও জোরে ধাক্কা দিতেই মরচে পড়া কব্জা তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করে উঠল খুলে গেল পাল্লা। চমকে উঠল সবাই।

কান খাড়া করে দুরু দুরু বুকে দাঁড়িয়ে রইল ওরা এক মুহূর্ত। না, কোনরকম শব্দ-শোনা গেল না। ভেতরে পা রাখল ওরা। একটা সিঁড়ি ঘর।

অন্ধকারে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল। সামনে আরেকটা। ধাক্কা দিয়ে দরজা খুলে ফেলল মরিডো।

খোলা ছাতে বেরিয়ে এল ওরা। ছাত ঘিরে রেখেছে উঁচু দেয়াল। দেয়ালের গায়ে মাঝে মাঝে বড় কুলুঙ্গিমত রয়েছে।

'ওখান থেকে তীর ছোঁড়া হত, গরম তেল ঢেলে দেয়া হত শত্রুর ওপর,' কুলুঙ্গিগুলো দেখিয়ে বলল মরিডো। আজকাল আর ওসবের দরকার হয় না। ছাতে পাহারাই থাকে না অনেক বছর ধরে।

প্রত্যেক কোনায় সেন্ট্রিরুম রয়েছে। এক কোণে পাথরের একটা খুপরিমত ঘরে নিয়ে এল ওদেরকে মরিডো। অনেক আপত্তি প্রকাশ করার পর খুলে গেল কাঠের দরজা। ভেতরে আলো ফেলল সে। চার দেয়াল ঘেঁষে চারটে লম্বা বেঞ্চ, ডিউটির ফাঁকে ফাঁকে ওখানেই শুয়ে ঘুমাত সেন্ট্রিরা। ধুলোয় একাকার। ছোট ছোট ফোকর রয়েছে দেয়ালে, কাচ নেই।

'এককালে সারাক্ষণ পাহারা থাকত এখানে,' বলল মরিডো। 'সে অনেক আগের কথা। এখানে আপাতত নিরাপদ আপনারা। আগামীকাল রাতে আবার আসব। যদি পারি।'

ধপ করে একটা কাঠের বেঞ্চে বসে পড়ল কিশোর। 'কপাল ভাল, এখন গরমকাল। নইলে ঠাণ্ডায় জমেই মরতে হত।...তো, এসব কি? কি ঘটেছিল?'

'কোন ধরনের ফাঁদ,' বলল মেরিনা। 'রূপালী মাকড়সা চুরির অজুহাতে আপনাদেরকে গ্রেফতার করা হত। তারপর, কোন একটা কায়দা বের করে সিংহাসনে বসতে দিত না প্রিন্স দিমিত্রিকে। এখন পর্যন্ত এইই জানি।'

'আমরা চুরি করিনি রূপালী মাকড়সা,' বলল কিশোর।

'জানি।'

'কিন্তু ওটা এখন আমাদের কাছেই আছে। রবিন, দেখাও ওদের।'

জ্যাকেটের এক পকেটে হাত ঢোকাল রবিন। তারপর ঢোকাল অন্য পকেটে। সর্তক হয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি খুঁজল সবক'টা পকেট। ঢোক গিলল। 'কিশোর...নেই...! নিশ্চয় পড়ে গেছে কোথাও!'

আট

'মাকড়সাটা ছিল আপনার কাছে? হারিয়েছেন?' আতঙ্কিত গলা মরিডোর।

'সর্বনাশ!' বলে উঠল মেরিনা। 'আপনাদের কাছে এল কি করে? হারালই বা কি করে?'

ভল্ট থেকে রূপালী মাকড়সা চুরি যাওয়ার কাহিনী খুলে বলল কিশোর, যা যা শুনেছিল প্রিন্স দিমিত্রির কাছে। জানাল, আসলটার জায়গায় নকলটা পড়ে আছে এখন। প্রিন্সের সন্দেহ, চুরি করেছে ডিউক রোজার, দিমিত্রির প্রিন্স হওয়া ঠেকানর জন্যে।

রবিন জানাল, ড্রয়ারে রুমালের ভাঁজ থেকে কি করে পেয়েছে সে মাকড়সাটা।

'ষড়যন্ত্রটা বুঝতে পারছি এবার,' চিন্তিত শোনাল মরিডোর গলা। 'ডিউক রোজারই মাকড়সাটা আপনাদের ঘরে লুকিয়ে রেখেছিল। তারপর লোক পাঠিয়েছে গ্রেফতার করতে। মাকড়সাটা পাওয়া যেত আপনাদের ঘরে। প্রিন্স দিমিত্রির অসাবধানতার কারণেই ওটা চুরি করতে পেরেছেন, ঘোষণা করে দিত ডিউক। প্রিন্সের ওপর বিশ্বাস হারাত লোকে। আপনাদেরকে ভ্যারানিয়া থেকে বের করে দিত রোজার, আমেরিকার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করত। রাজ্যশাসন চালিয়ে যেত। তারপর কোন এক সময়ে নিজেকে স্থায়ী রিজেন্ট ঘোষণা করে বসে পড়ত সিংহাসনে।'

'কিন্তু মাকড়সাটা এখন তার হাতে নেই,' বলল মুসা। 'আর তো এগোতে পারছে না।'

'পারছে,' বলল মরিডো। 'আপনাদেরকে ধরার চেষ্টা করবে। ধরতে পারলেই ঘোষণা করবে, মাকড়সাটা কোথাও লুকিয়ে ফেলেছেন আপনারা। আমেরিকান এমব্যাসিতে পালিয়ে যেতে পারলেও বদনাম থেকে রেহাই পাবেন না। তাহলে বলবে, রূপালী মাকড়সা চুরি করে নিয়ে চলে গেছেন আপনারা।'

'কিন্তু একটা ব্যাপার এখনও বুঝতে পারছি না,' বলল মুসা। 'রূপালী মাকড়সা হারালে কিংবা চুরি গেলে, দিমিত্রির দোষটা কোথায়? আমরা না এলেও তো ওটা চুরি যেতে পারত? আগুন লেগে কিংবা অন্য কোন কারণে নষ্ট হয়ে যেতে পারত। তখন?'

'তখন সারা দেশ শোক প্রকাশ করত দীর্ঘদিন ধরে। প্রিন্স দিমিত্রির কোন দোষ থাকত না। এখন তো বলবে, আমেরিকান কয়েকটা চোর বন্ধুকে এনে ভল্টে ঢুকিয়েছে, ফলে চুরি গেছে মাকড়সা। আসলে, প্রিন্স পল আমাদের কাছে কতখানি কি, সেটা বলে বোঝানো যাবে না আপনাদের। তাঁরই প্রতীকচিহ্ন ওই রূপালী মাকড়সা। ওটার ওপরই নির্ভর করছে আমাদের ভাগ্য, স্বাধীনতা, ভবিষ্যৎ।'

চুপ করে রইল তিন গোয়েন্দা।

'হয়ত বলবেন আমরা কুসংস্কারে বেশি বিশ্বাসী,' আবার বলল মরিডো। 'কিন্তু আজ পর্যন্ত মাকড়সার অবমাননা করে টিকতে পারেনি কেউ, ধ্বংস হয়ে গেছে। বংশ বংশ ধরে প্রিন্স পলকে ভালবেসে এসেছি আমরা। তাঁর আদেশ, তাঁর নির্দেশ এখনও ভ্যারানিয়ানদের কাছে ধ্রুববাক্য। আমরা জানি, যতদিন রূপালী মাকড়সা নিরাপদে থাকবে, ভ্যারানিয়ানরা নিরাপদ। ওটার কোন ক্ষতি হলেই অভিশাপ নেমে আসবে আমাদের ওপর। ওটা রক্ষা করার জন্যে প্রাণ দিতেও আপত্তি নেই আমাদের। সরাসরি না হলেও প্রিন্স দিমিত্রি এটা হারানর ব্যাপারে জড়িত, দেশের লোক তাই জানবে। মন থেকে কোনদিনই আর তাঁকে ভালবাসতে পারবে না। সিংহাসনে বসার অযোগ্য মনে করবে।' থামল একটু। ভাবল। তারপর বলল,

'তাহলে বুঝতেই পারছেন রূপালী মাকড়সা খুঁজে পেতেই হবে আমাদের। নইলে ডিউক রোজারেরই জিত।'

'সর্বনাশ করেছি তাহলে!' বলে উঠল রবিন। গলা কাঁপছে। ঢোক গিলল। 'কিশোর, মুসা, আমার পকেট খুঁজে দেখ।'

তন্ন তন্ন করে রবিনের সব পকেট খুঁজল মুসা আর কিশোর, টেনে উল্টে বের করে আনল পকেটের কাপড়। নেই। জামার হাতার ভাঁজ, প্যান্টের নিচের ভাঁজ, জুতো-মোজার ভেতর, কোথাও খোঁজা বাদ রাখল না। নেই তো নেই-ই। পাওয়া গেল না রূপালী মাকড়সা।

'ভাব, রবিন,' অবশেষে বলল কিশোর। 'ভাল করে ভেবে দেখ, কোথায় রেখেছিলে! তোমার হাতে ছিল ওটা, তারপর কি করলে?'

মনে করার চেষ্টা করল রবিন। 'জানি না!' হতাশ কণ্ঠ। 'রুমালের ভাঁজ থেকে পড়ে গিয়েছিল মেঝেতে। হাতে তুলে নিলাম। দরজায় ধাক্কা দেবার শব্দ হল। জানালা দিয়ে লাফিয়ে এসে পড়ল মরিডো। তারপর আর কিছু মনে নেই!'

'হুঁম্‌ম্‌!' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর। 'অ্যামনেশিয়া, আংশিক! মাথায় আঘাত পেলে মাঝেসাঝে ঘটে এটা। বিস্মরণ ঘটে। অতীত জীবনের সমস্ত স্মৃতি হারিয়ে যায় কারও, কেউ হারায় কয়েক হপ্তা, কেউ কয়েক দিন। কয়েক মিনিট হারিয়ে ফেলার ঘটনাও ঘটেছে অনেক। রবিনেরটা কয়েক মিনিট। কারও কারও বেলায় ঠিক হয়ে যায় এটা, আবার ফিরে পায় ওই স্মৃতি। ওর বেলায় কি ঘটবে, জানি না! মাথায় আঘাত লাগার তিন চার মিনিট আগের সমস্ত ঘটনা মুছে গেছে তার মন থেকে।'

'মনে হয় ঠিকই বলেছ,' বলল রবিন। 'হয়ত তা-ই ঘটেছে।' আহত জায়গায় হাত চলে গেল। 'খুব আবছাভাবে মনে পড়ছে এখন, সারা ঘরে ছুটোছুটি করছিলাম। মাকড়সাটা লুকানর জায়গা খুঁজছিলাম। উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম খুব। কার্পেটের তলায়, গদির তলায়, কিংবা আলমারিতে ঢুকিয়ে রাখার কথা মনে এসেছিল। তবে ওসব জায়গা নিরাপদ বলে মনে হয়নি...'

চুপ করল রবিন।

অন্যরাও চুপ করে রইল কয়েক মুহূর্ত। এরপর কি করেছে, মনে করার সুযোগ দিল রবিনকে। কিন্তু আর কিছু মনে করতে পারল না সে।

'আমাকে দেখার পর একটা কাজ করাই সবচেয়ে স্বাভাবিক,' বলল মরিডো। 'পকেটে ঢুকিয়ে ফেলা। হয়ত তাই করেছেন। তবে ভালমত রাখতে পারেননি তাড়াহুড়ায়। তারপর, যখন কার্নিসে উঠলেন, কোনভাবে পড়ে গেছে মাকড়সাটা। ব্যালকনিতে যখন আছড়ে পড়েছেন, তখনও পড়ে গিয়ে থাকতে পারে।'

'কিংবা হয়ত আমার হাতেই ছিল, পকেটে ঢোকাইনি,' বলল রবিন। 'কোন এক সময় হাত থেকে ছুটে পড়ে গেছে। কার্নিস কিংবা ব্যালকনিতে পড়ে থাকার

আশা খুবই কম, তবে সম্ভবত নিচে, আঙিনায় পড়েছে।'

'আঙিনায় পড়ে থাকলে পাওয়া যাবে,' বলল মরিডো। 'ব্যালকনি কিংবা কার্নিসে থাকলেও পেয়ে যাব! কিন্তু, যদি পাওয়া না যায়...' চুপ করে গেল সে।

'কিংবা ঘরেও ফেলে এসে থাকতে পারেন,' এতক্ষণে কথা বলল মেরিনা। 'হয়ত খোঁজার কথা ভাববেই না গার্ডেরা। ধরেই নেবে, আপনারা সঙ্গে নিয়ে গেছেন যদি আঙিনায় পাওয়া না যায়, আগামীকাল রাতে আবার সে ঘরে ফিরে যাব আমরা। খুঁজব। কার্নিস আর ব্যালকনিও বাদ দেব না।'

নয়

সারাটা রাত ওই সেন্ট্রিরুমেই কাটিয়ে দিয়েছে তিন গোয়েন্দা।

ছাতে কেউ খুঁজতে আসেনি তাদেরকে। বেশ ভালই বুদ্ধি করেছিল মরিডো। ব্যালকনি থেকে ঝোলানো দড়ি, একটা ডানজনের দরজায় পড়ে থাকা কিশোরের রুমাল (পরে জেনেছে তিন গোয়েন্দা) অন্যদিকে চোখ সরিয়ে রেখেছে পাহারাদারদের। ছাতে খোঁজার কথা ভাবেইনি কেউ।

আরও কিছুক্ষণ কথা বলে চলে গিয়েছিল মরিডো আর মেরিনা। তারপর লম্বা হয়ে কাঠের বেঞ্চেই শুয়ে পড়েছে তিন কিশোর। সারাদিন প্রচণ্ড পরিশ্রম আর উত্তেজনার মাঝে কেটেছে, শক্ত কাঠের ওপর শুয়েই ঘুমিয়ে পড়েছিল।

পরদিন সূর্য ওঠার পর ভাঙল ঘুম।

চোখ মেলল মুসা। বড় করে হাই তুলল, আড়মোড়া ভাঙল। পাশে চেয়ে দেখল, আগেই উঠে পড়েছে কিশোর। হালকা ব্যায়াম করছে মাংসপেশীর জড়তা দূর করার জন্যে।

উঠে বসল মুসা। জুতো গলাল পায়ে। দাঁড়াল। এখনও ঘুমিয়ে আছে রবিন।

'সকালটা বেশ সুন্দর,' দেয়ালের ফোকর দিয়ে বাইরে উঁকি দিয়ে বলল মুসা। 'দিনটা ভালই যাবে, তবে আমাদের জন্যে না। পেটের ভেতর ছুঁচো নাচানাচি করছে। অথচ কোন খাবার নেই, নাস্তাই নেই, লাঞ্চ আর ডিনার তো স্বপ্ন! কিশোর, খাওয়া-টাওয়া পাব কিছু?'

'দুত্তোর তোমার খাওয়া!' ঝাঁঝালো কণ্ঠ কিশোরের। 'কি করে বেরোব, এই মৃত্যুপুরী থেকে তাই জানি না, খাওয়া! মরিডো কি করছে না করছে, রাতেও আসতে পারবে কিনা, তাই বা কে জানে!'

'সত্যিই বেরোতে পারব না আমরা এখান থেকে!' চুপসে গেছে মুসা। 'তাহলে আর জীবনেও কিছু খাওয়া হবে না!' হতাশ ভঙ্গিতে এদিক ওদিক মাথা নাড়ল সে। 'আচ্ছা কিশোর, তোমার কি মনে হয়? জেগে উঠলে মনে করতে পারবে রবিন? রূপালী মাকড়সা কোথায় রেখেছে, বলতে পারবে?'

কিশোর কোন জবাব দেবার আগেই চোখ মেলল রবিন। মিটমিট করে বন্ধ করল, তারপর আবার খুলল। 'আমরা কোথায়?' বলতে বলতেই হাত নিয়ে গেল মাথার পেছনে, আহত জায়গায়। 'ইহ্! ব্যথা…! হ্যাঁ, এই বার মনে পড়েছে…'

'কি, কি মনে পড়েছে?' লাফ দিয়ে দেয়ালের কাছ থেকে সরে এল মুসা। 'রূপালী মাকড়সা কোথায়, মনে পড়েছে?'

মাথা নাড়ল রবিন। 'এখানে কি করে এলাম, সেটা মনে পড়েছে।'

'অ-অ!' আবার হতাশ হয়ে পড়ল মুসা। আবার চলে গেল ফোকরের কাছে।

'ভেব না, রবিন,' আশ্বাস দিল কিশোর। 'সময় যাক। তোমার মাথার যন্ত্রণা যাক। তারপর হয়ত মনে পড়ে যাবে সব কথা…'

'এই চুপ!' চাপা গলায় হুঁশিয়ার করল মুসা। 'একটা লোক! এদিকেই আসছে!'

দ্রুতপায়ে ফোকরের কাছে এসে দাঁড়াল অন্য দুজন।

ঢোলাঢালা ধূসর রঙের পোশাক পরনে। সামনের দিকে লম্বা অ্যাপ্রন। হাতে ঝাড়ু, বালতি আর ন্যাকড়া। কয়েক পা এগিয়েই হাতের জিনিসগুলো নামিয়ে রাখল লোকটা। ভুরু কুঁচকে তাকাল একবার সেন্ট্রিরুমের দিকে। পেছনে সিঁড়ির দিকে তাকাল। তারপর এগিয়ে এল পায়ে পায়ে।

টোকা পড়ল দরজায়। আস্তে করে।

'মুসা, দরজাটা খুলে দাও,' ফিসফিস করে বলল কিশোর। 'গার্ড নয়। ও জানে, আমরা আছি এর ভেতর।'

ছিটকিনি খুলে দিয়েই এক লাফে পাশে সরে গেল মুসা। তৈরি। যদি তেমনি বোঝে, লাফিয়ে পড়বে লোকটার ঘাড়ে। তিনজনে মিলে কাবু করে ফেলতে পারবে।

আস্তে ঠেলা দিয়ে দরজা খুলল লোকটা। চট করে ঢুকেই ঠেলে বন্ধ করে দিল আবার পাল্লা। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। তারপর গিয়ে দাঁড়াল একটা ফোকরের কাছে। সিঁড়ির দিকে চেয়ে বলল, 'কেউ পিছু লেগেছে কিনা, দেখছি! হুঁশিয়ার থাকা ভাল।'

দুটো মিনিট চুপচাপ ফোকরের কাছে দাঁড়িয়ে রইল ওরা। দৃষ্টি সিঁড়ি আর হাতের দিকে।

'না, কেউ লাগেনি পেছনে,' অবশেষে বলল লোকটা। 'আমি ঝাড়ুদার। এক ফাঁকে উঠে চলে এসেছি। দেখেনি কেউ। মরিডোর মেসেজ আছে। জানতে চেয়েছেঃ রবিনের মনে পড়েছে কিনা।'

'না,' জবাব দিল কিশোর। 'মরিডোকে বলবে, মনে পড়েনি।'

'বলব। অধৈর্য হতে মানা করেছে মরিডো। আঁধার নামলেই আসবে সে। এই যে নিন, খাবার।' অ্যাপ্রনের পকেট থেকে একটা অয়েল-পেপারের প্যাকেট বের

করে দিল লোকটা। আরেক পকেট থেকে একটা প্লাস্টিকের বোতল বের করল। 'আর এই যে, পানি।'

খাবারের প্যাকেট আর বোতল হাতে নিল মুসা।

'আমি যাই,' বলল লোকটা। 'নিচের অবস্থা খুব খারাপ। ধৈর্য হারাবেন না, সাহেবরা। প্রিন্স পল রক্ষা করবেন আপনাদের।' তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে চলে গেল ঝাড়ুদার।

দরজার ছিটকিনি তুলে দিল কিশোর।

ইতিমধ্যে খাবারের প্যাকেট অর্ধেক খুলে ফেলেছে মুসা। স্যাণ্ডউইচ, আর কিছু ফল। হাসি একান ওকান হয়ে গেল তার। 'আর দেরি করে লাভ কি? এস শুরু করে দিই।' একটা স্যাণ্ডউইচ নিয়ে প্যাকেটটা বেঁধে নামিয়ে রাখল। কামড় বসাল খাবারে।

'রেখে রেখে খেতে হবে,' একটা স্যাণ্ডউইচ তুলে রবিনের দিকে বাড়িয়ে ধরল কিশোর। 'এই খাবার আর পানি দিয়েই চালাতে হবে সারাটা দিন। প্রাসাদে মরিডোর লোক না থাকলেই মরেছিলাম!'

'হ্যাঁ,' স্যাণ্ডউইচ চিবোতে চিবোতে বলল রবিন। 'আচ্ছা, গতরাতে প্রিন্স দিমিত্রি আর মিনস্ট্রেল পার্টি নিয়ে কি যেন আলাপ করছিলে মরিডোর সঙ্গে। মাথার ব্যথায় ভালমত কান দিতে পারিনি।'

'কিছু কিছু কথা তো দিনেই শুনেছ,' বলল কিশোর। 'দিমিত্রির বাবার রাজত্বকালে প্রধানমন্ত্রী ছিলেন মরিডোর বাবা। ডিউক রোজার রিজেন্ট হয়েই তাঁকে চেয়ার ছাড়তে বাধ্য করল। তখন থেকেই রোজারের ওপর সন্দেহ মিনস্ট্রেলদের। ওরা বুঝে ফেলল, দিমিত্রিকে সহজে প্রিন্স হতে দেবে না ডিউক। কাজে নেমে পড়ল ওরা। গোপনে একটা দল গঠন করল। প্রিন্স পলের নাম করে শপথ নিল, নিজেদের প্রাণের বিনিময়ে হলেও, রোজারের পরিকল্পনা সফল হতে দেবে না। গার্ড, অফিসার এমনকি চাকর-বাকর ঝাড়ুদারদের মাঝেও লোক আছে তাদের। গতরাতে, আমাদেরকে গ্রেফতার করার আদেশ দিয়েছিল রোজার। সেটা জেনে ফেলেছিল একজন গার্ড, মিনস্ট্রেল পার্টির লোক। সঙ্গে সঙ্গে মরিডোকে জানিয়েছে সে ব্যাপারটা। এক বিন্দু দেরি করেনি মরিডো আর মেরিনা। ছুটে চলে এসেছে। নইলে তো গিয়েছিলাম ধরা পড়ে···,' স্যাণ্ডউইচে কামড় বসাল কিশোর। চিবিয়ে গিলে নিয়ে বলল, 'ছোট বেলায় প্যালেসে প্রায়ই আসত মেরিনা আর মরিডো। কোথাও ঢোকা বারণ ছিল না ওদের। ফলে এই প্রাসাদের গলি ঘুপচি প্রায় সবই ওদের চেনা। গোপন কোন্ পথ দিয়ে গিয়ে কোন্ সুড়ঙ্গে ঢোকা যায়, সেখান থেকে নেমে যাওয়া যায় বিশাল নর্দমায়, জানে ওরা। গার্ডদেরও অনেকেই চেনে না ওই পথ। ওদের চোখ এড়িয়ে তাই সহজেই প্রাসাদে ঢুকে পড়তে পারে দুই ভাইবোন, বেরিয়ে যেতে পারে।'

'খুব ভাল,' বলে উঠল মুসা। 'তবে আমরা আটকে আছি ছাতে, এটা আবার খুব খারাপ কথা। তোমার কি মনে হয়? গার্ডদের চোখ এড়িয়ে আজ রাতে আসতে পারবে ওরা? বের করে নিয়ে যেতে পারবে আমাদের?'

'মনে তো হয়,' বলল কিশোর। 'তার আগেই যদি অবশ্য ধরা না পড়ে যাই। এখান থেকে বেরিয়েই সোজা আমেরিকান এমব্যাসিতে চলে যেতে হবে আমাদের। ক্যাসেটটা তুলে দিতে হবে ওদের হাতে। রোজারের বিরুদ্ধে এটা একটা সাংঘাতিক প্রমাণ।'

'জেমস বণ্ড হলে নিশ্চিন্ত থাকতে পারতাম এখন,' হাতের অবশিষ্ট স্যাণ্ডউইচটুকু মুখে পুরে দিল মুসা। দুই চিবান দিয়েই গিলে ফেলল কোঁৎ করে। 'জেমস বণ্ডের একটা সুবিধে আছে। যে-কোন বিপদেই পড়ুক না কেন, ঠিক বেরিয়ে যায়। তারজন্যে বিপদে পড়া আর না পড়া সমান কথা। কিন্তু আমাদের? নিজেরা কিছুই করতে পারছি না। অন্যের ওপর নির্ভর করে হাঁ হয়ে বসে থাকতে হবে সারাটা দিন!'

'আমাদের সাধ্যমত আমরা করেছি, করব,' দৃঢ়কণ্ঠে বলল কিশোর। 'এখান থেকে বেরিয়ে যাব, প্রিন্স দিমিত্রিকে সাহায্যও করব। সহজে হাল ছাড়ছি না। তবে, মরিডো আর মেরিনা আসার আগে হাঁ করেই বসে থাকতে হবে আমাদের, এতে কোন সন্দেহ নেই।...সেকেণ্ড, নাস্তা-লাঞ্চ সব একবারেই সেরে ফেলবে নাকি?'

বাড়ানো হাতটা ঝট করে সরিয়ে নিল মুসা। করুণ চোখে তাকাল অবশিষ্ট কয়েকটা স্যাণ্ডউইচের দিকে। 'মনে করিয়ে দিয়েছ, ধন্যবাদ! ঠিক আছে লাঞ্চের সময়ই না হয় আবার খাব। আসলে, জানই তো, গোটা বিশেক স্যাণ্ডউইচ খাওয়ার পরেও একটা হাঁস খেয়ে ফেলতে পারি...'

'এখান থেকে বেরিয়ে যেতে পারলে ডবল খেয়ে পুষিয়ে নিয়ো,' বলল কিশোর। 'ভবিষ্যতে বেশি খাওয়ার জন্যেই এখন কম খেয়ে প্রাণটা বাঁচিয়ে রাখতে হবে তোমাকে। অনেক বড় একটা দিন পড়ে আছে সামনে।'

সত্যিই, অনেক দীর্ঘ একটা দিন। সারাটা দিন শুয়ে বসেই কাটাতে হল ওদের। কখনও উঠে গিয়ে ফোকরে চোখ রাখে, ছাতে কেউ উঠে আসছে কিনা দেখে।

অবশেষে সেইন্ট ডোমিনিকের সোনালি গম্বুজের চূড়ার কাছে নেমে গেল সূর্যটা। দু'এক মুহূর্ত ঝুলে রইল যেন অনিশ্চিতভাবে, তারপর টুপ করে ডুবে গেল পাহাড়ের ওপাশে। ডেনজো নদীর তীরে ঘন গাছগাছালির ভেতর থেকে ভেসে এল ঘরেফেরা পাখির কলরব। সেটাও থেমে গেল একসময়।

রাত নামল। ঘন হল অন্ধকার। সমস্ত প্রাসাদটা নীরব নিঝুম।

রাত বাড়ল। বাড়তেই থাকল। দেখা নেই মরিডোর। অস্থির হয়ে উঠছে তিন

গোয়েন্দা। তবে কি সে আসবে না? কোনরকম বিপদে পড়ে গেল?

দরজা খুলল মুসা। অন্ধকার ছাত। আকাশে মেঘ জমছে। দূরে মিটমিট করছে শহরের আলো। বাতিগুলোরও ঘুম পেয়েছে যেন।

হঠাৎ ধড়াস করে উঠল হৃৎপিণ্ডটা। পাঁই করে ঘুরল মুসা। কখন নিঃশব্দে পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে ওরা, টেরই পায়নি।

সেন্ট্রিরুমের দরজা বন্ধ করে দিয়ে টর্চ জ্বালল মরিডো। ফিসফিস করে বলল, 'এবার বেরোতে হয়। চলুন। আমেরিকান এমব্যাসিতে যেতে হবে। পরিকল্পনা বদল করেছে ডিউক রোজার। খবর পেলাম, প্রিন্স দিমিত্রির অভিষেক অনুষ্ঠান স্থগিত ঘোষণা করবে সে আগামী কালই। নিজেকে অনির্দিষ্টকালের জন্যে রিজেন্ট ঘোষণা করবে।'

'ঠেকানো যাবে না?' জানতে চাইল কিশোর।

'সম্ভব না। জনসাধারণকে যদি আসল কথাটা জানানো যেত, ছুটে আসত ওরা। ধ্বংস করে দিত রোজারকে। কিন্তু জানানো যাচ্ছে না। টেলিভিশন আর রেডিও স্টেশন দখল করে বসে আছে ডিউকের লোক। মিলিটারি দিয়ে ঘিরে রেখেছে। ওদেরকে হটানর ক্ষমতা আমাদের নেই,' রবিনের দিকে ফিরল। 'রূপালী মাকড়সা কোথায় রেখেছেন, মনে পড়েছে? আঙিনায় পাওয়া যায়নি ওটা।'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল রবিন। মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে।

'মাকড়সাটা যদি পাওয়া যায়,' বলে উঠল কিশোর, 'কি লাভ হবে? রোজারকে ঠেকানো যাবে এখন?'

'হয়ত,' কথা বলল মেরিনা। 'মিনস্ট্রেলরা গোপনে একটা সভা ডাকতে পারবে। পাড়ার মাতব্বর গোছের কিছু কিছু লোককে ডেকে আনা হবে। মাকড়সাটা দেখিয়ে বলতে পারবে প্রিন্স দিমিত্রি সাহায্য চান। আমাদের হাতের রূপালী মাকড়সা দেখলে অবিশ্বাস করবে না তারা। খবরটা ছড়িয়ে পড়বে। এতে হয়ত স্রোতের মোড় ঘুরেও যেতে পারে। শুধু ডেনজো শহরের লোক খেপে উঠলেই রোজারের বারোটা বাজবে।'

'তাহলে,' জোর দিয়ে বলল কিশোর। 'মাকড়সাটা খুঁজে বের করতেই হবে আমাদের। এবং সেটা এই প্রাসাদ ছাড়ার আগেই। ব্যালকনি, কার্নিস সব খুঁজব। শেষে ঢুকব সেই ঘরে। রূপালী মাকড়সা না নিয়ে যাব না।'

'বুঝতে পারছেন, কি ভয়ানক ঝুঁকি নিতে যাচ্ছেন?' হুঁশিয়ার করল মরিডো।

'পারছি,' শান্ত কণ্ঠে বলল কিশোর। 'তবে, বিপদে না-ও পড়তে পারি। ওই ঘরে আবার ফিরে যাব আমরা, ভাববে না কেউ।...অন্তত, সে-সম্ভাবনা কম...'

দশ

সেন্ট্রিরুম ছাড়ার আগে প্রতিটি সম্ভাবনার ব্যাপারে আলোচনা করল ওরা। এখানে ঢুকেছিল, এটা যাতে কেউ বুঝতে না পারে, সে ব্যাপারেও খুব সর্তক হল। পড়ে থাকা খাবারের প্রতিটি কণা তুলে নিল, ফেলে দিল ফোকর দিয়ে ডেনজো নদীতে। প্যাকেটের কাগজটা দলে মুচড়ে বল বানিয়ে ফেলে দিল। মোট কথা, কোনরকম চিহ্নই রাখল না।

রাত আরও বাড়ার অপেক্ষায় রইল ওরা, পাহারাদারদেরকে ঝিমিয়ে পড়ার সময় দিল।

'অনেক অপেক্ষা করেছি,' একসময় বলে উঠল মরিডো। 'দুটো বাড়তি টর্চ এনেছি, এই যে,' পকেট থেকে ছোট দুটো টর্চ বের করে মুসা আর কিশোরের হাতে তুলে দিল। 'নিতান্ত দরকার না হলে জ্বালবেন না। গতরাতের মতই আমি আগে থাকব, মেরি সবার পেছনে। ঠিক আছে?'

নীরবে মাথা কাত করে সমর্থন জানাল তিন গোয়েন্দা।

এক সারিতে সেন্ট্রিরুম থেকে বেরিয়ে এল ওরা। একটা তারা নেই আকাশে, ঢেকে গেছে কালো মেঘে। ওরা বেরোতে না বেরোতেই একটা দুটো করে বৃষ্টির ফোঁটা পড়তে শুরু করল, বড় বড়।

সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল ওরা। পাঁচতলার করিডরে নেমে থামল। কালি গুলে দিয়েছে যেন কেউ। আধ হাত দূরের জিনিস দেখা যায় না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল পুরো একটা মিনিট। না, কোন শব্দ কানে আসছে না। মরে গেছে যেন বিশাল প্রাসাদটা।

ঝুঁকি নিতেই হল। টর্চ জ্বালল মরিডো, অন্ধকারে এগোতে পারবে না নইলে। একবার জ্বেলেই নিভিয়ে দিল আবার। পথ দেখে নিয়ে পা বাড়াল।

অন্ধকারে এগিয়ে চলেছে ওরা। মাঝে মাঝে টর্চ জ্বেলে পথ দেখে নিচ্ছে মরিডো।

পেরিয়ে এল অসংখ্য করিডর, সিঁড়ি। ছেড়ে দিলে বলতেই পারবে না তিন গোয়েন্দা, কোন পথে এসেছে। পথ চিনে ফিরে যেতে পারবে কিনা সন্দেহ। মস্ত এক গোলক ধাঁধা যেন!

তবে মরিডো চেনে পথ। একটা ঘরে এসে ঢুকল সবাইকে নিয়ে। ছিটকিনি তুলে দিল দরজায়।

'একটু জিরিয়ে নিই এখানে,' বলল মরিডো। 'এ-পর্যন্ত তো ভালই এলাম। তবে সবচেয়ে সহজ পথটা পেরিয়েছি। এইবার আসতে পারে বিপদ। আমার মনে হয়, আপনাদেরকে প্যালেসে আর খুঁজছে না ওরা এখন। তাহলে সতর্কতায় ঢিল

পড়তে বাধ্য। সুযোগটা নেব আমরা। প্রথমে যাব সেই ঘরে, রূপালী মাকড়সা পাই আর না পাই। তারপর চলে যাব ডানজনে। সেখান থেকে নেমে পড়ব পাতালের ড্রেনে। মাটির তলা দিয়ে চলে যাব আমেরিকান এমব্যাসির কাছে। আপনাদেরকে নিরাপদে পৌঁছে দিয়েই অন্য কাজে হাত দেব। পোস্টার টানাব, হরতাল করব মিনস্ট্রেলদের নিয়ে। ডিউক রোজারের শয়তানী ফাঁস করে দেব। জনগণকে চেতিয়ে দেবার চেষ্টা চালাব। তারপর যা থাকে কপালে, হবে।' চুপ করল সে। তারপর বলল, 'চলুন, যাই। জানালা দিয়ে বেরিয়ে গতরাতের মত ব্যালকনিতে নামি। কার্নিস ধরে চলে যাব সেই ঘরটায়।'

দুটো দড়ি নিয়ে এসেছে ওরা। একটা মরিডোর হাতে পেঁচানো। আরেকটা মেরিনার কোমরে।

হাতের দড়িটা খুলে নিয়ে জানালার মাঝখানের দণ্ডের সঙ্গে শক্ত করে বাঁধল মরিডো। তারপর দড়ি বেয়ে নেমে চলে গেল। কয়েক মুহূর্ত পরেই চাপা শিসের শব্দ এল ব্যালকনি থেকে। তারমানে পৌঁছে গেছে সে। ওদেরকে যাবার জন্যে ইঙ্গিত করেছে।

মুসা নেমে চলে গেল। তাকে অনুসরণ করল কিশোর।

জানালা দিয়ে বাইরে উঁকি দিল মেরিনা আর রবিন। ব্যালকনিতে আবছা আলো নড়াচড়া করছে। টর্চের মুখে হাত চাপা দিয়ে রূপালী মাকড়সা খুঁজছে তিনজনে।

খানিক পরেই নিভে গেল আলো। আবার শোনা গেল চাপা শিস।

রবিনকে দড়ি ধরে ঝুলে পড়তে বলল মেরিনা।

ব্যালকনিতে নেমে এসেছে পাঁচজনে। দড়িটা ঝুলে আছে। থাকবে এভাবেই। রূপালী মাকড়সা খোঁজা শেষ করে আবার এপথেই ফিরে যেতে হবে। করিডর আর গোপন কিছু সিঁড়ি বেয়ে নামবে মাটির তলার ডানজনে।

'মাকড়সাটা এখানে পড়েনি,' অন্ধকারে ফিসফিস করে জানাল মরিডো। কণ্ঠস্বরেই বোঝা যাচ্ছে, উত্তেজিত। 'কে জানে, নদীতেই পড়ে গেল কিনা! তবে ঘরটা আর কার্নিস না দেখে শিওর হওয়া যাবে না।'

ব্যালকনির রেলিঙ টপকে কার্নিসে নামল ওরা। দেয়ালের দিকে মুখ করে এক সারিতে এগিয়ে চলল শামুক-গতিতে। তেমনি নিঃশব্দে।

কার্নিসটা যেখানে নব্বই ডিগ্রি কোণ করে মোড় নিয়েছে, সেখানে এসে মুহূর্তের জন্যে থমকে গেল রবিন। নিচে অন্ধকারের দিকে তাকাল! এখানে পড়ে যায়নি তো রূপালী মাকড়সা! তাহলে গেল। আর পাওয়া যাবে না ওটা। এর বেশি ভাবতে চাইল না রবিন। পাশে সরে সরে আবার এল সঙ্গীদের সঙ্গে।

কয়েক পা করে এগিয়েই টর্চ জ্বেলে দেখে নিচ্ছে মরিডো। শেষ পর্যন্ত পৌঁছুল এসে সেই ঘরটার ব্যালকনিতে। কিন্তু পাওয়া গেল না রূপালী মাকড়সা। শেষ

ভরসা এখন, ওই ঘর। ওখানেও যদি না পাওয়া যায়...রবিনের মতই আর ভাবতে চাইল না সে-ও।

সবাই এসে উঠল ব্যালকনিতে। সাবধানে। পর্দা সরিয়ে ঘরের ভেতরে উঁকি দিল মরিডো। অন্ধকার। কেউ আছে বলে মনে হল না। টর্চের আলো ফেলে নিশ্চিত হল, কেউ নেই।

একে একে ঘরে এসে ঢুকল ওরা সবাই।

'এইবার খুঁজতে হবে,' বলল কিশোর। 'কোথাও বাদ দিলে চলবে না। আনাচে-কানাচে, জিনিসপত্রের তলায়, সব জায়গায় দেখতে হবে।'

হঠাৎ তীক্ষ্ণ কর্কশ একটা শব্দে চমকে উঠল সবাই। কি করে জানি, ঘরে এসে ঢুকেছে একটা ঝিঁঝি পোকা।

'ঘরে ঝিঁঝি ঢোকা সৌভাগ্যের লক্ষণ,' ফিসফিস করে বলল মুসা। 'এটা আফ্রিকান প্রবাদ। প্রচুর সৌভাগ্য এখন দরকার আমাদের'

'হয়েছে,' বলল কিশোর 'কথা না বলে এস এখন কাজ করি।'

খুঁজতে শুরু করল ওরা। হাঁটু মুড়ে বসে, দরকার পড়লে উপুড় হয়ে শুয়ে, প্রতিটি বর্গ ইঞ্চি জায়গা খুঁজে দেখতে লাগল। কার্পেটের তলা, গদির নিচে দেখল আগে। তারপর দেখল খাট, আলমারি আর অন্যান্য আসবাবপত্রের তলায়। শেষে দেখল আলমারির প্রতিটি ড্রয়ার, মাকড়সাটা লুকিয়ে রাখা যেতে পারে, এমন প্রতিটি জায়গায়।

খাটের তলায় ঢুকে পড়ল রবিন। হাতে লাগল শক্ত মসৃণ কিছু। 'পেয়েছি!' বলে চেঁচিয়ে উঠেই চুপ হয়ে গেল প্রতিটি টর্চের আলো এসে পড়ল তার হাতের ওপর। 'ধাতব জিনিস!' তবে রূপালী মাকড়সা নয় অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি। ক্যামেরার ফিল্মের কৌটার ঢাকনা

'দুত্তোর!' ক্রল করে এগিয়ে গেল রবিন। উপুড় হয়ে বসে আলো ধরে রেখেছে মুসা।

'ক্রিক! ক্রিক!' তীক্ষ্ণ শব্দ উঠল।

আলো সরে গেল মুসার টর্চের। সবাই দেখল, ঘরের কোণের দিকে দ্রুত সরে যাচ্ছে কালো একটা পোকা। ঝিঁঝি। আলোয় অস্বস্তি বোধ করছে। ছুটে অন্ধকারে পালাতে চাইছে

কপাল খারাপ পোকাটার। তাড়াহুড়ো করে লাফিয়ে সরতে গিয়ে পড়ল প্রিন্স পল মাকড়সার জালে। ছাড়া পাবার জন্যে ছটফট করতে লাগল।

দুলে উঠল জাল। সুতো বেয়ে খবর পৌঁছে গেল মাকড়সার কাছে। তক্তার প্রান্ত আর মেঝের মাঝখানে সেই ফাঁকটাতেই বসে আছে মাকড়সা, গায়ে গা ঠেকিয়ে। দুটো। লাল বড় বড় চোখ চকচক করছে আলোয়।

দ্রুত জাল বেয়ে উঠে এল একটা মাকড়সা। তাই কবে ওরা। সঙ্গীসাথী তেই

থাকুক, শিকার ধরা পড়লে এক জালে একটা মাকড়সাই উঠে আসে। মুখ থেকে আঠালো সুতো বের করে পেঁচিয়ে ফেলে শিকারকে। তারপর ধীরেসুস্থে বসে আরাম করে চুষে খায় রস।

খুব বেশিক্ষণ ছটফট করতে পারল না বেচারা ঝিঁঝি। দ্রুত জড়িয়ে যেতে লাগল আঠালো সুতোয়। নড়ার ক্ষমতাই আর রইল না। সাদাটে-কালো একটা গোল পুটুলি হয়ে ঝুলে রইল জালে।

ছুটে গিয়ে ঝিঁঝিকে মুক্তি দেবার প্রচণ্ড ইচ্ছেটা জোর করে রোধ করল রবিন পোকাটাকে সরিয়ে আনতে হলে জাল ছিঁড়তে হবে মাকড়সার। হয়ত বা মাকড়সাটাকে আহত করতে হতে পারে। কিন্তু সেটা অসম্ভব ভ্যারানিয়ার সৌভাগ্যবাহী প্রাণীর গায়ে আঙুল ছোঁয়ালেই মৃত্যুদণ্ড হয়ে যাবে তার।

'কই, তোমার আফ্রিকান প্রবাদের কি হল?' মুসার দিকে ফিরে বলল রবিন 'আমাদের সৌভাগ্য আনতে গিয়ে ওই বেচারাকেই মরতে হল। ভাবছি, আমরাও না আবার রোজারের জালে জড়িয়ে মরি, ওই ঝিঁঝিটার মতই!'

চুপ করে রইল মুসা।

খাটের তলায় পাওয়া গেল না রূপালী মাকড়সা। বেরিয়ে এল রবিন আলমারির সমস্ত ড্রয়ার খুলে মেঝেতে ফেলেছে মরিডো আর কিশোর। ফোকরে হাত ঢুকিয়ে দেখছে।

'মনে হয়,' ফিসফিস করে বলল কিশোর, 'নদীতেই পড়ে গেছে মাকড়সাটা! গার্ডেরা পায়নি, আপনি শিওর তো?' মরিডোকে জিজ্ঞেস করল সে

'শিওর,' বলল মরিডো। 'ভয়ানক খেপে আছে ডিউক রোজার। মাকড়সাটা পেয়ে গেলে অন্যরকম থাকত তার মেজাজ ' পেছনে এসে দাঁড়ানো রবিনের দিকে ফিরল সে। আলো ফেলল তার গায়ে।

এদিক ওদিক মাথা নাড়ল রবিন ধীরে ধীরে। সেই আগের মতই অন্ধকারে ঢেকে আছে তার স্মৃতির কয়েকটা মিনিট কিছুতেই ঢাকনা সরাতে পারছে না ওখান থেকে।

'ঠিক আছে, আবার একবার খুঁজে দেখি সারা ঘর,' বলল মরিডো। কিশোরের দিকে ফিরল। 'আসুন, আমরা সুটকেসগুলো দেখি মেরি, তুমি দেখ বালিশের খোলের ভেতরে গদিটাও তুলে দেখ আরেকবার।'

জানে ওরা, বৃথা সময় নষ্ট, তবু আরেকবার খুঁজে দেখল।

পাওয়া গেল না রূপালী মাকড়সা।

ঘরের মাঝখানে এসে জড়ো হল সবাই।

'নেই এ ঘরে,' কাঁপছে মরিডোর গলা 'রোজারের লোকেরা পায়নি, আমরা পেলাম না, তারমানে গেল রূপালী মাকড়সা। নদীতেই পড়েছে ওটা! পাওয়ার আশা নেই আর।'

'তাহলে, কি করব এখন আমরা?' বলল কিশোর। স্বেচ্ছায় নেতৃত্ব ছেড়ে দিয়েছে মরিডোর হাতে। এছাড়া গতি নেই এপ্রাসাদে। ওর সাহায্য ছাড়া এখানে কিছুই করতে পারবে না তিন গোয়েন্দা।

'বেরিয়ে যাব,' বলল মরিডো। 'নিরাপদ জায়গায়— তার মুখের কথা মুখেই রইল। ঝটকা দিয়ে খুলে গেল দরজা। দপ করে জ্বলে উঠল তীব্র উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলো। চোখ ধাঁধিয়ে গেল ওদের

'খবরদার! যেখানে আছ, দাঁড়িয়ে থাক!' এল কর্কশ আদেশ। 'অ্যারেস্ট করা হল তোমাদের!'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত। দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগল পাঁচজনে। হঠাৎই নড়ে উঠল মরিডো। লাফ দিল সামনে। একই সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, 'মেরিনা, ওঁদেরকে নিয়ে পালাও! ব্যাটাদের ঠেকাচ্ছি আমি!'

'আসুন!' চেঁচিয়ে উঠল মেরিনা। জানালার দিকে ছুটেছে। 'আসুন আমার সঙ্গে!'

পাঁই করে ঘুরেই জানালার দিকে দৌড় দিতে গেল রবিন আর কিশোর। শক্ত একটা থাবা পড়ল কিশোরের ঘাড়ে। তা... শার্টের কলার চেপে ধরেছে। কিছুতেই ছাড়াতে পারল না সে।

দু'পা এগোল রবিন। পরক্ষণেই পিঠের ওপর এসে পড়ল ভারি দেহ জড়াজড়ি করতে করতে গায়ের ওপর এসে পড়েছে মরিডো আর এক প্রহরী।

ধাক্কা লেগে দড়াম করে হাত পা ছড়িয়ে আছড়ে পড়ল রবিন। জোরে ঠুকে গেল কপাল আর মাথার একটা পাশ। মেঝেতে পুরু কার্পেট না থাকলে খুলিই ফেটে যেত হয়ত। গত চব্বিশ ঘন্টায় এই নিয়ে দু'বার আঘাত পেল মাথায়।

জ্ঞান হারাল রবিন।

এগারো

চোখ বন্ধ করে পড়ে আছে রবিন। কানে আসছে কিশোর আর মরিডোর কথা।

'ওই ঝিঁঝিটার মতই জালে আটকা পড়লাম,' বলল কিশোর। 'বাইরে করিডরে লোক থাকবে, কল্পনাও করিনি। উত্তেজনার বশে হয়ত জোরেই কথা বলে ফেলেছিলাম। কানে গিয়েছিল ব্যাটাদের। কিংবা কোন ফাঁক ফোকর দিয়ে আলোও দেখে থাকতে পারে।'

'আমিও কল্পনা করিনি,' বিষণ্ন কণ্ঠ মরিডোর। 'তাহলে ওই করিডরে আগেই একবার উঁকি দিয়ে যেতাম। যাক, মুসাকে নিয়ে মেরি অন্তত পালাতে পেরেছে।'

'কিন্তু ওরা দুজনে কি করতে পারবে?'

'জানি না। হয়ত কিছুই না। বাবা আর মিনস্ট্রেল পার্টির লোকদের জানাতে

পারবে বড়জোর, আমরা ধরা পড়েছি। বাবা উদ্ধার করতে পারবে না আমাদের, তবে সময়মত লুকিয়ে পড়তে পারবে ডিউক রোজারের হাতে পড়ে কষ্ট ভোগ করতে হবে না।'

'কিন্তু আমরা তিনজন পড়লাম বিপাকে! দিমিত্রিও।' তিক্ত কিশোরের গলা। 'প্রিন্সকে সাহায্য করতে এসেছি। তা-তো করতে পারিইনি, উল্টে রোজারের পথ সাফ করে দিলাম। আমাদের কাম সারা।'

'কা-ম সা-রা!'

'বাংলা শব্দ মানে, আমরা শেষ।...মনে হয়, রবিনের জ্ঞান ফিরেছে। ইস্‌স্‌ বেচারা নথি। দু'বার লাগল বাড়ি, দু'বারই মাথায়।'

চোখ মেলল রবিন। কাঠের চৌকিতে শুধু পাতলা চাদরের ওপর শুয়ে আছে চিত হয়ে। ঘরে ম্লান আলো। মোমবাতিটার দিকে চেয়ে চোখ মিটমিট করল সে। পাথরের দেয়াল ঘেঁষে পাতা রয়েছে চৌকি। মাথার ওপরে পাথরের ছাত। লোহার ভারি দরজার ওপর দিকে ছোট গোল একটা ফুটো, বাইরে থেকে ঘরের ভেতরটা দেখার জন্যে।

সঙ্গীকে চোখ মেলতে দেখে কাছে এসে দাঁড়াল কিশোর আর মরিডো।

উঠে বসল রবিন। 'এর পরে আর কখনও ভ্যারানিয়ায় এলে মাথায় হেলমেট পরে আসব,' শুকনো হাসি হাসল সে।

'ভালই আছেন, মনে হচ্ছে!' বলল মরিডো। 'একটা দুশ্চিন্তা গেল।'

'রবিন, মনে করতে পারছ কিছু?' জিজ্ঞেস করল কিশোর। 'ভালমত ভেবে দেখ।'

'নিশ্চয়। ঝটকা দিয়ে খুলে গেল দরজা। ঘরে ঢুকল গার্ডেরা। এক ব্যাটাকে আমার ওপর ছুঁড়ে ফেললেন মরিডো। ব্যস, উপুড় হয়ে পড়ে খেলাম মাথায় বাড়ি। তারপর আর কিছু মনে নেই।'

'আমি জানতে চাইছি রূপালী মাকড়সার কথা। মনে পড়ছে কিছু?'

'না।' ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল রবিন।

'হুঁম্‌ম্‌! অনেক সময় দ্বিতীয়বার মাথায় চোট লাগলে চলে যায় অ্যামনেশিয়া। ফিরে আসে স্মৃতি।'

'আসেনি,' বিষণ্ণ কণ্ঠে বলল রবিন। 'কয়েকটা মিনিট এখনও ফাঁকা!'

'এটা বরং ভালই হল,' বলে উঠল মরিডো। 'যতই চাপাচাপি করুক ডিউক রোজার, রূপালী মাকড়সার খোঁজ জানতে পারবে না।'

ঠিক এই সময় চাবির গোছার শব্দ হল বাইরে। খুলে গেল ভারি দরজা। দুজন লোক। রয়্যাল গার্ডের ইউনিফর্ম পরা। বুটের গট গট শব্দ তুলে ভেতরে এসে ঢুকল ওরা। হাতে শক্তিশালী বৈদ্যুতিক লণ্ঠন। উজ্জ্বল আলো। দুজনেরই ডান হাতে ঝকঝকে খোলা তলোয়ার।

'এস,' ভারি মোটা একটা কণ্ঠস্বর। 'ডিউক রোজার অপেক্ষা করছেন। উঠ। আমাদের মাঝখানে থাকবে। চালাকির চেষ্টা করলে বুঝবে মজা!' তলোয়ার তুলে শাসাল সে।

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল তিন বন্দি। আগে রইল এক প্রহরী, পেছনে অন্যজন নিয়ে চলল বন্দিদের।

সরু অন্ধকার একটা করিডরে বেরিয়ে এল ওরা। বাতাসে ভাপসা গন্ধ পায়ের তলায় পাথরের মেঝে কেমন ভেজা ভেজা, ঘেমে উঠেছে যেন। সামনে পেছনে দুদিকেই অন্ধকার।

ঢালু হয়ে উঠে গেছে করিডরে। একটা জায়গায় এসে থেমেছে সিঁড়ির গোড়ায়। কয়েক ধাপ সিঁড়ির পরেই আবার শুরু হয়েছে করিডর। দু'পাশে সারি সারি লোহার দরজা। নিশ্চয় কয়েদখানা। এই করিডরের পরে আবার কয়েক ধাপ সিঁড়ি। ওপরে আরেকটা করিডরের মাথায় দাঁড়িয়ে আছে দু'জন প্রহরী।

প্রহরীদের মাঝখান দিয়ে করিডরে উঠে এল ওরা এগোল। সামনে, একপাশের একটা দরজা খোলা। উজ্জ্বল আলো এসে পড়েছে করিডরে। দরজার সামনে বন্দিদেরকে নিয়ে আসা হল। একবার ভেতরে চেয়েই শিউরে উঠল কিশোর আর রবিন। এই ধরনের ঘর এর আগেও দেখেছে ওরা, ভয়াল ছায়াছবিতে শত শত বছর আগেকার, মধ্যযুগীয় পীড়ন ঘর। তবে এটা ছায়াছবি নয়, বাস্তব।

পেছন থেকে ধাক্কা দিয়ে ঘরে ঢুকিয়ে দেয়া হল ওদের লম্বা একটা ঘর বিচিত্র, কুৎসিত সব জিনিসপত্র। নির্যাতনের যন্ত্র। একপাশে কুৎসিত একটা র‍্যাক থেকে ঝুলছে এক হতভাগ্য। লোহার শেকলে বাঁধা কব্জি পায়ের সঙ্গে শেকল দিয়ে বেঁধে ঝুলিয়ে দিয়েছে ভারি পাথর। লম্বা হয়ে গেছে লোকটা; মাঝখান থেকে দু'টুকরো হয়ে ছিঁড়ে যাবে আরেকটু টান পড়লেই। পরনে একটা সুতোও নেই। হাড়ের ওপর কুঁচকে জড়িয়ে আছে শুকনো চামড়া।

আরেকদিকে বিশাল একটা গোল পাথর, গম ভাঙার যাঁতার মত দেখতে, তবে অনেক বড়। ওটার গায়ে টান টান করে আটকে দেয়া হয়েছে আরেকটা মানুষকে। এক এক করে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে ভাঙা হয়েছে হাত-পায়ের হাড়।

আরও সব বিচিত্র যন্ত্রপাতি। বেশির ভাগেরই নাম জানা নেই কিশোর কিংবা রবিনের পাথর, লোহা কিংবা কাঠের তৈরি। ঘরের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে ছয় ফুট লম্বা এক লোহার মেয়েমানুষ। ওই জিনিস আগেও দেখেছে কিশোর, সিনেমায়। আয়রন মেইডেন বা লৌহমানবী নাম। আসলে মেয়েমানুষের আকৃতির একটা লম্বা বাক্স ওটা। একপাশে কব্জা। টান দিয়ে বাক্সের ডালা খোলার মতই খোলা যায়। ভেতরের দেয়ালে চোখা কাঁটা বসানো। বন্দিকে ধরে তার ভেতরে ঢুকিয়ে ধীরে ধীরে ডালা বন্ধ করা হয়। শরীরে ঢুকে যেতে থাকে অসংখ্য কাঁটা। কাঁটাগুলোর মাথায় আবার এক ধরনের ওষুধ মাখিয়ে রাখা হয়। রক্তের সঙ্গে মিশে

গিয়ে যন্ত্রণা শতগুণে বাড়িয়ে তোলে বন্দির।

'টর্চার রুম!' ফিসফিস করে বলল মরিডো। কাঁপছে গলা। 'এটা তৈরি হয়েছে সেই ব্ল্যাক প্রিন্স জনের আমলে। ভয়াবহ এক পিশাচ ছিল লোকটা। মধ্যযুগের সব চেয়ে অত্যাচারী সাত আটজন শাসকের একজন। ওর পরে এই ঘর আর কেউ ব্যবহার করেনি বলেই জানতাম কিন্তু এখন তো দেখছি অন্যরকম! ডিউক রোজার গোপনে ঠিকই ব্যবহার করছে এটা!'

পেটের ভেতরে অদ্ভুত একটা শিরশির অনুভূতি হল কিশোরের। একসঙ্গে ঢুকে পড়েছে যেন কয়েক ডজন প্রজাপতি, ডানা নাড়ছে! আড়চোখে দেখল, ফ্যাকাসে হয়ে গেছে রবিনের চেহারা। কিছু একটা বলতে গিয়েও থেমে গেল।

'চুপ!' ধমকে উঠল এক প্রহরী। 'ডিউক রোজার আসছেন।'

স্প্রিঙের মত লাফিয়ে উঠে অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে দরজার দু'পাশে দুজন প্রহরী। বুটের খটাশ শব্দ তুলে স্যালুট করল।

গটমট করে হেঁটে এসে ঘরে ঢুকল ডিউক রোজার। পেছনে এল ডিউক লুথার মরিডো।

বন্দিদের সামনে এসে দাঁড়াল রোজার। কুৎসিত হাসি ফুটল ঠোঁটে। 'ইঁদুরের বাচ্চারা ফাঁদে পড়লে শেষে! এইবার খোঁচানো হবে চোখা শিক দিয়ে। যত খুশি, গলা ফাটিয়ে চেঁচিও। কোন আপত্তি নেই। তারপর গড়গড় করে জবাব দিয়ে যাবে আমার প্রশ্নের। নইলে...'

ধুলো ঝেড়ে একটা চেয়ার নিয়ে এসে পেতে দিল এক প্রহরী। বসে পড়ল তাতে রোজার। আরেকটা লম্বা বেঞ্চ এনে পেতে দেয়া হল। তাতে রোজারের মুখোমুখি বসিয়ে দেয়া হল তিন বন্দিকে

চেয়ারের হাতলে আঙুল দিয়ে ধীরে ধীরে টোকা দিল রোজার। 'তারপর, মরিডো, তুমিও আছ এর মধ্যে! বেশ! টের পাবে তোমার বাবা, পুরো পরিবার। তোমার কথা বাদই দিলাম।'

ঠোঁটে ঠোঁট চেপে রেখেছে মরিডো। কোন জবাব দিল না।

'তারপর? আমেরিকান বিচ্ছুরা?' রোজারের গলায় কেমন খুশির আমেজ। ধরা তো পড়লে। একটা অবশ্য গেল পালিয়ে। তাতে কিছু যায় আসে না। এবার কিছু প্রশ্নের জবাব দেবে আমার? না না, তোমরা কেন এসেছ, জানতে চাই না। সেটা ক্যামেরাগুলোই জানিয়ে দিয়েছে। ভ্যারানিয়ার বিরুদ্ধে গুপ্তচরগিরি করতে এসেছ। মস্ত অপরাধ। তার চেয়ে বড় অপরাধ করেছ, রূপালী মাকড়সা চুরি করে।' সামনে ঝুঁকল। হঠাৎ চেহারা থেকে চলে গেল খুশি খুশি ভাবটা। 'কোথায় ওটা?'

'আমরা চুরি করিনি,' কণ্ঠস্বর শান্ত রাখার চেষ্টা করল কিশোর। 'কোন হারামজাদা চুরি করে আমাদের ঘরে রেখে এসেছিল। আলমারির ড্রয়ারে।'

ক্ষণিকের জন্যে ধক করে জ্বলে উঠল রোজারের চোখের তারা। তারপরই

স্বাভাবিক হয়ে গেল আবার। 'বেশ, বেশ! তাহলে স্বীকার করছ, মাকড়সাটা ছিল তোমাদের ঘরে। এটাও এক ধরনের অপরাধ। যাকগে। খুব নরম মনের মানুষ আমি। দুটো কিশোরকে মারধোর করতে খুব মায়া হবে। মাকড়সাটা কোথায় আছে, বলে দাও। ছেড়ে দেব তোমাদেরকে।'

কিশোরের দিকে তাকাল রবিন। দ্বিধা করছে গোয়েন্দাপ্রধান। শেষে বলে ফেলল, 'আমরা জানি না। কোথায় আছে, বলতে পারব না।'

'জেমস বণ্ডের ছবি খুব বেশি দেখেছ, না?' ভ্রূকুটি করল রোজার। মারের চোটে হেগেমুতে ফেলবে ব্যাটা, তবু মুখ খুলবে না। রবিনের দিকে তাকাল। 'তোমার কি ধারণা, বাচ্চা ইবলিস? রূপালী মাকড়সা কোথায়?'

'জানি না,' মাথা নাড়ল রবিন?

'জান না!' গর্জে উঠল রোজার। 'দেখেছ, অথচ কোথায় আছে জান না! কোথায়ও লুকিয়ে রেখেছ তোমরা। ফাঁকি দিতে চাইছ এখন। জানি না বললেই হল! কোথায় রেখেছ?...কাউকে দিয়েছ?...জবাব দাও!'

'জানি না,' বলল কিশোর। 'সারারাত চেঁচিয়ে যেতে পারবেন, জানি না-র বেশি কিছু বলতে পারব না আমরা।'

'বাহ্, চমৎকার! একেবারে জেমস বণ্ডের বাচ্চা!' চুপ হয়ে গেল হঠাৎ। ধীরে ধীরে আঙুলের টোকা দিতে লাগল চেয়ারের হাতলে। হঠাৎ বলল, 'তবে ঘাড় থেকে ভূত ছাড়িয়ে নিতে পারব। গোঁয়ার্তুমি রোগ সেরে যাবে একেবারে। তোমরা তো বাচ্চা খোকা। কত বড় বড় শক্তিশালী মানুষ এসে ঢুকেছে এখানে, পাথরের মত কঠিন। শেষে পানি হয়ে গেছে গলে। কোন্‌টা দিয়ে শুরু করব? আয়রন মেইডেন?'

ঢোক গিলল কিশোর। চুপ করে রইল।

'বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে!' বলে উঠল মরিডো। 'ভ্যারানিয়ার ইতিহাস জানা আছে আপনার, ডিউক। সিংহাসন নিয়ে এর আগেও কাড়াকাড়ি খাবলাখাবলি হয়েছে। কেউই টিকতে পারেনি। তাছাড়া, ব্ল্যাক প্রিন্সের কথাও আপনার অজানা নয়। দেশের লোক খেপে গিয়ে টেনে টেনে ছিঁড়েছিল তাকে। ভুলে যাবেন না কথাটা।'

'বড় বড় কথা, না?' দাঁত বের করে হাসল রোজার। 'ঠিক আছে, তোমার কথাই মেনে নিলাম। আয়রন মেইডেন ব্যবহার করব না। আগেই বলেছি, মনটা খুব নরম আমার। লোকের কষ্ট সইতে পারি না। তবে, কথা আমি আদায় করবই।'

প্রহরীর দিকে চেয়ে আঙুলের ইশারা করল রোজার। 'জিপসি বুড়ো আলবার্তোকে নিয়ে এস।'

'জাদুকর আলবার্তো!' উত্তেজিত হয়ে উঠেছে মরিডো। 'ও...ওকে...

'চুপ!' ধমকে উঠল রোজার।

দরজায় পদশব্দ হতেই মুখ ফিরিয়ে তাকাল কিশোর। রবিন আর মরিডোও তাকাল বৃদ্ধ একজন লোক এসে ঢুকেছে ঘরে। দু'দিক থেকে ধরে তাকে নিয়ে আসছে দুই প্রহরী। এককালে খুব লম্বা ছিল, বয়েসের ভারে কুঁজো হয়ে গেছে এখন। হাতের লাঠিতে ভর দিয়ে ঠুকঠুক করে এগিয়ে আসছে। উজ্জ্বল রঙের আলখেল্লা গায়ে, কানে সোনার আঙটা এক ছটাক মাংস আছে কিনা মুখে, সন্দেহ চামড়া কুঁচকে বসে গেছে হাড়ের গায়ে বড় বড় দুটো নীল চোখ, ধক ধক করে জ্বলছে যেন। সব মিলিয়ে ঘুমের ঘোরে আঁতকে ওঠার মত চেহারা।

লাঠি ঠুকতে ঠুকতে এসে ডিউক রোজারের সামনে দাঁড়াল বুড়ো।

'এই যে, এসে গেছে জিপসি বুড়ো,' রোজারের কথার ধরনে মনে হল, আলবার্তোর মালিক মনে করে সে নিজেকে কণ্ঠস্বরে নির্লজ্জ দাম্ভিকতা। 'তোমার জাদুক্ষমতা কিছু দেখাও তো, আলবার্তো এই ছেলেগুলো কথা গোপন করতে চাইছে। বের করে আন পেট থেকে।

বুড়ো জিপসির কুৎসিত মুখে কঠিন হাসি ফুটল। 'আদেশ মানতে অভ্যস্ত নয়, জিপসি আলবার্তো।' দু'পাশের দুই প্রহরীকে আশ্চর্য ক্ষিপ্রতায় ঠেলে সরিয়ে দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল 'গুডনাইট, ডিউক।'

স্পর্ধা বটে বুড়োর! মুখ কালো হয়ে গেল রোজারের কোনমতে দমন করে নিল রাগ। পকেট থেকে কয়েক টুকরো স্বর্ণ বের করল

'ভুল বুঝ না জাদুকর,' মোলায়েম গলায় বলল রোজার। 'এই যে নাও, তোমার সম্মানী সোনার টুকরো '

ধীরে ধীরে ঘুরল আলবার্তো শীর্ণ, ঈগলের নখের মত বাঁকানো আঙুলে একটা একটা করে টুকরো তুলে নিয়ে ঢোলা আলখেল্লার পকেটে ভরল

'হ্যাঁ, আলবার্তোর সঙ্গে যারা ভদ্র ব্যবহার করে,' বলল জাদুকর। তাদের সাহায্য করে সে। তো ডিউক, কি জানা দরকার?'

'এই ইবলিসের বাচ্চাগুলো ভ্যারানিয়ার রুপালী মাকড়সা লুকিয়ে রেখেছে,' বলল রোজার 'কিছুতেই বলতে চাইছে না সহজেই জেনে নিতে পারি ওগুলো ব্যবহার করলে, নির্যাতনের যন্ত্রপাতিগুলো দেখাল 'কিন্তু মনটা আমার খুবই নরম। ওসব করতে চাই না তোমার প্রচণ্ড ক্ষমতা প্রয়োগ করলে কোন যন্ত্রণা হবে না, ব্যথা পাবে না অথচ মনের কথা সুড়সুড় করে বলে দেবে ওরা। সেগুলো শুনতে চাই আমি

'ঠিক আছে, ফোকলা হাসি হাসল আলবার্তো। ঘুরে দাঁড়াল তিন বন্দির দিকে ঝোলা আলখেল্লার পকেট থেকে বের করল একটা পেতলের কাপ আর চামড়ার একটা ছোট থলে থলে থেকে কয়েক চিমটি কালো পাউডার তুলে নিয়ে ফেলল কাপে। আরেক পকেট থেকে বের করল দামি একটা সিগারেট লাইটার

আগুন ধরাল পাউডারে। নীল ঘন ধোঁয়া বেরিয়ে এল কাপের ভেতর থেকে।

'নাও, শ্বাস নাও বাছারা!' গলাটা বকের মত সামনে বাড়িয়ে দিয়েছে জাদুকর। বিড়বিড় করছে অদ্ভুত কণ্ঠে। এক এক করে কিশোর, রবিন আর মরিডোর নাকের কাছে ধরল কাপ! 'জোরে শ্বাস নাও! জাদুকর আলবার্তোর আদেশ! শ্বাস নাও! বুক ভরে টেনে নাও সত্যি-ভাষণের-ধোঁয়া!'

এদিক ওদিক মুখ ঘুরিয়ে ধোঁয়া থেকে নাক বাঁচানর চেষ্টা করল ওরা পারল না। নাকের ভেতর দিয়ে যেন মগজে ঢুকে গেল নীল ধোঁয়া। জ্বালা ধরিয়ে দিল মস্তিষ্কে, ফুসফুসে। তারপর হঠাৎ করেই আশ্চর্য এক পুলক অনুভব করল। আর জোরাজুরি করতে হল না, নিজেদের ইচ্ছেতেই টেনে নিল ধোঁয়া। ঢিল পড়ল স্নায়ুতে, ঘুম ঘুম লাগছে।

'এবার...তাকাও আমার দিকে!' ধীরে ধীরে মোলায়েম গলায় বলল আলবার্তো। 'আমার চোখের দিকে...'

পুরোপুরি ভাবতে পারছে না ওরা, তবু চোখ সরিয়ে রাখার চেষ্টা করল বুড়োর চোখ থেকে। পারল না। প্রচণ্ড এক আকর্ষণ, এড়ানর উপায় নেই নীল চোখের তারার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে মনে হল গভীর নীল সাগরে ডুবে যাচ্ছে ধীরে ধীরে...চারপাশ থেকে চেপে ধরেছে যেন পানি...কেমন এক ধরনের উষ্ণ আবেশ...

'এইবার বল!' আদেশ দিল আলবার্তো 'রূপালী মাকড়সা কোথায় ওটা?'

'জানি না,' ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল মরিডো। তার দিকেই চেয়ে আছে এখন বুড়ো নীল চোখের তারা থেকে আর সরিয়ে নিচ্ছে না চোখ 'জানি না...জানি না...'

'অহ্!' বিড়বিড় করল বুড়ো। 'শ্বাস নাও! আরও জোরে... আরও টেনে...

একবার করে আবার তিন বন্দির নাকের সামনে কাপ ধরল আলবার্তো, ওদেরকে ধোঁয়া টেনে নিতে বাধ্য করল রবিনের মনে হল, আর পানিতে নয়, আকাশে উঠে পড়েছে। সাঁতরে চলেছে মেঘের ভেতর দিয়ে।

বাঁকানো আঙুল দিয়ে মরিডোর কপাল টিপে ধরল বুড়ো আলতো করে। ধরে রাখল কয়েক মুহূর্ত, তারপর ছেড়ে দিল তর্জনীর মাথা ছোঁয়াল কপালের মাঝখানে। মুখ নিয়ে এল মুখের সামনে স্থির চোখে তাকাল মরিডোর চোখের তারার দিকে

'এবার,' ফিসফিস করল বুড়ো। 'এবার বল!...ভাব! ভাব, কোথায় রেখেছ রূপালী মাকড়সা। কোথায়!...অহ্!'

দীর্ঘ আরেক মুহূর্ত মরিডোর কপালে আঙুল ছুঁইয়ে রাখল আলবার্তো। তারপর সরিয়ে আনল। কিশোরের ওপরও একই প্রক্রিয়া চালাল। শেষে 'অহ্!' বলে সরিয়ে আনল আঙুল কপালের ওপর থেকে।

রবিনের দিকে হাত বাড়াল বুড়ো। ওর কপালে আঙুল ছুঁইয়েই ঝটকা দিয়ে সরিয়ে আনল, যেন জ্বলন্ত কয়লা ছুঁয়েছে। কুঁচকে গেল ভুরু। তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল রবিনের চোখের দিকে। স্থির চেয়ে রইল দীর্ঘ এক মুহূর্ত।

আলবার্তোর চোখের দিকে চেয়ে বার বার কেবল রূপালী মাকড়সার কথাই মনে আসতে থাকল রবিনের। দুনিয়ার আর সব ভাবনা চিন্তা সরে গেছে বহুদূরে। সে যেন উঠে বসেছে নীল মেঘের চূড়ায় পায়ের নিচ দিয়ে ভেসে যাচ্ছে মেঘ। অদ্ভুত এক শূন্যতা মাথার ভেতরে। মনে করতে চাইছে, কোথায় আছে রূপালী মাকড়সা। হঠাৎ এক টুকরো কালো মেঘ আচ্ছন্ন করে ফেলল মনকে…

অবাক হল যেন আলবার্তো। আরেকবার তার প্রক্রিয়া চালাল রবিনের ওপর। বিড়বিড় করল নরম গলায়, 'ভাব! ভাব!' অবশেষে শব্দ করে শ্বাস ফেলে ঘুরে দাঁড়াল।

চোখ মিটমিট করতে লাগল রবিন। মনে হল, প্রচণ্ড এক ঘূর্ণিপাক থেকে মুক্তি দেয়া হয়েছে তাকে

আপনমনেই ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল বুড়ো। তাকাল রোজারের দিকে।

'প্রথম ছেলেটা জানে না,' বলল আলবার্তো 'ও দেখেনি রূপালী মাকড়সা। মাথাবড় ছেলেটা দেখেছে, তবে হাতে নেয়নি। জানে না কোথায় আছে আর, ওই বেঁটে ছেলেটা হাতে নিয়েছিল। এবং তারপর…'

'তারপর?' সামনে ঝুঁকে এসেছে রোজার। উত্তেজিত। 'তারপর কি?'

'ভাবছিল সে ঠিক মতই। হঠাৎ এক টুকরো কালো মেঘ এসে ঢেকে দিল মনকে। মেঘের ভেতরে হারিয়ে গেল রূপালী মাকড়সা। এ-ধরনের ঘটনার মুখোমুখি হইনি আর কখনও! ও জানত কোথায় আছে রূপালী মাকড়সা, তারপর হঠাৎ করেই মুছে গেল মন থেকে। কিছুতেই মনে করতে পারছে না আর। ও না পারলে, আমারও কিছু করার নেই।'

'হারামির বাচ্চা!' গাল দিয়ে উঠল রোজার। চিন্তিত ভঙ্গিতে টোকা দিতে লাগল চেয়ারের হাতলে। 'বুড়ো জিপসি…' বলতে গিয়েও থেমে গেল সে। তাড়াহুড়ো করে স্বর পাল্টাল। 'জাদুকর আলবার্তো, তুমি যথেষ্ট করেছ। রূপালী মাকড়সা কোথায় রেখেছে, মনে নেই বিচ্ছুটার। এটা তোমার দোষ নয়। কিন্তু, অনুমানে কিছু বলতে পার না? প্রচণ্ড ক্ষমতা তোমার, জানি। অনুমান করা সম্ভব শুধু তোমার পক্ষেই। কোথায় থাকতে পারে রূপালী মাকড়সা?' আগ্রহী চোখে আলবার্তোর দিকে তাকাল সে। এক মুহূর্ত অপেক্ষা করল। 'ওটার আসলেই কি কোন দরকার আছে? ওটা ছাড়া আমার ইচ্ছে কি পূরণ হতে পারে না? নেহায়েত একটা দুধের বাচ্চাকে সিংহাসনে না বসালেই কি নয়? আমি বসতে পারি না?'

রহস্যময় হাসি ফুটল বৃদ্ধ জাদুকরের ঠোঁটে। 'ডিউক, রূপালী মাকড়সার সঙ্গে সাধারণ মাকড়সার তফাৎ নেই। তোমার ইচ্ছের কথা বলছ? বিজয়ের ঘন্টা

শুনেছি আমি।...বয়েস তো অনেক হল। পরিশ্রম আর করতে পারি না। ঘুমানো দরকার। এবার তাহলে আসি। গুড নাইট!'

রহস্যময় হাসিটা লেগেই রইল আলবার্তোর ঠোঁটে লাঠি ঠুকতে ঠুকতে এগোল দরজার দিকে।

প্রহরীদের দিকে চেয়ে হাত নাড়ল রোজার। 'জাদুকরকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে এস।' তারপর ফিরল সঙ্গী ডিউক লুথারের দিকে। 'শুনলে তো? জাদুকর কি বলে গেল! রূপালী মাকড়সা শুধুই একটা সাধারণ রূপার টুকরো ওটার কোন ক্ষমতা নেই। এবং ইচ্ছে করলে ওটা ছাড়াই চলতে পারি আমরা তাছাড়া, ও বলল, বিজয়ের ঘন্টা শুনতে পাচ্ছে। আর কোন দ্বিধা নেই আমার। জাদুকর আলবার্তোর ভবিষ্যদ্বাণী কখনও মিথ্যে হয় না। আর অপেক্ষা করে লাভ নেই আগামীকাল সকালেই কাজে লেগে পড়। অ্যারেস্ট কর দিমিত্রিকে অনির্দিষ্টকালের জন্যে নিজেকে রিজেন্ট ঘোষণা করব আমি। আমেরিকার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক বাতিল করে দেব, আমাদের ঘরোয়া ব্যাপারে অন্যায়ভাবে নাক গলানর জন্যে ঘোষণা করব, দুটো আমেরিকান স্পাই এবং চোর ধরা পড়েছে আমাদের হাতে; তৃতীয়টার জন্যে পুরস্কার ঘোষণা করব। ভোর হওয়ার আগেই ধরে নিয়ে এস মরিডোর পরিবারের সব লোককে। মিনস্ট্রেলদের যাকে যেখানে পাবে, ধরে নিয়ে এসে ঢোকাও কয়েকদখানায়। ওদের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার অভিযোগ আন।' একসঙ্গে অনেক কথা বলে দম নিল ডিউক। 'আগামীকাল সকালেই পুরো ভ্যারানিয়া চলে আসবে আমার হাতের মুঠোয় তারপর সিদ্ধান্ত নেব, চোর দুটোকে নিয়ে কি করা যায়। কানমলা দিয়ে ছেড়ে দেব, বের করে দেব দেশ থেকে, নাকি বিচার হবে প্রকাশ্যে?' প্রহরীদের দিকে তাকাল। 'এগুলোকে নিয়ে ভর কয়েদখানায়।'

রবিনের দিকে ঝুঁকল রোজার। 'ইঁদুরের বাচ্চা, ভাব...ভেবে বের কর, কোথায় রেখেছ রূপালী মাকড়সা। জনতা আমার মত নরম মনের মানুষ নয়। ওদের হাতে তুলে দিলে জ্যান্ত ছাল ছাড়িয়ে নেবে।...মাকড়সাটা অবশ্য দরকার নেই আমার, আলবার্তো বলেছে। তবু, এটা গলায় পরে সিংহাসনে বসতে বেশ ভালই লাগবে। প্রিন্সের মতই মনে হবে নিজেকে।'

কাছে এসে দাঁড়িয়েছে প্রহরীরা।

ওদের দিকে চেয়ে বলল রোজার, 'নিয়ে যাও।'

বারো

পাহারা দিয়ে নিয়ে চলল ওদেরকে দুজন প্রহরী। আবার সেই ভানজনে, পাতালের কয়েদখানায়।

আগে একজন প্রহরী, পেছনে রবিন, কিশোর, তাদের পেছনের মরিডো।

চলতে চলতে মরিডোর গা ঘেঁষে এল পেছনের প্রহরী। কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল, 'নর্দমায় বন্ধু ইঁদুর আছে।' বলেই সরে গেল

মাথা ঝোঁকাল মরিডো।

ডানজনের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল ওরা। ধাক্কা দিয়ে দরজা খুলল প্রহরী। ঠেলে বন্দিদেরকে ঢুকিয়ে দিল পাথরের ছোট্ট ঘরে দেয়ালের কাছে জ্বলছে মোমবাতি, আলতো বাতাস লেগে কেঁপে উঠল শিখা ছায়ার নৃত্য শুরু হল দেয়ালে।

পেছনে শব্দ তুলে বন্ধ হয়ে গেল আবার লোহার দরজা। তালা আটকানর আওয়াজ হল। বাইরে দরজার দুপাশে দাঁড়িয়ে গেল দুই প্রহরী। কড়া পাহারার আদেশ আছে তাদের ওপর

দীর্ঘ কয়েকটা মুহূর্ত নীরব হয়ে রইল ওরা। নিস্তব্ধ পরিবেশ কানে আসছে অতি মৃদু চাপা একটা কুলকুল ধ্বনি পানি বইছে কোথাও। সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে মরিডোর দিকে তাকাল দুই গোয়েন্দা।

'প্রাসাদের নিচেই আছে ড্রেন,' জানাল মরিডো। 'ডেনজো নদীতে গিয়ে পড়ছে পানি বাইরে নিশ্চয় তুমুল বৃষ্টি হচ্ছে।' থামল সে 'ডেনজোর ওই ড্রেনগুলো শত শত বছরের পুরানো পাথরের তৈরি পাতাল-খাল বলা চলে ওগুলোকে তলাটা চাপ্টা, ছাত ধনুকের মত বাঁকানো মাটির তলায় মাইলের পর মাইল জুড়ে রয়েছে ওই ড্রেন শুকনোর সময় হেঁটেই যাওয়া যায় ওর ভেতর দিয়ে বর্ষায় পানিতে যদি একেবারে ভরে না যায়, নৌকা বাওয়া যায় অনায়াসে'

চুপ করে মরিডোর কথা শুনছে দুই গোয়েন্দা চোখে মুখে আগ্রহের ছাপ

ওদের দিকে চেয়ে হাসল মরিডো 'আজকাল খুব কম লোকেই ঢোকে এর ভেতর পথ হারিয়ে মরার ভয় আছে তাছাড়া রয়েছে ইঁদুর। বেড়ালের সমান বড় একেকটা কায়দামত পেলে ধরে জ্যান্ত মানুষ খেয়ে ফেলতেও দ্বিধা করে না। তবে আমি আর মেরি ভয় করি না ওসবকে। ভালমতই চিনি ভেতরটা। অনেকবার ঢুকেছি। ওর ভেতরে গিয়ে কোনমতে ঢুকতে পারলে ঠিক চলে যেতে পারব আমেরিকান এমব্যাসির তলায়। ম্যানহোল দিয়ে উঠে যেতে পারব বাইরে।'

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর। মাথা ঝোঁকাল আস্তে করে। 'বুঝলাম কিন্তু আমরা বন্দি রয়েছি ডানজনে, দরজায় তালা বাইরে প্রহরী নর্দমায় পৌঁছব কি করে?'

'মিনিটখানেকের জন্যেও যদি সময় পাই,' বলল মরিডো। 'পৌঁছে যেতে পারব। বাইরে যে করিডরটা আছে, তার শেষ মাথাই রয়েছে ম্যানহোল। ওটা দিয়ে সহজেই ঢুকে পড়া যাবে ড্রেনে'

'কিন্তু সেজন্যে বেরোতে হবে আগে,' আবার নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে শুরু করল কিশোর

'ওখানে আমাদেরকে সাহায্য করার জন্যে লোক রয়েছে : এক প্রহরী মেসেজ দিয়েছে আমাকে।'

'তা দিয়েছে,' কথা বলল রবিন। 'কিন্তু ওই যে, কিশোর বলল। ডানজন থেকে বেরোব কি করে আমরা?'

'হুঁউঁ!' ধীরে ধীরে মাথা ঝোঁকাল মরিডো। চুপ করে গেল।

'আচ্ছা,' বলল রবিন। 'ওই বুড়ো জাদুকরটা আসলে কে? আমাদের মনের কথা জানল কি করে? থট রীডার গোছের কিছু?'

'হয়ত,' মাথা ঝোঁকাল মরিডো। 'জানি না ঠিক। ভ্যারানিয়ায় এখনও কিছু জিপসি রয়েছে। তাদের সর্দার ওই বুড়ো। একশোর বেশি বয়েস আশ্চর্য কিছু ক্ষমতার অধিকারী। কি সে ক্ষমতা, জানে না কেউই। বুঝতে পারে না। আমার তো মনে হয়, বুড়ো ঠিক জানতে পেরেছে, কোথায় আছে রূপালী মাকড়সা। কিন্তু বলেনি রোজারকে তবে, একটা ব্যাপারে খারাপ হয়ে গেছে মনটা। ও বলেছে, বিজয়ের ঘন্টা শুনতে পাচ্ছে। কখনও ভুল হয়নি ওর কথা। ফালতু কথা বলে না। তারমানে, সিংহাসন রোজারের দখলেই যাবে! ধরা পড়বে সমস্ত মিনস্ট্রেলরা, মৃত্যুদণ্ড হবে। আমার বাপকে ধরে আনবে, বন্ধুদের ধরে আনবে। ধরে আনবে মেরিকে…' চুপ করে গেল সে।

মরিডোর মনের অবস্থা বুঝতে পারছে রবিন। 'হাল ছেড়ে দেব না আমরা!' দৃঢ় গলায় বলল সে। 'এক বুড়োর কথায় নিরাশ হয়ে ভেঙে পড়ার কোন মানে হয় না। কোনদিন ভুল করেনি বলেই যে, সব সময় সত্যি হবে, এটা মানতে রাজি নই আমি।…কিশোর, তোমার মাথায় কোন বুদ্ধি এসেছে?'

'অ্যাঁ!' অন্য জগতে বিচরণ করছিল যেন এতক্ষণ গোয়েন্দাপ্রধান 'হ্যাঁ, একটা বুদ্ধি এসেছে। এখান থেকে হয়ত বেরিয়ে যেতে পারব প্রহরীদের দিয়ে আগে দরজা খোলাতে হবে। তারপর কাবু করে ফেলতে হবে ওদের।'

'দুটো অস্ত্রধারী লোককে কাবু করব?' বলে উঠল মরিডো। 'কি জোয়ান এরেকজন, দেখেছ? হাত দিয়ে চেপে ধরলে নড়তেই পারব না। নাহ্, পারা যাবে বলে মনে হয় না!' এদিক ওদিক মাথা দোলাল সে

'পারতেই হবে,' জোর দিয়ে বলল কিশোর। 'একটা কথা মনে পড়ছে। রহস্য কাহিনীতে পড়েছিলাম। ওটা নিছকই গল্প। তবে বুদ্ধিটা কাজে লাগাতে পারলে, মনে হয় কাবু করে ফেলতে পারব।'

'কি?' আগ্রহে সামনে ঝুঁকল রবিন।

'আমাদের মতই বন্দি করে রাখা হয়েছিল একটা ছেলে আর একটা মেয়েকে,' বলল কিশোর। 'বিছানার চাদর ছিঁড়ে দড়ি পাকিয়েছিল ওরা ফাঁস তৈরি করে ফেলে রেখেছিল দরজার কাছে। তারপর মেয়েটা মেঝেয় পড়ে চেঁচাতে শুরু করেছিল পেট ব্যথা পেট ব্যথা বলে।'

ভুরু কুঁচকে গেছে মরিডোর। আগ্রহী হয়ে উঠেছে সে। 'ঠিক, ঠিক বলেছেন! কাজ হবে এতে!' গলার স্বর খাদে নামাল। 'কিন্তু ফাঁস বানাব কি দিয়ে?'

'কেন, বিছানার চাদর,' বলল কিশোর। 'ওরা যা করেছিল। আমাদের এটা পুরানো। তাতে কিছু যায় আসে না। ছিঁড়ে ভালমত পাকিয়ে নিলে যথেষ্ট শক্ত হবে। হ্যাঁচকা টানে ছিঁড়বে না। ওরা ছিল দুজন, তাও আবার একজন মেয়ে। আমরা তিনজনেই ছেলে, গায়ে জোরও আছে। আমাদের তো আরও সহজে পারা উচিত।'

'ঠিক,' বিড়বিড় করল মরিডো। 'সহজেই পারা উচিত। তাছাড়া, প্রহরীদের একজন আমাদের লোক। কাজেই দরজা খোলানো তেমন কঠিন হবে না।'

কাজে লেগে পড়ল ওরা। পুরানো হলেও চাদরটা বেশ শক্ত। জোরে টান দিয়ে ছিঁড়তে গেলে শব্দ হবে। তাই আস্তে আস্তে ছিঁড়তে লাগল তাড়াহুড়ো করল না মোটেই।

চার ইঞ্চি চওড়া একটা ফালি ছেঁড়া হয়ে গেল। আরেকটা ছিঁড়তে শুরু করল ওরা

খুব ধীরে এগোচ্ছে কাজ। দাঁত ব্যবহার করতে হচ্ছে কখনও কখনও। একের পর এক ফালি ছিঁড়তে লাগল তিনজনে। বড় চাদর। শেষই হতে চায় না যেন আর। শব্দ হয়ে যাবার ভয়ে টান দিয়ে আধ ইঞ্চির বেশি ছিঁড়তে পারছে না একবারে।

আটটা ফালি ছেঁড়া হয়ে গেলে, থামল ওরা। হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল চিত হয়ে। বিশ্রাম নেবে। উত্তেজিত হয়ে আছে। শুয়ে সঙ্গে সঙ্গেই উঠে বসল আবার। না, কাজ শেষ না করে স্বস্তি পাবে না। কোন কারণে যদি দেখে ফেলে প্রহরীরা, চাদর ছিঁড়ছে ওরা তাহলেই গেল সুযোগ। আর বেরোতে পারবে না। কাজেই, যত তাড়াতাড়ি শেষ করতে পারবে কাজ, ততই মঙ্গল।

আবার ছিঁড়তে শুরু করল ওরা। আঙুল ব্যথা হয়ে গেছে। নাইলনের চাদর, কাজটা মোটেই সহজ নয়।

ছেঁড়ার কাজ শেষ হল। একটার সঙ্গে আরেকটা পাকিয়ে কয়েকটা দড়ি বানিয়ে ফেলতে হবে এখন।

এটা সহজ কাজ। বেশিক্ষণ লাগল না। তৈরি হয়ে গেল নাইলনের দড়ি। শক্ত। ফাঁস তৈরি করে ফেলল কিশোর। মরিডোর পায়ে লাগিয়ে টেনে দেখল।

উত্তেজনা চাপা দিতে পারল না মরিডো। 'ব্রোজাস!' ফিসফিস করে বলল সে। 'কাজ হবেই। চারটে দিয়েই তো হবে। আর কি দরকার?'

'হ্যাঁ, হবে,' মাথা ঝোঁকাল কিশোর।

'আরও কয়েকটা বানিয়ে নিই,' প্রস্তাব দিল রবিন। 'সঙ্গে নিয়ে যাব। কাজে লাগতে পারে দড়ি।'

একটার সঙ্গে আরেকটা ফালি বেঁধে জোড়া দিয়ে নিল ওরা। বেশ লম্বা শক্ত আরেকটা দড়ি তৈরি হয়ে গেল। কোমরে পেঁচিয়ে নিল ওটা মরিডো।

'এইবার আসল কাজ,' ফিসফিস করে বলল কিশোর। 'নথি, চৌকিতে শুয়ে পড় চিত হয়ে। কোঁকাতে শুরু কর। মাঝে মাঝেই গুঙিয়ে উঠবে। এমন ভাব দেখাবে, যেন মাথার যন্ত্রণায় অস্থির। প্রথমে আস্তে, তারপর সুর চড়াতে থাকবে। মরিডো, দরজার কাছে দুটো ফাঁস বিছিয়ে দিন। ব্যাটারা ঢুকলেই যেন পা পড়ে।'

তৈরি হয়ে গেল ফাঁদ। এইবার টোপ ফেলার পালা। গোঙাতে শুরু করল রবিন। সেই সঙ্গে কোঁকানি। বাড়তে থাকল। চড়তে লাগল সুর। চমৎকার অভিনয়। মনে হচ্ছে, সত্যি, মাথার যন্ত্রণায় ভারি কষ্ট পাচ্ছে বেচারা।

মিনিটখানেক পরেই দরজার ফোকরের ঢাকনা সরে গেল। মুখ দেখা গেল একটা। চোখ ঘরের ভেতরে। 'চুপ!' ধমকে উঠল প্রহরী। 'এত গোলমাল কিসের?' ভ্যারানিয়ান ভাষা। বুঝল না দুই গোয়েন্দা।

হাতে মোমবাতি নিয়ে রবিনের মুখের ওপর ঝুঁকে আছে কিশোর। চৌকির কাছেই দাঁড়িয়ে আছে মরিডো। প্রহরীর কথায় ফিরে চাইল। 'ব্যথা পেয়েছে,' ভ্যারানিয়ান ভাষায় জবাব দিল সে। 'গতরাতে দড়ি থেকে হাত ফসকে পড়ে গিয়েছিল। বাড়ি লেগেছে মাথায়। সাংঘাতিক জ্বর উঠেছে এখন। ডাক্তার দরকার।'

'সব তোমাদের শয়তানী, ইবলিসের দল!'

'আমি বলছি, ও অসুস্থ!' চেঁচিয়ে উঠল মরিডো। পায়ে পায়ে এগোল দরজার দিকে। 'এসে ওর কপালে হাত দিয়ে দেখ। ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাও।...তাহলে...তাহলে বলব রূপালী মাকড়সা কোথায় আছে। তোদের ওপর খুশি হবে ডিউক রোজার।'

দ্বিধা গেল না প্রহরীর।

'ভাল করেই জান,' আবার বলল মরিডো, 'আমেরিকান ছেলে দুটোর কোন ক্ষতি হোক, এটা চায় না ডিউক। আমি বলছি ছেলেটা অসুস্থ। ওকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাও। রূপালী মাকড়সা পেয়ে যাবে। আহ্, তাড়াতাড়ি কর! ওর অবস্থা খুব খারাপ!'

'সত্যি বলছে কিনা দেখা দরকার,' ফোকরে উঁকি দিয়েছে এসে দ্বিতীয় প্রহরী। মরিডোর কানে কানে মেসেজ দিয়েছিল সে-ই। 'ডিউকের কুনজরে পড়তে চাই না। আমি দরজায় থাকছি, তুমি ভেতরে গিয়ে দেখে এস। দু'তিনটে বাচ্চা ছেলেকে ভয় করার কিছু নেই।'

'ঠিক আছে,' বলল অন্য প্রহরী। 'যাচ্ছি কথা সত্যি না হলে কপালে খারাপি আছে ওদের, বলে দিলাম!'

তালায় চাবি ঢোকানর শব্দ হল। শব্দ তুলে খুলে গেল দরজা। ভেতরে পা

রাখল প্রহরী।

পা দিয়েই ফাঁদে আটকাল। দড়ির ফাঁসের মাঝখানে পা পড়ল প্রহরীর। হ্যাঁচকা টান দিয়ে ফাঁসটা আটকে দিল মরিডো। টান সইতে না পেরে দড়াম করে চিত হয়ে পড়ে গেল লোকটা। হাতের লণ্ঠন উড়ে গিয়ে পড়ল মেঝেতে।

লাফ দিয়ে এগিয়ে এসেছে কিশোর। আরেকটা ফাঁস আটকে দিল প্রহরীর গলায়। জোর টান দিলেই দম বন্ধ হয়ে যাবে। দ্রুত তৃতীয় আরেকটা ফাঁস তার দু'হাতে আটকে দিল মরিডো।

এতই দ্রুত ঘটে গেল ঘটনাগুলো, প্রথমে বিমূঢ় হয়ে গেল প্রহরী। চেঁচিয়ে উঠল হঠাৎ 'জলদি, জলদি এস! বিচ্ছুগুলো আটকে ফেলেছে আমাকে!'

ছুটে এল দ্বিতীয় প্রহরী। দরজার পাশেই অপেক্ষা করছে মরিডো। চোখের পলকে পায়ে আর গলায় একটা করে ফাঁস আটকে গেল দ্বিতীয় লোকটারও। হাতে আটকাল আরেকটা।

দ্বিতীয় প্রহরীর কানে কানে ফিসফিস করে বলল মরিডো। 'ছাড়া পাবার ভান করতে থাক! চুপ করে থেক না।'

হাত-পা ছোঁড়াছুঁড়ি করতে লাগল লোকটা।

শক্ত করে দুই প্রহরীকেই বেঁধে ফেলা হল। নড়ার উপায় রইল না আর ওদের।

মেঝেতে পড়ে থাকা লোক দুটোর দিকে চেয়ে হাসল মরিডো। মাকড়সার জালে আটকা পড়া পোকার অবস্থা হয়েছে যেন প্রহরীদের। শুভ লক্ষণ! আশা আর উদ্যম আবার ফিরে এল তার।

'জলদি করুন!' দুই গোয়েন্দাকে বলল মরিডো। 'করিডরের অন্য মাথায় প্রহরী থাকতে পারে। চেঁচামেচি শুনলে ছুটে আসবে ওরা। লণ্ঠন তুলে নিন।'

করিডরে বেরিয়ে এল মরিডো। পেছনে কিশোর আর রবিন। সামনে গাঢ় অন্ধকার। সেদিকেই ছুটল ওরা। ছোটার তালে তালে নাচছে বৈদ্যুতিক লণ্ঠনের আলো।

করিডরের প্রান্তে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল ওরা। সিঁড়ি নেমে গেছে। এক মুহূর্ত। সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করলো মরিডো এক এক লাফে দু'তিনটে করে সিঁড়ি টপকাচ্ছে। তাকে অনুসরণ করল দুই গোয়েন্দা।

সিঁড়ির শেষ ধাপের কাছেই একটা ম্যানহোল। লোহার ভারি ঢাকনা। কোনকালে শেষ খোলা হয়েছিল, কে জানে! মরচে পড়ে বাদামি হয়ে গেছে, তার ওপর পুরু হয়ে জমেছে ধুলো।

ঢাকনার রিঙ ধরে টান দিল মরিডো। নড়াতে পারল না। আবার টান দিল গায়ের জোরে। কোন কাজ হল না। অটল রইল ঢাকনা।

'আটকে গেছে!' ফ্যাসফ্যাসে আওয়াজ বেরোল মরিডোর গলা থেকে। 'মরচে!

নড়াতে পারছি না!'

'জলদি!' বলে উঠল কিশোর। 'জলদি দড়ি ঢোকান রিঙের ভেতর। সবাই ধরে টান দেব!'

'ঠিক!' দ্রুত কোমরে পেঁচানো দড়ি খুলে নিতে লাগল মরিডো।

সবটা খোলার দরকার হল না। একটা প্রান্ত রিঙের ভেতর দিয়ে ঢুকিয়ে দিল। শক্ত করে ধরল তিনজনে। টান লাগাল।

নড়ল না ঢাকনা।

ওরাও নাছোরবান্দা। টান বাড়াল আরও, আরও···! পেছনে পায়ের শব্দ : দ্রুত এগিয়ে আসছে। আর সময় নেই। হ্যাঁচকা টান লাগাল ওরা। অটল থাকতে পারল না আর ঢাকনা। নড়ে উঠল!

ঠনন্ আওয়াজ তুলে পাথরের মেঝেতে উল্টে পড়ল ভারি ঢাকনা। গর্তের ভেতরে কালো অন্ধকার। পানি বয়ে যাবার শব্দ আসছে।

'আমি আগে যাই,' টেনে রিঙের ভেতর থেকে দড়িটা খুলে আনতে আনতে বলল মরিডো। 'দড়ি ধরে থাকবেন। তাহলে হারানর ভয় থাকবে না।···নাহ্, এসে গেছে ব্যাটারা! ঢাকনা বন্ধ করে যাবার আর সময় নেই···'

গর্তের ভেতরে পা রাখল মরিডো। দড়ির একটা প্রান্ত ধরে রেখে অদৃশ্য হয়ে গেল অন্ধকারে।

দড়ির মাঝামাঝি ধরেছে রবিন। লণ্ঠনের সরু হ্যাণ্ডেল ধরে রেখেছে দাঁতে কামড়ে। গর্তের দিকে চেয়ে কেঁপে উঠল একবার। ওই অন্ধকার মোটেই ভাল লাগছে না তার। নিচ থেকে আসা পানির আওয়াজও কানে সুধা বর্ষণ করছে না। কিন্তু তবু যেতেই হবে। মুহূর্ত দ্বিধা করেই ভেতরে পা রাখল সে।

হাঁটু অবধি পা ঢুকিয়ে দিল রবিন। কিছুই ঠেকল না। তবে কি সিঁড়ি নেই! না না আছে। লোহার মই। খাড়া। নেমে পড়ল সে। এক ধাপ···দুই ধাপ···পা পিছাল হঠাৎ করেই। হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরে রাখতে পারল না ম্যানহোলের কিনারা।

রবিনের মনে হল, পতন আর কোন দিন শেষ হবে না। কিন্তু হল। প্রাচীন পাথুরে নর্দমার তলায় এসে নামল নিরাপদেই। গর্তের মুখ থেকে উচ্চতা বড় জোর সাত-আট ফুট হবে। কোনরকম আঘাত পায়নি, কারণ হাঁটু পানিতে পড়েছে। তাছাড়া, পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাকে ধরে ফেলেছে মরিডো।

'চুপ,' কানে কানে বলল মরিডো। 'ওই যে, কিশোর। সরুন। নামার জায়গা দিন।'

কিশোরও পা পিছলাল। তবে রবিনের মত নিরাপদে নামতে পারল না। সড়াৎ করে পিছলে গেল। ধপ করে পড়ে গেল পাথরের মেঝেতে চিত হয়ে। মইয়ের গোড়ায় মাথা বাড়ি লাগার আগেই ধরে ফেলল তাকে মরিডো। টেনে তুলল

'বাপরে বাপ! ঠাণ্ডা!···উফফ, মেরুদণ্ডটা ভেঙেই গেছে!' হাঁসফাঁস করে উঠল

গোয়েন্দাপ্রধান।

'বৃষ্টির পানি,' তাড়াতাড়ি বলল মরিডো। 'ময়লা নেই। চলুন, কেটে পড়ি। দড়ি ছাড়বেন না কিছুতেই। পথ হারাবেন তাহলে। নদীর দিকে বয়ে যাচ্ছে পানি। ড্রেনের মুখে লোহার মোটা মোটা শিক...'

মাথার ওপরে চিৎকার শুনে চুপ হয়ে গেল মরিডো। লণ্ঠন ঝুলছে, আলো।

সরে এল তিনজনে। হাঁটতে শুরু করল।

কয়েক গজ এগিয়েই নিচু হয়ে এল সুড়ঙ্গের ছাত। সোজা হয়ে দাঁড়ানো যাচ্ছে না। মাথা সামান্য নইয়ে রাখতে হচ্ছে। হাঁটুর নিচে পানির তীব্র স্রোত। পিচ্ছিল মেঝে। অসতর্ক হলেই আছাড় খেতে হবে।

ম্যানহোলের মুখে অনেক লোকের চেঁচামেচি। একটা মোড় ঘুরতেই আলো আর দেখা গেল না।

ধীরে ধীরে দূরে, অনেক দূরে মিলিয়ে গেল যেন চেঁচামেচি। আসলে খুব বেশি এগোয়নি ওরা। ম্যানহোল দিয়ে সুড়ঙ্গের ভেতরে বাইরের শব্দ আসতে পারছে না ঠিকমত।

সুড়ঙ্গের একটা মিলনস্থলে এসে পৌঁছুল ওরা। আরেকটা সুড়ঙ্গের সঙ্গে আড়াআড়ি মিলিত হয়েছে প্রথমটা। যেমন উঁচু তেমনি চওড়া। ওটাতে ঢুকে পড়ল ওরা।

দাঁড়ানো যাচ্ছে এখন সোজা হয়ে। ছাতে মাথা ঠেকছে না। পানি বেশি বড় সুড়ঙ্গটায়, স্রোতও বেশি। শাখা সুড়ঙ্গগুলো থেকে এসে এটাতে পড়ছে পানি। কলকল ছলছল আওয়াজ তুলছে পাথরের দেয়ালে বাড়ি দিয়ে। শক্ত করে দড়ি ধরে রেখেছে ওরা। বৈদ্যুতিক লণ্ঠনের আলোতেও কাটতে চাইছে না সামনে পেছনের ঘন কালো অন্ধকার। স্রোতের বিপরীতে এগোতে গিয়ে হিমশিম খেতে হচ্ছে।

চলতে চলতে দু'পাশে অসংখ্য ছোটবড় ফাটল দেখতে পেল ওরা। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল রবিন। ঝাড়া দিয়ে মাথা থেকে পানিতে ফেলে দিল কিছু একটা। তীক্ষ্ণ ক্যাচকোঁচ আওয়াজ উঠল ফাটলের ভেতর থেকে।

'ইঁদুর,' হেসে বলল মরিডো। 'পানি বইছে, তাই রক্ষে। নইলে এতক্ষণে হয়ত আক্রমণই করে বসত।'

খাবি খেতে খেতে এগিয়ে এল একটা বাদামি রোমশ জীব। টকটকে লাল চোখ। কাছে এসে কিশোরের পা বেয়ে ওঠার চেষ্টা করল। ঝাড়া দিয়ে ইঁদুরটাকে আবার পানিতে ফেলে দিল সে। স্রোতের ধাক্কায় ভেসে চলে গেল ওটা।

পেছনে মানুষের গলার আওয়াজ শোনা গেল।

'ব্যাটারা আসছে!' ফিসফিস করে বলল মরিডো। 'আসছে শুধু ডিউকের ভয়েতে। সুড়ঙ্গগুলো চেনে না ওরা। তবু আসতে হচ্ছে।'

গতি বাড়াল ওরা। ধীরে ধীরে পানি বাড়ছে, স্রোতও বাড়ছে। আরও

খানিকটা এগিয়ে ঝর্না দেখতে পেল। না না, ঝর্না না। খোলা ম্যানহোল দিয়ে একনাগাড়ে ঝরে পড়ছে, হয়ত রাস্তার পানি।

এড়িয়ে যাবার উপায় নেই। ভিজতেই হল। চুপচুপে হয়ে গেল মাথা-গলা-শরীর। ম্যানহোলটা পেছনে ফেলে এল ওরা।

হঠাৎই বেরিয়ে এল একটা বড়সড় ড্রামের মত গোল কক্ষে। চারপাশের দেয়ালে ছোট বড় গর্ত। সুড়ঙ্গমুখ। চারদিক থেকে এসে প্রধানটার সঙ্গে মিশেছে শাখা-সুড়ঙ্গগুলো। পানি থই থই করছে এখানে। লোহার ঢালু মই উঠে গেছে ওপরের দিকে।

'ইচ্ছে করলে এদিক দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারি,' বলল মরিডো। 'কিন্তু উচিত হবে না। প্রাসাদের কাছাকাছিই রয়ে গেছি এখনও। আসুন, মইটাতে উঠে বসে জিরিয়ে নিই। প্রহরীরা আসতে অনেক দেরি আছে, যদি এতটা আসার সাহস করে ওরা। পানি ঝরছে যে, ওই ম্যানহোলটার ওপাশ থেকেই ফেরত যেতে পারে হয়ত।'

দুই ফুট চওড়া একেকটা ধাপ। তিনটা ধাপে উঠে বসল তিনজনে।

হেলান দিতে গিয়েই ককিয়ে উঠল কিশোর। ছোঁয়াতে পারছে না পিঠের নিচের অংশ। উত্তেজনায় ব্যথা টের পায়নি এতক্ষণ।

'কি হল,' মুখ তুলে তাকাল রবিন আর মরিডো।

'কিছু না। পিঠে চোট পেয়েছি। সামান্য।'

'শেষ পর্যন্ত তাহলে পালাতে পারলাম!' জোরে একটা শ্বাস ফেলে বলল রবিন। 'এতটা যখন চলে এসেছি, আর ধরতে পারবে না।'

কিছু একটা বলতে গিয়েও থেমে গেল মরিডো। উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠল, 'বাতি নিভিয়ে ফেলুন! জলদি!'

সঙ্গে সঙ্গে বাতির সুইচ অফ করে দিল দুই গোয়েন্দা।

ড্রামের মত গোল দেয়ালের গায়ে বড় বড় দুটো গর্ত, প্রধান সুড়ঙ্গের দুটো মুখ। বাকিগুলো সব ছোট ছোট। ওগুলো দিয়ে ঢোকা যাবে না। বড় দুটো গর্তের একটা দিয়ে বেরিয়ে এসেছে ওরা খানিক আগে। ওটা দিয়েই আসছে প্রহরীরা। দ্বিতীয় মুখ, যেটা দিয়ে এগিয়ে যাবে ভেবেছিল, ওটাতে আলো দেখা যাচ্ছে। ওদিক থেকেও আসছে লোক!

তারমানে, ফাঁদে পড়ে গেছে তিনজনে।

তেরো

'ওপরে উঠুন!' চেঁচিয়ে উঠল মরিডো। 'ঢাকনা খুলে বেরিয়ে যাব!'

ভেজা পিচ্ছিল সিঁড়ির ধাপে পা রেখে রবিন আর কিশোরকে ডিঙিয়ে দ্রুত

উঠে চলে গেল মরিডো। তার পেছনে উঠল দুই গোয়েন্দা। পাশাপাশি দাঁড়ানর জায়গা নেই। ওরা এক ধাপ নিচে রইল।

অন্ধকার। কিছুই দেখা যায় না। অনুমানে ওপর দিকে হাত বাড়াল মরিডো। হাতে লাগল লোহার ঢাকনা। ঠেলা দিল। টান দিয়ে তোলার চেয়ে ঠেলা দিয়ে তোলা সহজ, বেশি জোর করা যায়। কিন্তু তবু প্রথমবারের চেষ্টায় উঠল না ঢাকনা।

আরেক ধাপ উঠে গেল মরিডো। কাঁধের একপাশ ঠেকাল ঢাকনার তলায়। ঠেলা দিল গায়ের জোরে। নড়ে উঠল ঢাকনা। ফাঁক হয়ে গেল। চাপ কমিয়ে দিল সে। হাত দিয়ে ঠেলে আরও খানিকটা ফাঁক করে বাইরে উঁকি দিল। সঙ্গে সঙ্গেই নামিয়ে আনল মাথা। ছেড়ে দিল ঢাকনা। বন্ধ হয়ে গেল ওটা আবার।

'দুজন গার্ড! মোড়ের কাছে অপেক্ষা করছে!' ফিসফিস করে জানাল মরিডো। 'বেরোলেই ক্যাঁক করে এসে চেপে ধরবে!'

'এখানেই যদি চুপ করে বসে থাকি?' বলল কিশোর। 'হয়ত দেখতে পাবে না আমাদের।'

'এছাড়া করারও কিছু নেই,' হতাশ কণ্ঠ মরিডোর। 'বসে থাকব চুপ করে। কপাল ভাল হলে বেঁচে যাব!'

আলো বাড়ছে সুড়ঙ্গে। এগিয়ে আসছে, বোঝাই যাচ্ছে। পানিতে ঝিলমিল করছে আলো।

হঠাৎ বেরিয়ে এল একটা ছোট ডিঙি। সামনের গলুইয়ের কাছে বসে আছে একজন, মাঝে আরেকজন। নৌকার পাটাতনে রাখা লণ্ঠন। গলুইয়ে বসা লোকটার হাতে একটা লগি।

'মরিডো।' ডেকে উঠল মাঝে বসা মেয়ে কণ্ঠ। 'মরিডো, আছ ওখানে?' ওপরের দিকে তাকাল সে।

'মেরিনা!' আনন্দে জোরে চেঁচিয়ে উঠেই আবার স্বর খাদে নামাল মরিডো। 'মেরি, আমরা এখানে!'

থেমে গেল নৌকা। হাত বাড়িয়ে পাশে রাখা টর্চ তুলে আলো ফেলল মেরিনা। চুপচুপে ভেজা ইঁদুরের মত সিঁড়ির ধাপে বসে আছে ওরা তিনজন।

'প্রিন্স পলকে ধন্যবাদ!' চেঁচিয়ে উঠল মেরিনা। 'আমরা তো ভেবেছিলাম, বেরোতেই পারবে না!'

দেয়ালের ফাটলে লগির মাথা ঢুকিয়ে দিয়ে নৌকাটাকে এক জায়গায় স্থির রাখল যুবক। তাড়াহুড়ো করে নেমে এল কিশোর, রবিন আর মরিডো। সঙ্গে সঙ্গেই লগিটা খুলে আনল যুবক। মেঝেতে লগি ঠেকিয়ে জোরে ঠেলা দিল। শাঁ করে আবার ঢুকে পড়ল নৌকাটা যে সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়েছিল, সেটার ভেতরে।

'একজন গার্ড তোমার মেসেজ দিয়েছে আমাকে,' মেরিনাকে বলল মরিডো।

'কয়েক ঘন্টা যাবৎ তোমাদেরকে খুঁজে বেড়াচ্ছি,' জানাল মেরিনা। 'জানি, মেসেজ পেলে যে করেই হোক বেরিয়ে পড়বেই তোমরা। এদিকে আরও দুবার খুঁজে গেছি। এবারে না পেলে ধরেই নিতাম, মেসেজ পাওনি।...ওহ্, মরিডো, তোমাদের দেখে কি-যে খুশি লাগছে...'

'আমাদেরও লাগছে!' তিনজনের হয়েই বলল মরিডো। যুবককে দেখিয়ে বলল দুই গোয়েন্দাকে, 'আমার চাচাতো ভাই, রিবাতো।' বোনের দিকে ফিরল আবার। 'বাইরে কি ঘটছে, মরি?'

জবাব দিতে গিয়েও থেমে গেল মেরিনা। সামনে হঠাৎ অন্ধকার দূর হয়ে গেছে খানিকটা জায়গায়। আলো এসে পড়েছে। কথা বলার শব্দ। ম্যানহোলের ঢাকনা খুলে ফেলা হয়েছে ওখানটায়।

'জলদি! জলদি নৌকা থামাও!' চেঁচিয়ে উঠল মেরিনা।

কিন্তু দেরি হয়ে গেছে ততক্ষণে। নৌকা ম্যানহোলের প্রায় তলায় চলে এসেছে। 'থেম না!' চেঁচিয়ে উঠল মরিডো। 'সোজা এগিয়ে যাও!'

লগি দিয়ে সুড়ঙ্গের মেঝেতে জোরে গুঁতো মারল রিবাতো। তীরের মত ছুটল হালকা ডিঙি।

সিঁড়ি নেই এখানে। একাধিক সুড়ঙ্গের মিলনস্থল নয় এটা। এখান দিয়ে সাধারণত নামে না কেউ। ওপরে কোন কারণে পানি আটকে গেলে, গর্তের ঢাকনা খুলে দেয়া হয়। পানি সরে যায়। রোজারের লোকেরা হয়ত জানে না এটা। তাই খুলেছে। ভেবেছে, এখান দিয়েই ঢুকবে।

ম্যানহোলের নিচ দিয়ে যাবার সময় ওপরের দিকে তাকাল সবাই। উঁকি দিয়ে আছে একটা মুখ। ডিঙিটা দেখেই চেঁচিয়ে উঠল লোকটা। পা ঢুকিয়ে দিল দু'হাতে ভর রেখে, ছেড়ে দিল শরীরের ভার। অল্পের জন্যে বেঁচে গেল নৌকাটা। ঝপাং করে পেছনের পানিতে পড়ল লোকটা। নৌকার ওপর পড়ে ওটাকে ঠেকাতে চেয়েছিল, পারেনি।

লগি দিয়ে ওর পেটে এক গুঁতো লাগাল রিবাতো। 'উঁ-ক্!' করে উঠল লোকটা। চেঁচিয়ে উঠল ব্যথায়।

ওপর থেকে আরও একজন প্রহরী পড়ল পানিতে। তার পর পরই আরও একজন। পানি ভেঙে তাড়া করে এল নৌকাটাকে।

'আলো নেভাও!' চেঁচিয়ে আদেশ দিল মরিডো। 'অফ করে দাও সুইচ!'

পরক্ষণেই গভীর অন্ধকার গ্রাস করল ওদেরকে। ম্যানহোল দিয়ে আসা আলো দ্রুত সরে যাচ্ছে পেছনে। স্রোতের টান, তার ওপর লগির ঠেলায় যেন উড়ে চলল খুদে ডিঙি। সামনের গলুইয়ে বসে দু'পাশে হাত ছড়িয়ে দিয়েছে মরিডো। দেয়ালে বাড়ি লাগতে পারে নৌকা, হাত দিয়ে ঠেলে ঠেকাবে।

'তাড়া করে আসবেই ওরা,' অন্ধকারে বলল মরিডো। 'তবে পারবে না

নৌকার সঙ্গে।'

'সামনে ম্যানহোলের ঢাকনা খুলে বসে থাকতে পারে,' বলল রিবাতো। 'মেরি, টর্চ জ্বালা তো। সামনেটা দেখে নিই।'

জ্বলে উঠল টর্চ। সামনে একটা কক্ষ। আরেকটা সুড়ঙ্গ-সঙ্গম।

'পাশের আরেকটা সুড়ঙ্গে ঢুকে পড়ব,' বলল রিবাতো। 'সামনে অপেক্ষা করে থাকলে ব্যাটাদের নিরাশ হতে হবে।'

বেশ বড় একটা কক্ষ। তিন দিক থেকে আরও তিনটে সুড়ঙ্গ এসে মিশেছে একটা সামনে ওটা প্রধান সুড়ঙ্গ। দু'পাশের দুটো সরু। ও দুটো দিয়ে পানি এসে পড়ছে প্রধান সুড়ঙ্গে। দুটোর সবচেয়ে সরু সুড়ঙ্গটাতে নৌকা ঢুকিয়ে দিল রিবাতো।

আবার লণ্ঠন জ্বালল মেরিনা।

স্রোত ঠেলে যেতে হচ্ছে এখন। এগোতে চাইছে না নৌকা। হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে একা রিবাতো। 'পাটাতনের নিচে আরেকটা লগি আছে, মরিডো।'

ছোট লগিটা বের করে নিল মরিডো। দু'জনে মিলে বেয়ে নিয়ে চলল নৌকাটাকে। নিচু ছাত। কোথাও কোথাও এত নিচু, মাথা নুইয়ে ফেলতে হচ্ছে। তবে, সামনে পথ রুদ্ধ হয়ে নেই কোথাও।

'রিবাতোকে চিনতে পারছেন?' দুই গোয়েন্দার দিকে চেয়ে হঠাৎ বলে উঠল মরিডো।

এতক্ষণ উত্তেজনায় খেয়াল করেনি, ভাল করে চাইল এখন রবিন। আরে, তাই তো! চেনা চেনা লাগছে! কোথায় দেখেছে এর আগে! কোথায়...

'ব্যাঙ পার্টির সর্দার,' বলে উঠল কিশোর। 'সেদিন পার্কে দেখিছিলাম।'

'চিনেছেন,' বলল মরিডো। 'আমার আর মেরিনার চেয়ে ভাল চেনে সে এই সুড়ঙ্গ। ওপরে কোথায় কি আছে, তা-ও বলে দিতে পারে শুধু দেয়াল দেখেই।'

সামনে আবার নিচু হয়ে আসছে ছাত। ওটা পেরোনর সময় প্রায় শুয়ে পড়তে হল সবাইকে।

পেছনে কারও আসার শব্দ নেই। শুধু দেয়ালে পানি বাড়ি লাগার ছলছলাৎ।

'মুসা কোথায়?' পেছনে বসে থাকা মেরিনার দিকে চেয়ে বলল কিশোর।

'অপেক্ষা করছে আমাদের জন্যে,' জানাল মেরিনা। 'ইচ্ছে করেই রেখে এসেছি। ছোট নৌকা। বোঝা বাড়িয়ে লাভ কি? তাছাড়া, নিরাপদ জায়গায় বসিয়ে রেখে এসেছি। সবাই একসঙ্গে ধরা পড়ার আশঙ্কাও রইল না।'

ঠিকই করেছে মেরিনা, আর কিছু বলল না কিশোর।

'কোথায় এলাম আমরা, রিবাতো?' জানতে চাইল মরিডো। 'হারিয়ে-টারিয়ে যাচ্ছি না-তো?'

'কেন এদিকটায় আসনি?' জবাবের অপেক্ষা না করেই বলল রিবাতো,

'ঘুরপথে যাচ্ছি। পাঁচ মিনিটেই পৌঁছে যাব আরেকটা কক্ষে।'

এগিয়ে চলেছে নৌকা। মিনিট তিন-চার পরেই আলো দেখা গেল সামনে।

'আবার আসছে কে জানি!' আঙুল তুলে দেখিয়ে বলে উঠল রবিন।

'আসছে না, অপেক্ষা করছে,' জবাব দিল মেরিনা। 'মুসা।'

আরেকটা বড় কক্ষে এসে ঢুকল নৌকা। উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক লণ্ঠন জ্বলছে। পুরানো মরচে ধরা সিঁড়ির ধাপে আরাম করে বসে আছে গোয়েন্দা সহকারী। রবিন আর কিশোরের দিকে চেয়ে হাসল। ঝকঝক করে উঠল সাদা দাঁত। 'আহ্ বাঁচা গেল! এসে পড়েছ! আমি তো ভাবছিলাম, আর আসবেই না!'

'একাই বসে আছ!' বলল রবিন।

'না, ঠিক একা নয়,' দেয়ালের ফাটলগুলোর দিকে তাকাল একবার মুসা। 'বেশ কয়েকটা ইঁদুর সঙ্গ দিতে এসেছে বার বার। খাতির বেশি হয়ে গেলে গায়ের ওপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। তাই তাড়িয়েছি। বাপরে বাপ! ইঁদুর না-তো! যেন বেড়াল একেকটা!'

দেয়ালের একপাশে বিরাট এক গর্ত। ধারগুলো অসমান। মানুষের তৈরি নয়, দেখেই অনুমান করা যায়। দেয়াল তৈরির আগে থেকেই ছিল ওটা ওখানে, তেমনি রেখে দেয়া হয়েছে।

নৌকাটাকে সিঁড়ির সঙ্গে বেঁধে ফেলা হল। কয়েক ধাপ নেমে বসল মুসা।

'নর্দমা তৈরির সময়ই ওটা দেখতে পেয়েছিল মিস্ত্রিরা,' গর্তটা দেখিয়ে বলল মরিডো। 'বন্ধ করেনি, তেমনি রেখে দিয়েছে। ওটাও একটা সুড়ঙ্গমুখ, প্রাকৃতিক। অনেক আগেই এটা আবিষ্কার করেছি আমরা। বলতে ভুলে গেছি, ছোটবেলায় একটা দল ছিল আমাদের। প্রায়ই নেমে পড়তাম এই সুড়ঙ্গে। একেক দিন একেকটার ভেতর ঢুকে পড়তাম। এমনি করেই চিনেছি সুড়ঙ্গগুলো। কাজটা খুবই বিপজ্জনক ছিল। কিন্তু কেয়ার করতাম না। এমনকি বাবাও ঠেকাতে পারেনি আমাদের। ছেলেবেলার সেই খেলা আজ হয়ত আমাদের প্রাণই বাঁচিয়ে দিল!'

'দেরি করে লাভ কি?' বলল মেরিনা। 'এঁদেরকে নিয়ে যাওয়া দরকার। মনে হচ্ছে, আগের প্ল্যানে চলবে না।'

'কি কি ঘটেছে, সেটা আগে বল আমাকে,' বলল মরিডো। 'রিবাতো, তুমি এখানে এলে কি করে?'

'চাচাকে অ্যারেস্ট করার সময় তোমাদের বাড়িতেই ছিলাম,' জানাল রিবাতো। 'গোপন দরজা দিয়ে পালিয়ে এসেছি। চাচাকে ধরার সময় ক্যাপ্টেন ব্যাটা বললঃ তোমার বিশ্বাসঘাতক ছেলেকেও শিগগিরই কোর্টে হাজির করা হবে। মেরিনার কথা কিছু বলল না। বুঝলাম তাকে ধরতে পারেনি রোজাস্রের কুত্তারা। বাড়ি থেকে বেরিয়েই দেখা হয়ে গেল মেরিনার সঙ্গে। পেছনের গলি দিয়ে বাড়িতে ঢুকতে যাচ্ছিল। ঠেকালাম। ছুটলাম তাকে নিয়ে। এই সময় শুরু হল তুমুল বৃষ্টি। তোমাদের কথা জানাল মেরিনা। মিনস্ট্রেলদের গোপন আড্ডায় চলে গেলাম।

ওখানেই মুসা আমানকে বসিয়ে রেখে গিয়েছিল মেরিনা। তোমাদেরকে বের করে আনা দরকার। মেসেজ দিয়ে পাঠিয়ে দিলাম একজনকে। আমরা তিনজন নৌকা নিয়ে ঢুকে পড়লাম সুড়ঙ্গে। ডেনজো নদী দিয়ে ঢুকেছি। অনেকদিন আগে শিক ভেঙে রেখেছিলাম যে মুখটার...'

'হ্যাঁ,' বলে উঠল মেরিনা। 'কোন অসুবিধে হয়নি ঢুকতে। তখনও পানি বেরোতে শুরু করেনি ততটা। স্রোত খুব বেশি ছিল না। ঢুকে ডানজনের ওদিক থেকে কয়েকবার ঘুরে এসেছি, আগেই তো বলেছি। অনুমান করতে কষ্ট হয়নি, তোমাদেরকে ডানজনেই আটকে রাখবে ওরা। বেরোতে পারলে, ডানজনের বাইরের ম্যানহোল দিয়েই নামবে তোমরা। ওটা ছাড়া আর কোন পথ নেই ওখান থেকে বেরোবার, জানিই।'

'রেডিওটা কোথায়?' মুসার দিকে চেয়ে বলল রিবাতো।'

'আছে,' পকেট থেকে খুদে একটা রেডিও বের করল মুসা। 'এই যে! বন্ধ করে রেখেছি। ভাষা তো বুঝি না...'

নব ঘুরিয়ে চালু করে দিল রেডিওটা মুসা।

ঝমঝম করে বাজছে যন্ত্রসঙ্গীত। বিশেষ সামরিক সুর। হঠাৎ থেমে গেল। ভেসে এল একটা ভারি গমগমে গলা। খানিকক্ষণ একটানা শব্দ বর্ষণ করে থেমে গেল। আবার বেজে উঠল বাজনা।

একটা বিন্দুও বুঝতে পারল না তিন গোয়েন্দা। ভ্যারানিয়ান ভাষা।

'সকাল আটটায় সমস্ত রেডিও আর টেলিভিশন সেট খোলা রাখার অনুরোধ জানাচ্ছে,' বলল মেরিনা। ভ্যারানিয়ার সকল নাগরিককে সেটের সামনে থাকতে বলছে। জাতির উদ্দেশ্যে এক বিশেষ ভাষণ দেবে ডিউক রোজার।...তারমানে, সকাল আটটায় জানাবে, সেঃ একটা বিদেশী ষড়যন্ত্র ধরা পড়েছে। অভিযোগ আনবে প্রিন্স দিমিত্রির বিরুদ্ধে। নিজেকে অনির্দিষ্ট কালের জন্যে রিজেন্ট ঘোষণা করবে। লোককে বোঝাতে বিশেষ বেগ পেতে হবে না। আপনাদেরকে স্পাই ঘোষণা করা তেমন কঠিন হবে না তার পক্ষে। ক্যামেরাগুলো প্রমাণ হিসেবে দেখাবে দেশবাসীকে।'

'তারমানে,' হতাশ গলায় বলল রবিন। 'দিমিত্রির সর্বনাশ করলাম আমরা! উপকার কিছুই করতে পারলাম না। কার মুখ দেখে যে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলাম!'

'আপনাদের কোন দোষ নেই,' বলল মেরিনা। 'আপনারা না এলেও প্রিন্স দিমিত্রিকে সিংহাসনে বসতে দিত না রোজার। কোন না কোন উপায়ে সরিয়ে দিতই। এখন আপনাদেরকে যাতে ধরতে না পারে, সে ব্যবস্থা করতে হবে। পৌঁছে দিতে হবে আমেরিকান এমব্যাসিতে। রিবাতো, কি বল?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝোঁকাল রিবাতো।

'কিন্তু আপনাদের কি হবে?' মেরিনার দিকে চেয়ে বলল কিশোর। 'আপনার বাবা? প্রিন্স দিমিত্রি?'

'সেটা পরে ভাবব,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল মেরিনা। 'অনেক দেরিতে বুঝেছি আমরা রোজারের পরিকল্পনা! আগে জানলে, প্রিন্স দিমিত্রিকে সরিয়ে ফেলতাম। তারপর দেশবাসীকে বোঝানো এমন কিছু কঠিন হত না। কিন্তু, অনেক সময় নিয়ে, চারদিক গুছিয়ে আঁটঘাট বেঁধে কাজে নেমেছে রোজার। কি করে পারব আমরা তার সঙ্গে? তাছাড়া ক্ষমতায় রয়েছে সে…'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝোঁকাল রিবাতো। 'মহা ধড়িবাজ! তবে সহজে ছাড়ব না। যতক্ষণ প্রাণ থাকবে, চেষ্টা করে যাব। একটা শয়তান দেশের স্বাধীনতা নষ্ট করবে, এটা কিছুতেই হতে দেয়া যায় না। হয়ত আমরা মরে যাব! কিন্তু দিন আসবেই! কুচক্রী লোক বেশিদিন রাজত্ব করতে পারেনি এখানে, ভ্যারানিয়ার ইতিহাস বলে। ডিউক রোজারের ধ্বংস অনিবার্য। হয়ত সময় লাগবে…। …হ্যাঁ, চলুন, আপনাদেরকে পৌঁছে দেয়ার চেষ্টা করি। ধরা পড়তে দেয়া চলবে না কিছুতেই।'

'নৌকা নিয়ে যাওয়া যাবে না,' বলল মেরিনা। 'সকাল হয়ে গেছে। ডেনজো নদীতে দেখে ফেলবে আমাদেরকে। ধরা পড়ে যাব।'

'হ্যাঁ,' বলল রিবাতো। 'এই সুড়ঙ্গ দিয়েই বেরোতে হবে।'

পানিতে নেমে পড়ল রিবাতো। তার পর পরই নামল মরিডো। একে একে নেমে পড়ল অন্যেরাও।

কোমরে পেঁচানো দড়ি খুলে নিল মরিডো। একটা লণ্ঠন হাতে নিয়ে ঢুকে পড়ল সুড়ঙ্গে। দড়ি ধরে তার পেছনে ঢুকে পড়ল আর সবাই। সবাইকে পাশ কাটিয়ে আগে চলে গেল রিবাতো। হাতে আরেকটা লণ্ঠন। হেঁটে চলল আগে আগে।

রিবাতোকে অনুসরণ করল দলটা নীরবে।

চোদ্দ

বৃষ্টি থেমে গেছে। ঢালু সুড়ঙ্গ বেয়ে নেমে আসা পানি দেখেই বোঝা যায়। পায়ের পাতা ভিজছে এখন শুধু, এতই কম। আস্তে আস্তে আরও কমে যাচ্ছে। লণ্ঠন টর্চ সবই আছে সঙ্গে। একটা জায়গায় এসে ঘোরপ্যাঁচও কমে গেছে। এখন প্রায় সোজা এগিয়ে গেছে সুড়ঙ্গ। দ্রুত হাঁটতে পারছে ওরা।

'আচ্ছা, একটা কথা,' একসময় বলল রিবাতো। 'আমেরিকান এমব্যাসির ওদিক দিয়ে যে বেরোব, যদি গার্ড থাকে?'

তাই তো! এটা তো ভাবেনি কেউ! অনেকখানি চলে এসেছে ওরা। মনে হচ্ছে, না জানি কত পথ! অথচ নৌকা থেকে নামার পর বড়জোর আট কি দশটা ব্লক পেরিয়ে এসেছে। বেশ চওড়া একটা জায়গায় এসে থেমে গেল রিবাতো। তার সঙ্গে সঙ্গে অন্যেরাও।

প্রাকৃতিক সুড়ঙ্গ। কিন্তু অব্যবহৃত থাকেনি। ওপরে ম্যানহোল তৈরি হয়েছে। সিঁড়ি না বসিয়ে অন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে। খাড়া পাথরের দেয়ালে গেঁথে দেয়া হয়েছে দুই কোনা লোহার আঙটা।

একই সঙ্গে দুভাবে ব্যবহার করা যায় এটা। হাত দিয়ে ধরা যায়, পা রেখে অনেকটা মইয়ের মতই ওঠা নামাও যায়।

'এখানে দাঁড়ালে কেন?' জিজ্ঞেস করল মরিডো। আরও দুটো ব্লক পেরোতে হবে।'

'বিপদের গন্ধ পাচ্ছি,' বলল রিবাতো। 'জায়গাটায় পাহারা থাকবেই। প্রথমে আমরা কোথায় যাব, এটা ঠিকই আঁচ করে নেবে ওরা। তারপর জায়গা মত ওত পেতে বসে থাকবে। যেই বেরোব, ক্যাঁক করে চেপে ধরবে গর্ত থেকে বেরোনো ইঁদুরের মত। সেইন্ট ডোমিনিকের পেছনে রয়েছি আমরা এখন। এই একটা জায়গায় পাহারা থাকার সম্ভাবনা কম। এখান দিয়ে বেরিয়ে বাড়িঘরের আড়ালে আড়ালে চলে যেতে পারব এমব্যাসিতে।'

'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ,' সায় দিল মরিডো। 'ঠিক আছে। খামোকা সময় নষ্ট করে লাভ নেই। চল, উঠি।'

আঙটা বেয়ে তরতর করে উঠে গেল রিবাতো। ম্যানহোলের ঢাকনাই নেই এখানটায়। কোনকালে খুলে গিয়েছিল কে জানে, লাগানো হয়নি আর। বাইরে উঁকি দিয়ে দেখল একবার সে। তারপর চেঁচিয়ে বলল, 'একজন একজন করে উঠে আসবে। টান দিয়ে তুলে নেব আমি।'

বাইরে বেরিয়ে গেল রিবাতো। গর্তের দিকে মুখ ঝুঁকে বসল।

প্রথমে উঠে গেল মেরিনা। ওপরে উঠে হাত বাড়িয়ে দিল। তাকে তুলে নিল রিবাতো।

অন্যেরাও উঠে এল একে একে।

আকাশ মেঘে ঢাকা। গোমড়া সকাল। বিষণ্ন এক দিনের শুরু। পানি জমে গেছে রাস্তার দু'পাশে। খানাখন্দগুলো ভরা।

সরু একটা গলি পথে এসে উঠল ওরা। বাজারের ভেতর দিয়ে গেছে পথ। দু'পাশে সারি সারি দোকানপাট। বেশিরভাগই ফুল আর ফলের দোকান। ভিড় কম। মাত্র সকাল হয়েছে। ক্রেতারা আসতে শুরু করেনি এখনও। হয়ত রেডিও-টেলিভিশনের সামনে বসে আছে!

অবাক চোখে ছয়জনের দলটার দিকে তাকাল লোকে। সারা গা ভেজা, ময়লা, চুল উষ্ক-খুষ্ক, মুখ শুকনো। ঝড়ো কাকের অবস্থা হয়েছে! কারও দিকেই তাকাল না ওরা। নীরবে এগিয়ে চলল দ্রুত।

আগে আগে চলেছে রিবাতো। পঞ্চাশ গজমত গিয়ে থমকে দাঁড়াল। সামনে, মোড়ের কাছে দাঁড়িয়ে আছে দুজন প্রহরী, রয়্যাল গার্ড।

'পিছাও!' চাপা গলায় আদেশ দিল রিবাতো। 'লুকিয়ে পড় সবাই!'

কিন্তু দেরি হয়ে গেছে ততক্ষণে। ফিরে চেয়েছে এক প্রহরী। দেখে ফেলেছে। ভেজা কাপড়-চোপড় আর চেহারা দেখেই অনুমান করে নিয়েছে, কারা ওরা। চেঁচিয়ে উঠেই ছুটে এল।

'খবরদার!' চেঁচিয়ে বলল প্রহরী। 'পালানর চেষ্টা কোরো না। রিজেন্টের আদেশে অ্যারেস্ট করা হল তোমাদেরকে!'

'ধরতে হবে আগে, তারপর তো অ্যারেস্ট,' ফস করে বলল রিবাতো। পাঁই করে ঘুরেই দৌড় দিল। 'গির্জার দিকে...এছাড়া আর জায়গা নেই লুকানর...'

ছুটতে শুরু করেছে দলের সবাই। লোকজন কেউ সামনে পড়লে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিচ্ছে। আশেপাশে আরও প্রহরী ছিল। চেঁচামেচিতে ওরাও এসে যোগ দিয়েছে প্রথম দুজনের সঙ্গে। মোট ছ'জন প্রহরী তাড়া করে আসছে এখন।

ছুটতে ছুটতেই ওপরের দিকে তাকাল রবিন। সামনে বাড়িঘর। ছাতের ওপর দিয়ে চোখে পড়ছে ডোমিনিকের সোনালি গম্বুজ। জোরে জোরে হাঁপাচ্ছে ও। ভাবছে, গির্জার ভেতর লুকিয়ে কি হবে? ধরা পড়তে সামান্য বিলম্ব হবে, এই যা।

পাশে চেয়ে দেখল, কিশোরও চেয়ে আছে গম্বুজের দিকে। ছুটছে, চিমটি কাটছে নিচের ঠোঁটে। জরুরি কিছু একটা ভাবছে নিশ্চয় সে। কিন্তু সেটা জিজ্ঞেস করার সময় এখন নেই।

পেছনে, আছাড় খেল এক প্রহরী। তার গায়ে হোঁচট খেয়ে পড়ল আরেকজন। পড়ল আরও দুজন। হৈ হট্টগোল, চেঁচামেচি। আশপাশ থেকে লোকজন ছুটে এসে তুলছে টেনে।

অনেকখানি এগিয়ে যাবার সুযোগ পেয়ে গেল দলটা। প্রহরীদেরকে পঞ্চাশ গজ পেছনে ফেলে এল ওরা ছয়জন। অবাকই হল রবিন। একই পথ ধরে ছুটে এসেছে ওরা। ওদের কেউ তো আছাড় খেল না! তাহলে ইচ্ছে করেই কি পড়ে গেল সামনের প্রহরীটা! মিনস্ট্রেল পার্টির লোক?

মোড় ঘুরল ছ'জনে। আর মাত্র একটা ব্লক। তারপরেই সেইন্ট ডোমিনিক। বিশাল গির্জার ব্লক খানেক দূরে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকজন প্রহরী। চেয়ে আছে এদিকেই।

প্রধান ফটক দিয়ে ঢোকা যাবে না কিছুতেই।

কিন্তু সেদিকে এগোলও না রিবাতো। রাস্তা পেরিয়ে ছুটে গেল গির্জার পেছনের ছোট একটা দরজার দিকে। শাঁ করে ঢুকে পড়ল ভেতরে। অন্যেরাও ঢুকে পড়ল তার পেছন পেছন। দরজা বন্ধ করেই ছিটকিনি তুলে দিল।

পৌঁছে গেল প্রহরীরা। দরজায় ধাক্কা দিতে আরম্ভ করল। সেই সঙ্গে ক্রুদ্ধ চেঁচামেচি।

মুহূর্তের জন্যে চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে আনল রবিন। বিশাল চার দেয়াল, ওপরে ছাত আছে বলে মনে হল না। তবে আকাশও দেখা যাচ্ছে না পুরোপুরি। কিছু একটা বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে চোখের সামনে। একপাশের দেয়াল

ঘেঁষে ঘুরে ঘুরে উঠে গেছে লোহার সিঁড়ি। ওপর থেকে নেমে এসেছে আটটা লম্বা দড়ি। সিঁড়ির পাশে দেয়ালে গাঁথা লোহার আঙটার সঙ্গে বাঁধা রয়েছে প্রান্তগুলো।

আর কিছু দেখার সময় পেল না রবিন।

'ক্যাটাকম্বের দিকে যেতে হবে,' কানে এল রিবাতোর কথা। 'লুকিয়ে থাকতে হবে ওখানেই...'

ক্যাটাকম্ব কি, রবিনের জানা আছে : গির্জার ভেতরে মাটির তলায় ভাঁড়ারের মত বড় বড় ঘর। কফিনে ভরে লাশ নিয়ে রেখে দেয়া হয় ওসব ঘরে। বড় বড় গির্জায় মাটির নিচেও থাকে একাধিক তলা। তাতে অসংখ্য ঘর, অসংখ্য করিডর, সিঁড়ি! অন্ধকার।

'কি হবে ওখানে গিয়ে?' বলে উঠল কিশোর। 'ওরা ঠিক বুঝে যাবে, কোথায় গেছি আমরা। বাতি নিয়ে এসে সহজেই খুঁজে বের করবে।'

সবাই চোখ তুলে তাকাল কিশোরের দিকে।

'কিছু একটা ভাবছ তুমি, কিশোর!' বলল মুসা। 'কি?'

'ওই দড়িগুলো,' হাত তুলে দেখাল কিশোর। 'ওগুলো টেনে প্রিন্স পলের ঘন্টা বাজানো যায়?'

'প্রিন্স পলের ঘন্টা!' অবাক হয়ে তাকাল মরিডো। কিশোরের কথা বোঝার চেষ্টা করছে। 'না, ওগুলো সাধারণ ঘন্টার দড়ি। প্রিন্স পলের ঘন্টা রয়েছে অন্য টাওয়ারটাতে। ওপাশে। একটাই ঘন্টা। বিশেষ বিশেষ সময়ে কেবল বাজানো হয়।'

'শুনেছি,' দ্রুত বলল কিশোর। 'প্রিন্স দিমিত্রির কাছে শুনেছি, শত শত বছর আগে আরেকবার অভ্যুত্থান হয়েছিল ভ্যারানিয়ায়। ওই ঘন্টা বাজিয়ে দেশবাসীর কাছে সাহায্য চেয়েছিলেন প্রিন্স পল।'

হাঁ করে অন্য পাঁচজন চেয়ে আছে কিশোরের মুখের দিকে।

চোয়ালের একপাশ চুলকাল রিবাতো। 'হ্যাঁ। ভ্যারানিয়ায় বাচ্চা ছেলেরাও জানে একথা। কিন্তু তাতে কি?'

'উনি বলতে চাইছেন, প্রিন্স পলের মতই গিয়ে আমরাও বাজাব ওই ঘন্টা!' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল মরিডো। 'সাহায্য চাইব প্রিন্স দিমিত্রির জন্যে! ইস্‌স্, কেউ ভাবিনি আমরা এ কথাটা! খালি খবরের কাগজ, রেডিও আর টেলিভিশনের দিকেই ছিল খেয়াল! অনেক দিন বাজেনি ওই ঘন্টা। যদি আজ হঠাৎ করে...'

'...বাজতে শুরু করে,' মরিডোর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল মেরিনা, 'চমকে উঠবে লোকে! দেশবাসী ভালবাসে প্রিন্স দিমিত্রিকে। দলে দলে ছুটে যাবে তারা প্রাসাদের দিকে। জানতে চাইবে, কি হয়েছে!'

'কিন্তু যদি...' শুরু করেই থেমে গেল রিবাতো।

'আর দেরি নয়!' চেঁচিয়ে উঠল মরিডো। 'দরজায় আওয়াজ শুনছ! ভেঙে ফেলবে শিগগিরই! যা করার জলদি করতে হবে!'

'ঠিক আছে!' আর দ্বিধা করল না রিবাতো। 'মরিডো, তুমি এঁদেরকে নিয়ে যাও! আমি আর মেরিনা এখানে অপেক্ষা করছি। প্রহরীদের দেখিয়ে ছুটে যাব ক্যাটাকম্বের দিকে। লুকিয়ে পড়ব। ওরা আমাদের পেছনে সময় নষ্ট করবে। ঘন্টা বাজানর সুযোগ পেয়ে যাবে তোমরা। যাও!'

'আসুন!' তিন গোয়েন্দাকে বলল মরিডো। 'এপথে!'

গির্জার ভেতর দিয়েও পৌঁছে যাওয়া যায় অন্য টাওয়ারটাতে। আগে আগে ছুটছে মরিডো। পেছনে রবিন, মুসা, তার পরে কিশোর।

পেছনে পড়তে শুরু করল রবিন। হঠাৎ ব্যথা আরম্ভ হয়েছে তার ভাঙা পায়ে। গতরাত থেকে নিয়ে অনেক বেশি দৌড়াদৌড়ি করেছে। সবে জোড়া লেগেছে পায়ের হাড়। এ-পর্যন্ত সয়েছে, এটাই বেশি।

সবার পেছনে পড়ে গেল রবিন। থামল না। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ছুটল। অন্য সময় হলে হেসে মাটিতে গড়াগড়ি করত মুসা। কিন্তু এখন দেখেও দেখল না।

দাঁড়িয়ে পড়েছে আগের তিনজন। বিচিত্র ভঙ্গিতে লাফাতে লাফাতে কাছে এসে দাঁড়াল রবিন। আরেকটা বেল-টাওয়ার। প্রথম যেটায় ঢুকে ছিল, তেমনি। তবে এখানে ওপর থেকে একটা মাত্র দড়ি ঝুলে আছে।

লোহার সিঁড়ির দিকে ছুটে গেল মরিডো। অন্য তিনজন অনুসরণ করল তাকে।

রিঙে বাঁধা দড়ি খুলে দিল মরিডো। ঝুলে পড়ল দড়ির প্রান্ত। দ্রুত সিঁড়ি টপকে ওপরে উঠে চলল সে।

মরিডোর পেছনে উঠে যেতে যেতে পেছনে ফিরে তাকাল একবার কিশোর। না, পড়ে যাবে না রবিন। তার হাত শক্ত করে ধরে রেখেছে মুসা। উঠে আসছে দ্রুত।

পনেরো

উঠেই চলেছে ওরা। সিঁড়ি যেন আর ফুরায় না।

ভীষণ ক্লান্ত ওরা। হাঁপাচ্ছে জোরে জোরে। কষ্ট বেশি হচ্ছে রবিনের।

গতি শ্লথ হয়ে এসেছে চারজনেরই। জিরিয়ে নেবার জন্যে থামল। এই সময় নিচে শোনা গেল চেঁচামেচি।

চমকে নিচে তাকাল ওরা। কয়েকজন প্রহরী এসে দাঁড়িয়েছে নিচে। চেয়ে আছে ওপরের দিকে। দেখে ফেলল একজন। চেঁচিয়ে উঠল। ছুটে এল সিঁড়ির দিকে।

দু'দিক থেকে রবিনের দুই বাহু চেপে ধরল মরিডো আর মুসা। তাকে শূন্যে তুলে নিয়ে আবার টপকাতে শুরু করল সিঁড়ি। খুব পরিশ্রমের কাজ। কিন্তু থামল না ওরা। পেছনে উঠে আসতে লাগল কিশোর।

সামনে একটা বেশ বড়সড় দরজা। পাল্লা বন্ধ
'কিশোর!' চেঁচিয়ে উঠল মরিডো। 'জলদি ধাক্কা দিন দরজায়!'

ঠেলা দিতেই খুলে গেল দরজা। রবিনকে নিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল মুসা আর মরিডো। কিশোর ঢুকেই বন্ধ করে দিল ভারি পাল্লাটা। বিশাল এক ছিটকিনি তুলে দিল।

'সামনে এমন আরও দুটো দরজা আছে,' আবার সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে জানাল মরিডো। 'আগে, দেশের ভেতরে কোন গোলমাল দেখা দিলেই ঘন্টাঘরে গিয়ে ঠাঁই নিত পাদ্রী আর গির্জার অন্যান্য লোকেরা। ভীষণ শক্ত দরজা। ভাঙতে সময় নেবে।'

দ্বিতীয় দরজাটা পেরিয়ে এল ওরা। ছিটকিনি তুলে দিল কিশোর। এই সময় কানে এল প্রথম দরজায় ধাক্কার আওয়াজ।

আরও তাড়াতাড়ি করতে হবে। বেলটা বাজানোর আগেই যদি দরজা ভেঙে ঢুকে পড়ে প্রহরীরা, তাহলে এত কষ্ট সব বিফলে যাবে।

'সময় খুব বেশি পাব না আমরা!' জোরে জোরে হাঁপাচ্ছে কিশোর। 'এর মাঝেই কাজ সারতে হবে!'

তৃতীয় দরজা খুলে ফেলল কিশোর। রবিনকে নিয়ে মরিডো আর মুসা ঢুকে যেতেই সে-ও ঢুকে পড়ল। তুলে দিল ছিটকিনি। হাঁপ ছাড়ল। চমকে উঠে উড়ে গেল এক ঝাঁক পায়রা।

কংক্রীটে তৈরি গোল একটা চত্বরে এসে দাঁড়াল ওরা। খোলা। রেলিঙে ঘেরা। চত্বরের ঠিক মাঝখানে বেশ বড় গোল একটা ফোকর।

ফোকরের কাছে এগিয়ে গেল মরিডো। নিচে তাকাল । অনেক নিচে পুতুলের মত দেখাচ্ছে প্রহরীদেরকে। দড়িটা টান দিয়ে তুলে নিল সে। ঝট করে ওপরে তাকাল প্রহীরা ' কিন্তু দড়িটা চলে এসেছে তাদের নাগালের বাইরে।

'প্রথম দরজাটা ভাঙার চেষ্টা করছে ওরা,' বলল মরিডো। 'শিগ্গিরই শাবল কুড়াল নিয়ে আসবে গিয়ে।' চিন্তিত ভঙ্গিতে ঘন্টাটার দিকে তাকাল সে। 'কিন্তু যা ভারি! বাজাব কি করে! নড়াতেই তো পারব না!'

চিন্তিত চোখে ঘন্টার দিকে চেয়ে আছে কিশোর। কি বিশাল! মোটা দুটো থামের মাথায় লোহার দণ্ডে ঝোলানো। চারদিক থেকে ঘন্টাকে ঘিরে উঠে গেছে শক্ত কাঠের আরও কয়েকটা থাম। ওগুলোর মাথায় বসানো চোঙের মত টিনের চাল। রোদ-বৃষ্টি থেকে ঘন্টাকে বাঁচায়। ঘন্টার চূড়ায় মোটা একটা রিঙ। তাতে বাঁধা দড়ির আরেক প্রান্ত। দড়ি ধরে টানলেই দুলতে শুরু করে ঘন্টা, ভেতরে নড়ে ওঠে দোলক। তালে তালে ঘন্টার গায়ে বাড়ি মারে, একবার এপাশে, একবার ওপাশে। যেমন ঘন্টা তেমনি তার দোলক। বিশাল, ভারি।

রবিনই দেখছে ঘন্টাটাকে। ভেতরের দিকে ঘন্টার নিচে টুপির মত ছড়ানো অংশে নানারকম সূক্ষ্ম কারুকাজ, খোদাই করা। দেখলে শ্রদ্ধা বেড়ে যায় প্রাচীন

শিল্পীর ওপর, যে করেছিল কাজগুলো।

রেলিঙের কাছে এগিয়ে গেল রবিন। নিচে তাকাল। প্রায় পুরো ভেনজো শহরটাই চোখে পড়ছে। এখান থেকে দেখলে মনে হয় একটা লিলিপুটের দেশ। খুদে মানুষ, খুদে গাড়ি। শহরের পরিবেশ শান্ত। দেখে মনে হয় না, কি সাংঘাতিক এক ষড়যন্ত্র চলছে ভেতরে ভেতরে! মনেই হয় না, প্রাণের ভয়ে ওরা এসে পালিয়েছে এখানে। নিচে প্রাণপণে চেষ্টা চালাচ্ছে ঘাতকরা ওদের ধরার। পাশে তাকাল। নিচে এখন সেইন্ট ডোমিনেকের সোনালি গির্জা। এখান থেকে দেখতে অদ্ভুত লাগছে। বিশাল এক বাটি যেন উপুড় করে ফেলে রাখা হয়েছে, পিঠটা চোখা।

'হায় আল্লাহ! খামোকাই এলাম!' বলে উঠল মুসা। 'বাজাব কি করে ওটা!'

ফিরে তাকাল রবিন।

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে কাটতে হঠাৎ ঝটকা দিয়ে হাত সরিয়ে নিল কিশোর। 'পেয়েছি! সাধারণ নিয়মে ঘন্টাটা বাজাতে পারব না আমরা। দড়ি ধরে টেনে কাত করে ফেলতে হবে। তারপর দোলকে দড়ি বেঁধে দোলাতে হবে ওটাকে। বাড়ি লাগবে ঘন্টার গায়ে। এস, কাজে লেগে পড়ি।'

চারজনেই দড়ি ধরে টান দিল। নড়ে উঠল ঘন্টা, খুবই সামান্য।

'জোরে! আরও জোরে!' চেঁচিয়ে বলল কিশোর।

আরেকটু কাত হল ঘন্টা।

'হ্যাঁ, হবে। ছেড়ে দাও!' বলল কিশোর।

কিশোর ছাড়া আর সবাই ছেড়ে দিল। দড়িটা নিয়ে গিয়ে এক পাশের একটা সরু থামের উল্টো পাশ দিয়ে ঘুরিয়ে আনল সে। তারপর আবার সবাইকে ধরে টানার নির্দেশ দিল।

একটু একটু করে কাত হতে শুরু করল ঘন্টা। দোলকটা সরে যেতে লাগল ঘন্টার এক কানার দিকে। সামান্য একটু ফাঁক থাকতেই চেঁচেয়ে উঠল কিশোর, 'এবার দড়ি পেঁচিয়ে বেঁধে ফেলতে হবে থামের সঙ্গে!'

বেঁধে ফেলা হল দড়ি। কাত হয়ে রইল ঘন্টা।

আবার হাঁপাতে শুরু করল ওরা। ঘামে নেয়ে উঠেছে শরীর। টিনের চালে আবার নেমে এসেছে পায়রাগুলো। বাক-বাকুম বাক-বাকুম শুরু করে দিয়েছে।

নিচে, প্রথম দরজায় ধাক্কার শব্দ থেমে গেছে।

'নিশ্চয় কুড়াল আনতে গেছে ব্যাটারা!' বিড়বিড় করল মরিডো।

'ক'টা বাজে, মুসা?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'আটটা বাজতে বিশ।'

'হুঁ। তাড়াতাড়ি করতে হবে। ডিউক রোজার ভাষণ দেবার আগেই শহরবাসীকে হুঁশিয়ার করে দেব।...মরিডো, দড়িটা দিন

'দড়ি!...'

'কোমরে পেঁচানো...'

'ও, হ্যাঁ! ভুলেই গিয়েছিলাম!' চাদরে তৈরি দড়িটা কোমর থেকে খুলে দিল মরিডো।

'দোলকে বেঁধে দিতে হবে। ওটা ধরেই টানব।'

এক মুহূর্ত স্থির চোখ কিশোরের দিকে চেয়ে রইল মরিডো। অনেকক্ষণ পর এই প্রথম হাসল। 'সত্যি, আপনি বুদ্ধিমান...'

'আহ্, তাড়াতাড়ি করুন...'

'কিন্তু ওখানে উঠব কি করে?'

'কিশোর,' বুদ্ধি বাতলে দিল মুসা। 'আমি আর মরিডো পাশাপাশি দাঁড়াচ্ছি। তুমি আমাদের কাঁধে চড়ে উঠে যাও।'

'ঠিক আছে।'

দোলকটার তলায় গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে পড়ল মুসা আর মরিডো। ওদের কাঁধে উঠে পড়ল কিশোর। দড়ি হাতে নিয়ে দাঁড়াল। দোলকের সঙ্গে পেঁচিয়ে বেঁধে দিল দড়ির এক মাথা। তারপর লাফিয়ে নেমে এল। 'যাক, অনেক কাজে লাগল দড়িটা!'

মনে হচ্ছে ওদের, কত সময় পেরিয়ে গেছে! অথচ ঘন্টাঘরে ঢোকার পর পেরিয়েছে মাত্র দেড় মিনিট।

আবার শব্দ শোনা গেল দরজায়।

'দেরি করে লাভ নেই,' বলে উঠল মুসা। 'এস, শুরু করে দিই।'

দড়ি ধরল মুসা আর মরিডো। চারজনের মাঝে ওদের দুজনের গায়েই জোর বেশি। আস্তে করে টেনে কানার কাছ থেকে দোলকটা সরিয়ে আনল ওরা। তারপর হঠাৎ ঢিল দিল দড়িতে। প্রচণ্ড জোরে গিয়ে ঘন্টার গায়ে আঘাত হানল ভারি দোলক।

গমগমে ভারি একটা শব্দ উঠল। কানে তালা লেগে যাবার জোগাড় হল ছেলেদের! রেলিঙের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে রবিন আর মুসা। নিচে চেয়ে দেখল, রাস্তার সবাই মুখ তুলে তাকিয়েছে এদিকে।

'কানের বারোটা বেজে যাবে!' বলে উঠল কিশোর। 'রবিন, তোমার পকেটে রুমাল আছে না?'

'আছে? এই নাও,' বের করে দিল রবিন।

দ্রুত হাতে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করল কিশোর রুমালটা। দুটো টুকরো ঢুকিয়ে দিল নিজের কানে। দুটো দিল রবিনকে। চারটে করে দিল মুসা আর মরিডোকে। ওরা কানে আঙুল দিতে পারবে না। কাজেই ভালমত বন্ধ করে নিতে হবে কানের ফুটো।

নিচে দরজার কাছ থেকে আসছে জোর আওয়াজ। কুড়াল এসে গেছে। ভেঙে ফেলবে শিগগিরই দরজা।

একনাগাড়ে ঘন্টা বাজিয়ে যেতে ইশারা করল কিশোর।

আবার বেজে উঠল ঘন্টা। আবার, তারপর আবার। বেজেই চলল। তাল ঠিক নেই! আওয়াজটাও অনেক বেশি চড়া। বেশ দূর থেকে গিয়ে কানায় আঘাত হানছে দোলক, তাই। কান ফাটানো শব্দে ঘোষণা করে চলল যেন ঘন্টাটাঃ হুঁশিয়ার! হুঁশিয়ার!

কানে আঙুল দিয়ে রেখেছে কিশোর আর রবিন। তবু রেহাই পাচ্ছে না। মাথার মগজসুদ্ধ যেন ঝাঁকিয়ে দিচ্ছে প্রচণ্ড শব্দ। মুসা আর মরিডোর অবস্থা কল্পনা করতে পারল ওরা। নিচে থেকে দরজা ধাক্কানর শব্দ শোনা যাচ্ছে না আর। শোনা যাচ্ছে না কিছুই। সারা পৃথিবী জুড়ে আছে যেন শুধু একটাই শব্দ প্রচণ্ড ঢ-অ-ঙ-ঙ! ঢ-অ-ঙ-ঙ!

টাওয়ারের নিচে রাস্তায় জমা হতে শুরু করেছে লোক, রেলিঙে দাঁড়িয়ে দেখছে কিশোর আর রবিন। পিল পিল করে লোক বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে অন্যান্য রাস্তায়, সবাই চেয়ে আছে গির্জার দিকে। কেউ কেউ উত্তেজিত ভাবে প্রাসাদের দিকে দেখাচ্ছে হাত তুলে। মেসেজটা কি পাবে ওরা? বুঝতে পারবে, প্রিন্স দিমিত্রির বড় বিপদ?

টাওয়ারের নিচে জনতার মাঝে হঠাৎ একটা আলোড়ন উঠল। যাচ্ছে সবাই। হাঁটতে শুরু করল। রওনা হয়ে পথ ধরে, সম্ভবত প্রাসাদেই চলল ওরা।

দেখতে দেখতে জনতার ঢল নামল যেন শহরের পথে পথে। আর তাকাচ্ছে না ওরা গির্জার দিকে। সোজা এগিয়ে চলেছে। লক্ষ্য, রাজপ্রাসাদ। হাসি ফুটল কিশোর আর রবিনের মুখে।

হাজারে হাজারে লোক জমে গেছে প্রাসাদের সামনে। প্রধান ফটকের সামনে ভিড়। একদল লাল কাপড় পরা পুতুল চোখে পড়ল কিশোর আর রবিনের। নড়ছে ওগুলো। কিন্তু কয়েকটা সেকেণ্ড। জনতা-পুতুলের ধাক্কায় স্রোতের মুখ কুটোর মত ভেসে গেল যেন লাল ইউনির্ফম পরা প্রহরীরা। আঙিনায় ঢুকে পড়তে শুরু করল জনতা।

মেসেজ পেয়ে গেছে তাহলে দেশবাসী!

হঠাৎ থেমে গেল ঘন্টাধ্বনি। দড়ি ছেড়ে দিয়েছে মরিডো আর মুসা. কিশোর আর রবিনের পাশে এসে দাঁড়াল। ওরাও দেখতে চায়, কি ঘটছে। জনতার দিকে চেয়ে ওদের মুখেও হাসি ফুটল।

ঘড়ি দেখল মুসা। পকেট থেকে খুদে রেডিওটা বের করে নব ঘুরিয়ে দিল।

কোন শব্দ ঢুকল না কানে। ভুরু কুঁচকে তাকাল মুসা রেডিওর দিকে। চোখ তুলতেই দেখল, কানের ভেতর থেকে রুমালের টুকরো বের করছে কিশোর।

কানের ফুটো থেকে রুমালের টুকরো বের করে নিল সবাই। শোনা গেল ভারি একটা কণ্ঠস্বর। ভ্যারানিয়ান ভাষা। ডিউক রোজার! নির্দিষ্ট সময়ের আগেই ভাষণ শুরু করে দিয়েছে?

চুপচাপ শুনল কিছুক্ষণ মরিডো তারপর অনুবাদ করে শোনাল তিন গোয়েন্দাকেঃ 'ডিউক রোজার। বলল, সাংঘাতিক এক বিদেশী ষড়যন্ত্র ধরা পড়েছে। অভিষেক অনুষ্ঠান অনির্দিষ্ট কালের জন্যে স্থগিত। শাসনভার পুরোপুরি নিজের হাতে তুলে নিয়েছে। শিগগিরই আসামীদের ধরে হাজির করবে দেশবাসীর সামনে। রূপালী মাকড়সা গায়েব। প্রিন্স দিমিত্রিকে নজরবন্দি করা হয়েছে। দেশবাসীর কাছে সাহায্যের আবেদন জানাচ্ছে ডিউক।'

'কাম সারছে!' বলে উঠল মুসা। 'এমনভাবে বললেন, আমারই বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে! আল্লাই জানে, কি হবে!'

'কিন্তু ডেনজোর অনেকেই শুনছে না তার ভাষণ!' বলল মরিডো। 'ছুটে যাচ্ছে প্রাসাদের দিকে। ঘন্টা কেন বাজল, এটাই হয়ত জানতে চায়…' চমকে উঠে থেমে গেল সে।

'দরজা ধাক্কার শব্দ। দুটো দরজা ভেঙে ফেলেছে প্রহরীরা। পৌছে গেছে তৃতীয় দরজার ওপাশে।

'দরজা খোল!' চেঁচিয়ে উঠল একটা ভারি কণ্ঠ। 'রিজেন্টের আদেশে অ্যারেস্ট করা হল তোমাদের!'

'দরজা ভেঙে আস!' চেঁচিয়ে জবাব দিল মরিডো। 'আমরা খুলব না!' সঙ্গীদের দিকে ফিরে বলল, 'আসুন। আবার বাজাই। ওরা ঢোকার চেষ্টা করুক, আমরা বাজিয়ে যাই!'

আবার কানে রুমালের টুকরো ঢোকাল ওরা।

আবার বাজতে শুরু করল ঘন্টা। মাত্র কয়েক ফুট দূরে কুড়াল আর ক্রো-বার নিয়ে দরজা আক্রমণ করেছে প্রহরীরা। সে শব্দ ঢাকা পড়ে গেছে প্রচণ্ড ঘন্টাধ্বনিতে!

হঠাৎ ভেঙে পড়ল দরজা।

ষোলো

আগেপিছে প্রহরী। সিঁড়ি দিয়ে নেমে চলল ছেলেরা। ক্লান্ত।

সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে প্রহরী। গোল একটা বেস্টনী তৈরি করে দাঁড়াল। তার মাঝে ঠেলে ঢুকিয়ে দেয়া হল ছেলেদেরকে।

গির্জা থেকে বের করে আনা হল চার বন্দিকে। রাস্তায় এখনও লোক আছে, তবে খুবই কম। কৌতূহলী চোখে তাকাল ওরা। কি হচ্ছে না হচ্ছে বুঝতে পারছে না কিছুই। পায়ে পায়ে এগিয়ে এল কয়েকজন। প্রহরীদের ধমক শুনে পিছিয়ে গেল আবার।

চারপাশ থেকে বন্দিদেরকে ঘিরে নিয়ে মার্চ করে এগোল প্রহরীরা। দুটো ব্লক পেরিয়ে এসে থামল একটা পাথরের বাড়ির সামনে। ওটা থানা। ভেতর থেকে

বেরিয়ে এল দুজন নীল পোশাক পরা পুলিশ অফিসার।

'দেশের শত্রু!' অফিসারদের দিকে চেয়ে বলল প্রহরীদের ক্যাপ্টেন। 'হাজতে ভরে রাখুন। পরে, ডিউক রোজার যা করার করবেন।'

দ্বিধা করতে লাগল দুই অফিসার।

'প্রিন্স পলের ঘন্টা...' বলতে গিয়েও থেমে গেল এক অফিসার।

'রিজেন্টের আদেশ!' খেঁকিয়ে উঠল ক্যাপ্টেন। বোঝা গেল, পুলিশের চেয়ে অনেক বেশি ক্ষমতা দেয়া হয়েছে রয়্যাল গার্ডকে। অনেকটা সেনাবাহিনীর মত। 'সরুন! পথ ছাড়ুন!'

সরে দাঁড়াল দুই অফিসার। বন্দিদেরকে নিয়ে একটা হলে এসে ঢুকল প্রহরীরা। অন্য পাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল করিডরে। দুটো করে দু'পাশে চারটে ছোট ছোট সেল। লোহার শিকের দরজা। একটা ঘরে ঢুকিয়ে দিল মুসা আর মরিডোকে। আরেকটাতে কিশোর আর রবিন। বন্ধ করে দিল দরজা।

'তালা আটকানো,' পেছনে আসা পুলিশ অফিসারের দিকে চেয়ে আদেশ দিল ক্যাপ্টেন। 'ভালমত পাহারার ব্যবস্থা করুন। এখান থেকে ওরা পালালে, কপালে দুঃখ আছে আপনাদের।...আমরা যাচ্ছি। রিজেন্টকে খবর দিতে হবে।'

বেরিয়ে গেল প্রহরীরা।

প্রতিটি সেলে দুটো করে বাংক। এগিয়ে গিয়ে একটাতে বসে পড়ল মরিডো। 'ধরা শেষতক পড়লামই! তবে, আর কিছু করারও ছিল না আমাদের। প্রাসাদে কি ঘটছে, কে জানে!'

কোন জবাব দিল না মুসা। অন্য বাংকটাতে গিয়ে বসে পড়ল চুপচাপ।

'সারারাত জেগেছি,' বাংকে বসে বলল কিশোর। 'ধকলও গেছে সাংঘাতিক! শরীরে আর সইছে না। যা হবার হোকগে পরে, আগে ঘুমিয়ে নিই...' শুয়ে পড়ল সে।

রবিনও হাই তুলতে লাগল। চোখ ডলল দু'হাতে। আর কিছুই করার নেই। সে-ও শুয়ে পড়ল বাংকে।

শুয়ে শুয়ে বিড়বিড় করতে লাগল কিশোর, 'শত শত বছর আগে একবার বাজানো হয়েছিল এভাবে, আজ আবার আমরা বাজালাম! রেডিও-টেলিভিশনের চেয়ে অনেক অনেক পুরানো মাধ্যম! আজকাল অনেক জায়গাতেই এটা নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। তবে প্রথম নিষিদ্ধ হয়েছিল ১৪৫৩ সালে, তুর্কীরা কনস্টান্টিনোপল অধিকার করার পর...এই রবিন, শুনছ...'

সাড়া দিল না রবিন। ঘুমিয়ে পড়েছে।

চোখ মুদল কিশোর।

সতেরো

গাঢ় অন্ধকার। পা পিছলে নর্দমার পানিতে পড়ে গেছে রবিন। ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে তাকে তীব্র স্রোত। হাত-পা নেড়ে ভেসে থাকার চেষ্টা করছে সে। বার বার বাড়ি খাচ্ছে সুড়ঙ্গের দেয়ালে। একবার এপাশে, একবার ওপাশে। বহুদূর থেকে যেন ভেসে এল কিশোরের ডাক, 'রবিন! এই রবিন!'

উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করছে রবিন। পারছে না। কাঁধ চেপে ধরল একটা হাত। কানের কাছে চেঁচিয়ে উঠল কিশোর, 'রবিন! চোখ মেল! ওঠ!'

চোখ মেলল রবিন। মিটমিট করে তাকাল। প্রথমে বুঝতে পারল না কোথায় রয়েছে। মুখের ওপর ঝুঁকে আছে কিশোরের মুখ। হাসছে।

'রবিন! দেখ কে এসেছে। ওঠ, উঠে বস!'

উঠে বসল রবিন। কিশোর সামনে থেকে সরে দাঁড়াল। নজরে পড়ল বব ব্রাউনের হাসি হাসি মুখ।

'দারুণ কাজ দেখিয়েছে, রবিন!' এগিয়ে এল বব। রবিনের কাঁধে হাত রাখল। 'তোমরা সবাই! এতটা আশা করিনি!'

চোখ মিটমিট করে ববের দিকে তাকাল রবিন। 'প্রিন্স দিমিত্রি? সে ভাল আছে?'

'খুব ভাল। এই এসে পড়ল বলে,' বলল বব। 'ডিউক রোজার, তার প্রধানমন্ত্রী এবং দলের আর সবাইকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে। রোজার আর লুথারকে আচ্ছামত ধোলাই দিয়েছে জনতা। প্রিন্স দিমিত্রি ঠিক সময়ে এসে না পড়লে মেরেই ফেলত। মরিডোর বাবাকে মুক্তি দেয়া হয়েছে। আবার প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছেন তিনি...'

উল্টোদিকের সেলের দরজা খোলার শব্দ হল। বেরিয়ে এল মুসা আর মরিডো। এই সেলে এসে ঢুকল। পেছনে এল দুই পুলিশ অফিসারের একজন। হাসি একান-ওকান হয়ে গেছে দুজনেরই।

'ঘন্টা বাজানর পর কি কি হয়েছে, নিশ্চয় জানতে ইচ্ছে করছে তোমাদের না?' চারজনের দিকেই তাকাল একবার বব।

মাথা ঝোঁকাল তিন গোয়েন্দা।

'তোমাদের সঙ্গে হঠাৎ রেডিও যোগাযোগ বন্ধ হয়ে গেল,' বলল বব। 'উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লাম। আজ ভোরে আর থাকতে না পেরে অ্যামব্যাসাডর সাহেবকে নিয়ে বেরিয়েই পড়লাম। প্রাসাদের মেইন গেট বন্ধ। তালা দেয়া। গেটের ওপাশে গার্ড। ভেতরে ঢুকব, বললাম। গেট খুলল না ওরা। ডিউক রোজারের হুকুম, খোলা যাবে না, বলল। এর পরেও দরজা খোলার জন্যে চাপাচাপি করছি, এই সময় বেজে উঠল প্রিন্স পলের ঘন্টা। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেল রাস্তার লোক। তারপর, বেজেই চলল ঘন্টা। পিলপিল করে ঘর থেকে বেরিয়ে এল মানুষ। বন্যার মত ধেয়ে এল

প্রাসাদের দিকে। গেট খুলে দিতে বলল গার্ডদেরকে। প্রিন্স দিমিত্রির কি হয়েছে, জানতে চাইল। ওদেরকে সন্তুষ্ট করতে পারল না গার্ডেরা। ব্যস, খেপে গেল জনতা। ধাক্কা দিয়ে ভেঙে ফেলল গেট। ঢুকে পড়ল আঙিনায়। হাতে গোনা কয়েকজন গার্ডের সাধ্য হল না সে জনস্রোতকে থামানর। দেখতে দেখতে ভরে গেল আঙিনা। বারান্দায় উঠে পড়ল গার্ডেরা। ঠিক এই সময়, দোতলায় রেলিঙের কাছে এসে দাঁড়াল এক প্রহরী। চেঁচিয়ে বলল জনতাকে, প্রিন্স দিমিত্রি সাংঘাতিক বিপদে পড়েছে। তাকে যেন উদ্ধার করে তারা। কয়েদখানায় প্রিন্সকে আটকে রেখেছে শয়তান ডিউক রোজার। ভয়ানক এক ষড়যন্ত্র করেছে। ব্যস, আমিও পেয়ে গেলাম সুযোগ,' হাসল বব। 'উঠে দাঁড়ালাম গাড়ির ছাতে। ভ্যারানিয়ান ভাষা জানি। শুরু করলাম শ্লোগানঃ প্রিন্স দিমিত্রি! জিন্দাবাদ! ডিউক রোজার! নিপাত যাক।' থামল সে। তারপর বলল, 'এমনিতেই ডিউক রোজারকে দেখতে পারে না জনসাধারণ। গতরাতে রেডিও-টেলিভিশনে বারবার ঘোষণা করা হয়েছে, সকাল আটটায় জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেবে রোজার। প্রাসাদের গেট তালা দিয়ে রাখা হয়েছে। হঠাৎ বেজে উঠেছে প্রিন্স পলের ঘন্টা। দোতলায় গার্ডের সাহায্যের আবেদন, আবার শ্লোগান···দুয়ে দুয়ে ঠিক চার মিলিয়ে নিল জনতা। বারুদে জ্বলন্ত ম্যাচের কাঠি পড়ল যেন। গার্ডদের আক্রমণ করে বসল ওরা। তারপর যা একখান দৃশ্য! বলে বোঝাতে পারব না! প্রাসাদে ঢুকে পড়ল জনতা। চাপের মুখে প্রিন্স দিমিত্রিকে কোথায় আটকে রেখেছে, দেখিয়ে দিতে বাধ্য হল গার্ডেরা। বের করে আনা হল তাকে। সত্যি, প্রিন্স বটে! ওইটুকু ছেলে! অথচ বেরিয়েই কি সুন্দর থামিয়ে ফেলল সব গোলমাল। রোজার আর লুথারকে অ্যারেস্ট করার আদেশ দিল। বেগতিক দেখে দল বদল করল গার্ডেরা, যারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। এবার বিশ্বাসঘাতকতা করল ওরা দুই ডিউকের সঙ্গে। ওদেরকে ধরে আনতে ছুটল। গিয়ে দেখল ঘরের দরজা ভাঙা। দুজনকে ধরে বেদম পেটাচ্ছে জনতা। কোনমতে উদ্ধার করে আনা হয়েছে ওদেরকে। তারপর আর কি? দোতলায় দাঁড়িয়ে জনতার উদ্দেশে মিনিট দুয়েক ভাষণ দিল প্রিন্স। থেমে গেল সব গোলমাল।'

'এখন দু-এক ঘা লাগানো যায় না রোজারকে?' শার্টের হাতা গোটাল মুসা। 'মানে, হাতের ঝাল একটু মিটিয়ে নিতাম।'

হেসে ফেলল সবাই।

'না,' হাসতে হাসতে বলল বব। 'সুযোগ হারিয়েছে। জেলখানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে বিশ্বাসঘাতকদের সব কটা রুই-কাতলাকে। চুনোপুটিগুলো ছাড়াই আছে। ওরা আর কিছু করতে সাহস পাবে না।'

'ক্যালিফোর্নিয়ায় ইচ্ছে করেই অ্যাক্সিডেন্ট ঘটাতে চেয়েছিল লিমোসিনের ড্রাইভার,' বলল কিশোর। 'এখন এটা পরিষ্কার। 'ওই ব্যাটাও রোজারেরই লোক। বিশ্বাসঘাতক। প্রিন্স দিমিত্রিকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল ওরা আমেরিকায়

থাকতেই।'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝোঁকাল বব। 'ওরা...' থেমে গেল সে।

শোরগোল উঠেছে বাইরে। শোনা যাচ্ছে শ্লোগানঃ প্রিন্স! প্রিন্স! লঙ লিভ দ্য প্রিন্স!'

সেলের দরজায় এসে দাঁড়াল দিমিত্রি। ছুটে এসে ঢুকল। জড়িয়ে ধরল বন্ধুদেরকে। 'তোমরা সত্যি আমার বন্ধু! তোমরা না এলে...' কথা শেষ করতে পারল না রাজকুমার। ধরে এসেছে গলা।

আলিঙ্গন মুক্ত হল দিমিত্রি। মরিডোর দিকে তাকাল। 'ঘন্টা বাজানর বুদ্ধিটা কার?'

'কিশোরের,' বলল মরিডো। 'আমরা তো খালি-রেডিও টেলিভিশন আর খবরের কাগজের কথাই ভাবছিলাম। ঘন্টার কথা মনেই আসেনি...'

'ধন্যবাদ...।'

'...ধন্যবাদটা আসলে তোমার আর রবিনের পাওয়া উচিত, প্রিন্স,' মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল কিশোর। 'ষোলোশো পঁচাত্তরের সেই বিদ্রোহের কথা তোমরাই বলেছিলে। নইলে জানতে পারতাম না। মাথায় ঢুকত না ঘন্টা বাজিয়ে দেশবাসীর কাছে সাহায্য চাওয়ার কথা...'

'যত যা-ই বল! তোমরা না এলে গিয়েছিল ভ্যারানিয়া!' হাসল দিমিত্রি। 'প্রিন্স পল এখন বেঁচে থাকলে তোমাদেরকে মাথায় নিয়ে নাচতেন...' থেমে গেল রাজকুমার।

হঠাৎ আবার বেজে উঠেছে প্রিন্স পলের ঘন্টা। বেজেই চলল, তালে তালে।

আবার বলল দিমিত্রি, 'সাঁঝ পর্যন্ত ঘন্টা বাজাতে বলে এসেছি আমি। আনন্দ প্রকাশের জন্যে, জয়ের আনন্দ,' চুপ করল রাজকুমার। বিষণ্ন হয়ে গেল হঠাৎ। 'তবে, রূপালী মাকড়সা সঙ্গে থাকলে পরিপূর্ণ হত আনন্দ!'

'দিমিত্রি,' বলল কিশোর। 'আমাকে আরেকবার সেই ঘরে নিয়ে চল। প্রাসাদে, যে-ঘরে আমরা ঘুমিয়েছি। আরেকবার দেখি চেষ্টা করে, রূপালী মাকড়সা বের করা যায় কিনা! একটা ব্যাপারে খচখচ করছে মনের ভেতর...'

'তুমি জান কোথায় আছে রূপালী মাকড়সা!' চেঁচিয়ে উঠল রবিন। 'তাহলে আগে বলনি কেন?'

'যা উত্তেজনা গেছে, ভাবারই সুযোগ পাইনি,' বলল কিশোর। 'তবে, ঘুমিয়ে এখন ঝরঝরে লাগছে শরীরটা। মগজের ধূসর কোষগুলো আবার কাজ করতে শুরু করেছে...চল চল, আর দেরি করে লাভ নেই...এখুনি বেরিয়ে পড়ি...'

রাস্তার দু'পাশে লোকের ভিড়। মাঝখান দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে গাড়ি। হাত নাড়ছে জনতা। চেঁচাচ্ছে। সবারই মুখে এক কথাঃ লঙ লিভ দ্য প্রিন্স!

ছলছল করছে দিমিত্রির চোখ। হাত নেড়ে তাদের সংবর্ধনার জবাব দিচ্ছে।

অনেক অনেকক্ষণ পর পাসাদের আঙিনায় এসে ঢুকল গাড়ি। ঘিরে ধরল সশস্ত্র প্রহরী। ওরা সবাই মিনস্ট্রেল পার্টির লোক। দিমিত্রি নামতেই দু'দিক থেকে এগিয়ে এল দুজন দেহরক্ষী।

একে একে কিশোর, মুসা আর রবিনও নেমে পড়ল। ড্রাইভারের সিট থেকে নেমে এল মরিডো। তিন গোয়েন্দার দু'পাশেও এসে দাঁড়িয়ে গেল তলোয়ারধারী দেহরক্ষী। রবিনের দিকে চেয়ে সবার অলক্ষ্যে চোখ টিপল মুসা। ভাবখানাঃ কি ব্যাপার! আমরাও প্রিন্স হয়ে গেলাম নাকি! মুচকে হাসল রবিন।

অনেক অলিগলি করিডর আর সিঁড়ি পেরিয়ে তেতলার সেই ঘরে এসে ঢুকল ওরা। দিমিত্রি, তিন গোয়েন্দা আর মরিডো। দেহরক্ষীরা সব দাঁড়িয়ে রইল বাইরে।

'এ ঘরের কোন জায়গায়ই খোঁজা বাদ দিইনি,' বলল কিশোর। 'শুধু একটা জায়গা ছাড়া। যদি থাকে, ওই একটা জায়গাতে আছে রূপালী মাকড়সা। হয়ত আমার ভুলও হতে পারে, হয়ত, পকেটেই রেখেছিল রবিন। নদীতে পড়ে গেছে...'

'দূর!' হাত তুলল মুসা। 'তোমার বক্তৃতা থামাও তো, কিশোর! কোথায় আছে, বের করে ফেল!'

'ঠিক আছে দেখি,' ঘরের কোণে এগিয়ে গেল কিশোর খাট ঘুরে। হাঁটু আর কনুইয়ে ভর দিয়ে উপুড় হল। জালটা এখনও আগের জায়গায়ই ঝুলছে। হামাগুড়ি দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল মাকড়সার জালের দিকে।

তক্তার প্রান্ত আর মেঝের ফাঁকে গায়ে গা ঠেকিয়ে বসে আছে দুটো মাকড়সা। হাত বাড়াল কিশোর। চট করে ভেতরে ঢুকে পড়ল একটা মাকড়সা। আরেকটা বসেই রইল। লাল লাল চোখ।

হাত আরও সামনে বাড়াল কিশোর। আরও, আরও। নড়ল না মাকড়সা। দু'আঙুলে চেপে ধরল সোনালি মাথাটা। তবু নড়ল না মাকড়সা। ধীরে ধীরে বের করে নিয়ে এল সে ওটাকে। হাতের তালুতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। হেঁটে এসে দাঁড়াল প্রিন্স দিমিত্রির সামনে।

'এই যে, দেখ!' তালুতে বসা মাকড়সাটা দেখাল কিশোর।

'ভ্যারানিয়ার রূপালী মাকড়সা,' বিড়বিড় করে বলল দিমিত্রি। 'আসলটা!'

'উত্তেজিত না থাকলে প্রথমবারেই বুঝে যেতাম,' বলল কিশোর। 'দরজায় ধাক্কা দিচ্ছিল গার্ডেরা। লাফিয়ে এসে ঘরে ঢুকেছে মরিডো, অসাধারণ একটা বুদ্ধি খেলে গেল রবিনের মাথায়!'

'আমি রেখেছি!' চোখ বড় বড় হয়ে গেল রবিনের।

'হ্যাঁ। মাথায় আঘাত লাগায় ভুলে গিয়েছ। চমৎকার বুদ্ধি এঁটেছিলে! ঠিক বুঝেছিলে, মাত্র ওই একটা জায়গাতেই খুঁজবে না কেউ। খোঁজার সাহসই করবে না। মাকড়সার মাথা বেরিয়ে আছে, সেই সঙ্গে জাল, জ্যান্ত একটা মাকড়সা ঘোরাফেরা করছে জালের কাছে...নাহ্, দারুণ দেখিয়েছ, নথি!'

'ব্রোজাস!' রবিনের মুখে হাত রাখল দিমিত্রি। 'রবিন, তোমার তুলনা হয় না!

বুঝতে পারছি, অলক্ষ্যে থেকে সেদিন প্রিন্স পলই তোমাদের সঙ্গে দেখা করিয়ে দিয়েছিলেন আমার।'

'মরিডো,' বলল কিশোর। 'মনে আছে, কি বলেছিল জিপসি আলবার্তো? বলেছিল, বিজয়ের ঘন্টা শুনছি আমি! ঠিকই বলেছে! আরও একটা কথা বলেছে সেঃ রূপালী মাকড়সার সঙ্গে সাধারণ মাকড়সার তফাৎ নেই! কথাটা তখন রহস্যময় ঠেকেছিল আমার কাছে। কিন্তু ঘন্টা বাজানর পর যখন প্রিন্স দিমিত্রির বিজয় হল, বুড়ো জাদুকরের কথা মনে পড়ে গেল আমার। তার রহস্যময় কথা আর রহস্য থাকল না। অনুমান করে ফেললাম, কোথায় আছে রূপালী মাকড়সা।'

'কিন্তু কি করে জানাল সে?' ভুরু কুঁচকে গেছে মুসার। জ্বিনটিন বশ নেই তো তার?'

'মোটেই না,' বলল কিশোর। 'আসলে, মস্তবড় থট রীডার সে। ওই যে নীল ধোঁয়া ওটা এক ধরনের কেমিক্যাল। ওটা শুঁকিয়েছে আমাদেরকে। তারপর সম্মোহন করেছে। তোমার অবচেতন মনে গাঁথা রয়েছে রূপালী মাকড়সার কথা, সেখান থেকে মুছে যায়নি। ঠিক ওখানে পঠিয়ে দিয়েছিল বুড়ো আলবার্তো তার ব্রেনওয়েভ বা ওই জাতীয় কিছু। বের করে এনেছিল মনের যত কথা। খুব ভাল ভবিষ্যৎ-বক্তাও সে। আশ্চর্য ক্ষমতা…রোজারকে অপছন্দ করে সে, তাই বলেনি কোথায় আছে রূপালী মাকড়সা।' দিমিত্রির দিকে চেয়ে হাসল। 'কাজেই, বুঝতেই পারছ, রূপালী মাকড়সাটার খোঁজ আসলে আলবার্তোই দিয়েছে...'

'দিয়েছে, কিন্তু আর কেউ তো সে কথার মানে বের করতে পারেনি,' কিশোরের হাত থেকে রূপালী মাকড়সাটা নিল দিমিত্রি। রুমালে পেঁচিয়ে সাবধানে রাখল পকেটে। 'সে যাই হোক, তোমাদের ঋণ শোধ করতে পারব না আমি।' আরেক পকেট থেকে তিনটে রূপালী মাকড়সা বের করল সে। তিনটাতেই রূপার চেন আটকানো। এক এক করে তিন গোয়েন্দার গলায় তিনটে মাকড়সা ঝুলিয়ে দিল সে।

হাত তালি দিয়ে উঠল মরিডো।

'ভ্যারানিয়ার সবচেয়ে সম্মানিত পদক,' হেসে বলল দিমিত্রি। 'অর্ডার অফ দ্য সিলভার স্পাইডার। তোমাদেরকে ভ্যারানিয়ার নাগরিকের সম্মানও দিয়েছি আমি। এর চেয়ে বেশি সম্মান দেবার ক্ষমতা আমার নেই। তোমাদের কারও কোন ইচ্ছে থাকলে বল, পূরণ করার যথাসাধ্য চেষ্টা করব আমি।'

'না না, আর…' বলতে গিয়ে বাধা পেয়ে থেমে গেল কিশোর।

'আছে,' কথার মাঝখানেই কথা বলে উঠেছে মুসা। 'আমার একটা ইচ্ছে আছে। সামান্য কিছু খাবার হবে? বেশি না, এই ডজনখানেক স্যাণ্ডউইচ, একটা মুরগি, ডিম, কিছু আঙুর আর এক জগ দুধ হলেই চলবে আপাতত।'

হো হো করে হেসে উঠল সবাই।

—০—

ভলিউম ১/১

তিন গোয়েন্দা

রকিব হাসান

হাল্লো, কিশোর বন্ধুরা—
আমি কিশোর পাশা বলছি, আমেরিকার রকি বীচ থেকে।
জায়গাটা লস অ্যাঞ্জেলেসে, প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে,
হলিউড থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে।
যারা এখনও আমাদের পরিচয় জানো না, তাদের বলছি,
আমরা তিন বন্ধু একটা গোয়েন্দা সংস্থা খুলেছি, নাম

তিন গোয়েন্দা।

আমি বাঙালী। থাকি চাচা-চাচীর কাছে।
দুই বন্ধুর একজনের নাম মুসা আমান, ব্যায়ামবীর,
আমেরিকান নিগ্রো; অন্যজন আইরিশ আমেরিকান,
রবিন মিলফোর্ড, বইয়ের পোকা।
একই ক্লাসে পড়ি আমরা।
পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ডে লোহা-লক্কড়ের জঞ্জালের নিচে
পুরানো এক মোবাইল হোম-এ আমাদের হেডকোয়ার্টার।

তিনটি রহস্যের সমাধান করতে চলেছি—
এসো না, চলে এসো আমাদের দলে।

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রূম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রূম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০